# এক এগারো

## এক-এগারো

বাংলাদেশ ২০০৭-২০০৮

মহিউদ্দিন আহমদ



# এক-এগারো

## বাংলাদেশ ২০০৭-২০০৮

মহিউদ্দিন আহমদ

প্রথমা প্রকাশন

প্রথমা
প্রকাশন

এক-এগারো : বাংলাদেশ ২০০৭-২০০৮

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৯
ফাল্গুন ১৪২৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন : ৮১৮০০৮১

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল
লেখকের আলোকচিত্র : খালেদ সরকার
বইয়ে ব্যবহৃত আলোকচিত্র : জিয়া ইসলাম, মনিরুল আলম,
সাহাদত পারভেজ। কিছু ছবি সংগৃহীত

মুদ্রণ : ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

**মূল্য : ৯০০ টাকা**

Ek-Egaro
by Mohiuddin Ahmad
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 900 only

ISBN 978 984 525 044 3

# সূচিপত্র

# ভূমিকা

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলো। আশা জেগেছিল, একটি মুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে এবং অনেক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে। সবাই মিলেমিশে এ দেশ গড়ে তুলবেন এবং সবাই সমৃদ্ধ হবেন—এমন একটি স্বপ্ন ছিল সাধারণ মানুষের মনে। বিশ শতকের ষাটের দশকজুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক জাগরণের পথ বেয়ে একটি জাতিরাষ্ট্রের ভিত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা জেগেছিল। সমাজের সব অংশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় এককাট্টা হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধ একদিন শেষ হলো। কিন্তু ফিকে হতে থাকল আশাজাগানিয়া সম্ভাবনার আলো।

ইংরেজি শব্দভান্ডার থেকে দুটি শব্দ ধার নিয়ে স্বপ্নভঙ্গের আলোচনাটি শুরু করা যাক। অর্থশাস্ত্রে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বিপরীতে অলিগোপলি (Oligopoly) বা কয়েকটি বড় গোষ্ঠীর দখলদারি কায়েম হতে দেখা যায়। ওই গোষ্ঠীগুলো নিজেরা সলাপরামর্শ করে অথবা একে অপরকে দেখে ইচ্ছেমতো পণ্যের দরদাম হাঁকায়। ভোক্তা সেখানে নিরুপায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অলিগার্কি (Oligarchy) বা গোষ্ঠীতন্ত্রের উল্লেখ আছে, যেখানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ক্ষুদ্র দু-একটি বর্গের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় একচেটিয়া কারবার কিংবা গোষ্ঠীশাসন সংগতিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য নয়। গণতন্ত্রে সাধারণ নাগরিকেরাই মুখ্য এবং মৌল উপাদান। রাষ্ট্রনীতির এই জটিল বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন কথামালার একটি গল্প দিয়ে :

> এক কৃষক কৃষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে পুত্রদিগকে ওই সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বলিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে

পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল ওই-সকল ভূমির অভ্যন্তরে পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা গুপ্তধনের লোভে সেই-সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল। এইরূপে যারপরনাই পরিশ্রম করিয়া তাহারা গুপ্তধন কিছু পাইল না বটে, কিন্তু, ওই-সকল ভূমির অতিশয় খনন হওয়াতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল, যে, গুপ্তধন না পাইয়াও তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাইল।—*কথামালা*, পৃষ্ঠা ৩৮

আমাদের পোলিটিক্যাল ক্ষেত্র হইতে কোনো গুপ্তধন পাইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এরূপ যাঁহারা প্রত্যাশা করেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন—কিন্তু সকলে একত্র মিলিয়া কর্ষণে যে শস্য জন্মিবে তাহাতে পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে ('কথামালার একটি গল্প', *সাধনা*, বৈশাখ ১৩০২)।

বাহাত্তরের সংবিধানে কয়েকটি জনপ্রিয় ও মুখরোচক শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি। পরে বোঝা গেছে, এ শব্দগুলো নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল, জাতীয় ঐকমত্যও তৈরি হয়নি। দেশ কোন পথে যাবে, রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হবে, সংবিধানে কী থাকবে আর কী থাকবে না—এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে পেরিয়ে গেছে অনেকটা সময়।

১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে দ্বিদলীয় রাজনীতি শুরু হয়। কিন্তু পারস্পরিক আস্থার জায়গাটি তৈরি হয়নি। ১৯৯০ সালে তিন জোটের রূপরেখায় গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার কাগুজে ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহি না থাকার কারণে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো পাশ কাটিয়ে সংসদে সদস্যরা শুধু বন্দনা, বচসা আর বাগাড়ম্বরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যকার সম্পর্ক সহযোগিতামূলক না হয়ে সংঘাতমূলক হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক সংকটের একটি প্রধান কারণ ছিল বিরোধী দলের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই সরকারের এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা এবং বিরোধী দলের 'বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা'। বিলেত থেকে আমদানি করা 'ওয়েস্টমিনস্টার' পদ্ধতির ছায়া সরকার এ দেশে গড়ে ওঠেনি বা উঠতে দেওয়া হয়নি। ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রে ছন্দপতন হয়েছে বারবার। দ্বিদলীয় রাজনীতির প্রথম পর্বটি সুখকর হলো না। সন্দেহ, অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতার কারণে দলীয় সরকারের অধীনে

নির্বাচন অনুষ্ঠানের রীতি ঠাঁই নিল হিমঘরে। বিকল্প হিসেবে এল নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচনব্যবস্থা। কিন্তু এ ব্যবস্থাও পরাজিত পক্ষ মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি। ফলে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের আগ্রহ দিনে দিনে বেড়েছে।

নির্বাচনে জয় রাজনৈতিক দলকে দায়িত্বশীল ও বিনয়ী করেনি। তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি আক্রোশ ও প্রতিহিংসা নিয়ে ক্ষমতায় বসেছে। এ ছাড়া দলীয় প্রধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য, দলের মধ্যে নিয়ম-নীতির বালাই না থাকা, সহযোগী ছাত্রসংগঠনের সদস্যদের যথেচ্ছাচার—সব মিলিয়ে রাজনীতির একটি অশুভ পরিচিতি দাঁড়াল। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে ইচ্ছেমাফিক সাজানোর প্রবণতা দেখা গেল। এর ফলে সংকট আরও বাড়ল। ২০০৬ সালের শেষ দিকে এসে যুযুধান দুই রাজনৈতিক পরাশক্তি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পরস্পরের মুখোমুখি হলো। তৈরি হলো এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। ঠিক এ সময় এক দমকা হাওয়ায় পাল্টে গেল চালচিত্র। সামরিক বাহিনী রাজনীতির আঙিনায় পা রাখল। দৃশ্যপটে হাজির হলো 'সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। এই সরকারের আয়ু ছিল দুই বছর।

'গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি'—এ রকম একটি আহাজারি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যেমন আছে, তেমনি আছে জনমনে। নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত বিরতিতে নির্বাচন হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করেন, কিন্তু 'গণতন্ত্র' যেন ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। যে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র সবল ও সাবালক হতে পারে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যায় দুর্বল ও নাজুক। ফলে নির্বাচনব্যবস্থা হয়ে পড়ে প্রশ্নবিদ্ধ। সরকার আসবে-যাবে, কিন্তু গণতন্ত্র, অর্থাৎ মানুষের সচেতন অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়বে, সমাজের সব ক্ষেত্রে জবাবদিহি তৈরি হবে, এমনটি যেন হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে আবারও রবীন্দ্রনাথে শরণ নিতে হয় :

> সমাজ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই, কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত তাহা হইলে বিষম গোলযোগ বাধিত। বুদ্ধিবিচারগত আদর্শের উপর সমাজপ্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজপ্রতিষ্ঠা করা হয়—মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোন কাজই সতেজে করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনি করিতে ইচ্ছা যায়

না—সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে ('একটি পুরাতন কথা,' *ভারতী*, অগ্রহায়ণ ১২৯১)।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি এমন একটি ঝড়ের কবলে পড়েছিল বাংলাদেশ। এর অভিঘাত এখনো আছে রাজনীতিতে, সমাজে এবং নাগরিকদের মনোজগতে। ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে এক যুগ। ওই সময়ের একটি বস্তুনিষ্ঠ বয়ান থাকা জরুরি। তবে এখনই তার উপযুক্ত সময় কি না, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে।

১১ জানুয়ারির ঘটনা এক-এগারো নামে গণমাধ্যমে ও জন-আলোচনায় ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। আজও তা নানাভাবে তাড়া করে বেড়ায়। প্রশ্ন হলো, এক-এগারো কি ষড়যন্ত্রের ফসল, নাকি এটা অনিবার্য ছিল। ওই সময় চোখের সামনে অনেক কিছুই ঘটেছে। আবার অনেক কিছু ঘটেছে আড়ালে। সবাই সবটা জানেন না। আর আমজনতার তো অনেক কিছুই অজানা।

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি কয়েক বছর ধরে। ২০০৭-০৮—এই দুই বছর আমাদের ইতিহাসে নানা দিক থেকেই স্বতন্ত্র, আলাদা বৈশিষ্ট্যের। এর একটা সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করার ইচ্ছে ছিল। সমস্যা মূলত একটাই—তথ্য পাব কোথায়। যাঁরা এই সময়ের প্রধান কিংবা পার্শ্বচরিত্র, তাঁরা যদি মুখ না খোলেন, তবে অনেক কিছুই থেকে যাবে অজানা। হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

পত্রপত্রিকায় দৈনন্দিন ঘটনার তথ্য ও প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে অনেক। সূত্র হিসেবে এগুলো যথেষ্ট মূল্যবান। তার চেয়ে কম মূল্যবান নয় যাঁরা এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন এবং জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের বয়ান। আমি চেষ্টা করেছি তাঁদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি জানবার, বুঝবার। কেউ কেউ মন খুলে কথা বলেছেন। তবে সবাই সবটা বলেননি। কিছুটা বলেছেন, কিছুটা লুকিয়েছেন। কেউ কেউ কথা বলতে রাজি হননি।

এই বইয়ে বিশেষ একটি সময়ের যে ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তার বড় একটি অংশ সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রথাগতভাবে প্রশ্নমালা সাজিয়ে উত্তর খুঁজতে যাইনি। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় চলে আসে। আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল সাক্ষাৎকারে অনেকেই মেপে মেপে জবাব দেন। আমি ওপথে হাঁটিনি। আমি চেয়েছি খোলামেলা আলাপের মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে। যাঁর সঙ্গে যখন কথা বলেছি, তিনি হয়তো জানেন না, অন্য কারও সঙ্গে আগে কথা বলেছি বা পরে কথা বলব কি না। দেখা গেছে, একই বিষয়ে একেকজন একেক রকম তথ্য

দিয়েছেন বা মন্তব্য করেছেন। আবার কিছু কিছু বিষয়ে একমত পেয়েছি। এই ভিন্নতাটুকু সময়ের চরিত্রগুলো বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে ওয়ার্কশপ করে তো এ ধরনের তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করা সম্ভব নয়। প্রয়োজনও নেই। একটি হাইপোথিসিস ধরে কিছু একটা প্রমাণ করার জন্য আমি কাজটি হাতে নিইনি। সমাজে মুক্ত আলোচনার আরও অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে আমরা হয়তো আরও ভালোভাবে সময়টিকে জানতে ও বুঝতে পারব।

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, যখন একজন একটি ঘটনা বা প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেন, তখন সে বর্ণনায় অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্ততা বা বিশ্বাসযোগ্যতা স্বচ্ছভাবে ফুটে ওঠে না, বিশেষ করে তা যদি হয় কোনো বিব্রতকর বা ভীতিজনক বিষয় নিয়ে। তাঁর মধ্যে একটা মানসিক চাপ থাকে, যা তাঁর বয়ানে অস্পষ্টতা বা গোঁজামিল তৈরি করে। পাঠকও হয়তো বুঝতে পারেন যে বর্ণনাকারী সবটা পরিষ্কারভাবে বলছেন না। আবার যিনি ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, অন্যের কাছে শুনে তিনি হয়তো একটি বিবরণ তৈরি করেন। মনে হতে পারে, ওই বিবরণটিই বেশি গ্রহণযোগ্য। তিনি যা শুনেছেন, তার সঙ্গে নিজের কিছু পছন্দ-অপছন্দ ও প্রতিক্রিয়া হয়তো নিজের অবচেতনেই যোগ করে পুরো বিষয়টিকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করেন। যিনি অংশগ্রহণ করেন বা দেখেন এবং যিনি শোনেন, তাঁদের উভয়ের বয়ানেই অতিশয়োক্তি অথবা তথ্য গোপনের চেষ্টা থাকতে পারে।

সাক্ষাৎকার পর্বটি ছিল দীর্ঘ। শুরু করেছিলাম ২০১৬ সালের এপ্রিলে, শেষ হয়েছে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে। একটি কথা না বললেই নয়। সাক্ষাৎকারের জন্য যাঁকেই অনুরোধ করেছি, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। আমাকে আস্থায় নিয়ে খোলামনে কথা বলেছেন। এঁদের কেউ কেউ আমার পূর্বপরিচিত, বন্ধু, সতীর্থ। আবার অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরেই পরিচয়। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা না হলে এ বই কোনো দিনই লেখা যেত না।

যাঁরা কথা বলতে রাজি হননি বা সবটা বলতে চাননি, তাঁদের ব্যাপারে আমার একটি সরল মূল্যায়ন আছে। হয়তো তাঁরা মনে করেছেন, কথা বলার অনুকূল সময় এখনো আসেনি। হয়তো তাঁরা অন্যকে বিব্রত করতে চান না। হয়তো তাঁরা মনে করেন, তাঁরা কাজটি ঠিক করেননি। একধরনের অপরাধবোধ হয়তো তাঁদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে এবং সে জন্যই সব তথ্য প্রকাশিত হোক, এটা তাঁরা চান না। কেউ কেউ কথা বললেও অনুরোধ করেছেন, আমি যেন তাঁদের উদ্ধৃত না করি। আবার কারও কারও কাছে

যাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারিনি। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই আমাকে এগোতে হয়েছে।

সীমিত সুযোগ ও সময়ের মধ্যে থেকে কাজটি করতে হয়েছে। তারপরও অনেকের কাছ থেকে উৎসাহজনক সাড়া পেয়েছি। রেজাউল হক মুশতাক, মতিউর রহমান চৌধুরী, আনোয়ার পারভেজ হালিম, বিজন সরকার ও আফজালুর রহমান আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাঁদের তালিকা বইয়ের শেষে দেওয়া আছে। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই বইয়ে যেসব ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, তা সমসাময়িক পত্রিকা, ইন্টারনেট ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com

# এক এগারো

# নাগরিক ভাবনা

বাঙালির জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হোক কিংবা দীর্ঘকাল বিজাতীয় শাসকের অধীনে থাকার কারণেই হোক, সামান্য ত্রুটি দেখলে ক্ষোভে ফেটে পড়া এবং অল্প পাওয়ার আনন্দে নেচে ওঠা এ দেশের মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা। জনজীবন কখনোই সরলরেখায় চলেনি। এখানে অনেক খানাখন্দ, চড়াই-উতরাই। সে জন্য এ দেশে রাজনীতির শব্দভান্ডারে লড়াই-সংগ্রাম-আন্দোলন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়েছে।

১৯৭১ সালে দেশটি নতুন করে স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সংহতির অভাব স্পষ্ট। সব জায়গায় একটা ভাগ-ভাগ ভাব। মতভিন্নতা এখানে দাঙ্গা তৈরি করে; বিতর্কে তার নিষ্পত্তি হয় না। নতুন এই রাষ্ট্রের প্রথম দুই দশক তো গেল নানান ওলট-পালটের মধ্য দিয়ে। ১৯৯১ সালে দেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিক যাত্রায় শামিল হলো। সেই সঙ্গে শুরু হলো দ্বিদলীয় রাজনীতি। দেখা গেল এক দলের সরকার মেয়াদ শেষ করতে না-করতেই তার পতনের আন্দোলন শুরু হয়ে যায় বা তাকে টেনে নামানোর চেষ্টা হয়। সুযোগ পেলে নাগরিকেরা তাঁদের ভোটশক্তি প্রয়োগ করে গণেশ উল্টে দেন। এখানে ভোটাররাই রাজা, এক দিনের জন্য হলেও। কিন্তু তাতে ক্ষমতার কেন্দ্রে দল বদলায়, অবস্থা পাল্টায় না। তারপরও সংসদীয় ব্যবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে দেশজুড়ে একধরনের ঐকমত্য আছে।

দেশে দ্বিদলীয় রাজনীতির উদ্ভব হলেও এক দলের ওপর অন্য দলের সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়নি। ফলে জনগণকে ছাপিয়ে রাজনীতিতে দুই পরাশক্তির উদ্ভব হয়েছে। উভয়েই জিততে চায়। কেউ হারতে রাজি নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন হলো একটি আবশ্যিক শর্ত। জনপ্রতিনিধি ঠিক করার জন্য এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে সেই নির্বাচন পদ্ধতি নষ্ট করে দিচ্ছে একটি দুষ্টচক্র, যারা সব সময়

ক্ষমতা কবজায় রাখতে চায়। ফলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৯৪ সালে এল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা। এ ধরনের অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে পরপর দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পরাজিত পক্ষ কখনোই ফলাফল মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি।

এ দেশে বিপদে-আপদে-সংকটে নাগরিক সমাজ সাধ্যমতো ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর দশকের সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং ১৯৮০-র দশকে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে নাগরিক সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা যায়। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নাগরিক সমাজের একধরনের আড়াআড়ি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। শুধু এ দেশে নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই নাগরিক সংগঠনগুলো দুর্বল। এখানেও রাজনৈতিকীকরণ হয়েছে। কেউ কেউ রাষ্ট্রশক্তির কাছে নিজেকে সহজেই বিকিয়ে দেন। এর সুযোগ নিয়ে অনেক রাজনীতিবিদ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের হেলাফেলা করেন। নিজ নিজ জায়গায় থেকে দেশের জন্য, সমাজের জন্য কাজ করার অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নাগরিক সমাজ তার আরাধ্য কাজটি অনেক সময় করতে পারেনি।

নাগরিক সমাজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এস্টাবলিশমেন্টবিরোধী। তারা হলো প্রেশার গ্রুপ কিংবা ওয়াচডগ। এটা অনেক সময় সরকার বুঝতে চায় না। আবার নাগরিক সমাজ কোনো কোনো সময় বুঝে কিংবা না বুঝে নিজের সীমানা অতিক্রম করতে চায়।

নাগরিক সমাজে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সম্মিলনগুলোর মধ্যে আছে বিদ্বজ্জন (অ্যাকাডেমিয়া), দাতব্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও), স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলন (মানবাধিকার, জেন্ডার, পরিবেশ, শান্তি, উন্নয়ন ইত্যাদি)। মোদ্দা কথা হচ্ছে, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের এসব সম্মিলন বা সংগঠন রাষ্ট্রশক্তির বা রাষ্ট্রপরিচালনাকারী সরকার বা রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষ নয়, তাদের পক্ষভুক্তও নয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতে ঘুরপাক খেলেও তার ভালো-মন্দ সবকিছুই দেশের সব নাগরিকের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে নাগরিকদের নানান ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগ এবং মতপ্রকাশের নানান অবলম্বন। এভাবেই দেশে গড়ে উঠেছে অনেক নাগরিক সংগঠন। নাগরিকেরা কীভাবে ভালো থাকবেন, এ নিয়ে যেমন তাঁরা কথাবার্তা বলেন, তেমনি রাজনীতির নানান বিষয়ে তাঁরা মতামতও দিয়ে থাকেন।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) তেমন একটি নাগরিক সংগঠন। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে সিপিডি ১৬টি টাস্কফোর্স তৈরি করে বাংলাদেশের উন্নয়নে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ তৈরি করেছিল। ওই নির্বাচনে জয় পেয়ে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল।

২০০৭ সালে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, সিপিডি তখন আবার নড়েচড়ে বসে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ৫০ বছরে পা রাখবে। তখন বাংলাদেশের চেহারা কেমন হবে? নাগরিকেরা কেমন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেন? এই ভাবনা থেকে সিপিডি একটি ভিশন বা রূপকল্পের চিন্তা করে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় 'নাগরিক সংলাপের' ধারণা। ২০০৬ সালের ২০ মার্চ ঢাকার শেরাটন হোটেলে সমাজের বিভিন্ন অংশের নাগরিকদের এক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় 'জাতীয় নাগরিক সংলাপ'। সিপিডির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সহ-উদ্যোক্তা হিসেবে জাতীয় দৈনিক *প্রথম আলো* এবং *দ্য ডেইলি স্টার* এতে শামিল হয়। সংলাপের আয়োজন করা হয়েছিল ২০০৭ সালের জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে। আসন্ন এই নির্বাচন ঘিরে নাগরিকদের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে আলোচনাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সে জন্য এই আয়োজনের শিরোনাম দেওয়া হয় 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ'। উদ্যোক্তাদের এই আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো রাখঢাক ছিল না। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তাঁর সূচনা বক্তব্যে সংলাপের মূল প্রতিপাদ্য কী, তা খোলাসা করে বলেন:

> ...আমাদের আরেকটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে নিজের দলের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোতে সাংসদসহ নেতৃবৃন্দের অবহেলা, তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ। তাই ইশতেহারগুলোর প্রস্তুতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি, এসব নির্বাচনী ইশতেহারকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দেশের জনগণের একটি গ্রহণযোগ্য সামাজিক চুক্তি হিসেবে আইনানুগভাবে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।...
>
> বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তত ৪০ শতাংশ বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করতে হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব-অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থানের সঙ্গে ফলপ্রসূভাবে সংযুক্ত করতে হবে।...উন্নয়নের চলমান বিকৃত ধারায় অগ্রাভিমুখী পরিবর্তন আনতে হলে সর্বোপরি প্রয়োজন হবে বিকাশমান আধুনিক

খাতগুলোতে নিম্ন আয়ের মানুষের হিস্যা বাড়ানো। তাই প্রয়োজন হবে নতুন সম্পদে প্রান্তিক মানুষগুলোর অধিকার বৃদ্ধির, যাতে করে তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আক্রান্ত দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে।

সেই ত্বরান্বিত ও প্রাগ্রসর উন্নয়ন-সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের চাবিকাঠি বর্তমানে অপশাসনের কাছে জিম্মি হয়ে আছে।...অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন আনতে হলে প্রয়োজন হবে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যার কেন্দ্রবিন্দু হবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার। এর জন্য আরও প্রয়োজন একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, রাজনীতির প্রভাবমুক্ত প্রশাসন, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন, সক্ষম দুর্নীতি দমন কমিশন ও প্রভাবশালী মানবাধিকার কমিশন এবং আরও অনেক সৃষ্টিশীল প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর।

কিন্তু অর্থনৈতিক সুশাসনকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশকে আগামী দেড় দশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করতে হলে সর্বোপরি প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক বাতাবরণ। বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির জনমুখী মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া এই উন্নয়ন সম্ভাবনার আধখোলা দরজাকে পুরোপুরিভাবে উন্মুক্ত করা যাবে না।

আগামী নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচনের অভিপ্রায়ে সংশ্লিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও জোরালো ও অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আর সেই লক্ষ্যে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করব। আমরা সবাই বুঝি যে এই উদ্যোগ কোনো একক নির্বাচনে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়। কিন্তু আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা একটা সূচনা করতে চাই এবং এ প্রচেষ্টা থেকে কিছু সুফলও প্রত্যাশা করি।...

কেউ যদি মনে করেন, ভিনদেশিরা অথবা অন্য কোনো শক্তি আমাদের দেশের বিকাশমান পরিস্থিতির ওপর শান্তি ও শৃঙ্খলা আরোপ করে তাকে সামাল দেবে, তবে সেটা হবে সবচেয়ে বড় বাতুলতা। তাই জোর দিয়ে বলা দরকার, বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনের কোনো বিকল্প নেই।[১]

সূচনা বক্তব্যে নাগরিকদের চাওয়া মোটামুটি পরিষ্কার যে দেশে অর্থনীতির চাকা আরও সচল করতে হবে, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষকে উন্নয়নের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে এবং অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজন রাজনৈতিক সুশাসনের।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ফসল হিসেবে ১৯৯১ সালে এ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হয়েছিল। মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিলেন। ওই সময় রাজপথে উচ্চারিত হয়েছিল—আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব। বিগত সামরিক সরকারগুলোর আমলে মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছিল। এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের প্রত্যাশা ছিল জনমনে। সমাজে সংঘাত বেড়েছে, স্বস্তি আসেনি। আশাভঙ্গ হয়েছে মানুষের। সংলাপের সহ-আয়োজক *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন :

> আজ গণতন্ত্রের সঙ্গে অগণতান্ত্রিক শক্তির, অসাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার, সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে সংঘাতময় রাজনীতির, শুভর সঙ্গে অশুভর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ সামরিক শাসনের পর ১৯৯১ সাল থেকে বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি—পরপর তিনটি নির্বাচিত সরকার আমাদেরকে এই গভীর সংকটের মধ্যে নিয়ে গেছে।...যে দল বিজয়ী হয়েছে তারা রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান ও তহবিলের ওপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে।...সংসদে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতিগত আলোচনা হয় না।...এভাবেই সংসদ অকার্যকর হয়ে আছে।...এ ব্যাপারে দেশের দুই প্রধান দল বিএনপি আর আওয়ামী লীগের ভূমিকা প্রায় অভিন্ন।[২]

পরবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তার জন্য একটি নীতি-দায়বদ্ধতা তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মতিউর রহমান বলেন, 'এখানে নাগরিক সমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে।' বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য তিনি ১৯২৩ সালের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন বাতিল করে অবাধ তথ্যপ্রবাহের আইন প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।[৩]

অপর সহ-আয়োজক *দ্য ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহ্ফুজ আনাম বিরাজমান পরিস্থিতিতে নাগরিক সমাজের দায়দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, সুশীল সমাজ 'অতি সাবধানতা' রোগে ভুগছে। এ জন্য তারা নিষ্ক্রিয় ও চুপ করে বসে আছে। তাদের উচিত, নিজেদের অবস্থানে থেকে জোর দিয়ে বলা—কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। সরকার যত গণতান্ত্রিকই হোক না কেন, সে চায় একটা 'নির্বাক জনগোষ্ঠী'। এ জন্য প্রতিনিয়ত ব্যক্তি, সমষ্টিগত ও জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 'ইটারনাল ভিজিলেন্স ইজ দ্য প্রাইম অব লিবার্টি'। সে জন্য 'সুশীল সমাজকে' আরও বেশি সাহসের সঙ্গে

কথা বলতে হবে, দাবি উচ্চারণ করতে হবে। রাজনীতির সঙ্গে নাগরিক সমাজের সম্পর্ক কেমন হবে, এ প্রসঙ্গে মাহ্ফুজ আনাম বলেন :

> আমরা অনেকেই মনে করি, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অর্থই হচ্ছে দলীয় রাজনীতির অংশ হওয়া। আমি এটা মনে করি না। যেকোনো লোক যেকোনো দলকে পছন্দ করতে পারে, কিন্তু বিশাল জনগোষ্ঠী যারা কোনো দলীয় রাজনীতিতে জড়িত হতে চায় না, তাহলে কি তারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হবে না?...আমরা হয়তো কেউ সক্রিয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে রাজি নই, অথবা সে ধরনের মানসিকতা আমাদের নেই, কিন্তু আমরা সবাই চাই, যেন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরাই আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। তাহলে কেমন করে তাঁরা নির্বাচিত হবেন, যদি আমরা সে ধরনের একটি পরিবেশ সৃষ্টি না করি, অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের না জড়াই, সেখানেই রয়েছে সুশীল সমাজের ভূমিকা।...
>
> আমরা যখন রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করি, তখন তাঁদের গুণগত মান উন্নত করার জন্যই সমালোচনা করি। তাঁদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বসানোর অভিপ্রায় থেকে করি না। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রমাণিত যে গণতন্ত্রই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আমরা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোনো রকম ব্যবস্থাকে গ্রহণ করব না। আমরা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের স্বার্থেই রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করে থাকি।[৪]

সম্মেলনের সভাপতি সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হতে পারত, তা সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। সব জায়গায় দলীয়করণ হয়েছে, এমনকি বিচার বিভাগ এবং সশস্ত্র বাহিনীর চাকরির ক্ষেত্রেও। পেশাজীবী গোষ্ঠীগুলোও রাজনৈতিক কর্মীর ছদ্মাবরণে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। দুর্নীতিও দলীয় রূপ নিয়েছে এবং বিজয়ী দল সব নিয়মকানুন ও জবাবদিহি বাদ দিয়ে সব সুবিধা নিচ্ছে। সমাজে চলছে টাকা আর পেশির শাসন। ফলে দুর্বলেরা হচ্ছে আরও অরক্ষিত এবং থেকে যাচ্ছে নির্বাচনের বাইরে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় শুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার এবং অর্থনীতির নির্দেশিত পথে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে অধ্যাপক সোবহান বলেন :

আমরা সুশীল সমাজের উদ্বেগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য, যা এমন সব জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবে, যাঁদের অতীত ও বর্তমান কর্মকাণ্ড ত্রুটিমুক্ত, যাঁরা টাকা আর পেশিশক্তি প্রয়োগের বদলে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন, যাঁদের কাছে অধিকতর ন্যায়সংগত ও জবাবদিহিতাপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সৎ ও কার্যকর শাসন প্রত্যাশা করা যেতে পারে। সুশীল সমাজের কাজ হবে সেসব লোকের ক্ষমতায়ন করা, যাঁরা একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত। এর মাধ্যমে এমন সব উপায় খুঁজে বের করা হবে, যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যাশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ প্রার্থী বাছাইয়ে উৎসাহিত করার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থা নতুন করে বিন্যাস করা যেতে পারে।[৫]

নাগরিক সংলাপের এই সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। 'দশের জন্য, দেশের জন্য' শিরোনামে এক লিখিত প্রবন্ধে তিনি বিরাজমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে গণতন্ত্রের নানাবিধ সংকটের দিকে ইঙ্গিত করেন। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার ও পরিবারতন্ত্রের সমালোচনা করে তিনি বলেন :

আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা মুষ্টিমেয় এবং মহাপ্রতাপান্বিত। আমরা আর মামুরা—এই স্বজনতন্ত্র ও স্বজনাশ্রিত রেওয়াজের একটা আশু সমাধান হওয়া উচিত। সমাজে কীভাবে পরিবারতন্ত্র বা প্রায়-রাজতন্ত্রের বিকাশ লাভ করে, নৃতাত্ত্বিকদের কাছে তার গবেষণার জন্য বাংলাদেশ একটা বড় আকর্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক চারণভূমি। গণতন্ত্রের জন্য বটবৃক্ষ ভালো নয়। ভালো নয় অঞ্চলপ্রভাব। গণতন্ত্রের পরিবর্তে আমরা মনোনয়নতন্ত্র সৃষ্টি করেছি। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র বা সাংস্কৃতিক অঙ্গসংগঠন সব দলীয় প্রধানের মনোনয়নসিঞ্চনে প্রাণ পায়। দলীয় প্রধানের প্রাধান্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ছাড়িয়ে সর্বত্র এক বিস্ময়কর বশংবদ প্রজাকুলের সৃষ্টি করেছে।[৬]

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান নাগরিক সমাজের অবস্থানটি স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, সুশীল সমাজ সংসদের বিকল্প নয়, অকার্যকর সংসদেরও বিকল্প নয়। 'ওঁরা জনমত সৃষ্টি করতে পারেন, উৎসাহ দিতে পারেন এবং প্রয়োজনে লজ্জাও দিতে পারেন। চাটুকারের "জিয়ো জিয়ো"র চেয়ে



সিপিডি আয়োজিত নাগরিক সংলাপে ভাষণ দিচ্ছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

ছিদ্রান্বেষীর দুয়োধ্বনি সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করতে অধিকতর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।' কেমন রাষ্ট্র চাই, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> আমি ন্যূনতম রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাস করি না।...বিত্তবানরা রাষ্ট্রের পরিধি সংকুচিত রাখতে চায় যাতে করে তাদের আয় ও অর্জনের ওপর কর কম দিতে হয়।...আমাদের দেশে দরিদ্র দিশেহারা মানুষের কাছে রাষ্ট্র হচ্ছে বাপ-মা। মানুষ কল্যাণকর রাষ্ট্রের কথা ভাবে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সে লক্ষ্য আমাদের আয়ত্তের বাইরে হলেও সে আমাদের স্বপ্ন।...সরকার তার নিয়ামকের দায়িত্ব যদি না পালন করেন, দরিদ্র সেবাগ্রাহকদের কে রক্ষা করবে?
>
> গত দেড় দশকের অধিককাল ধরে যাঁরা সংসদকে অকার্যকর করে রেখেছেন এবং ওয়াকআউটের মধ্যে সংসদীয় দায়িত্ব পালন সীমিত রেখেছেন, তাঁদের হিসাব কে নেবে? সংসদ-সদস্যদের হৃদ-প্রভাব অস্বাভাবিকভাবে স্ফীতি ও বিস্তার লাভ করেছে। তাঁরা আঞ্চলিক সব গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি।...প্রতিটি জেলার জন্য আমরা যে একজন করে সংসদ সদস্যকে দায়িত্বভার দিয়ে ভূঁইয়া বানিয়েছি, সে কোন আইন বা সংসদীয় রেওয়াজের বলে?[৭]

নাগরিক সংলাপের অন্যতম বক্তা ছিলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সমাবেশে তিনি 'যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন' শিরোনামে একটা

লিখিত বক্তব্য দেন। নির্বাচনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়ে তিনি 'অন্য কোনো পথের সন্ধান' না করার পরামর্শ দেন এবং সবকিছু সংবিধানসম্মতভাবে করার আহ্বান জানান। অর্থবহ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দুর্নীতিবাজেরা প্রার্থী হবে আর মানুষ দলীয় আনুগত্যের কারণে তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে, সেটা কোনো রকমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর বক্তব্যে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রস্তাব ছিল :

১. 'সৎ প্রার্থী আন্দোলন' বা 'যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন' নামে নাগরিকদের একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে এক বা একাধিক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে। তাঁরা একটা আন্দোলন পরিচালনা কমিটি তৈরি করবেন। এই কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য একটি নির্বাহী কমিটি এবং একজন নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ করবেন।
২. এই আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় সৃষ্টি করতে হবে। সিপিডি এই সচিবালয়ের দায়িত্ব নিতে পারে।
৩. প্রত্যেক জেলা, নির্বাচনী এলাকায় স্থানীয় কমিটি ও সচিবালয় তৈরি করা যেতে পারে।
৪. সকল নাগরিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে সচিবালয় করা যাবে।[৮]

অধ্যাপক ইউনূস তাঁর বক্তৃতায় নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া, প্রার্থীর যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি, কারা যোগ্যতা বিচার করবেন, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত সুপারিশ রাখেন। নির্বাচনে দুর্নীতিবাজদের ঠেকানোর জন্য তিনি সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন :

> সংসদে যদি দুর্নীতিবাজ এবং অগ্রহণযোগ্য প্রার্থীরা সাংসদ হিসেবে ঢুকে পড়ে, তবে আগামী মেয়াদে দুর্নীতির পরিমাণ এমন প্রচণ্ড মাত্রায় বেড়ে যাবে যে দেশে অস্থিরতা ও সহিংসতা তীব্র আকার ধারণ করবে। দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য প্রার্থীদের সংসদে প্রবেশ ঠেকাতে হলে এখনই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। সময় আমাদের হাতে খুব অল্প।[৯]

সমাবেশের উদ্বোধনী অধিবেশনেই একটি নাগরিক কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক হন অধ্যাপক রেহমান সোবহান এবং সদস্যসচিব হন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সিপিডি কার্যালয়কে কমিটির সচিবালয়ের দায়িত্ব দেওয়া

হয়। কমিটির সহ-আহ্বায়ক হন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান এবং মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক সভাপতি লায়লা রহমান কবির। কমিটির ২২ জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সাবেক পররাষ্ট্রসচিব আবুল আহসান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইকবাল মাহমুদ, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ এস এম শাহজাহান, বাঁচতে শেখা-এর নির্বাহী পরিচালক এঞ্জেলা গোমেজ, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম মুজিবুল হক, সাবেক কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এম হাফিজউদ্দিন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জামিলুর রেজা চৌধুরী, ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদা ইসলাম, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ ইউনূস, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী, চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি লতিফুর রহমান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল, এপেক্স ট্যানারির চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক।[১০]

নাগরিক সংলাপের এই সমাবেশে সমাজের নানা অংশের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, এনজিও প্রতিনিধি এবং সাংস্কৃতিক ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের কয়েকজন রাজনীতিবিদও সমাবেশে যোগ দেন। তাঁদের অনেকেই 'মুক্ত আলোচনা'য় অংশ নিয়ে নিজ নিজ মত তুলে ধরেন। এখানে তাঁদের কয়েকজনের বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

> এম সাইদুজ্জামান (সাবেক মন্ত্রী) : সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রত দলসমূহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মেলবন্ধন হতে পারে কেবল নৈতিক ও সর্বজনীন মূল্যবোধের মোহনায়। আমাদের দেশের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এমন সব মানুষকে নির্বাচন করতে হবে যাঁরা হবেন নীতিনিষ্ঠ, সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। সুশীল সমাজের দুটো বিষয়ের

ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত; নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দলগত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত কোনো উন্নয়ন-ভাবনা আমাদের দেশে নেই। রাজনৈতিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে একটি উন্নয়ন-পরিকল্পনা আমাদের দেশের জন্য অপরিহার্য।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র): আমাদের দেশের সরকার একটি জগদ্দল পাথর। কিন্তু জগদ্দল হলেও এর একটি ভালো দিক আছে—আকারটা গোল। ধাক্কা দিলে গড়ায়। বেশি দূর যায় না, কিছু দূর গিয়েই থেমে যায়। তখন আবার ধাক্কা দিতে হয়। সে জন্য আমাদের সরকারকে সক্রিয় রাখার জন্য একটি নিদ্রাহীন-অতন্দ্র নাগরিক সমাজ দরকার। সরকারের মধ্যে বহু দুর্বৃত্ত থাকার পরও রাজনীতি থেকে শুরু করে আমলাতন্ত্রে বেশ কিছু ভালো মানুষ আছে। তারা সুন্দর-ভালো কাজের মূল্যায়ন করে। সাহায্য করতে চায়। কিন্তু সরকারের মধ্যে দুর্নীতিবাজ অংশের সঙ্গে সরকারের বাইরের অংশের যোগাযোগ থাকায় তারা কিছু করতে পারে না। তবে নাগরিক সমাজের কোনো প্রতিনিধি তাদের কাছে গেলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। আমাদের একজনের পেছনে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে। সেই মানুষগুলো সমাজ থেকে শুরু করে সরকারের মধ্যেও আছে। শুধু আমাদেরকে তাদের কাছে যেতে হবে।

ইকবাল মাহমুদ (সাবেক উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়): আমরা প্রায়ই লক্ষ করি, যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনে পরাজিত রাজনৈতিক দল কারচুপির অভিযোগ তোলে। এই ব্যাপারে আমরা কি নিশ্চিত হতে পারব যে যাঁরা পরাজিত হবেন তাঁরা বলবেন না কারচুপি হয়েছে। এটুকু অর্জন করতে পারলে অন্তত কিছুটা হলেও আমরা এগোতে পারব বলে আমি মনে করি। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহে নির্বাচন হয়, কিন্তু পরাজিতরা কারচুপির অভিযোগ সচরাচর করেন না।

জামাল নজরুল ইসলাম (অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়): যেকোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুষ্ঠু নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন—যাদের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গতিশীলতা পাবে। আমি এক পয়সাও বিদেশি সাহায্য নেওয়ার বিপক্ষে। বিদেশি সাহায্য ছাড়া দেশ খুব ভালোভাবেই চলতে পারবে। দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুশীল সমাজের সাথে আমাদের একটি যোগসূত্র তৈরি করা দরকার। এটা একবিংশ শতাব্দী। দ্রুতলয়ে পাল্টাচ্ছে পৃথিবী। বদলাচ্ছে দৃশ্যপট। অথচ অনেক কিছুতেই আমরা পিছিয়ে আছি।

মওদুদ আহমদ (আইনমন্ত্রী): আমরা নিজেদের মধ্যে যতই বাগ্‌বিতণ্ডা করি না কেন, আমাদের রাজনৈতিক কালচারে যতই দুর্বলতা থাকুক না কেন, তা সত্ত্বেও আমাদের অর্জন অনেক হয়েছে এবং দেশের মানুষ এগিয়ে চলেছে এবং চলতে থাকবে। প্রফেসর ইউনূস সাহেব আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর এই যে যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন—এর সঙ্গে আমি একমত এবং আশা করি, আন্দোলন এত জোরদার হোক যাতে করে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য হয়ে যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দিই। গণতন্ত্রের কথা আমরা যখন বলি তখন আজকে আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে—দুটি বড় বড় রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব এটা কি দেশের জন্য ভালো হয়েছে, না ভালো হয়নি? আমি তো ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা ভালোই হয়েছে। এখন যদি এই দলগুলোর মধ্যে আমরা ভালো সংস্কৃতির ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে হয়তো এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থার অবসান ঘটবে এবং ভবিষ্যতে আমরা নতুন পথে যাওয়ার একটা সুযোগ পাব।

মতিয়া চৌধুরী (প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ): আশার কথা এখানে *প্রথম আলো*, *দ্য ডেইলি স্টার*, সিপিডিসহ দেশের বিদ্বান ব্যক্তিরা আছেন, যাঁরা সত্যিকার অর্থেই দেশের ভালো চান। আমি আশ্বস্ত এই ভেবে যে এটা মরুপথে হারাবে না। রাজনীতিবিদদের ওপর সমস্ত দায় চাপানো হয় সবকিছুর ব্যর্থতার জন্য। রাজনীতিবিদদের অনেক সীমাবদ্ধতার পরেও এ দেশের ভালো অর্জনগুলো তাঁদের মাধ্যমেই হয়েছে। এটা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই, নির্বাচনের আগে রাজনীতিবিদেরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। নির্বাচিত হওয়ার পর যতটুকু করা সম্ভব, বিদ্যমান বাস্তবতায় ততটুকুই করেন। তারপরও ভালোর শেষ নেই। আরও অনেক কিছু করা দরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য। এ জন্য রাজনীতিবিদ থেকে সুশীল সমাজ পর্যন্ত সবাই চেষ্টা করে যাবে। যারা করবে না তারা জনগণের বিচারে ও কালের বিচারে সমাজের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

কামাল হোসেন (সভাপতি, গণফোরাম): সত্যিকার রাজনীতি হলো দেশকে সুস্থ একটা সমাজ গড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা স্বপ্ন দেখতে চাই একটা সুস্থ রাজনীতির। সেই রাজনীতির মধ্যে একটা নতুন চেহারা দেখতে চাই গণতন্ত্রের। সুস্থ রাজনীতি ছাড়া সংবিধান শুধু একটা কাগজের মধ্যে থাকে, বইয়ের মধ্যে থাকে। কার্যকর সংসদ সুস্থ রাজনীতির মধ্যে সম্ভব। ছয় মাস পরেই এ সরকারের সময় শেষ। এই



নাগরিক সংলাপে মতিয়া চৌধুরীসহ অনেক রাজনীতিবিদ অংশ নিয়েছিলেন

ছয় মাসের মধ্যে এই উদ্যোগ একটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা। যেখানে কালোটাকা নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি, দলীয়করণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারকবলিত নির্বাচন পদ্ধতি এবং উগ্র জঙ্গিবাদের আক্রমণ থেকে সমাজ ও জনগণ উদ্ধার পাবে, তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। আমরা চাই জনগণ যেন তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে পারে।

সেলিনা হায়াৎ আইভী (চেয়ারম্যান, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা) : ২০০৭-এর নির্বাচন সামনে রেখে যেন কালোটাকা বন্ধ হয় এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সংগ্রহের মাধ্যমে যাঁরা সৎ রাজনীতিবিদ আছেন, তাঁদেরকে যেন মনোনয়ন দেওয়া হয়। রাজনীতিবিদেরা যেভাবে সাবেক আমলাদের ও সাবেক সেনাপ্রধানদের এবং বিভিন্ন দল থেকে আগত দলছুট নেতাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে, এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমরা যারা সৎভাবে রাজনীতি করতে চাই, তারা মনে হয় হারিয়ে যাব। বিশেষ করে একজন নারী হিসেবে অবশ্যই আমার দলের প্রতি, সুশীল সমাজের প্রতি এবং আপনাদের প্রতি দাবি থাকবে, যেন মেয়েরা এগিয়ে আসতে পারে।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ) : সিভিল সোসাইটি ছাড়া পৃথিবীর কোনো গণতন্ত্র কোথাও শক্তিশালী হয়েছে বলে আমার জানা নাই। শুধু একটি কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে

মহাভারতের কুম্ভকর্ণের মতো আপনাদের সিভিল সোসাইটি প্রতি ইলেকশনের পর পাঁচ বছরে একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেন এবং বাকি সময় ঘুমিয়ে থাকবেন আর আশা করবেন যে গণতন্ত্রটা সুরঞ্জিত আর ড. কামাল হোসেন করে দেবে—তা হবে না। আমি মনে করি, জাতি ঐকমত্য পোষণ করছে যে এমন একটি নির্বাচন হোক, যে নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করবে। দুই নম্বর হচ্ছে এমন একটি নির্বাচন হোক, যে নির্বাচন সব রাজনৈতিক দল ও আমাদের গণতন্ত্রের পার্টনার দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের যে জিনিসটির অভাব সেটি হচ্ছে, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যে জনগণ এই সত্যটি মেনে নেওয়ার সাহসিকতা আমাদের নাই। অথচ জনগণের রায়ের ওপর নির্ভর করেই প্রতিনিধিদের আসতে হয়।[১১]

২০০৬ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৫টি জেলা শহরে সিপিডির উদ্যোগে এবং নাগরিক কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে নাগরিক সংলাপের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলাগুলোর মধ্যে ছিল ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল, সিলেট, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল ও নারায়ণগঞ্জ। স্থানীয় পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ এবং এনজিও প্রতিনিধিরা এসব সংলাপে অংশ নেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করণীয় ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের আশু কর্মসূচি' শিরোনামে আরেকটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংলাপে মুখ্য বক্তা ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি তাঁর বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য কিছু পরামর্শ দেন। তিনি নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৯০ দিন এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের প্রথম ১০০ দিনের একটা কাজের তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিতে বলেন। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নির্বাচিত সরকারগুলোর এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

আমরা শিগগিরই আরেকটি নির্বাচিত সরকার পাব, তার আশায় দিন গুনছি। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত জোট নানাভাবে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করবে, নানা অভিযোগে জয়ী জোটকে

অভিযুক্ত করবে। আশা করি এবার সকল অভিযোগ সত্ত্বেও বিরোধী দল পার্লামেন্ট বর্জন করবে না, জয়ী জোট বিরোধী জোটের ওপর প্রতিহিংসা নেবার উন্মত্ততায় মেতে উঠবে না।

দেশের স্বার্থে সকল সরকারকেই কিছু রূঢ়, অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হলো প্রথম ১০০ দিনের প্রথম ভাগেই সবচেয়ে অপ্রিয় সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে নেওয়া।...

যে জোট এবার বিজয়ী হবে, সরকার গঠনের পর প্রথম ১০০ দিনে কী কাজ করলে দেশের মানুষ খুশি হবে তার একটা তালিকা আমরা সবাই মিলে এখনই তৈরি করে দিতে পারি।[১২]

এই সভায় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১'-এর ধারণা উপস্থাপন করা হয়। ২০ মার্চ ২০০৬ শুরু হওয়া ঢাকা ও ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত নাগরিক সংলাপগুলোর আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে এই 'রূপকল্প' তৈরি করা হয়। রূপকল্পে ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। রূপকল্পে আটটি অভীষ্টের উল্লেখ করা হয়েছিল। এগুলো হলো :

১. একটি অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা;
২. স্বচ্ছ, দক্ষ, জবাবদিহিপূর্ণ ও বিকেন্দ্রীকৃত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
৩. দারিদ্র্য-বিমোচিত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া;
৪. সবল ও স্বাস্থ্য সম্পদময় একটি জাতিতে পরিণত হওয়া;
৫. সুদক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি গড়ে তোলা;
৬. বৈশ্বিক কাঠামোর সঙ্গে সুসম্পৃক্ত একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া;
৭. টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা;
৮. একটি অন্তর্ভুক্তিকর ও সমতাভিত্তিক দেশ গড়ে তোলা।[১৩]

ইতিমধ্যে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ২৯ অক্টোবর ২০০৬ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব হাতে নেন। নাগরিক কমিটির উদ্যোগে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) ২০০৬-এর খসড়া সুপারিশ' নামে আরেকটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল। সংসদ নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন, এই প্রতিবেদনে এ বিষয়ে কিছু সুপারিশ রাখা হয়। ১৯

নভেম্বর ২০০৬ অনুষ্ঠিত এক সভায় রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিবেচনার জন্য সব সুপারিশকে একত্র করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। ৯ ডিসেম্বর ২০০৬ অনুষ্ঠিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল জলিল ও বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার হাতে ওই প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিবেদন তৈরির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার একটি স্পষ্ট ধারণা গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরেছিল, যার শুরুটা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে নাগরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে।

২০০৬ সালে বাংলাদেশের রাজনীতি সংঘাতময় হয়ে উঠেছিল। দেশের ক্রান্তিকালে, নানা সময়ে এ দেশের নাগরিক সমাজের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের সাধ্যমতো অবদান রাখার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, মধ্য-পঞ্চাশের দশক থেকে দুই অর্থনীতির তত্ত্বের উদ্ভাবন এবং ১৯৬০-এর দশকজুড়ে সাংস্কৃতিক জাগরণে এ দেশের বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজ রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরির ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে কাজ করে গেছেন। নাগরিক সমাজের ধারণাটি আরও সুসংহত হতে থাকে ১৯৭০-এর দশক থেকে।

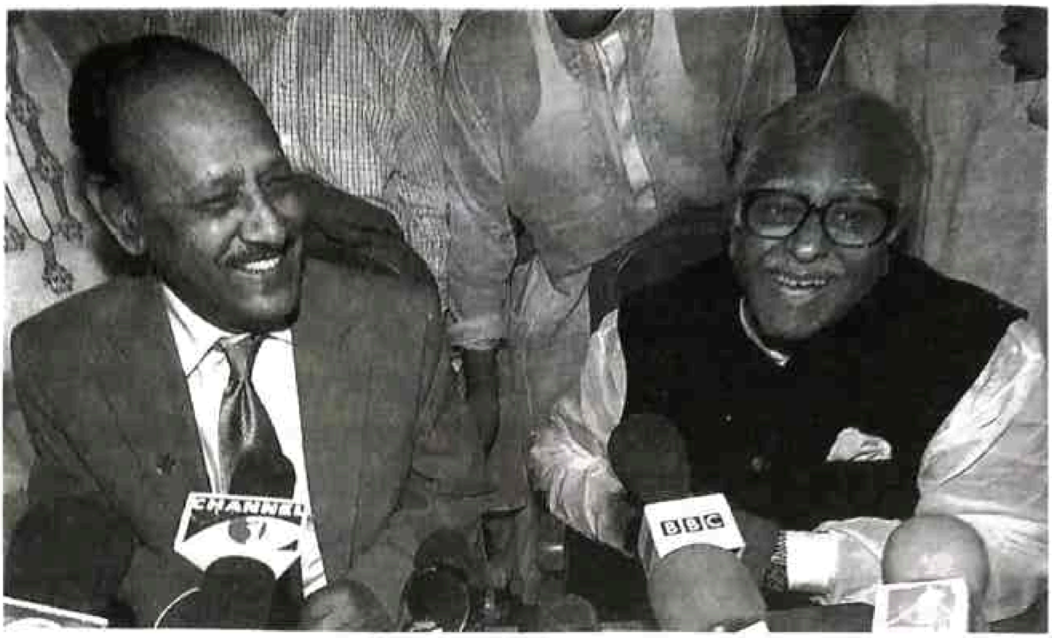
জাতীয় রাজনীতিতে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার ইচ্ছা বা সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও নাগরিকদের প্রাগ্রসর অংশটি সমাজের প্রয়োজনে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে চেয়েছে। এ দেশের বিভাজিত রাজনীতির পাশাপাশি নাগরিক সমাজেও এসেছে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভক্তি। তারপরও বলা যায়, নাগরিক সমাজ তার স্বাভাবিক ভূমিকাটি সব সময়ের জন্য হিমঘরে তুলে রাখেনি। ২০০৬ সালের নাগরিক সংলাপ এই ভূমিকারই একটি প্রতিফলন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এর প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও অভিঘাত দৃশ্যমান হয়েছিল।

# সংকট

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর নেওয়ার বয়সসীমা ৬৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বছর করে। আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার মতলবেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। আওয়ামী লীগ বিচারপতি হাসানকে বিএনপির পছন্দের লোক হিসেবে প্রচার করে। এই প্রচারে সত্যতা ছিল। বিচারপতি হাসান বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। জিয়াউর রহমানের সরকার তাঁকে রাজনৈতিক বিবেচনায় ইরাকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিল, বিচারপতি হাসান সুপ্রিম কোর্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানির সময় 'বিব্রতবোধ' করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ফারুক-রশিদের ভায়রা ভাই হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন না।[১]

২৭ ডিসেম্বর ২০০৬ ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটিনেসের এক তারবার্তায় শেখ হাসিনার বরাত দিয়ে বলা হয়, বিচারপতি কে এম হাসান শেখ হাসিনার বাবার হত্যাকারী দুজন দণ্ডিত আসামির আত্মীয়। হাসানকে মানতে না পারার ক্ষেত্রে সেটাই ছিল 'প্রকৃত ও আবেগপূর্ণ' কারণ। বিএনপির সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আওয়ামী লীগের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এখানে বিএনপির ভুল ছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতার আসল কারণ খুঁজে না দেখা।[২]

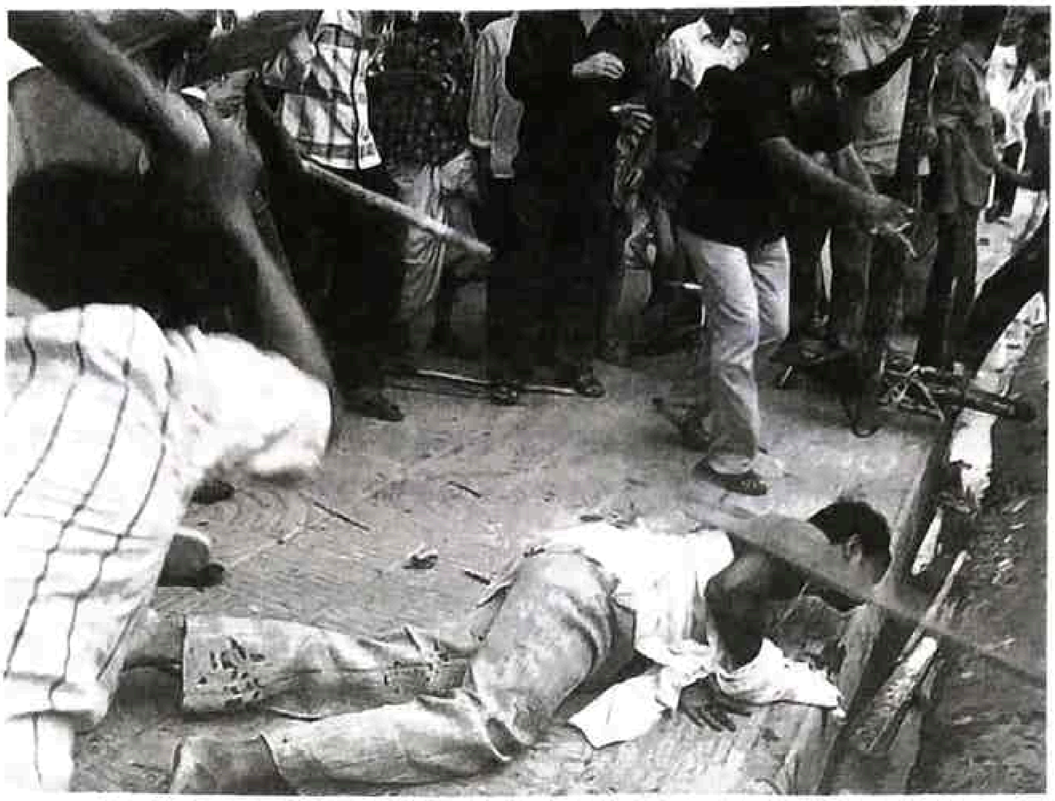
১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় শেখ হাসিনা সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন, 'বিচারপতি হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নিলে ঢাকা অচল করে দেওয়া হবে। যার যা আছে, তা-ই নিয়ে



আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এবং বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার মধ্যকার সংলাপে বরফ গলেনি। ৫ অক্টোবর ২০০৬

আপনারা ঢাকায় আসবেন।' ২৩ সেপ্টেম্বর কুমিল্লার বরুড়ায় এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে বিএনপি বসে আঙুল চুষবে না।'[৩]

একটি গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে ৫, ১৬ ও ২৩ অক্টোবর ২০০৬ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এবং বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার মধ্যে তিন দফা বৈঠক হয়। তাঁরা একমত হতে পারেননি। ২৮ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল। ২৭ অক্টোবর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোট পরদিন ঢাকায় 'লগি-বইঠা'র সমাবেশ ডাকে। ওই দিন বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটের সামনে সমাবেশ করে। দুই জোটের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও মারামারি হয়। ওই দিন সহিংস সংঘর্ষে সারা দেশে ১১ জন নিহত হয়। ঢাকায় পাঁচজন এবং কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, মাগুরা, মেহেরপুর, বাগেরহাট ও মৌলভীবাজারে একজন করে নিহত হয়। আহত হয় কয়েক হাজার মানুষ। আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে ঢাকায় সারা দিন ধরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইটপাটকেল ছোড়া, ককটেল ফাটানো ও গুলিবিনিময় এবং পুলিশের লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাসের



২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকার রাজপথে তাণ্ডব

শেল ও রাবার বুলেট ছোড়া হয়।[৪]

২৮ অক্টোবর দুপুরে বিচারপতি কে এম হাসান নিউমার্কেট থানার ওসি সাইদুর রহমানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে খামে ভরা একটি চিঠি দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। ওই চিঠি পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি বিকেল চারটায় বঙ্গভবনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ও বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে আমন্ত্রণ জানান। জলিল ৩টা ৫৫ মিনিটে বঙ্গভবনে হাজির হন। মান্নান ভূঁইয়া পৌছান পৌনে পাঁচটায়। রাষ্ট্রপতি তাঁদের দুজনকে নিয়ে বৈঠক করেন। জলিল বলেন, যেহেতু বিচারপতি হাসান অপারগতা জানিয়েছেন, সংবিধানের ৫৮(গ)৩ এবং ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজনকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হোক। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজের পরিবর্তে বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী ও বিচারপতি মো. হামিদুল হকের নাম প্রস্তাব করেন। মান্নান ভূঁইয়া আপত্তি জানিয়ে বলেন, বিচারপতি মাহমুদুল আমীন সংবিধান অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা পদের দাবিদার নন। একপর্যায়ে তিনি রাষ্ট্রপতিকেই প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ

করার অনুরোধ জানান। এরপর জলিল বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. হামিদুল হকের নাম প্রস্তাব করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার বিষয়টি দলের সঙ্গে আলোচনা করে জানাবেন বলে জানান। মান্নান ভূঁইয়া বলেন, বিচারপতি হামিদুল হকের বিষয়টি তিনি দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানাবেন।[৫]

সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে ধানমন্ডির সুধা সদনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৪-দলীয় জোটের সভা হয়। হাসিনা রাতে সাংবাদিকদের বলেন, সংবিধান অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দিতে হবে। 'রাষ্ট্রপতি যেন আবার প্রধান উপদেষ্টার অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ না করেন... আমাদের সেই অনুরোধ রইল।'[৬]

বঙ্গভবন সূত্র ও বিএনপির মহাসচিব সাংবাদিকদের বলেন, বিচারপতি হামিদুল হক দায়িত্ব নিতে চান না। কিন্তু মাহমুদুল আমীন ও হামিদুল হক দুজনেই বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও পত্রিকার সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা দায়িত্ব পালনে অপারগতা জানাননি।[৭]

২৯ অক্টোবর দুপুরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল, প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু ও তোফায়েল আহমেদ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানান। দলের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি চিঠিও দেওয়া হয়। চিঠিতে বলা হয় :

> আপনি সংবিধান সমুন্নত রাখার জন্য শপথ নিয়েছেন ও অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আপনি সংবিধানের প্রাসঙ্গিক ধারা-উপধারা সম্পর্কে অবগত আছেন।...
>
> আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের সাথে আলোচনা করে আপনাকে জানানো হয়েছে যে, আপনার প্রস্তাবটি সংবিধান পরিপন্থী।...
>
> আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, ৫৮গ(৪) উপঅনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, 'যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা... সম্মত না হন' তবেই আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের তালিকা আপনি বিবেচনায় আনতে পারেন। উল্লেখ্য যে, ৫৮গ(৪) উপঅনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে না পাওয়া যায় তাহলেই আহূত আলোচনা সাংবিধানিকভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সাংবিধানিক নির্দেশের আলোকে সাবেক প্রধান বিচারপতিদের

তালিকায় একজন মাত্র বিচারপতি অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। অন্যদের আহ্বান জানানো আপনার সাংবিধানিক কর্তব্য।

সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদে যে প্রক্রিয়ার উল্লেখ রয়েছে সে প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের দুটি তালিকা সামনে রেখে ক্রম অনুসারে সাবেক প্রধান বিচারপতিদের আহ্বান করবেন। যদি এরূপ প্রধান বিচারপতিদের না পাওয়া যায় তবেই মাত্র আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যারা অন্য কোনো সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত নন, তাঁকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে আজকের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।...[৮]

রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ আওয়ামী লীগের পরামর্শে কান দেননি। দৃশ্যত তিনি বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নিজেই দায়িত্ব নেন। ২৯ অক্টোবর রাত ৮টা ১০ মিনিটে রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনের দরবার হলে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। শপথ অনুষ্ঠানে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা, স্পিকার, সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ, সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং ৩৮টি বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন। বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের অন্য নেতারাও সেখানে ছিলেন। আওয়ামী লীগ ও ১৪-দলীয় জোটের কোনো নেতা সেখানে যাননি।

ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হবেন, এটি অনেকের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের (এনডিসি) কমান্ড্যান্ট ছিলেন মেজর জেনারেল আবু তৈয়ব মুহম্মদ জহিরুল আলম (পরে লে. জেনারেল)। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের শপথ অনুষ্ঠানে এ টি এম জহিরুল আলম উপস্থিত ছিলেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

তখন তো আমরা চেয়েছিলাম একটা রিকনসিলিয়েশন। অ্যাকমোডেশনের মাধ্যমে একটা ইলেকশন হোক। যখন দুই দলের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন একটা হোপ ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া এবং তাঁর আশপাশে যারা ছিল, তারা অলরেডি একটা ডিসিশন নিয়ে নিয়েছে। যার কারণে তারা দ্রুত ইয়াজউদ্দিনকে চিফ অ্যাডভাইজার করে দিল। যে

প্রেসিডেন্টের ডিউটি করতে পারে না, সে কীভাবে—হি ইজ সো সিক অ্যান্ড হি ডিড নট ইভেন হ্যাভ দ্য ব্রেইন—উনার অ্যাটিচুডও ছিল না, প্লাস হি ওয়াজ সিক।

আমি যদি চিফ থাকতাম, আই উড নেভার অ্যালাউড খালেদা জিয়া... অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি চিফ থাকলে কী করতে?

আমি বলেছি, নো, আমি থাকলে তো এ অবস্থায় যেতেই দিতাম না। আমি বলতাম, আপনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে অ্যাকমোডেশন করে...। আমি উনার কাছে বসে থাকতাম। আমি তো ক্যু করতাম না। আমি তাঁকে বলতাম, আপনি এভাবে যেতে পারেন না।

ইয়াজউদ্দিনের শপথ হলো, আমরা ভাবছিলাম, হু উইল বি দ্য চিফ অ্যাডভাইজার। ইকবাল করিম ভূঁইয়া তখন সিজিএস। আমার কোর্সমেট সাদিক হাসান রুমী তখন ডিজিএফআইয়ের ডিজি।

রুমী বলল, দোস্ত, আমি এখনো জানি না। সিজিএসকে বললাম। ও তো আমার জুনিয়র। বলল, স্যার, সন্ধ্যার মধ্যে শুনতে পাবেন। ইউনিফর্ম পরে রেডি থাকবেন। আমি রিং দিলেই যাতে ইউ ক্যান জয়েন আস। পরে আমাকে ফোন করে জানাল, সাতটার দিকে বঙ্গভবনে যেতে হবে। তখনো নাম অ্যানাউন্স করেনি।

আমি বসে আছি। যখন বলবে তখন যাব। তারপর জানাল, সন্ধ্যা সাতটায় মইন ইউ আহমেদ সবাইকে মেসে আসতে বলেছে। সবাই একসঙ্গে যাবে। আমি নামতেই ইকবাল করিম আমাকে রিসিভ করল। রুমীকে বললাম, এখন তো জানো। সে বলল, ইয়াজউদ্দিন। আরে, এই মরা মানুষটাকে বানাল? প্রেসিডেন্টের দায়িত্বই পালন করতে পারে না, আবার চিফ অ্যাডভাইজার? মইনরা তখন পর্যন্ত অ্যান্টি-বিএনপি কোনো প্লে করে নাই। কারণ, তারা ছিল 'পিক'।[৯]

রাষ্ট্রপতির যুগপৎ প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়াকে আওয়ামী লীগ সংবিধানবিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে দেখলেও দলের প্রতিক্রিয়া ছিল কিছুটা নমনীয়। রাতে ধানমন্ডির সুধা সদনে ১৪ দলের সভা শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনা বলেন :

নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি, সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। তাঁর এই কাজ দেখে সিদ্ধান্ত নেব নির্বাচনে যাব কি যাব না।... রাষ্ট্রপতি নিজে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব না নিয়ে অন্য কাউকে

করলে তা সংবিধানসম্মত হতো।... প্রধানমন্ত্রী বলে দিলেন আর রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিলেন, এটা কেমন হলো? শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পাঁচ মিনিট আগে আমি দাওয়াত কার্ড পেয়েছি, এটা কেন হলো?...

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদক্ষেপ নেননি। একাধিক বিকল্প বাদ দিয়ে তিনি নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।... রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন।... যেহেতু রাষ্ট্রপতি সংবিধান মানেন নাই, সেহেতু তাকে স্বাগত জানাতে পারলাম না।... এখন আমরা তাঁর আচার-আচরণ দেখব।[১০]

৩০ অক্টোবর বিকেলে শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে ১১টি বিষয়ে ২০ দফা দাবিনামা দেন। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন; প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও তিন কমিশনার এবং কমিশন সচিবকে অবিলম্বে অপসারণ ও সচিবালয় পুনর্গঠন; দলীয় উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করে তাঁদের নিয়োগ আদেশ স্থগিত করা; সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংশোধন এবং ছবিসহ হালনাগাদ করা; পুরোনো ভোটার তালিকার মুদ্রণ স্থগিত এবং ওই তালিকা বাতিল করা; পয়লা জুলাই থেকে জারি করা সব নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অবসর দেওয়ার আদেশ অকার্যকর করা, সব চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা; স্পর্শকাতর সব পদে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করা (তালিকা দেওয়া হবে); বিএনপি-জামায়াতের অনুগত, আশীর্বাদপুষ্ট, সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার এবং তাঁদের নতুনভাবে পদায়ন না করা (তালিকা দেওয়া হবে); অ্যাটর্নি জেনারেলকে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করে আলোচনার ভিত্তিতে নতুন একজনকে দায়িত্ব দেওয়া; পুলিশ বাহিনীতে বিএনপি-জামায়াতের আশীর্বাদপুষ্ট নির্যাতনকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করা (তালিকা দেওয়া হবে); পুলিশ বাহিনীতে স্পর্শকাতর সব পদে পরিবর্তন; বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও ও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সব সংবাদ ও প্রচারমাধ্যমে ১৪-দলীয় জোট, এলডিপি ও আওয়ামী লীগকে যথাযথ অধিকার দেওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দান; গত পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি রেডিও-টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ এবং মালিকদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান; ৪ অক্টোবরের পর দেশব্যাপী যত সব ধরপাকড় ও মামলা হয়েছে, সেগুলো প্রত্যাহার এবং গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি; গত পাঁচ বছরে সমুদয় বোমাবাজি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের যে

জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাকে দমন করার জন্য অবিলম্বে সব তদন্ত নতুন করে শুরু ও চিহ্নিত জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করা; গত দুই বছরে দেওয়া সব আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার; জোটের দুর্নীতিগ্রস্ত সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী গডফাদার এবং অন্য ব্যক্তিদের দেশত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সব বিমান, স্থল ও নৌবন্দরে আদেশ প্রদান করা; ১ জানুয়ারি থেকে উন্নয়ন বিষয়ে যত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যথা : উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, থোক বরাদ্দ, প্রকল্প চুক্তি এবং এ-সম্পর্কিত অর্থ অবমুক্তি, সব স্থগিত ও অকার্যকর করা; সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছবি এখনো বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে টাঙানো আছে, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করছে, এই ছবি এখনই অপসারণের আদেশ দেওয়া। শেখ হাসিনা অবরোধ কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'ভোট চুরি ঠেকাতে বইঠা, লগি মানুষের হাতে থাকবে। এটা হাতে রেখেই দাবি আদায় করতে হবে।'[১১]

বিএনপি নিজেদের দৃশ্যমান ও রাষ্ট্রপতির ওপর চাপ বজায় রাখার কৌশল নেয়। একই সঙ্গে চলে প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের সমালোচনা। ৩০ অক্টোবর ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে আয়োজিত চারদলীয় জোটের এক সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে বলেন :

> আমাদের নেতা-কর্মীরা অনেক মার খেয়েছে, অনেক রক্ত দিয়েছে। আর ধৈর্য ধরবে না, মার খাবে না। পাল্টা জবাব দেবে। এখন আমাদের এগিয়ে যাবার পালা।... তারা বাংলাদেশে খায় দায় আর সহযোগিতা করে অন্য দেশকে। মদদ জোগায় সেই দেশকে। এরা রাজনীতিবিদ নয়, এরা জাতীয় বেইমান। এরা দেশকে অন্য দেশের হাতে তুলে দিতে চায়। এরা দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। ওরা লাশের রাজনীতি করে আবার নিজ মুখে বলে একটার বদলে দশটা লাশ চাই।... যারা গায়ের জোরে দখল করতে চায়, তাদের ঠাঁই জনগণ আর দিবে না।[১২]

৩১ অক্টোবর রাত ১০টায় বঙ্গভবনে ১০ মিনিটের এক অনুষ্ঠানে ১০ উপদেষ্টা শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি ফজলুল হক, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আকবর আলি খান, সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধূরী, সাবেক পররাষ্ট্রসচিব সি এম শফি সামি, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক আজিজুল হক, সাবেক সচিব ধীরাজ কুমার

নাথ, *দ্য ইনডিপেনডেন্ট*-এর সম্পাদক মাহবুবুল আলম, জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক ডা. সুফিয়া রহমান, স্কলাসটিকা স্কুলের অধ্যক্ষ ইয়াসমিন মুর্শেদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল।

উপদেষ্টা করার জন্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগ থেকে যাঁদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বিএনপির তালিকা থেকেই বেশি সংখ্যায় নেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের দেওয়া তালিকা থেকে শুধু একজনকে নেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি এই দুই দলের দেওয়া তালিকার বাইরেও একাধিক উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। জাতীয় পার্টি তিনজনের একটা তালিকা দিয়েছিল। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) নেতারা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে আওয়ামী লীগের দেওয়া উপদেষ্টার তালিকার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। ৩১ অক্টোবর বঙ্গভবনে উপদেষ্টার তালিকা ঠিক করা নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে রীতিমতো দর-কষাকষি হয়। এ জন্য শপথ অনুষ্ঠান দুবার পেছানো হয়। তালিকা চূড়ান্ত করতে রাত নয়টা বাজে। রাত আটটা থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ফোন করে কয়েকজন সম্ভাব্য উপদেষ্টাকে বাসায় থাকতে বলা হয়েছিল। তাঁদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।[১৩]

আওয়ামী লীগের তালিকায় সাবেক সচিব মসিউর রহমান ও ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের নাম ছিল। তাঁদের উপদেষ্টা না করায় আওয়ামী লীগ হতাশ হয়। আইন মন্ত্রণালয় থেকে বিকেলে ফোন করে বিচারপতি গৌরগোপাল সাহার ঠিকানা নেওয়া হয়েছিল। সন্ধ্যায় তাঁর নামও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপদেষ্টা হন ধীরাজ কুমার নাথ। রাতে মেজর জেনারেল (অব.) ডা. মতিউর রহমানের নাম শোনা গেলেও তাঁকে উপদেষ্টা করা হয়নি। উপদেষ্টা হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন রাজি হননি। বিএনপি থেকে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। শপথের সময় শুধু বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য গণমাধ্যমের শতাধিক সাংবাদিক বঙ্গভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।[১৪]

১ নভেম্বর ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটিনেস বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর সেনানিবাসের বাসায় সন্ধ্যা সাতটায় দেখা করে কয়েক দিন আগে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এটা দেখে আমি হতবাক হয়েছি। এমন ধরনের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও মানুষের চরিত্রের



মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া আগাথা বিউটিনেস

কোনো মিল পাওয়া যায় না। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য কখনো শান্তির বিকল্প হতে পারে না।'[১৫]

এদিন ঢাকার র‍্যাডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে ১৪ দলের বৈঠকের কথা ছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে শেখ হাসিনা হাজির হতে পারেননি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল শেখ হাসিনার লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান। বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে বিচারপতি কে এম হাসানের অপারগতা এবং রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার খবরে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন :

> একসময়ের জিয়া পরিষদের নেতা ও বিএনপির ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তে গোটা জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।... তাঁর এ ধরনের কর্মকাণ্ডের পরও আমরা তাঁকে অসম্মান ও তাঁর পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করিনি। পাশাপাশি তাঁর এই অস্বাভাবিক কাজকে আমরা গ্রহণও করিনি। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ নিজেকে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে সুযোগ দিতে চায়।[১৬]

বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটিনেস জানতে চান, 'গত কয়েক দিন রাজপথে আমরা সহিংসতা দেখেছি, যাতে কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছে। ৩ নভেম্বরের মধ্যে দাবি না মানা হলে আবার কি রাজপথে সহিংস ঘটনা ঘটবে?' এই প্রশ্নের জবাবে গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেন, '১৪ দল সহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।' রাজপথের সহিংসতা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনারের অপর এক প্রশ্নের জবাবে কামাল হোসেন বলেন, 'আমরা জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন করছি।' ১৪ দলের পক্ষ থেকে কূটনীতিকদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করা হয়।[১৭]

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ অন্যান্য দাবি না মানা হলে ৩ নভেম্বর পল্টনে অনুষ্ঠেয় ১৪ দলের জনসভায় আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণার কথা ছিল। ২ নভেম্বর রাতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বেগম খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে আওয়ামী লীগের যে দাবি, তা অযৌক্তিক। তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনাররা দলীয় লোক নন, তাঁরা নিরপেক্ষ। পাঁচ বছরের মধ্যে খালেদা জিয়া প্রথমবারের মতো নয়াপল্টনের এই কার্যালয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানও ছিলেন।[১৮]

২ নভেম্বর গভীর রাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুজন উপদেষ্টা সি এম শফি সামি ও সুলতানা কামাল ধানমন্ডির সুধা সদনে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব জানিয়ে দেন। সোয়া এক ঘণ্টার বৈঠক শেষে তাঁরা চলে যাওয়ার পর আব্দুল জলিল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে।'[১৯]

৩ নভেম্বর বিকেলে জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে ১৪-দলীয় জোটের এক জনসভায় তাদের আগের দেওয়া ১১ দফা দাবি পূরণের সময়সীমা এক সপ্তাহের জন্য বাড়ানো হয়। শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, এই সময়ের মধ্যে দাবি না মানা হলে '১২ নভেম্বর থেকে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আবার অবরোধ শুরু করব।' দাবি পূরণের জন্য সাত দিনের সময় দেওয়ার ঘোষণাকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্বাগত জানান।[২০]

বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ৪ নভেম্বর দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে ১০ দফা দাবিনামা হস্তান্তর করে। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল : সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা

যাবে না; কোনো চাপের কাছে নতিস্বীকার করা যাবে না; সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নৈরাজ্য, হত্যা ও সন্ত্রাসের যথাযথ তদন্ত করে শাস্তির বিধান করতে হবে; আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে; সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেবল দৈনন্দিন কাজ করবে, নীতিনির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না; উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী প্রণীত ভোটার তালিকার কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে; নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে বদলি করা যাবে না; দুই উপদেষ্টা সি এম শফি সামি ও সুলতানা কামাল নিয়ম ভেঙে একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রীর বাসভবনে দেখা করে নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসের সময় শেষ হওয়ার ১৫ দিন আগেই নির্বাচনী কার্যক্রম শেষ করতে হবে ইত্যাদি। খালেদা জিয়ার 'হাওয়া ভবন' অফিসে বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চারদলীয় জোটের এক বৈঠক হয়।[২১]

৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সম্মানে রাষ্ট্রপতি এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সংবর্ধনার জবাবে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে অধ্যাপক ইউনূস বলেন :

> আপনি যত শক্ত হবেন, দেশ তত ভালো চলবে। দেশের মানুষ চায় আপনি শক্ত হাতে দেশ চালান।... আপনি সবার কথা শুনবেন, আবার কারও কথাই শুনবেন না। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে, একতালে এবং একযোগে চলবেন। ছোটখাটো কাজের ঝামেলায় আটকে যাবে না। কেউ সমালোচনা করলে রাগ করবেন না। সমালোচকদের কাছেই আপনি প্রমাণ করুন তাদের সমালোচনা ঠিক নয়।[২২]

সংবর্ধনা সভায় অনেক শিক্ষাবিদ ও বিদেশি কূটনীতিক উপস্থিত ছিলেন। বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের কয়েকজন নেতা উপস্থিত থাকলেও আওয়ামী লীগের কোনো নেতা সেখানে যাননি।[২৩]

৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে ঢাকায় এক জনসভায় খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি ও উপদেষ্টাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এই নির্বাচন কমিশন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করুন। এটা জনগণ সহ্য করবে না। নির্বাচন কমিশন নিয়ে কে কোন দাবি দিল, তা দেখার বিষয় আপনাদের নয়।' একই দিন ধানমন্ডি অফিসে দলের প্রেসিডিয়ামের সভা শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনা বলেন :

> এম এ আজিজকে নির্বাচন কমিশনে বহাল রেখে কারচুপির নির্বাচন করার চেষ্টা করা হলে দেশে আরও রক্ত ঝরবে।... মানুষ এবার লগি, বইঠা এবং লাঠি নিয়ে বাড়িতে বসে রয়েছে। ভোট চুরি করতে গেলে বুঝবেন।... দাবি না মানলে আমাদের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১২ নভেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ শুরু হবে। রাজপথ, রেলপথ, নৌপথ, বন্দর সব অচল করে দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি আদায় করা হবে।[২৪]

চারদলীয় জোট সরকারের শেষ সময়ে পদত্যাগকারী বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এবং এলডিপি নেতা মেজর জেনারেল (অব.) আনোয়ারুল কবির তালুকদার বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির এক ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেন। তিনি রীতিমতো হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেন। ৭ নভেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে তিনি বলেন, জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনামলে এই খাতে অন্তত ৬ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে লোপাট হয়েছে। তিনি বলেন:

> তৎকালীন সরকারের প্রধান, বিশেষ ভবন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুই কর্মকর্তা এবং এ সময়ের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা বর্তমান বিদ্যুৎসচিব আ ন হ আখতার হোসেন এই অর্থ নিজেদের থলেতে ভরেছেন।... আমি এমন অসৎ এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা আমার চাকরি এবং রাজনৈতিক জীবনে দেখিনি।... ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকার এই খাতকে চাঁদার স্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। আর তাই প্রতিটি কাজে তারা চাঁদা বসিয়েছে। যেখানে চাঁদা পায়নি সেই কাজ তারা বন্ধ করে দিয়েছে।[২৫]

এ সময় দেশে বিদ্যুৎ খাত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিংয়ের ফলে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের বিদায়ী কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন ওয়ালিক বলেন, বিগত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ খাতে বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির দায়ে প্রভাবশালী ও আলোচিত কোনো ব্যক্তির বিচার করে শাস্তি দেওয়াটা হবে বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। তাতে দুর্নীতিগ্রস্তরা যে বিনা বিচারে অব্যাহতি পাবেন না, তার একটা পরিষ্কার সংকেত দেওয়া যাবে।' দুই বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি বিষয়ে দাতাগোষ্ঠীর পক্ষে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সমস্যা কেবল তহবিল সংকট নিয়ে ছিল না, সংকট ছিল অর্থায়নের

জন্য ভালো প্রকল্প না পাওয়া। বিগত কয়েক বছরে নিয়ম না মেনে ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কাজ দেওয়ার উদাহরণ দেখেছি। এগুলো আর্থিকভাবেও ভালো প্রকল্প ছিল না বলে কোনোটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এতে বঞ্চিত হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষ।'[২৬]

বিএনপি ও জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদল ৮ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ ও অন্য কমিশনারদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেন। প্রতিনিধিদলে বিএনপির পক্ষে এম কে আনোয়ার ও মোফাজ্জল করিম এবং জামায়াতের পক্ষে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি সম্পর্কে কারও কথায় কান না দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।[২৭]

১১ নভেম্বর গণমাধ্যমে ২৭ জন 'বিশিষ্ট নাগরিকের' একটি বিবৃতি ছাপা হয়। বিবৃতিতে তাঁরা উৎকণ্ঠা জানিয়ে বলেন, 'দেশ এক সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের মানুষ এতে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত।' বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন খান সারওয়ার মুরশিদ, অজয় রায়, হামিদা হোসেন, মুজিবুল হক, কামাল লোহানী প্রমুখ।[২৮]

একই দিন 'সংঘাত পরিহার করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিকদের প্রতি আহ্বান শিরোনামে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একটি বিবৃতি ছাপা হয়। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'মানুষ রাজনীতিকে ভয় করুক, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।'[২৯]

এ সময় বিদেশি কূটনীতিকদের তৎপরতা বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচার তৃতীয়বারের মতো ঢাকা সফরে আসেন। ১১ নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতি, বিএনপির চেয়ারপারসন এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করেন। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অনেক বিষয়ের সমাধান করতে হবে এবং এ জন্য আরও সময় প্রয়োজন। থাইল্যান্ডের মতো বাংলাদেশেও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা নেওয়ার কোনো আশঙ্কা আছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সেটা হলে খুবই খারাপ হবে। এখানকার পরিস্থিতি জটিল। কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। আমি মনে করি না সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিলে সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে। আমরা চাই এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকুক।'[৩০]

বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ ১১ দফা দাবি পূরণ না হওয়ায় ১২ নভেম্বর থেকে শুরু হয় ১৪ দলের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি। রাজধানী ঢাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার

দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে পারে বলে কানাঘুষা হয়। রাতে উপদেষ্টা পরিষদের সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সরকারের মুখপাত্র তথ্য উপদেষ্টা মাহবুবুল আলম বলেন, সামরিক বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তের কথা উপদেষ্টারা জানেন না। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে যেকোনো বাহিনীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে ফ্যাক্সযোগে পাঠানো স্বরাষ্ট্রসচিব এস এম জহুরুল ইসলামের সই করা একটি দাপ্তরিক আদেশে বলা হয়, 'দেশে উদ্ভূত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তার নিমিত্তে প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।' এই সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করে ১৪ দলের সমন্বয়ক আব্দুল জলিল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।[৩১]

১৩ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপদেষ্টাদের না জানিয়ে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্তসংক্রান্ত স্বরাষ্ট্রসচিবের প্রজ্ঞাপন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন উপদেষ্টা আকবর আলি খান। অন্য উপদেষ্টারাও এ নিয়ে আলোচনা করতে বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, এভাবে প্রজ্ঞাপন জারির কথা নয়। স্বরাষ্ট্রসচিব আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব আলাউদ্দিন সরকারের মতামত নিয়ে যথাযথ আইনি পথ অনুসরণ করেই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। আইনসচিবকে সভায় তলব করা হলে তিনি বলেন, তিনি এ ব্যাপারে কোনো পরামর্শ বা মতামত দেননি। তথ্য উপদেষ্টা মাহবুবুল আলম সাংবাদিকদের জানান, এটা ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি ভুল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। সরকারের ১০ উপদেষ্টাকে 'ভুল' সংশোধনে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ১৪ নভেম্বর *প্রথম আলোর* এক মন্তব্য প্রতিবেদনে বলা হয়, 'তাঁরা যৌথভাবে দেশকে একটা বড় ধরনের সংকট থেকে বাঁচিয়েছেন। দেশে সেনা মোতায়েনের পদ্ধতি ছিল ভুল। এই সেনা মোতায়েনের উদ্দেশ্যও অসৎ ছিল।'[৩২]

প্রভাবশালী চার দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূতেরা ২০ নভেম্বর ২০০৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান ও শফি সামির সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দেন, বাংলাদেশে যে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। 'সবার কাছে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোনো জাতীয় নির্বাচন হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে

না।' রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে ছিলেন প্যাট্রিসিয়া এ বিউটিনেস (যুক্তরাষ্ট্র), আনোয়ার চৌধুরী (যুক্তরাজ্য), বারবারা রিচার্ডসন (কানাডা) ও ডগলাস ফসকেট (অস্ট্রেলিয়া)। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের থাকা না-থাকার প্রশ্নে বিএনপি এ সময় একটু নমনীয় হয়। খালেদা জিয়া দলের কয়েকজন সিনিয়র নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। বিএনপির একটি সূত্র জানায়, সিইসি যদি পদত্যাগ করেন অথবা ছুটি নেন, তাতে বিএনপি আপত্তি জানাবে না। তবে তাঁকে চাপ দিয়ে অথবা অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সরানোর চেষ্টা হলে তাঁর বিরুদ্ধে বিএনপি রাজপথে আন্দোলনের কর্মসূচি দেবে।[৩৩]

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আজিজ ২২ নভেম্বর তিন মাসের ছুটিতে যাওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে দেন রাষ্ট্রপতিকে। রাষ্ট্রপতি মাঝরাতে বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে আশাবাদ জানিয়ে বলেন, ১৪ দল এ প্রস্তাব মেনে নেবে বলে তাঁর বিশ্বাস। ২৩ নভেম্বর খালেদা জিয়া তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'সংবিধান রক্ষায় সফল হয়েছি।' এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন, 'আজিজের ছুটি জনগণের বিজয়।'[৩৪]

রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্য উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেও সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন নিজের মতো করে। এর প্রতিবাদে ২৩ নভেম্বর কয়েকজন উপদেষ্টা সচিবালয়ে যাননি। তাঁরা হলেন আকবর আলি খান, হাসান মশহুদ চৌধূরী, শফি সামি, মাহবুবুল আলম ও সুলতানা কামাল। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, আগ্নেয়াস্ত্র জমা এবং নির্বাচন-উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের রদবদল নিয়ে উপদেষ্টাদের প্রস্তাব উপেক্ষিত থেকেছে বলে জানা যায়।[৩৫]

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কানাডায় একটি ক্ষুদ্রঋণ সম্মেলনে যোগ দিয়ে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় অংশ নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন ২৫ নভেম্বর। ঢাকা বিমানবন্দরে দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করে তিনি বলেন :

> এমন কোনো কাজ করা ঠিক হবে না যাতে নির্বাচন বিঘ্নিত হয়। রাজনীতিবিদরা একে অপরকে নিয়ে বেশি খোঁচাখুঁচি করবেন না। বিদ্যমান অবস্থার মধ্যেই নির্বাচন করতে হবে।...তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসের মধ্যে এক মাস চলে গেছে। সময় বেশি নেই। জাতির সামনে এখন একটাই লক্ষ্য—নির্বাচন। সেদিকেই সবাইকে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সবাইকে নির্বাচনের দিকে যেতে হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও

শান্তিপূর্ণ হতে হবে। কোনোভাবেই যেন এটা বিঘ্নিত না হয়।...নির্বাচন হয়ে গেলেই শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসবে। কাজেই নির্বাচন করে ফেলতে হবে।[৩৬]

১৪-দলীয় জোটের একটি প্রতিনিধিদল ২৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে ভোটার তালিকা সংশোধনের আগে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা না করার অনুরোধ জানায়।[৩৭]

২৬ নভেম্বর মধ্যরাতে বঙ্গভবনে বৈঠক সেরে নির্বাচন কমিশন ২৭ নভেম্বর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে দেয়। নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হয় ২১ জানুয়ারি ২০০৭। ১৪-দলীয় জোট জানিয়ে দেয়, তারা এই তফসিল মানে না। বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'নির্বাচনে যাব, অন্যরাও যাবে আশা করি।'[৩৮]

রাষ্ট্রপতি আরও দুজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেন। এঁদের একজন হলেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী। তিনি সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন। অন্যজন হলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক মহাপরিচালক সাইফুল আলম। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ও নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে উপদেষ্টাদের কিছুই জানানো হয়নি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এক প্রতিক্রিয়ায় জানান, 'এটা প্রধান উপদেষ্টার বিদায়ের তফসিল।'[৩৯]

২৮ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়, রাজনৈতিক সমঝোতা হলে তফসিলে পরিবর্তন হতে পারে।[৪০]

ঢাকা সিটি করপোরেশন আয়োজিত জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় তাঁর সম্মানে দেওয়া এক নাগরিক সংবর্ধনায় অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস চার ও ১৪-দলীয় জোটকে 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের আহ্বান জানিয়ে একটি সাত দফা চুক্তির খসড়া উত্থাপন করেন। দফাগুলোর মধ্যে ছিল : ১. দুই জোটের যৌথ নির্বাচনী পরামর্শক কমিটি গঠন; ২. নির্বাচনের পর উভয় জোট মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন, যে জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে, তার নেতা প্রধানমন্ত্রী হবেন, অপর জোটের আসনসংখ্যা যা-ই হোক না কেন, তার নেতা উপপ্রধানমন্ত্রী হবেন এবং মন্ত্রিসভায় তাঁরা এক-তৃতীয়াংশ সিট পাবেন; ৩. একমত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা, নির্বাচনের আগেই তাঁর নাম স্থির করা ইত্যাদি।[৪১]

রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'আপনারা সংঘাতের পথ পরিহার করুন। পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলান।

দেশকে বাঁচান। আরও অনেক এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। এই ক্ষমতাকে নষ্ট হতে দেবেন না।' সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকাবাসীর পক্ষে মানপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অধ্যাপক ইউনূসের হাতে ঢাকার স্মারক চাবি তুলে দেন মেয়র সাদেক হোসেন খোকা। এই অনুষ্ঠানে বিএনপির অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও ১৪-দলীয় জোটের কোনো নেতা আসেননি।[৪২]

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের বিশেষ দূত ক্রেগ জেনেস বাংলাদেশ সফরে এসে ৯ ডিসেম্বর ঢাকার শেরাটন হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের পরিবেশ ও রাজনৈতিক সংঘাত নিয়ে জাতিসংঘের উদ্বেগের কথা জানান। তিনি বলেন, জাতিসংঘ সংকট নিরসনে কোনো মধ্যস্থতা করবে না, কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সহায়তা দেবে। এ ছাড়া জাতিসংঘ সংসদ নির্বাচনের সময় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করবে। তিনি আরও বলেন, 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের সর্বাধিক সেনাসদস্য রয়েছেন এবং তাঁরা দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছেন। দেশে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর প্রভাব জাতিসংঘে কর্মরত বাংলাদেশি সৈন্যসহ অন্যান্য কার্যক্রমের ওপর পড়বে।'[৪৩]

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশে ১ কোটি ২১ লাখ ভোটারই ভুয়া, যা মোট ভোটারের ১৩ শতাংশ। ২ ডিসেম্বর ঢাকায় এই জরিপের ফল প্রকাশ করা হয়।[৪৪]

নির্বাচন কমিশন ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের সংশোধিত তফসিল ঘোষণা করে। নতুন তফসিল অনুযায়ী ২২ জানুয়ারি ২০০৭ নির্বাচনের দিন ঠিক হয়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারিত হয় ২১ ডিসেম্বর ২০০৬।[৪৫]

৯ ডিসেম্বর ২০০৬ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র) জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে 'জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ'-এর অংশ হিসেবে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কারের সুপারিশমালা এবং দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একটি মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ 'রূপকল্প ২০২১' প্রকাশ করা হয়। সিপিডি, *দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো* এবং চ্যানেল আইয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'নাগরিক সংলাপের' ভিত্তিতে ওই প্রস্তাব ও রূপকল্প তৈরি করা হয়। সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এবং বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া অংশ নেন। জলিল বলেন, 'নাগরিক ফোরামের সংস্কার প্রস্তাব ও উন্নয়ন রূপকল্পের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের প্রস্তাব ও ভাবনার সাদৃশ্য

রয়েছে।' মান্নান ভূঁইয়া নাগরিক ফোরামের প্রস্তাবের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে বলেন, নির্বাচন কমিশন, দুদক, সরকারি কর্ম কমিশন—এসব 'গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন করতে না পারলে কার্যকরভাবে নির্বাচনী কিংবা রাজনৈতিক সংস্কার সাধন দুরূহ হবে।' সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান উপস্থিত ছিলেন। সভায় নাগরিক কমিটির চারজন সদস্য—অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক মাহমুদা ইসলাম এবং অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বক্তব্য দেন।[৪৬]

রাষ্ট্রপতির আদেশে ১০ ডিসেম্বর দেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে উপদেষ্টাদের মতামত নেওয়া হয়নি। এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শেখ হাসিনা রাতে ধানমন্ডির দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রাষ্ট্রপতি ঠিক করেননি। তিনি অন্যায় করেছেন।'[৪৭]

বিকেলে দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মান্নান ভূঁইয়া সেনা মোতায়েনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, '১৪ দল আন্দোলনের নামে যেভাবে মারধর, অগ্নিসংযোগ এবং সর্বশেষ উচ্চ আদালত ভাঙচুর করেছে, তাতে এবার একটু আগেই সেনাবাহিনী নামাতে হয়েছে। এমনিতেই অন্যবার নির্বাচনের আগে সেনা মোতায়েন হয়। তবে এবার এটি আগে করে রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সঠিক কাজ করেছে। এটা না হলে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যেত।'[৪৮]

রাষ্ট্রপতির একক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে চারজন উপদেষ্টা ১১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন আকবর আলি খান, হাসান মশহুদ চৌধূরী, সি এম শফি সামি ও সুলতানা কামাল। তাঁদের পদত্যাগের ব্যাপারে অন্য উপদেষ্টাদের মন্তব্য হলো, তাঁরা চারজন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন, এতে সরকারের কাজ ব্যাহত হবে না। উপদেষ্টাদের পরস্পরবিরোধী মনোভাব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যকার বিভাজনটি স্পষ্ট করে তোলে।[৪৯]

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পদত্যাগকারী উপদেষ্টাদের বনিবনা হচ্ছিল না। উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা না করেই প্রধান উপদেষ্টা অনেক সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁদের পদত্যাগে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও জার্মানির দাতাগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলে, উপদেষ্টাদের পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার প্রতি চ্যালেঞ্জ। এ প্রসঙ্গে পদত্যাগকারী উপদেষ্টাদের তাৎক্ষণিক মন্তব্য ছিল এ রকম :

- মূল লক্ষ্য অর্জনে কাজ বা অবদান রাখার সুযোগ না থাকায় নেহাত চাকরির মোহে পদ আঁকড়ে থাকার কোনো কারণ নেই।—আকবর আলি খান
- সেনা মোতায়েনের ব্যাপারটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। প্যাকেজের প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা নির্বাচন কমিশনার জাকারিয়াকে সরাতে পারলাম না।—হাসান মশহুদ চৌধূরী
- উপদেষ্টাদের উদ্যোগ যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল, তখনই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।—সি এম শফি সামি
- রাষ্ট্রপতির ব্যর্থতার দায় আমরা কেন নেব?—সুলতানা কামাল[৫০]

চারজন উপদেষ্টার পদত্যাগ অনেকেই ভালোভাবে নেননি। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্য ছিল, 'চোর ধরার দায়িত্ব পালন না করে তাঁরা পালিয়ে গেলেন।' জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী অভিযোগের সুরে বলেন, 'ওই চারজন উপদেষ্টা নিরপেক্ষতা প্রমাণে ব্যর্থ।' ওই দিন আরও একটি ঘটনা ঘটে। ভারতের হাইকমিশনার শেখ হাসিনার সঙ্গে এবং পাকিস্তানের হাইকমিশনার খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন।[৫১]

১২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি চারজন নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। তাঁরা হলেন মে. জে. (অব.) রুহুল আলম চৌধুরী, শফিকুল হক চৌধুরী, মঈন উদ্দিন চৌধুরী ও শোয়েব আহমদ। তাঁদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাবের সঙ্গে বঙ্গভবন থেকে দুটি শর্ত দেওয়া হয়েছিল: প্রধান উপদেষ্টার কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁরা কোনো ভিন্নমত প্রকাশ করবেন না এবং কোনো বিষয়ে নতুন কোনো ধারণা কিংবা প্রস্তাব দেওয়া যাবে না। সাবেক সচিব নজরুল ইসলামও উপদেষ্টা হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন। কিন্তু ওই শর্ত মেনে উপদেষ্টা হতে তিনি রাজি হননি।[৫২]

১৪ ডিসেম্বর রাতে হাওয়া ভবনে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে। খালেদা জিয়া তাদের বলেন, 'আওয়ামী লীগকে রুখতে না পারলে ইমান-আকিদা নিয়ে বাঁচা যাবে না।... ১৪ দলের মূলনীতি ইসলাম ধ্বংস করা। তারা ধর্মে বিশ্বাস করে না। ১৪ দলের ১৩টি দলের নেতারা ধর্মবিরোধী মুরতাদ।'[৫৩]

নির্বাচন সামনে রেখে ১৪ দলের সঙ্গে জাতীয় পার্টি (এরশাদ), এলডিপি, জাকের পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোটসহ বিএনপি-জামায়াতবিরোধী দলগুলোর মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। এরশাদকে ঠেকাতে বিএনপির প্রতি নমনীয়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার তুরুপের তাস বের করে। ১০ বছর পর হঠাৎ করেই জাপানি নৌযান কেনা নিয়ে দুর্নীতি মামলায় এরশাদের আপিল খারিজ করে হাইকোর্ট ১৪ ডিসেম্বর তাঁকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। এরশাদের সাজার খবর শুনে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিল, তোফায়েল আহমেদ ও আসাদুজ্জামান নূর তাঁর বাসায় যান। এরশাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন শেখ হাসিনা ও এলডিপি নেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী। এলডিপি নেতা অলি আহমদ বিএনপিকে 'চোর, ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের দল' আখ্যায়িত করে দলটিকে ভোট না দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। মহাখালীর কমিউনিটি সেন্টারে এক সমাবেশে তিনি বলেন, 'খালেদা জিয়া রাজাকারদের গাড়িতে পতাকা তুলে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কলঙ্কিত করেছেন।'[৫৪]

১৫ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বিদায়ী মহাসচিব কফি আনানের বাংলাদেশ বিষয়ে একটি বিবৃতি সাংবাদিকদের পড়ে শোনান তাঁর মুখপাত্র স্টিফেন জুজারিখ। নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে এনে নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরি করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।'[৫৫]

১৭ ডিসেম্বর ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর আমেরিকান স্টাডিজের উদ্যোগে আয়োজিত 'গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটিনেস বলেন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা এক ব্যক্তি হওয়াতে অস্বাভাবিক ও জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এ রকম :

> বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে মার্কিন সরকারের যে তীব্র আগ্রহ রয়েছে, তা গোপন কিছু নয়। বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যা কিছু করছি, তা নির্ভর করছে একটি সফল নির্বাচনের ওপর।... আমি বলতে চাই এমন একটি নির্বাচন, যাতে সব দলই অংশ নেবে, যার ফলাফল বৈধতা ও যথার্থতার নিরিখে ব্যাপকভাবে গৃহীত হবে, যে নির্বাচনে সহিংসতার হুমকি জনগণকে ভোটদান কিংবা তাদের মতামত প্রদান থেকে বিরত রাখবে না, যে নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপর নির্যাতন চালানো হবে না এবং যে নির্বাচনের ক্ষেত্রটি হবে সবার জন্য কমবেশি সমতল।
>
> আমরা কোনো দল বা জোটকে সমর্থন করি না, আবার বিরোধিতাও করি না। দুটি বড় দলই আমার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিপক্ষকে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ এনেছে। এ ব্যাপারে আমি বলব, দুটি দলই ভুল

করছে। কারণ, আমরা এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী যে, নির্বাচনে যে দলটিই জিতুক না কেন, তার সরকারের সঙ্গে আমরা কার্যকরভাবে কাজ করতে পারব।...

মার্কিন সরকার যেকোনো দলের হরতাল ডাকায় বিরোধিতা করে আসছে। আমরা এটাকে পুরোনো ধ্যান-ধারণা, সহিংসতার উৎস এবং অগণতান্ত্রিক বলে মনে করি। মনে রাখতে হবে, উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আমরা দেশব্যাপী অবরোধেরও বিরোধিতা করি। কারণ, এটি দেশের অর্থনীতির ক্ষতি করে। লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, এমনকি তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে।...

কিছু কিছু বাংলাদেশি আমাকে বলেছেন, এবারই হবে সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কারণ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান যে জায়গা থেকে আসেন, সেই বিচার বিভাগ এখন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের শিকার। তারপরও নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশকে প্রস্তুত করতে সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মানুষের ওপর সংবিধানবহির্ভূত কোনো কিছু আরোপ, যেমন সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ, বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দুর্বলতা পূরণ করতে পারছে না। বরং সংবিধানবহির্ভূত বিধিনিষেধ বড় ধরনের অস্থিতিশীলতা ও হতাশার সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্রের হেফাজতকারীদের শক্ত হাতে এটাকে প্রতিহত করতে হবে।...

দুঃখের বিষয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব সময় নিরপেক্ষভাবে কাজ করেনি। এ কারণে গোটা জাতিকে ভুগতে হয়েছে। আমরা আশা করব এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।[৫৬]

নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ২১ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। ১৮ ডিসেম্বর পল্টনে অনুষ্ঠিত হয় ১৪ দলের একটি জনসভা। এতে ১৪ দল ছাড়াও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) এবং এলডিপি যোগ দেয়। এদের নিয়ে 'মহাজোট' তৈরির ঘোষণা দেন শেখ হাসিনা। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনী তফসিল বাতিল করে নতুন তফসিল ঘোষণার দাবি জানান। অন্যথায় ২১ ডিসেম্বর সারা দেশে হরতাল হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সমাবেশে এরশাদ এবং বদরুদ্দোজা চৌধুরীও বক্তব্য দেন।[৫৭]

১৯ ডিসেম্বর পল্টনে অনুষ্ঠিত হলো চারদলীয় জোটের জনসভা। খালেদা




১৮ ডিসেম্বর ২০০৬ পল্টন ময়দানে বিএনপি-জামায়াতবিরোধী মহাজোটের জনসভায় মঞ্চে (বাঁ থেকে) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সাজেদা চৌধুরী, শেখ হাসিনা, মতিয়া চৌধুরী ও বদরুদ্দোজা চৌধুরী

জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৯০ দিন মেয়াদের মধ্যেই নির্বাচন হতে হবে।[৫৮]

২০ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল চতুর্থবারের মতো পরিবর্তন করে। নির্বাচনের তারিখ ২২ জানুয়ারি ঠিক রেখে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ তিন দিন পিছিয়ে ২৪ ডিসেম্বর করা হয়। তা সত্ত্বেও ২১ ডিসেম্বর মহাজোটের ডাকে হরতাল হয়।[৫৯]

ঢাকায় ইসলামী ঐক্যজোট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেখ হাসিনা। আলোচনার বিষয় ছিল 'চলমান আন্দোলনের যৌক্তিকতা এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ওলামা-মাশায়েখদের ভূমিকা'। প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রপতিকে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার 'ইয়েসম্যান' ও 'ছাত্র' হিসেবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'রাষ্ট্রপতি খালেদা জিয়ার কাছে বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান—সবই বন্ধক রেখেছেন।'[৬০]

২৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ও খেলাফত মজলিসের মধ্যে একটি পাঁচ দফা লিখিত চুক্তি হয়। নিজ নিজ দলের পক্ষে সই দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এবং খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী। চুক্তির ধারাগুলো হলো :

১. রাষ্ট্রীয় আইনের বাইরে ধর্মীয় আলেমরা ফতোয়া দেওয়ার অধিকার ফিরে পাবেন।
২. কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন তৈরি করা যাবে না।
৩. কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।
৪. যারা মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী মানেন না, তারা নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে না।[৬১]

এই চুক্তির কথা জেনে ১৪-দলীয় জোটের অন্য শরিকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য বলেন, কেবল নির্বাচনী কৌশল থেকেই এটা করা হয়েছে। তাঁদের একজন বলেন, 'জলিল সাহেব তো কত কিছুতেই সই করেন। এসব চুক্তি-টুক্তির কিছুই বাস্তবায়ন হবে না।' এই চুক্তির ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, 'খেলাফত মজলিসকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ এমন এক মিত্র লাভ করেছে যে এরপর তার কোনো শত্রুর দরকার হবে না।' অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'প্রমাণ হয়েছে তাদের আদর্শহীনতা।'[৬২]

দেশের ৬৩ জন বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিক এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের যত্রতত্র ফতোয়া জারি করায় যে পীড়নমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা বন্ধ করতে হাইকোর্ট ফতোয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। এখন ফতোয়াবাজির অধিকার স্বীকৃত হলে দেশে সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা চলবে। চুক্তিটি মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র, উদারনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী এবং তা দেশের জন্য খুব ক্ষতিকর। বিবৃতিতে সই দেন কবীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, মোশাররফ হোসেন, রেহমান সোবহান, আনিসুজ্জামান, মোজাফফর আহমদ, হেনা দাস, সি আর দত্ত প্রমুখ। আহমদিয়া জামাত এক বিবৃতিতে এই চুক্তির বিরোধিতা করে বলে, এর ফলে দীর্ঘদিনের লালিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধূলিসাৎ হবে এবং বাংলাদেশ আবার সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের পথে ফিরে যাবে।[৬৩]

ভেতরে-ভেতরে দুই জোটই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আওয়ামী লীগ নিজেদের জন্য ২১২টি আসন রেখে বাকি ৮৮টি আসন মহাজোটের শরিকদের জন্য বরাদ্দ দেয়। এর মধ্যে জাতীয় পার্টি ৫০, এলডিপি ২৩, জাসদ ৬টি। শেখ হাসিনা ৪টি আসনে প্রার্থী হবেন বলে জানা যায়। এরশাদ ৫টি এবং রওশন এরশাদ ২টি আসনে প্রার্থী হবেন বলে জানান।[৬৪]

জাতীয় পার্টি অবশ্য ৩০০ আসনেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার ঘোষণা

দেয়। মনোনয়ন না পেয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। ২৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে জানা যায়, ৩০০ আসনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ৪ হাজার ১৪৬। আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত শরিকদের জন্য ৯৬টি আসন ছেড়ে দেয়। এর মধ্যে জাতীয় পার্টি ৫০, এলডিপি ২৯, জাসদ ৪, ওয়ার্কার্স পার্টি ৪, গণফোরাম ৩, গণতন্ত্রী পার্টি ১ এবং জাকের পার্টিসহ ইসলামি দলগুলোকে ৫টি আসন দেওয়া হয়।[৬৫]

এর মধ্যে ২৬৪টি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। নির্বাচনের দৌড়ে টিকে থাকেন ৩ হাজার ৮৮২ জন। পাঁচটি আসনেই এরশাদের মনোনয়ন বাতিল হয়। আদালতের রায়ে এরশাদ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে আগে থেকেই সংশয় ছিল। ফলে আওয়ামী লীগ অস্বস্তিতে পড়ে যায়।[৬৬]

২৯ ডিসেম্বর ঢাকার র‍্যাডিসন হোটেলে মহাজোটের পক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের পদত্যাগ, সংবিধান অনুযায়ী নতুন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে নতুন করে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ঈদের আগেই সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া এবং নির্বাচন পর্যন্ত র‍্যাবের কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবি জানান। প্রধান উপদেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তিনি ইয়েস ম্যাডাম, ইয়েস ম্যাডাম করতেই ব্যস্ত। তাঁকে দিয়ে কিছু হবে না। এই ইয়েসউদ্দিনকে যেতে হবে।' মহাজোট ৮ জানুয়ারি অবরোধের কর্মসূচি দেয়।[৬৭]

এরশাদ বগুড়ায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, মহাজোট তাঁকে ছাড়া নির্বাচনে যাবে না। তিনি বলেন, 'নির্বাচনে গেলে সবাই মিলেই যাব আর না গেলে সবাই মিলেই সিদ্ধান্ত নেব।'[৬৮]

৩ জানুয়ারি ২০০৭ ঢাকার শেরাটন হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা মহাজোটের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত জানান। মহাজোটের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। ফলে খালেদা জিয়া, তারেক রহমানসহ ১৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যান।[৬৯]

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী এক মন্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে বৈধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য নির্বাচনে সব বড় দলের অংশগ্রহণ থাকা দরকার।[৭০]

৫ জানুয়ারি রাতে লন্ডনের প্রভাবশালী *দ্য ইকোনমিস্ট*-এর ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদনে বলে :

২২ জানুয়ারি যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে তার ফলাফল হবে অর্থহীন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। ১৯৯৬ সালের (ফেব্রুয়ারি) মতো একটি নির্বাচন সম্ভব। কোনো না কোনো ধরনের একটা সামরিক হস্তক্ষেপও অবশ্য সম্ভব। দুটি ভবিষ্যদ্বাণী এখন সংগত কারণেই উল্লেখ করা চলে। প্রথমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের প্রতিষ্ঠানটি সংকট থেকে আর নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরপর্ব হবে অধিকতর হিংসাত্মক।

১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু এটা এখনো স্পষ্ট নয় যে এর পরিবর্তে কী আসবে। আপাতত সব ধরনের সমাধানই কোনো না কোনো প্রকারের সামরিক সংশ্লিষ্টতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।... আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে এখনো অংশ নেয়, তাহলে তার হেরে যাওয়ার আশঙ্কাই থাকবে।... আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জনের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইছে। ওই বছর বিএনপি দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু রাজপথের সহিংসতা ও প্রতিবাদ বিএনপি এবং তার রাজনৈতিক মিত্রদের সংবিধান সংশোধন করতে বাধ্য করে। ১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। তবে এই দৃষ্টান্তের আলোকে বলা যায়, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দিতে বিএনপি এবার রাজি হবে না।[৭১]

৭ জানুয়ারি মহাজোটের ডাকে টানা ৭২ ঘণ্টার অবরোধ শুরু হয়। একতরফা নির্বাচন এড়াতে কয়েকজন উপদেষ্টা ও কূটনীতিক সক্রিয় হন।

১০ জানুয়ারি 'পুতুল ইয়াজউদ্দিনই দায়ী থাকবেন' শিরোনামে *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমানের এক মন্তব্য প্রতিবেদনে বলা হয়, সংকট মোকাবিলায় প্রধান উপদেষ্টা যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তাতে যেকোনো পরিণতির জন্য তিনিই দায়ী থাকবেন। বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদনের মন্তব্য ছিল :

দেশের এ পরিস্থিতিতে মানুষ খুবই হতাশ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শঙ্কিত। একটি বিরোধপূর্ণ নির্বাচন, প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, স্বৈরাচার রাষ্ট্রপতির নির্লজ্জ কার্যক্রমের কারণে দেশের মানুষকেই ভবিষ্যতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে, দেশের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে। ব্যাহত হবে সমাজের সব অগ্রগতি।...

তবে এত হতাশার মধ্যেও আমরা আশা হারাতে চাই না। গণতন্ত্র, নির্বাচন, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ভোটের অধিকার, সৎ ও যোগ্য প্রার্থী,


প্রথম আলো

একতরফা ভোট এড়াতে সক্রিয় কূটনীতিক ও কয়েকজন উপদেষ্টা

পুতুল ইয়াজউদ্দিনই দায়ী থাকবেন

আজ মহাজোট নির্বাচন প্রতিরোধের কর্মসূচি দেবে

বঙ্গভবনের আশপাশে পুলিশের সঙ্গে মহাজোট কর্মীদের সংঘর্ষ

চোরাগোপ্তা হামলা বাড়ছে

অনিশ্চিত পথে দেশ

কালোটাকার দৌরাত্ম্য, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সংবিধান সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে। সচেতন জনগণই সব অপতৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্থিতিশীলতা ফিরে পেতে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের অনেক বেশি বেগ পেতে হবে। তবে এটা এখন সত্য বলে মেনে নিতে হবে যে বর্তমান ব্যর্থ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দল বা জোট দিয়ে আমাদের সামনে এগোনো আর সম্ভব নয়। এই চরম সুবিধাবাদী ও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নেতৃত্ব দিয়ে দেশের কোনো অগ্রগতি হবে না। তাঁরাই এখন এগিয়ে যাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। সে জন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে নতুন করে ভবিষ্যতের পথ সন্ধান করতে হবে।[৭২]

বিএনপি সরকারের মেয়াদের শেষের দিকে, অর্থাৎ ২০০৬-এর শেষ ভাগে হঠাৎই তখনকার পুলিশপ্রধানের পরিবর্তন হয়। ১৯৭৩ সালে নিয়োগ পাওয়া ব্যাচের আবদুল কাইয়ুমকে পরিবর্তন করে একই ব্যাচের আনোয়ারুল

ইকবালকে আইজিপি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। গুজব ছড়ানো এবং হালকা মেজাজের ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে এ পরিবর্তনটি একটি ধাঁধা সৃষ্টি করে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের কাছে মনে হয়েছে যে শেষোক্ত জনই ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পুলিশপ্রধানের দায়িত্বে থাকবেন, এমনটাই তখনকার সরকারের পরিকল্পনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে সংবিধান অনুযায়ী সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানানোর পর রাষ্ট্রপতিই (ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের দায়িত্ব নেন। এই নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারই খোদা বখশ চৌধুরীকে ২ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে আইজিপি হিসেবে নিয়োগ দেয়। বাজারে গুজব ছড়ানো গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে এটা ছিল একটি অপ্রত্যাশিত নিয়োগ। লগি-বইঠার তাণ্ডবে মৃত্যুবরণকারী রাজনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালনে পুলিশের ব্যর্থতাকেই এই হঠাৎ পরিবর্তনের একটি কারণ হিসেবে প্রচার করেন কেউ কেউ। এ দেশে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো প্রেক্ষাপট কখনো ব্যাখ্যা করেন না, তাই এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত কী বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল, তার সঠিক কার্যকারণ কখনো জানা যাবে না। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পুলিশের মহাপরিদর্শক খোদা বখশ চৌধুরীর ভাষ্যে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কার একটি চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো :

> নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি ঘটনা ঘটে, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য সম্বন্ধে প্রচলিত পারসেপশনের সঙ্গে একেবারেই মিলে না। আমাকে একদিন বেশ রাতে রাষ্ট্রপতির এডিসি টেলিফোনে বলেন, 'মহামান্য (রাষ্ট্রপতি) কথা বলবেন।' এই দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন আগে মহামান্য একটি বড় রকমের শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে তখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে ছিলেন। আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে এত রাতে মহামান্য জেগে আছেন এবং কেন কথা বলতে চাচ্ছেন। যাহোক, স্বাভাবিক কুশল বিনিময় এবং আরও দু-একটি হালকা কথা শেষে তিনি আন্দোলন পরিচালনকারী রাজনৈতিক দলের আন্দোলন মোকাবিলার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা পুলিশি কৌশল এবং নীতির প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি মৃদুস্বরে হালকাভাবে বললেন যে বিএনপি সরকারের সময় জনশৃঙ্খলা বা পাবলিক অর্ডার যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো, এখন তেমনভাবে হচ্ছে না

বলে তিনি জানতে পেরেছেন। তাই তিনি বিষয়টি আমার কাছে জানতে চাচ্ছেন। তাঁর হালকা চালের কথা থেকে তিনি ঠিক কী জানতে চাচ্ছেন, এটা আমার কাছে পরিষ্কার না হওয়ায় আমি তখন মহামান্যের কাছে বিষয়টি সামনাসামনি ব্যাখ্যা করার অনুমতি চাই। তিনি পরদিন সকাল ৯টায় রাষ্ট্রপতির অফিসে আসার কথা বললেন। আমি মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে কঠোর হাতে আন্দোলন দমন করা হচ্ছে না মর্মে কেউ রাষ্ট্রপতির কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

এখানে বলে রাখা ভালো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নির্বাচন অনুষ্ঠান। এক দলকে রেখে আরেক দলকে নির্বাচনী মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের লক্ষ্য হতে পারে না। এটাই ছিল আমার বিশ্বাস এবং সে মতেই পুলিশের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছিল। র‍্যাব নামক সংগঠনটির হাতে ক্রসফায়ারের নামে নরহত্যার ঘটনা তখন ঘটছিল না। ভেবে পাচ্ছিলাম না কী পরিস্থিতি পরদিন সকালে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সকালে মহামান্যের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমি পুলিশের শক্তি প্রয়োগের আইনি পদ্ধতি এবং আইনি সংযম অনুসরণের বাধ্যবাধকতা, শক্তি প্রয়োগকারীর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি প্রত্যেক মাঠপর্যায়ের পুলিশ অফিসারদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করার প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব রয়েছে তা ব্যাখ্যা করি। আমি স্পষ্টভাবে বলি যে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ নয়, শুধু ইশারা করলেই মাঠপর্যায়ের পুলিশ অফিসাররা আন্দোলনকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং রাস্তা থেকে প্রতিবাদকারীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবে। ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রতিদিন দু-একটা লাশ পড়বে, এই যা। আর বাস্তবতা হলো, এসব লাশ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তায় স্লোগান হবে 'খুনি ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগ চাই' বা 'বিচার চাই'। আমি মহামান্যকে বলি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক না হলেও তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই সকল ছাত্রের শিক্ষক—এমনটা আমি মনে করে আসছি। আর আমি সেই শিক্ষা থেকেই মহামান্যকে আমার নিজের শিক্ষকই মনে করি এবং সেভাবে শ্রদ্ধা করি। আমার কোনো কাজ আমারই শিক্ষককে জনসমক্ষে 'খুনিতে' রূপান্তর করার মতো উপাদান জোগাবে, এমনটা সচেতনভাবে আমি করতে পারি না। তবে তিনি হলেন সরকারের প্রধান নির্বাহী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই তিনি নির্দেশ দিলে সেই নির্দেশ আমি প্রতিপালনে আইনত বাধ্য। পুলিশের জনশৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও

> ঝুঁকিপূর্ণ। আর কঠোর বা ডিসপ্রপোরশনাল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিবাদকারীদের দমন করার কাজটি অত্যন্ত সহজ। কিন্তু এর পুরো দায়টি তাঁর কাঁধে গিয়ে পড়বে। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম যে তিনি আমাকে কোনো প্রকার কঠোর বা হঠকারী কাজ করতে নির্দেশ তো দেনইনি, বরঞ্চ আমার অনুসৃত আইনানুগ পন্থায় প্রতিবাদকারীদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা যাতে অব্যাহত রাখি, সে বিষয়ে জোরের সঙ্গে নির্দেশ দেন। আমি দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে বঙ্গভবন ত্যাগ করি।
>
> ওপরের বয়ানটি সে সময়ের পাবলিক পারসেপশনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। প্রচারমাধ্যম, বোদ্ধাজনেরা, তথাকথিত বিবেকবান লোকেরা এবং সরকারের বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক জোট/দলের নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানকে একজন পক্ষপাত-দুর্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং অস্বচ্ছ প্রশাসন পরিচালনকারী হিসেবে জনসমক্ষে প্রমাণ করার জন্য সমস্ত মেধা ও শ্রম নিয়োগ করেছিলেন। শত সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু সেদিনের সরকারপ্রধান তাঁর প্রতিপক্ষকে 'নিশ্চিহ্ন করতে' এমনকি একবারের জন্যও নির্দেশ দেননি।
>
> এর ফলে আমি প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ সমন্বয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এবং বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে আমি নিয়মিত দুটি দলের ও জোটের সভা-সমাবেশের স্থান ও সময় নিয়ে কথা বলে সমন্বয় করার কাজটি সহজেই করতে পেরেছিলাম। উভয় নেতাই আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই। আমি একটি নিয়ম অনুসরণ করতাম। প্রথম যে দল বা জোট সভা/সমাবেশের ঘোষণা দিত, আমি সে সংবাদটি অন্য পক্ষকে জানিয়ে সে জায়গায় সে সময়ে যাতে সমাবেশ/সভা না করে, সেই মতো অনুরোধ করতাম। একটিবারের জন্যও উভয় দল একই স্থানে সমাবেশ ডেকে পুলিশকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেনি।[৭৩]

খোদা বখশ চৌধুরীর বক্তব্যে মনে হয়, ওই সময় পুলিশ প্রশাসনের আচরণ ছিল সংযত। কিন্তু জনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল বলে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, তা একেবারে অমূলক ছিল না। রাজনৈতিক সমঝোতা না হওয়ার কারণেই এ ধারণা তৈরি হয়েছিল। 'কী হবে', 'কী হতে পারে', 'আমরা কোন দিকে যাচ্ছি'—এ রকম অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল জনমনে। সংকটের মূলে ছিল নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাংঘর্ষিক অবস্থান নেওয়া।

১০ জানুয়ারি নির্বাচন প্রতিরোধের ডাক দেয় মহাজোট। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ১৪ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গভবন ঘেরাও, ১৪-১৫ ও ১৭-১৮ জানুয়ারি সারা দেশ অবরোধ এবং ভোটের দিন ও আগের দিন ২১-২২ জানুয়ারি সারা দেশে হরতাল। পল্টনে এক জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, এরপরও যদি নির্বাচনের কাজ চলে, তাহলে ২২ তারিখের পর লাগাতার হরতাল চলবে।[৭৪]

১০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিক ইনস্টিটিউট (আইআরআই) জানিয়ে দেয়, সব বড় দল নির্বাচনে অংশ না নিলে তারা কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাবে না। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন জানায়, বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে না। ১০ জানুয়ারি কুমিল্লার চান্দিনায় নির্বাচনী পথসভায় খালেদা জিয়া বিএনপির নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'এই নির্বাচনে যারা বাধা দিতে আসবে, তাদের এমনভাবে প্রতিহত করতে হবে, যেন ভবিষ্যতে আর ভোট চাওয়ার সাহসই তারা না পায়।'[৭৫]

পরিস্থিতি দিন দিন ঘোলাটে হচ্ছিল। আওয়ামী লীগ আর বিএনপি—বাংলাদেশের রাজনীতির এ দুই পরাশক্তির যুযুধান অবস্থানের কারণে মীমাংসার সম্ভাবনা তলানিতে ঠেকেছিল। সাধারণ মানুষ যেন হতাশার গভীরে ডুবে যাচ্ছিল। চারদিকে কেবলই অন্ধকার। দেশ এ ধরনের পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে। কিন্তু বারবার একই ধরনের সংকট মানুষকে আস্থাহীনতার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক সহিংসতা যে মাত্রায় গিয়ে ঠেকেছিল, অতীতে তেমনটি দেখা যায়নি। আন্তদলীয় বিবাদ আর সাংবিধানিক জটিলতা—দুটোই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। মানুষ চাচ্ছিল দ্রুত একটা সমাধান আসুক। অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে সবাই মরিয়া। অথচ কোথাও আশার আলোর ক্ষীণতম শিখাটিও দেখা যাচ্ছে না। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে মানুষ কোথায় নববর্ষের আনন্দের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেবে, তা না, দিন দিন অবস্থা যাচ্ছে খারাপের দিকে। বিষয়টি উঠে এসেছে নাগরিক ভাবনায়। ৪ জানুয়ারি *প্রথম আলো* নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজন করে একটি গোলটেবিল আলোচনার। এতে অংশ নেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও এম হাফিজউদ্দিন খান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান ও সুলতানা কামাল, সাবেক সেনা কর্মকর্তা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব সা'দত হুসাইন,

অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম। তাঁদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপ :

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ : চলমান রাজনৈতিক সংকটের এমন একটা পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি, যেখান থেকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফেরার খুব বেশি পথ আর খোলা নেই। আমাদের দুই বিবদমান পক্ষের পরপর ভুল পদক্ষেপের কারণেই বর্তমান রাজনৈতিক সংকট এ পর্যন্ত গড়িয়েছে। এখন ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের ভাগ্যে যা-ই থাকুক না কেন, ভোট গ্রহণ সম্ভব হোক বা না হোক, একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে। কারণ, সংকটটি মূলত রাজনৈতিক; সাংবিধানিক নয়। দুই পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে একটা সমাধান পাওয়া গেলে সাংবিধানিক বিধিনিষেধ বড় সমস্যা হবে বলে মনে করি না। যদি রাজপথে শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই সমাধান খুঁজতে হয়, তাহলে আমাদের খুব বড় মূল্য দিতে হবে।

বর্তমান সংকট থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, আমাদের যে দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আছে, এদের সহযোগিতা ছাড়া সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রাখা সম্ভব নয়। এক পক্ষকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে অন্য পক্ষের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা কোনো বাস্তবসম্মত কৌশল হতে পারে না। সংকটের জন্য পরস্পরকে দায়ী করে দায়দায়িত্ব একজন আরেকজনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কারও কোনো লাভ হবে না। দেশের তো নয়ই।

হাফিজউদ্দিন খান : আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে মহাসংকট—'সুনামি আসছে'। সে সুনামি কাকে আঘাত করবে, কীভাবে আঘাত করবে, বলা মুশকিল। সবাইকে আঘাত করবে।

যে আশা সৃষ্টি হয়েছিল নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে, সেটা পরে আমরা ভুলে গেছি—যারা ক্ষমতায় গেছে বা যারা বিরোধী দলে—সবাই। যেসব বক্তব্য বা আদর্শ তারা জনসাধারণের সামনে তুলেছিল, তারা তা ভুলে গেছে। সে হিসেবে অভ্যুত্থানটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ যেন আমাদের নেতাদের মধ্যে সুবুদ্ধি দেন। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আমাদের দেশবাসীর আবেদন, আপনারা আর যা-ই করেন, দেশটার সর্বনাশ করবেন না। গণতন্ত্রের সর্বনাশ করবেন না।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম : আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ হয়ে গেছে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। আর এখানে আমরা ছাড়া সবাই যুদ্ধে ব্যস্ত। ভিন্ন রাষ্ট্র, দেশগুলোও তাদের স্বার্থ নিয়ে আমাদের ভূমিতেই যুদ্ধ করছে। এবং ভিন্ন দেশের সরকার প্রকাশ্যে হোক আর অপ্রকাশ্যে হোক, নীরবে হোক, সরবে হোক, আমাদের এখানে ব্যস্ত। এখানে আমি কোনোভাবেই দেখছি না যে দুটো দলের মধ্যে কোনো সমঝোতা আনা সম্ভব। নাগরিকেরা তথা প্রচারমাধ্যম সব সময়ই ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের সবাইকেই ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমরা আবেদন করতে চাই তিন জায়গায়—একটা হচ্ছে, যদি সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটা জাতীয় সরকার গঠন করা যায়। দুই নম্বর হচ্ছে, রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে, ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে, সুশীল সমাজের সমন্বয়ে এবং সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা যায়। যদিও এটা অগণতান্ত্রিক এবং গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, তো আমি বারবার জোর দিয়ে বলতে চাই, সব সমস্যা কিন্তু কিতাবে লেখা থাকে না। সুতরাং সমাধানও সব সময় শুধু কিতাবে খোঁজাটাই বাঞ্ছনীয় নয়।

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ : দুই প্রতিপক্ষ জোটকে ঘিরে ইদানীং যে ধরনের মেরুকরণ হচ্ছে, তাতে এটাকে কি আসলেই আদর্শের চূড়ান্ত সমাধানের লড়াই বলা যায়? নাকি আমাদের রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে, বাণিজ্যিকায়ন হয়েছে এবং এর ফলে গোষ্ঠীস্বার্থের যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, তারই বহিঃপ্রকাশ হলো বর্তমান রাজনৈতিক বিরোধ-সংঘাত। অবৈধ উপার্জনের ভাগ-বাঁটোয়ারাই যদি ক্ষমতার রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি হয়, রাজনীতি যদি বিপুলসংখ্যক দলীয় কর্মী বাহিনীর জীবিকার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা হাতছাড়া না করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলো মরণপণ যুদ্ধে নামবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

কাজী খলীকুজ্জমান : আমাদের যে পাবলিক ইনস্টিটিউশনগুলো আছে: একটা পার্লামেন্ট, সেটা কাজ করছে না। সেখানে নানা ধরনের লোক ঢুকে পড়েছে; রাজনীতির সঙ্গে যাদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের নিজেদের স্বার্থে সেটাকে ব্যবহার করছে। আরেকটা হচ্ছে আমাদের নির্বাচন কমিশন। আমাদের সংবিধানে এমন একটা অবস্থা আছে যে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সব ক্ষমতার অধিকারী। যিনিই প্রধানমন্ত্রী থাকেন, তিনি নির্বাচন কমিশনকে তাঁর ইচ্ছেমতো গঠন করতে পারেন। আগে আমরা

খুব সাবধানে বলতাম, পাছে আদালত অবমাননা হয়ে যায় কি না, নিচু আদালত দুর্নীতিবাজ, এখন তো আমরা দেখছি উচ্চ আদালতও সেই পথে চলছে। সেখানে ইচ্ছেমতো মামলা ওঠে, ইচ্ছেমতো নামে।

আমার ধারণা, সাবেক প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিলে কে কে আসবেন, সেই হিসাব ১৪ দলের ঠিক ছিল না। তারা তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা একজনকে সরিয়ে তারপর কে আসবে চিন্তা করেনি। কিন্তু প্রতিপক্ষ যারা, যারা সরকারে ছিল, তারা অনেক গভীর চিন্তা করে রেখেছে। এক-দুই নয়, তিন-চার-পাঁচ—একজনকে বাদ দিলে কে আসবেন, তারপর কে আসবেন, তারপর কে আসবেন—প্রতিটা ধাপ সেট করা হয়েছে। তো সেই সেট করা অবস্থায় মহাজোট হোক, যে জোটই হোক, আমিও যদি হই বা আপনারা যে কেউ হন, তাতে পা দেবেন কেউ? দেওয়া উচিত? আমার তো মনে হয়, না।

সা'দত হুসাইন : প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন প্রতিষ্ঠানগুলো দলের হয়ে গেল। আমি বাস্তবতায় মনে করি যে এটাই হওয়ার কথা। যখন আমরা পাকিস্তানে ছিলাম বা কলোনিয়াল ছিলাম, তখন প্রশাসন ছিল অনেক দূরে, আমরা প্রশাসনের মধ্যে ছিলাম না। কিন্তু আমাদের হাতে যখন ক্ষমতা প্রকৃতভাবে এল, তখন বাস্তবতা কাজ শুরু করল। ক্ষমতা যদি থাকে, তাহলে আমি তো চেষ্টা করবই সব প্রতিষ্ঠান আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়ার। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে নির্বাচন কমিশনার বানাতে পারি। যাকে-তাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দিতে পারি। তারপর এমনকি বিচার বিভাগে হাই জুডিশিয়ারি সিলেকশন প্রসেসও কিন্তু নেই। তিন-চারজন লোক মিলে যা মোটামুটি করে ফেলতে পারে। আমার যদি ক্ষমতা থাকে, আমি আস্তে আস্তে সব কবজা করব, এটাই তো স্বাভাবিক। এটাই হয়েছে বাংলাদেশে।

সংবিধানের ফাঁকফোকর যত দিন এ রকম থাকবে, যত দিন সংবিধানের চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সিং আসবে না, যত দিন সংবিধান প্রকৃতপক্ষে জনগণকে অপারেশনালি অধিকার দেবে না, তত দিন কিন্তু এই ফাঁকফোকর আসবে। যদি শুরু করতে হয় আমাদের, তাহলে সাংবিধানিক পুনর্গঠন থেকে শুরু করতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : রাজনীতিতে মানুষ ক্ষমতা চায় জনগণের মঙ্গল করার জন্য। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে অপ্রতিরোধ্য দুর্নীতি, ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য একটা পদ্ধতি।

এখানে আমি চারটা প্রধান শক্তিকে দেখছি। এক নম্বর হলো রাজনীতির মধ্যে একটা সুস্থ ধারা আছে; রাজনীতিবিদদের মধ্যে, প্রতিটি দলের মধ্যে এবং বড় দলগুলোর বাইরে যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের কারও কারও একটা আকাঙ্ক্ষা আছে প্রকৃত গণতন্ত্রায়ণের। সেই মানুষগুলো কিন্তু এখনো এই প্রচলিত রাজনীতির সঙ্গে অস্বস্তিতে আছেন। তাঁরাও একটি পথ খুঁজছেন। দুই নম্বর হলো, গত এক বছরে গ্রামগঞ্জে, মফস্বল শহরে ঘুরে দেখেছি বাংলাদেশে একটা সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছে। তারা পরিবর্তন চায়, তাদের কাছে কোনো ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া নেই। তারা শুধু নাগরিক অধিকারগুলোর বাস্তবায়ন চায়, তার বিকাশের সুযোগ চায়। তৃতীয়ত, আমি মনে করি যে বাংলাদেশের একটি বিকাশমান অর্থনীতির ভেতরে একটি নতুন বিকাশমান আর্থসামাজিক গোষ্ঠী থাকে। যে আর্থসামাজিক গোষ্ঠী এ মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে দুর্নীতির কারণে এবং বিচ্ছিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের কারণে তাদের যে একটা প্রতিযোগিতাক্ষম বাজার অর্থনীতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, সেটা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা টেন্ডার পাচ্ছে না ব্যক্তিসংযোগ নেই বলে, আত্মীয়সংযোগ নেই বলে, রাজনৈতিক সংযোগ নেই বলে। তারাও কিছু অস্থির হয়ে উঠেছে। চতুর্থত, এই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ছে একটা একটা করে। রাজনীতির ভেতরে যেমন একটা সুস্থ ধারা আছে, আমি মনে করি, রাষ্ট্রক্ষমতার ভেতরে যেসব রাষ্ট্রীয় বর্গ আছে, আমি বলছি সামরিক-বেসামরিক মিলিয়েই এটার ভেতরে আছে, এই শক্তিও কিন্তু যুক্ত হতে যাচ্ছে। এই শক্তিও বাংলাদেশের, তারা সরকার পরিবর্তনের পরপরই এভাবে প্রত্যেকে ভিকটিমাইজড হতে চায় না। তারাও দেখতে চায় যে তাদের মেধার ভিত্তিতে তাদের এগোনোর রাস্তা যেন ঠিক থাকে। এই চারটি জাতীয় বড় শক্তি যদি এক হতে পারে, তাহলে যে মহাসমাধানের কথা বলা হচ্ছে, আমি মনে করি, তার পক্ষে একটা মহা-উদ্যোগ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

আমি পঞ্চম শব্দটা ব্যবহার করব—এটা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে—আন্তর্জাতিক শক্তির ভূমিকা নিয়ে। আমি মনে করি, এই চারটি শক্তি যে তাদের মহাসমাধানের পথে আসবে, তার অবশ্যই একটা আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে।

সুলতানা কামাল : আমার মনে হয় গণতন্ত্রকে একটা জায়গায় আনারও ব্যাপার আছে। আমি মনে করি যে নাগরিক সমাজের একটা বড়

কাজ এখানটায় রয়ে গেছে। এই যে এখানটার নীতিবিবর্জিত ক্ষমতার একটা প্রক্রিয়া চলছে, সেই প্রক্রিয়াটাকে কীভাবে আমরা আটকাতে পারি। আমরা কিন্তু অনেক ওনারশিপ ছেড়ে দিয়েছি। এটা আমাদের অনেক বড় দুর্বলতা যে আমরা নিজেদের ওনারশিপ ছেড়ে দিই। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আমরা দিনের পর দিন একটা একটা করে রূপরেখা দাঁড় করিয়েছি—যে রকম একটা দেশ আমরা চেয়েছি। কাজেই এখন দেশটার হেফাজতটাই আমাদের নিতে হবে এবং নেওয়াটাই আমাদের সবচেয়ে বড় নৈতিক দায়িত্ব এখন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সব আইনি সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু তো এই যে একজন নতুন তত্ত্বাবধায়কপ্রধান লাগবে।

আকবর আলি খান: বড় দুটি রাজনৈতিক জোট যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এ ধরনের আইনি সমাধান হওয়া উচিত, তাহলে দেখা যাবে যে সেটা বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ: বর্তমানের আলোচনা-বিতর্ক নির্বাচনকে ঘিরে হলেও সমস্যার মূলে রয়েছে উচ্চ আদালত, নির্বাচন কমিশন বা সরকারি কর্ম কমিশনের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়। দলীয় সংকীর্ণ বিবেচনায় এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা মেধা ও যোগ্যতার চরমভাবে অবমূল্যায়ন করেছি। সাংবিধানিক পদের মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, দক্ষ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সবার আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়োগদানের সংস্কৃতি আমাদের গড়ে ওঠেনি। এ কারণে ব্যক্তিবিশেষের গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতাকে আমরা এক করে ফেলেছি। এটা শুধু সংবিধান বা আইনের বিষয় নয়, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও রীতিনীতির বিষয়। এ জন্য আমি মনে করি যে নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের জন্য নাগরিকদের যে আন্দোলন, এটা ঠিক ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে সাংবিধানিক পদে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগের বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

হাফিজউদ্দিন খান: আইনি সমাধানের জন্য দুটি বড় জোটের মধ্যে যে সমঝোতা দরকার, সেই সমঝোতা থাকলে কোনো সমস্যাই হতো না। এখন যে পরিস্থিতি, যে সংঘাতময়, যে দ্বন্দ্ব; এখন তো এটা আশা করতে পারি না। আমার ঘুরেফিরে একটা কথাই মনে পড়ছে, কার্ল মার্ক্সের কথা। একটা লাইন মনে আছে—ফোর্স ইজ দ্য মিডওয়াইফ অব এভরি ওল্ড সোসাইটি প্রেগন্যান্ট উইথ নিউ ওয়ান। ফোর্স মানে এখানে ওই

ফোর্স, গণ-অভ্যুত্থানের ফোর্স। সামাজিক যে ফোর্স, অর্থাৎ পিপলস ফোর্স, সেটা শান্তিপূর্ণ হতে পারে, সংঘাতময় হতে পারে।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম: কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম ইজ ইমপর্ট্যান্ট, কিন্তু এই অবস্থায় নয়। নট বিফোর টোয়েন্টি সেকেন্ড অব জানুয়ারি। আর প্লিজ ডোন্ট ফিল শাই টু গো আউট অব দ্য ওয়ে টু সল্‌ভ আ প্রবলেম হুইচ ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দ্য বুকস। এর জন্য প্রয়োজন হলে ওপেন লিংক লাইন করেন পাবলিককে, পুলিশকে, সেনাবাহিনীকে যে আপনারা এই সাহায্য আমাদের করতে পারেন।

সা'দত হুসাইন: এখন যেটা ইমিডিয়েট প্রবলেম, সেটা দিয়ে যদি মানুষের কাছে হাইলাইট করা যায় এবং যারা মধ্যস্থতা ইত্যাদি করে তাদের বোঝানো যায়, সেটা আসলে একটাই বাকি। সেটা হলো ভোটার তালিকা। আসলে ভোটার তালিকাটা সামহাউ রাদার পাবলিশ হয়নি। তো ভোটার তালিকা না থাকলে নির্বাচন হওয়া কঠিন এবং এটা বোধ হয় সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এটা করার ব্যাপারে আমি এখনো মনে করি, এটা সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্সের মাধ্যমে করতে পারে।

কাজী খলীকুজ্জমান: ইলেকটোরাল রুলটি যদি ঠিক না হয়, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। দ্বিতীয় হচ্ছে, যে যাকে ভোট দিল সেটা গণনা করার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, আমি ভোট দিয়ে এলাম, আমার ইলেকটোরাল নামও আছে, কিন্তু দিলাম সা'দত হুসাইনকে, গণনা হলো ইবরাহিম সাহেবের। তাহলে তো চলবে না। কাজেই ওই পদ্ধতিটাও ঠিক করতে হবে। তা না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। এই ২২ তারিখের মধ্যে আমার মনে হয় না সমঝোতা হওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২২ তারিখের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচন অংশগ্রহণভিত্তিক না হওয়ায় এবং সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হবে না। ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হয়ে যেতে পারে, এ রকম সম্ভাবনাকে অনেকেই অসম্ভব বলে মনে করছেন। আমি এটা মনে করি না। অন্যান্য আলোচনা অবশ্যই ২২ তারিখের পরও আমাদের করার সুযোগ হবে।

কিন্তু রাজনীতিবিদদের যদি বিপুল জনগণের অথবা বিকাশমান শক্তির সমর্থন চাইতে হয়, তাহলে এগুলোর বাইরে আরও কিছু তাঁদের দিতে হবে। যদি রাজনীতিবিদেরা প্রচলিত ভোটার তালিকার বাইরে গিয়ে আমাদের সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের সামনে আনার সুযোগ না দেন, রাজনৈতিক সংস্কার এবং তার ওপর যদি জবাবদিহি সৃষ্টির সুযোগ না

দেন, তাহলে কী জন্য মানুষ শুধু এই ভোটার তালিকা আর অন্য একটি অনুষঙ্গ ঠিক করার জন্য জীবন দেবে। আমি মনে করি যাত্রাবিন্দু হতে হবে সংবিধান অনুযায়ী একজন নতুন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের মাধ্যমে। সময় নিয়ে, প্রস্তুতি নিয়ে আমরা একটা প্রকৃত ভালো নির্বাচন যাতে করতে পারি।

সুলতানা কামাল : ইলেকশন ইজ অল অ্যাবাউট ফ্রিডম অব চয়েস। বাট দেয়ার ইজ নো ফ্রিডম অব চয়েস অ্যাকচুয়ালি ইনভল্ভড ইন দিস ইলেকশন। যদি আমরা ২২ জানুয়ারিকেই রাখি শেষ দিন, সেটার মধ্যেই যতটুকু করা সম্ভব বা করা দরকার, এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপারেও নিয়ে আসা দরকার। আমি মনে করি যে নির্বাচনের জন্য শুধু একটা নির্বাচন করা—আমাদের রাজি হওয়া উচিত নয়। যেহেতু সংকট এত ঘনীভূত, যেটা আমরা বলি যে ওয়ার্স্ট অব টাইম বেস্ট অব টাইম। আমার মনে হয় দিস ইজ অলসো বেস্ট অব টাইম ফর আস। এ সময়েই এগুলোতে আমাদের আঘাত হানা দরকার এবং কথা বলা দরকার।[৭৬]

এই আলোচনায় একটি জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে শিগগির সমস্যার জট খুলছে না। সমস্যা যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক সংস্কৃতির। আলোচকদের মতে, অনেক দিন ধরে জমে যাওয়া জঞ্জাল সাফ করতে সময় লাগবে। সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। তবে সামাজিক শক্তিকে এক সুতায় বাঁধতে হবে। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনই শেষ কথা নয়। ভাবতে হবে এর বাইরে গিয়েও, নাগরিক সমাজকে হতে হবে আরও সক্রিয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে সরে যেতে হবে বৃহত্তর জনস্বার্থে। নির্বাচনে শুধু ভোট দেওয়া নয়, রাজনৈতিক সংস্কারের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার সূচনা নিশ্চিত করতে হবে।

এই গোলটেবিল আলোচনায় বক্তাদের কথায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ঘটল পালাবদল।

# অভ্যুত্থান

২০০৭ সাল। ১১ জানুয়ারি বিকেলে গণেশ উল্টে গেল। বঙ্গভবনে মঞ্চস্থ হলো রুদ্ধশ্বাস নাটক, যার স্ক্রিপ্ট লেখা হচ্ছিল বেশ কয়েক দিন ধরে। হঠাৎ করেই পাল্টে গেল রাজনীতির চালচিত্র। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার ঘটনাটি দুনিয়াজুড়ে নাইন-ইলেভেন নামে পরিচিতি পেয়েছিল। এর অনুকরণে ঢাকায় ১১ জানুয়ারি ২০০৭-এর পালাবদলের নামকরণ হলো ওয়ান-ইলেভেন বা এক-এগারো।

এক-এগারো ঘটনাটিকে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবেও দেখেন কেউ কেউ। এখানে সশস্ত্র বাহিনী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি না নিয়ে সামনে একটা অসামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রেখে পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে। কয়েক বছর ধরেই এই হস্তক্ষেপের জমি তৈরি হচ্ছিল। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার স্থূল প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিবিশেষের একগুঁয়েমি, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং ধর্মীয় চরমপন্থার উত্থান এই পরিবর্তনের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাসের কাছ থেকে। তিনি ২০০৩ সালের ২৭ মে থেকে ২০০৫ সালের ২ জুলাই পর্যন্ত ঢাকায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ টমাস ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি তারবার্তার মাধ্যমে জানান যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান ও আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী নূরউদ্দীন খান ক্ষমতাসীন চারদলীয় সরকারের অবসান ঘটিয়ে দুই প্রধান দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার ক্ষমতায় বসাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। সম্প্রতি এক নৈশভোজের সময় তিনি রাষ্ট্রদূতকে বলেন, তিনি 'উপর্যুপরি গণবিক্ষোভের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে' চান। রাষ্ট্রদূত নূরউদ্দীনকে জানিয়ে দিয়েছেন যে



মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দার নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছেন

যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতা চায়, সরকার বদলের জন্য যেকোনো অসাংবিধানিক পদ্ধতি বা সামরিক অভ্যুত্থান সমর্থন করে না। নূরউদ্দীনের অভিযোগ ছিল, প্রধানমন্ত্রীর ভাই মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দারের সতীর্থদের মধ্য থেকে সাতজন জেনারেলকে অনুগত মনে করে সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদে বসানো হয়েছে। খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে (১৯৯১-৯৬) সামরিক বাহিনীতে দলীয়করণ শুরু হয়। শেখ হাসিনার সরকার (১৯৯৬-২০০১) এই ধারা অব্যাহত রাখে। নূরউদ্দীন প্রস্তাব করেন যে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট আবু তৈয়ব মোহাম্মদ জহিরুল আলম (জেনারেল জহির নামে ডাকা হয়) দেশের দায়িত্ব নিক। জহির উভয় দল থেকে যোগ্য মন্ত্রী নিয়ে দু-তিন বছরের জন্য একটি সরকার গঠন করবেন; দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত করা, নতুন একটি সংবিধান তৈরি করা, দুর্নীতি দূর করা এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হবে তাঁর লক্ষ্য; এরপর তিনি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আয়োজন করবেন।[১]

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য নিজেকেও কিছুটা দায়ী করে নূরউদ্দীন রাষ্ট্রদূতকে বলেন, জেনারেল এরশাদের পতনের সময় তাঁর বন্ধু ও সাবেক সহকর্মী পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসলাম বেগ গোপনে দূত পাঠিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। নূরউদ্দীন

তাতে রাজি না হয়ে আসলামকে অনুরোধ করেছিলেন বিএনপিকে সমর্থন করতে। তখন পাকিস্তান তাদের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইকে ব্যবহার করে বিএনপিকে অর্থের জোগান দিয়েছিল, আর ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' টাকা দিয়েছিল আওয়ামী লীগকে। এ ধরনের অর্থায়ন এখনো চলছে। নূরউদ্দীন বলেন, শেখ হাসিনার কাজকর্মে নয়াদিল্লি অসন্তুষ্ট ছিল এবং ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় উভয় দলকেই তারা টাকা দিয়েছে। 'র' খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানকে টাকা দিয়েছিল, কারণ ভারতে গ্যাস রপ্তানি করতে ও অভিন্ন নদীগুলোর পানি ভাগাভাগির বিষয়টি সুরাহা করতে তিনি তাঁর মাকে রাজি করানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু তা পারেননি। নূরউদ্দীন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, ২০০৬ সালে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে ভারত খুব চেষ্টা করবে।

রাষ্ট্রদূত এই তারবার্তায় আরও বলেন, গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিএনপির সাংসদ ও সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান তাঁকে বলেছেন যে সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থান ঘটানোর আগে সব সময়ই যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে একটি সংকেতের অপেক্ষায় থাকবে; ১৯৯৬ সালে সম্ভবত দুটি অভ্যুত্থান ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। তবে মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন, সামরিক বাহিনী এমন কিছু করবে না, যার ফলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে।[২]

লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল নূরউদ্দীন দাবি করেছেন, রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাসের সঙ্গে তাঁর এ রকম কোনো কথা হয়নি। রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য হলো, এটা 'ডিপ্লোমেটিক মিথ্যাচার'।[৩]

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি যখন মুখোমুখি অবস্থানে এবং চারদিকে কেবলই অনিশ্চয়তার অন্ধকার আর সহিংসতার আশঙ্কা, তখন রাজনীতিতে লেখা হচ্ছিল ভিন্ন এক চিত্রনাট্য। মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটিনেস এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী ৬ জানুয়ারি ২০০৭ শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে বলেন, আওয়ামী লীগের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা তাঁদের কাছে হাসিনা ও খালেদাকে নির্বাসনে পাঠানোর এবং সামরিক হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের ওই নেতাদের পেছনে বিএনপির একটি অংশের সমর্থন আছে। দূতেরা হাসিনাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে এ ধরনের প্রস্তাবে তাঁদের সায় নেই এবং অচলাবস্থা কাটাতে দুই নেত্রী সাহসী পদক্ষেপ নিলে এ ধরনের জল্পনাকল্পনার অবসান হবে।[৪]

হাসিনা দূতদের দেওয়া তথ্য খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'প্রত্যক্ষভাবে বা জরুরি অবস্থার অধীনে সামরিক বাহিনীর ঢুকে পড়া নিয়ে তিনি সমস্যাবোধ করেন না; সামরিক বাহিনী যদি হস্তক্ষেপ করে সবকিছু ঠিকঠাক করে দিতে পারে, তা ভালো হবে।' মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানতে চান, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা নিলে আবার তা ফিরিয়ে দিতে চাইবে কেন। জবাবে হাসিনা বলেন, তিনি সামরিক আইনের সম্ভাবনা দেখছেন না। তাঁর মতে, সামরিক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিতে পারে, এমন দৃঢ়চেতা কেউ নেই। তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক সংকট দূর করতে জনগণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে না; সামরিক বাহিনী যদি যেতে না চায়, তাহলে সহিংসতা ও রক্তপাত হবে, দেশ অচল হয়ে যাবে।[৫]

একটা সমাধান খুঁজে পেতে খালেদা জিয়া যদি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে তিনি কী করবেন—এ প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি এ ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। দুই দূত বিএনপির কয়েকজন নেতার দেওয়া একটি প্রস্তাবের কথা বলেন, যেখানে এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যে পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে নতুন করে আবার নির্বাচনের আয়োজন করা হবে। হাসিনা তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে বলেন, বিএনপি আবার ক্ষমতায় যাবে, এ রকম একটি অবস্থার চেয়ে সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে যেকোনো সমাধানকে তিনি সমর্থন দেবেন। ৭ জানুয়ারি ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো রাষ্ট্রদূত বিউটিনেসের তারবার্তায় এসব কথা উঠে এসেছে। হাসিনার সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের কথাবার্তায় এটা স্পষ্ট হয় যে বিএনপি আবারও ক্ষমতায় যাবে, এর চেয়ে হাসিনার চোখে ঢের ভালো সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা নেওয়া।[৬]

রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার পরদিন ৭ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে একই কথা বলেন। তাঁরা জানান, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা তাঁদের কাছে এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরির সুপারিশ করেছেন, যার ফলে খালেদা জিয়া এবং তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ শেখ হাসিনা দুজনই বিদেশে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হবেন এবং সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করবে, সম্ভবত সামরিক আইন জারি হবে বা অভ্যুত্থান ঘটবে। এই সুপারিশের পেছনে উভয় দলের কিছু অংশের সমর্থন আছে বলে মনে হচ্ছে। এসব কথা উঠে এসেছে ৯ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে পাঠানো প্যাট্রিসিয়া বিউটিনেসের আরেকটি তারবার্তায় :

রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার খালেদা জিয়াকে বলেন, অচলাবস্থা দূর করার জন্য দুই নেত্রীর সাহসী ভূমিকা নেওয়া দরকার। তাঁরা বলেন, একটি রাজনৈতিক সমঝোতা নিশ্চয়ই সম্ভব, যার ফলে দেশ সহিংসতা থেকে রক্ষা পাবে এবং সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ নিয়ে জল্পনার অবসান হবে। খালেদা জিয়া তাঁদের বলেন, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে ২২ জানুয়ারি নির্ধারিত নির্বাচন করতেই হবে এবং নির্বাচিত হলে তাঁর সরকার আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ী ভোটার পরিচয়পত্র তৈরিসহ নির্বাচনী সংস্কার বাস্তবায়ন করে ১২ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে আবার নির্বাচন দেবে।[৭]

খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা রিয়াজ রহমান রাষ্ট্রদূতকে নিশ্চিত করেন যে খালেদা 'বার্তা' পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও নির্বাচন স্থগিত বা জরুরি অবস্থা জারি ও সামরিক হস্তক্ষেপ—এসব সম্ভাবনার মধ্যে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সবচেয়ে কম ক্ষতিকর হবে বলে বিএনপি মনে করে। সেনাবাহিনী তাঁর অবাধ্য হবে, খালেদা জিয়া এমন ধারণা খারিজ করে দিয়ে বলেন, বিএনপির মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। রাষ্ট্রদূত তাঁর বার্তায় জানান, লোকজন খালেদাকে খারাপ সংবাদ জানাতে ভয় পাচ্ছে এবং একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি অবাক হয়েছে।[৮]

ঢাকার বিদেশি দূতাবাসের কূটনীতিকেরা বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁদের সাতজনের একটি গ্রুপ ছিল। এটাকে তাঁরা বলতেন 'কফি গ্রুপ'। সম্ভবত একসঙ্গে বসে তাঁরা কফি পান করতে করতে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলতেন বা বাংলাদেশের ব্যাপারে সমন্বিত ভূমিকা কীভাবে রাখা যায়, এ নিয়ে সলাপরামর্শ করতেন।[৯]

দূতদের কথায় এটা বোঝা যায় যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কোনো কোনো নেতা ইতিমধ্যে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। দুই পক্ষই দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তন চাচ্ছেন এবং এ কাজে সেনাবাহিনীকে তাঁরা সহযোগী হিসেবে পাশে পাবেন বলে আশা করছেন। কেউ কেউ ভাবছেন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল সরকারে থাকার চেয়ে সামরিক বাহিনীর কাছে ক্ষমতা থাকা হবে মন্দের ভালো। রাজনীতিকদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর এই সংযোগ পরে নানান সমীকরণ তৈরি করেছিল। রাষ্ট্রদূতের বার্তায় এই ইঙ্গিত আছে যে সেনাবাহিনীর মার্কটাইম শুরু হয়ে গেছে এবং তার জন্য অনুকূল জমি তৈরি করে দিয়েছে প্রধান দুই দলের শীর্ষ রাজনীতিবিদের একটি অংশ।

১১ জানুয়ারি সকালে ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটিনেসের একটি তারবার্তায় জানানো হয়, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও

জার্মানির রাষ্ট্রদূত (ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতির প্রতিনিধি) এবং ইউরোপীয় কমিশন ও জাতিসংঘের প্রতিনিধিকে নিয়ে তৈরি 'কফি গ্রুপ' বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের করণীয় সমন্বয় করছে। তারা জাপানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও কথা বলেছে। এমনকি তারা বাংলাদেশের বাণিজ্য-সহযোগী দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে। স্থিতিশীলতার বিষয়টি বিবেচনা করে তারা ওয়াশিংটন দূতাবাসের মাধ্যমে সৌদি আরবের প্রতিও অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'কফি গ্রুপ' জানিয়ে দিয়েছে যে তারা আওয়ামী লীগের অবস্থান অনুমোদন করবে না। আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের বার্তা হলো :

> সহিংসতার অবসান ঘটাতে হবে। নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতাকে উৎসাহ দিলে দেশের ভাবমূর্তি ও অর্থনীতির ক্ষতি হবে; এবং আমরা সংকট নিরসনের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো ধরনের অসাংবিধানিক সামরিক সমাধান সমর্থন করি না। গঠনমূলক সংলাপে যোগ দিতে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার দ্বিধার ব্যাপারে রাষ্ট্রদূত তাঁর উদ্বেগ জানিয়েছেন এবং আলোচনায় বসতে তাঁকে অনুরোধ করেছেন।[১০]

বার্তায় আরও বলা হয়, বড় সব দল ছাড়া নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন তুলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দেওয়া বিবৃতিগুলো বিএনপি ও তার প্রধান শরিক জামায়াতে ইসলামীর অনেকের ক্রোধের কারণ হয়েছে। সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা ৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বিদেশি কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছিলেন।[১১]

১১ জানুয়ারি সকালে ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো রাষ্ট্রদূত বিউটিনেসের আরেকটি তারবার্তা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপ, ব্যবসায়ী সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের দূতাবাসে ধরনা দিচ্ছেন। তাঁরা একটি সামরিক সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন চাইছেন। তাঁরা বলেছেন, সামরিক বাহিনী যেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে কয়েকটি বিষয়ে রাজি করায় :

- ছয় মাস থেকে দুই বছরের জন্য নির্বাচন স্থগিত করা;
- প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়া;
- একজন নতুন প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগ দেওয়া এবং/অথবা একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করা।[১২]

এমনও শোনা যাচ্ছে যে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে অন্য কোনো দেশে রাজনৈতিক নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সামরিক শাসন জারির কথাও শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংকেত ছাড়া সামরিক বাহিনী পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। দূতাবাস থেকে সামরিক বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে একান্তে এবং প্রকাশ্য বৈঠকে বলে দেওয়া হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীর কোনো অসাংবিধানিক ভূমিকা সমর্থন করে না। বর্তমান পরিস্থিতি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার মতবিরোধিতার ফল এবং এ জন্য রাজনৈতিক সমাধান দরকার। সামরিক বাহিনীকে অসামরিক সরকারের অধীনে ও সমর্থনে সংবিধানের আওতায় কাজ করে যেতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) মে. জেনারেল. মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে ৭ জানুয়ারি দেখা করে সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃঢ় অবস্থান আবারও জানিয়ে দেন। প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে ৯ জানুয়ারি সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মইন ইউ আহমেদের সঙ্গে একই ধরনের বৈঠক করেন। জেনারেল জাহাঙ্গীর বলেন, 'বর্তমানের সেনা মোতায়েনই তো আমাদের পছন্দ নয়, কেন আমরা অভ্যুত্থানকে সমর্থন দিতে যাব?' রাজনৈতিক সংকট দূর করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর চাপ বজায় রাখতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীকে উসকানি না দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাতে তিনি রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেন। মইন প্রতিরক্ষা অ্যাটাশেকে বলেন যে ৮ জানুয়ারি ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে তাঁর একই ধরনের আলাপ হয়েছে। জাহাঙ্গীর রাষ্ট্রদূতকে বলেন, তিনি রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা জারি করার বিষয়টি এড়াতে বলেছেন। মইন বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতি জরুরি অবস্থা দাবি করে না; তবে সেনাবাহিনীর আপৎকালীন পরিকল্পনা আছে। নৈরাজ্য বেড়ে গেলে তিনি জরুরি অবস্থার কথা ভাবতে পারেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে না। বরং নির্বাচন-পরবর্তী সম্ভাব্য অস্থিরতা নিয়ে তিনি বেশি চিন্তিত।'[১৩]

বিউটিনেসের বার্তায় সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান লে. জে. (অব.) এইচ এম এরশাদের ৮ জানুয়ারির সাক্ষাতের প্রসঙ্গে বলা হয় যে সেনাসমর্থিত একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বর্তমান অবস্থার একটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে বলে এরশাদ মনে করেন। শেখ হাসিনা এর আগে রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন, সামরিক বাহিনী যদি 'সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারে', তাহলে তিনি তাতে কোনো সমস্যা দেখেন না।[১৪]

রাষ্ট্রদূতের তারবার্তায় বলা হয়, জাতিসংঘের প্রতিনিধি সেনাপ্রধান মইনের উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন, জরুরি অবস্থা বা অন্য কোনোভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মইনের ওপর প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। সামরিক বাহিনী যদি সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়, তাহলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ হারানোর ঝুঁকি আছে কি না, মইন এই মর্মে একটা চিঠি চান। কেননা, এ রকম গুরুতর পরিণতির কোনো প্রমাণ ছাড়া তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে সামরিক হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানানোর ঝুঁকি নিতে পারছেন না। তারবার্তায় রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন যে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈরিতা এতই তীব্র এবং তিক্ত যে তাঁরা উভয়েই বলছেন, একজন অন্যজনকে ক্ষমতায় দেখার চেয়ে বরং সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা গেলে তাঁরা খুশি হবেন। কিন্তু সামরিক শাসনের অধীনে তাঁরা নিজেরাই যে বহিষ্কৃত হতে পারেন, এটা তাঁরা কেউই ভাবছেন না। উভয় পক্ষের এই অনড় অবস্থানের কারণে নাগরিক সমাজ ও ব্যবসায়ীরা হতাশ এবং জনমনে সামরিক হস্তক্ষেপের জল্পনা আরও বাড়ছে। দুই নেত্রীকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে দুই দলের কর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন চাওয়া অব্যাহত আছে।[১৫]

এক-এগারোর পালাবদলে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্সের (ডিজিএফআই) সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (পরে মেজর জেনারেল) এ টি এম আমিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য আমিন ১২ জানুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের রিজিওনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের কথাবার্তার বিবরণ পাওয়া যায় ১২ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটি তারবার্তায়। আমিনের বরাত দিয়ে তারবার্তার বলা হয়, সেনাবাহিনীর পিএসও মে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মইন ইউ আহমেদসহ তিন বাহিনীর প্রধানেরা ১১ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায় রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নতুন একজনকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ, ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন বাতিল এবং সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরির পর নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণের অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রদূতের এক প্রশ্নের জবাবে আমিন বলেন, তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে বিষয়টি বিবেচনা করার সময় দেননি। কারণ, তাঁরা জানতেন যে রাষ্ট্রপতি যদি এ বিষয়ে বিএনপির মতামত জানতে চান, তাহলে বিএনপি তাঁকে রাজি হতে নিষেধ করবে।[১৬]

আমিন রাষ্ট্রদূতকে বলেন, দুটি কারণে রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথমত, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী যদি একতরফা নির্বাচনের পক্ষে কাজ করে, তাহলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে কি না। দ্বিতীয়ত, জেএমবি (জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ) সদস্যদের সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার ও বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনাগুলো; কিছু সাক্ষ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে জেএমবি নির্বাচন বানচাল করতে চায়। এর সঙ্গে যোগ হয় আওয়ামী লীগের অব্যাহত প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও নির্বাচনবিরোধী তৎপরতা। সবকিছু মিলিয়ে সামরিক বাহিনীর মনে হয়েছিল, জনজীবনের শৃঙ্খলা হুমকির মুখে পড়েছে এবং তখন তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[১৭]

১১ জানুয়ারি বঙ্গভবনে দিনভর ছিল উত্তেজনা। ওই দিনের একটি খোলামেলা বিবরণ পাওয়া যায় পরের বছরের ১১ জানুয়ারি *প্রথম আলোয়* ছাপা হওয়া টিপু সুলতানের প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে লেখা হয়: বেলা তিনটার দিকে বঙ্গভবনে ঢোকেন তিন বাহিনীর প্রধানেরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী ফজলুল বারী। তাঁরা সরাসরি দেখা করেন ড. ইয়াজউদ্দিনের সঙ্গে। প্রথমে সেনাবাহিনীর প্রধান দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ড. ইয়াজউদ্দিন বিষয়টি প্রথমে গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর বক্তব্য ছিল এমন—সবই তো ঠিক চলছে। নির্বাচন হলে অসুবিধাটা কোথায়। এ সময় একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা অসন্তুষ্ট হয়ে ড. ইয়াজউদ্দিনকে বলেন, দেশ এক মহাসংকটের দিকে এগিয়ে চলছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন দিলে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। এ সময় উপস্থিত আরেক ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করেন। তখন রাষ্ট্রপতি বিষয়টা নিয়ে ভাবার জন্য দু-এক দিন সময়ের কথা বলেন। কিন্তু সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্য ছিল অনেকটা এ রকম—দেশকে বাঁচাতে হবে। আর সময় নষ্ট করা যাবে না, যা করার এখনই করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধান টেলিফোনে নবম পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে কিছু জরুরি নির্দেশনা দেন। এই পর্যায়ে ড. ইয়াজউদ্দিন নমনীয় হন। এ বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করে বলেন, 'আমি ভেতরে গিয়ে একটু কথা বলে আসি?' উপস্থিত সেনা কর্মকর্তারা এতে সায় দেননি। তাঁদের বক্তব্য, এটা রাষ্ট্রীয় বিষয়, এ নিয়ে ওনার সঙ্গে আলোচনার দরকার নাই। একপর্যায়ে সেনা

কর্মকর্তাদের প্রস্তাবে রাজি হন রাষ্ট্রপতি। তখন সই করার জন্য তাঁর হাতে ইস্তফার কাগজ তুলে দেওয়া হয়। একজন বললেন, 'কলম লাগবে স্যার?' 'না, আমার কাছে কলম আছে'—এ কথা বলে ড. ইয়াজউদ্দিন পকেট থেকে কলম বের করতে করতে মৃদুকণ্ঠে জানতে চান, দুই পদ থেকেই ইস্তফা কি না। জবাব আসে, 'না স্যার, শুধু প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে।' তিনি কাগজে সই করেন। এরপর দেশে জরুরি অবস্থা জারিসংক্রান্ত কাগজ এগিয়ে দেওয়া হয়, তাতেও তিনি সই করেন। সর্বশেষ তাঁর হাতে দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির উদ্দেশে দেওয়ার জন্য তৈরি করা ভাষণের খসড়া। সেটা পড়তে গিয়ে এক জায়গায় তিনি থেমে যান এবং বলেন, এই অংশটুকু বাদ দিলে হয় না? যেখানে লেখা ছিল, দেশ বিগত পাঁচ বছর কীভাবে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তার বিবরণ। সেনা কর্মকর্তারা তাঁর কথা মেনে নেন। আর এভাবেই এক ঘণ্টা ধরে বঙ্গভবনে কেটেছে 'ওয়ান-ইলেভেনের' পটপরিবর্তনের চূড়ান্ত ক্ষণগুলো।[১৮]

বিকেল চারটার দিকে বঙ্গভবন থেকে বের হন তিন বাহিনীর প্রধানেরা এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। প্রায় ওই সময়ে বঙ্গভবনে ঢোকেন নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও একজন ঊর্ধ্বতন গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং তাঁদের সঙ্গে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একদল সেনাসদস্য। তাঁরা যাওয়ার পর পাল্টে যায় বঙ্গভবনের চেনা পরিবেশ। তাঁদের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্যামেরা-ক্রুরা গিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ধারণ করেন। ওই সেনা কর্মকর্তারা বঙ্গভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেন। সারা দেশে সেনা মোতায়েন ও টহল শুরু করা হয়। টিপু সুলতানের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় :

> ওদিকে তখন নীতিনির্ধারকেরা ব্যস্ত পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের খোঁজে। রাত ১১টার দিকে দুই ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা যান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাসায়। তিনি দায়িত্ব নিতে অপারগতা জানান। তারপর রাত ১২টার দিকে তাঁরা হাজির হন ড. ফখরুদ্দীনের বাসায়। ফখরুদ্দীন আহমদ এতে সম্মত হন। আর এভাবে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি পরিবর্তনের ঘটনা 'ওয়ান-ইলেভেন' নামে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থান করে নেয়।[১৯]

সেনাবাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন মে. জে. এ টি এম জহিরুল আলম। ২০০৪ সাল থেকে তিনি ছিলেন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের (এনডিসি) কমান্ড্যান্ট। সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ ছিলেন তাঁর কোর্সমেট। ওই ব্যাচে প্রথম হয়ে জহির বঙ্গবন্ধুর হাত থেকে সোর্ড অব অনার

পেয়েছিলেন। এক-এগারোর সঙ্গে তাঁর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তবে একটা কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে, তিনি তা বুঝতে পারছিলেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি পূর্বাপর কিছু তথ্য তুলে ধরেন, যা ওই পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করে। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

এ টি এম জহিরুল আলম : আমি মাসুদকে বলেছি, যদি নেশন কোনো দিন ডাকে, এসব কথা তো খোলাখুলি বলতে পারি না—ইউ ক্যান নট আসক সামবডি টু ইন্টারভিন। ইট ইজ আ ট্রিজন। বললাম, ইফ দ্য কল অব দ্য ন্যাশন কামস, মাসুদ, পরিবারের আগে কিন্তু দেশ। দেশের দিকে গেলে আমরা আছি। পরিবারের দিকে গেলে কিন্তু আমাদের সাপোর্ট পাবে না।

মহিউদ্দিন আহমদ : তখন বলেছেন?

জহির : তখন তো বুঝতে পারছি, ইট ইজ ইনএভিটেবল। তবে একটা ক্রেডিট আমি দেব। মইন মার্শাল ল দেয়নি। আমরা বলেছি, ক্যু গ্রহণযোগ্য হবে না। বিকল্প খুঁজতে হবে। আমি ওকে ক্রেডিট দিই এ জন্য যে সে এই ম্যাসেজটা নিয়েছে এবং কনস্টিটিউশনাল মেথডে গেছে।

মহিউদ্দিন : যখন ইন্টারভেনশন হলো, আপনি কি জানতেন যে ওরা বঙ্গভবনে যাচ্ছে?

জহির : ১১ জানুয়ারি আমাদের কমিশন ডে, আমাদের ব্যাচের। নরমালি মইন আমাকে ফোন করে বলে, হ্যাপি কমিশন ডে। ওই দিন আমি অফিসে গিয়ে তাকে রিং দিই। তখন সকাল আটটা। সে ফোন ধরল। হ্যাপি কমিশন ডে বলার পর বলল, দোস্ত, আমি একটু ইয়েতে আছি। আমার জন্য দোয়া করিস। অতটুকুই ইঙ্গিত।

যখনই লগি-বইঠা মারামারি হচ্ছে, তখন ড. কামাল হোসেন একবার এলেন। উনি আমার রিসোর্স পারসন। ক্যান্টনমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া হলেও আমাদের তো ওপেন ইনস্টিটিউশন। যদিও সবই রেকর্ড হয়। ফোন করে উনি আসতে চাইলেন। বললাম, স্যার, আপনার তো আজ ক্লাস আছে। আপনি ইচ্ছে করলে ডিসকাস করার জন্য আসতে পারেন, বারোটায়। রিং করার সাথে সাথেই আমি বুঝে ফেলেছি।

মহিউদ্দিন : ১১ তারিখে?

জহির : না, তার আগে। যখন মারামারি হচ্ছে, স্টেলমেট অবস্থা। উনি এসে আমাকে বললেন, ইলেকশন ঠেকাব কীভাবে। এই ইলেকশন হলে তো ডিজাস্টার হবে?

আমি বললাম, স্যার, একমাত্র উপায়—ইউনাইটেড নেশনকে বলেন।

ওই সময় ইউনাইটেড নেশন থেকে একজন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এসেছিলেন। ঠিক আছে, বলে উনি চা-টা খেয়ে চলে গেলেন।

ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ইয়াজউদ্দিনকে কনভিন্স করতে গেছে। ইয়াজউদ্দিন কিন্তু বলেছে, ইলেকশন হবে। ড. কামাল আবার ফোন করলেন। আমি ফোনটা কেটে দিয়ে অন্য একজনের সেট থেকে ফোন করলাম। উনি বললেন, কাজ তো হলো না। নেক্সট স্টেপ হলো, ইউএন মইনকে বলবে, আর্মি যদি কনস্ট্রাকটিভ রোল প্লে না করে, তাহলে তারা ইউএনে বাংলাদেশ আর্মির পার্টিসিপেশন নিয়ে রি-থিং করবে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, মইন, মাসুদ এবং অন্য সব জেনারেল, তাদের সিলেক্ট করেছে বিএনপি। সুতরাং তারা বিএনপির বিরুদ্ধে এমনি-এমনি যাচ্ছে না। আনলেস দেয়ার ইজ আ প্রেশার ক্রিয়েটেড। ওই সময় ফিফটি পারসেন্ট নিয়োগ পেয়েছে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে, আর ফিফটি পারসেন্ট হলো 'পিকস'। ওই পিকসগুলো আবার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে। নাইন ডিভ, এএফডি, সিজিএস। আর যারা 'পিক' না, তাদেরকে পাঠায় রংপুর, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, স্টাফ কলেজ—ওখানে বসে বসে তারা মাস্টারি করে।

এর মধ্যে রেনাটা (ইউএনডিপির রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর রেনাটা লক ডিসালিয়ন) আমাকে কয়েকবার ফোন করেছে। ড. কামালকে আমি বললাম, আপনি রেনাটাকে বলেন মইনকে রিং করতে।

রেনাটা এই মেসেজটা নিয়ে ৯ বা ১০ তারিখ মইনের কাছে গেছে। আমি এটা মইনকে কখনো বলি নাই। আপনাকেই ফার্স্ট বললাম।

মহিউদ্দিন : রেনাটা পরে *ডেইলি স্টার*কে এক সাক্ষাৎকারে ইউএনের ওই চিঠির ব্যাপারটা অস্বীকার করেছিলেন।

জহির : ওটা তো ইউএন ডিনায়াল। রেনাটা ওয়াজ ফুললি ইন (পুরো মাত্রায় ছিল)।

আগেরবার তো প্রেসিডেন্ট নিজেই প্রধান উপদেষ্টা হলেন। পরেরবার ড. ইউনূস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট চয়েস। ড. ইউনূস বলেছে, না, আমি পারব না। ড. ইউনূসের কথায় ড. ফখরুদ্দীনকে আনা হয়েছে। ড. ফখরুদ্দীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থাকার সময় আমার (এনডিসির) রিসোর্স পারসন ছিলেন। আর্মি থেকেই ড. ইউনূসের নাম এসেছিল, বিকজ অব হিজ প্রোফাইল। ওই হাইটের একজন চাইছিল সবাই, যিনি রিকনসিলিয়েশন করতে পারবেন।[২০]

ডিজিএফআইয়ের হাত ধরে ২০০৩ সালে তৈরি হয়েছিল সেন্টার ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল স্টাডিজ (সিএনআরএস) নামে একটি এনজিও। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিব খান। ২০০৫ সালে সভাপতির দায়িত্ব নেন অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাজ্জাদ হোসেন এবং ইংরেজি *প্রোব* ম্যাগাজিনের সম্পাদক ইরতিজা নাসিম আলী ছিলেন যথাক্রমে এর সহসভাপতি ও মহাসচিব। এটি ছিল বিএনপিপন্থী একটি থিংকট্যাংক। পরে এর নাম বদলে রাখা হয়েছিল বাংলাদেশ পারসপেকটিভ রিসার্চ ফাউন্ডেশন (বিপিআরএফ)। সাজ্জাদ হোসেন ছিলেন এর প্রধান নির্বাহী। সাজ্জাদ ওই সময়ের অনেক ঘটনার সাক্ষী। এখানে তাঁর ভাষ্য তুলে ধরা হলো, যা ওই সময়ের প্রেক্ষাপটটি বুঝতে সাহায্য করে :

**২৫. ১২. ২০০৬ : সোমবার**

চারদিকে সেনা অভ্যুত্থানের গুজব শুনছি। মেজর জেনারেল মাসুদকে নিয়ে কানাঘুষা হচ্ছে। ডিজিএফআইয়ের যেসব কর্মকর্তার সঙ্গে আমার ওঠাবসা, দেখলাম তাঁরা সবাই জেনারেল মাসুদের ভক্ত। আমি এনএসআইয়ের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। বেলা সাড়ে ১১টায় ফোন করে তাঁকে বললাম, জরুরি কথা আছে। আজ ছিল ছুটির দিন। তিনি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ক্যান্টনমেন্ট গলফ ক্লাবে আমাকে আসতে বললেন। আমি বললাম, ড. মাহবুবউল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে সময়মতো চলে আসব। আমি মাহবুবউল্লাহ স্যারকে রাজনীতির বিষয়গুলো সব সময় শেয়ার করতাম।

গল্‌ফ ক্লাবে পৌঁছালাম সন্ধ্যা সোয়া সাতটায়। *প্রোব* ম্যাগাজিনের চিফ এডিটর ইরতিজা নাসিম আলী আমাদের স্বাগত জানালেন। জেনারেল হায়দারের সঙ্গে আমাদের বৈঠকের সময় তিনি কোথা থেকে উদয় হলেন, ভেবে অবাক হলাম। জেনারেল হায়দারের সঙ্গে রেস্তোরাঁর ভেতরে দেখা হলো। এনএসআইয়ের দুজন সিনিয়র কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার লোদি এবং ব্রিগেডিয়ার এনামের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের উপস্থিতি আশা করিনি। খাবারের অর্ডার দেওয়া হলো। জেনারেল হায়দারকে বললাম, তাঁর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে চাই। তিনি আমাকে ব্যালকনির দিকে নিয়ে গেলেন। আমি সরাসরি জানতে চাইলাম, সেনাবাহিনীর কাঠামোতে কোনো রদবদল করার ক্ষমতা তাঁর আছে কি না। তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। আমি সোজাসুজি বললাম নবম

ডিভিশনের কমান্ড থেকে জেনারেল মাসুদকে সরিয়ে এমন একজনকে বসাতে, যে বেইমানি করবে না।

নবম ডিভিশনের জিওসি হিসেবে আমি তাঁর নাম প্রস্তাব করলাম। আমার কথায় হায়দার হেসে ফেললেন এবং আমার আকাঙ্ক্ষাকে পাত্তা না দিয়ে মাসুদের প্রশংসা শুরু করলেন। তিনি বললেন, যদি কিছু ঘটে, তবে তা করবে সেনাপ্রধান। কিন্তু চিফ তো উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন।

### ২৬. ১২. ২০০৬ : মঙ্গলবার

আমার অফিসে বসে আছি। বেলা ১১টায় মাহবুবউল্লাহ স্যারকে ফোন করতেই বললেন, চলে এসো। ১২টায় গেলাম তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে। বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে কথা হলো। তাঁকে বললাম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে মাসুদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে।

### ২৭. ১২. ২০০৬ : বুধবার

অফিসে বসে আছি। বেলা ১১টায় মুকুল বোস (আওয়ামী লীগ নেতা) ফোন করে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললেন। তিনি জানালেন, নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবনা নমনীয়। আমি তাঁকে ওই লাইনেই কাজ করতে বললাম এবং তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। বেলা একটায় কামারুজ্জামান (জামায়াত নেতা) ফোন করলেন। আমি তাঁকে পরদিন আমার অফিসে লাঞ্চের দাওয়াত দিলাম। দেড়টার সময় জেনারেল হায়দার ফোন করে জেনারেল মাসুদের আনুগত্যের ব্যাপারে আবারও নিশ্চয়তা দিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে আর তর্কে জড়ালাম না। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান আমার অফিসে এলেন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। এরপর এলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মাওলানা মুখলেছুর রহমান। চারদলীয় জোটের সমর্থনে জানুয়ারির মাঝামাঝি একটা বড়সড় উলেমা সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারে কথা বললাম।

### ২৮. ১২. ২০০৬ : বৃহস্পতিবার

বেলা ১১টায় সাইফ (লে. ক. সাইফুল ইসলাম জোয়ারদার) ফোন করে ডিজিএফআই অফিসে যেতে বলল। বেলা একটায় গেলাম, লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। কর্নেল ফরিদও যোগ দিল। আমরা নির্বাচন নিয়ে কথা বললাম। বেলা তিনটায় আমরা একসঙ্গে ঢুকলাম ব্রিগেডিয়ার বারীর কামরায়। সেখানে আরও ছিলেন মশিউর (অতিরিক্ত পরিচালক,

অসামরিক), লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফরিদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এনাম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফজলু এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল আফজাল নাসের। আমি দেখলাম, ফরিদ ছাড়া সবাই ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের এবং বিএনপির ক্ষমতায় ফিরে আসার পক্ষে। একপর্যায়ে সাইফ জেনারেল মাসুদকে ফোন করল। তারপর করিডরে গিয়ে ফোনে কথা বলল তাঁর সঙ্গে। বিকেল পাঁচটায় সেখান থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরলাম।

আমি কিছু একটা গোলমালের গন্ধ পাচ্ছিলাম। এসব রাজনৈতিক আলোচনায় ব্রিগেডিয়ার আমিন নেই কেন? যেহেতু সাইফ, ফজলু, আফজাল—এরা সবাই আমিনের অধীনে সিআরআইবির জি-ওয়ান কর্মকর্তা, আমিনের সম্মতি ছাড়া তাদের তো এভাবে জড়ানোর কথা নয়? সন্দেহ হলো, হয়তো তিনি অন্য কিছু নিয়ে আছেন।

## ৩০. ১২. ২০০৬ : শনিবার

আজ আমাদের ২০তম বিবাহবার্ষিকী। ভাইবোন এবং ডিজিএফআইয়ের বন্ধুরা ফোন করে অভিনন্দন জানাল। বেলা ১১টায় অফিসে গেলাম। সেখানে উপস্থিত ছিল সানাউল্লাহ, কামাল এবং ধানমন্ডি তাকওয়া মসজিদের খতিব জুলফিকার জহুর। কক্সবাজারে অনুষ্ঠেয় প্রোগ্রাম নিয়ে কথাবার্তা বললাম।

জহুর চলে যাওয়ার পর কামাল বলল, আগের দিন সন্ধ্যায় লালবাগের আওয়ামী লীগার বন্ধুদের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তারা বলেছে, শিগগিরই একটা মিলিটারি ক্যু হবে। আমি তাদের বললাম, এটা গুজব এবং এর কোনো ভিত্তি নেই। আমার কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল কাউন্টার টেররিজম ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (সিটিআইবি) লে. কমান্ডার মিজান। তাকে ফোন করে কক্সবাজারের প্রোগ্রামের ব্যাপারে অবহিত করলাম।

## ৩১. ১২. ২০০৬ : রোববার

মাহবুবউল্লাহ স্যার আবদুল হাই সিকদারকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে এলেন বেলা সাড়ে ১১টায়। তিনি সরাসরি জানতে চাইলেন, সম্ভাব্য সেনা অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমি জানি কি না। আমি বললাম, যেভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে, এ অবস্থায় যেকোনো ধরনের সেনা হস্তক্ষেপকে আমি স্বাগত জানাব। তাঁরা দুজনই আমার সঙ্গে একমত হলেন। আমি বললাম, আমরা যা ভাবছি, তেমন কোনো তৎপরতা ডিজিএফআই অফিসে দেখছি না। মনে হচ্ছে ডিজিএফআই খালেদা

জিয়ার পক্ষে ২২ জানুয়ারি নির্বাচন নিয়েই এগোচ্ছে। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করলাম। পরদিন কোরবানির ঈদ। অনেকেই শুভেচ্ছা জানালেন।

### ২. ১. ২০০৭ : মঙ্গলবার

সারা দিন বাসায় ছিলাম। এরশাদের জাতীয় পার্টি নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সন্ধ্যায় মাহবুবউল্লাহ স্যারের বাসায় গেলাম। জাতীয় পার্টির নির্বাচন বর্জন নিয়ে কথা হলো। ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক জেনারেল রুমীকে ফোন করে বললাম পরদিন সকাল ১০টায় দেখা করব।

### ৩. ১. ২০০৭ : বুধবার

সকাল ১০টায় দেখা হলো জেনারেল রুমীর সঙ্গে। বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে এক ঘণ্টা আলাপ হলো। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন নির্বাচনে অংশ নিতে আওয়ামী লীগের বন্ধুদের বোঝাই। একটা জরুরি সভায় অংশ নিতে জেনারেল রুমী বেলা ১১টায় বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা হন।

আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা জানিয়ে দেয়, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে তারা অংশ নেবে না। নির্বাচন ঠেকানোর জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। আমরা একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছি। রাত ৯টায় ব্রিগেডিয়ার বারী ফোন করে পরদিন সকালে দেখা করতে বললেন।

### ৪. ১. ২০০৭ : বৃহস্পতিবার

ইরতিজা নাসিম আলী আর আমি সকাল ১০টায় ব্রিগেডিয়ার বারীর সঙ্গে দেখা করলাম। আওয়ামী লীগের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে বারীকে খুবই রাগান্বিত দেখলাম। তিনি আওয়ামী লীগকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে বললেন, সরকারের পেছনে সেনাবাহিনীর শতভাগ সমর্থন আছে এবং ২২ জানুয়ারির নির্বাচন সফল করতে তারা সবকিছুই করবে। বারী আমাদের বললেন, আমরা যেন আওয়ামী লীগের মধ্যে আমাদের যোগাযোগ আরও বাড়াই এবং তাদের 'মতলব' সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করি।

### ৫. ১. ২০০৭ : শুক্রবার

বিকেলে সোনারগাঁও হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করলেন খালেদা জিয়া। বানচাল করে নৈরাজ্য সৃষ্টি ও সংঘাতের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট ও শেখ হাসিনাকে দায়ী করেন। সংবাদ

সম্মেলনে মঞ্চে খালেদা জিয়ার পাশে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে দেখে অবাক হলাম। সন্ধ্যায় ফোনে কথা বললাম এমাজউদ্দীন স্যারের সঙ্গে।

## ৬. ১. ২০০৭ : শনিবার

ব্রিগেডিয়ার বারী দুপুর ১২টায় ফোন করে পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে চান। পরদিন আওয়ামী লীগের অবরোধ কর্মসূচি শুরু হবে। এ জন্য শহরজুড়ে উত্তেজনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিকেলে একটি প্রেসনোটের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়, কোনো রকম নৈরাজ্য সহ্য করা হবে না এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সন্ধ্যায় শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর বাসায় দেখা করেন।

## ৭. ১. ২০০৭ : রোববার

আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি শুরু। প্রথম দিন পুলিশের সঙ্গে কিছু বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হলেও তারা রাস্তার দখল নিতে পারেনি। আগামীকাল পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে।

## ৮. ১. ২০০৭ : সোমবার

সকাল ১০টায় ইরতিজা ফোন করে বলল, বিকেলে সে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। আমি অবাক হলাম। কেননা এটা আমি জানতাম না। আমার সহকর্মী কামাল বলল, পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে এবং সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা আছে—এটা ভেবে সে পালাচ্ছে। আমার খুব রাগ হলো। কারণ, সে আমার সংগঠনের মহাসচিব এবং এ সময় তার উপস্থিত থাকা দরকার।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী বেশ তৎপর। বেলা ১১টায় তিনি সেনাসদরে চিফ অব স্টাফ জেনারেল মইনের সঙ্গে দেখা করেন। একই সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের পিএসওর সঙ্গে দেখা করেন। সেনাপ্রধান মইন বেলা তিনটায় বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে সকালে রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে অবহিত করেন। আমি চারদিকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। আমি সব সময়ই বলে এসেছি যে বিরাজমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিত এড়াতে সেনা হস্তক্ষেপকে সমর্থন করব। আমার কথা পরিষ্কার—সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি ক্ষমতা নিতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীকে কোনো রকম প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফরিদকে ফোন করলাম। সে আমাকে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে বলল, আমি যেন পরবর্তী কয়েক দিন ঢাকার বাইরে না যাই। আমাকে যেকোনো সময় দরকার হতে পারে। সাইফ ফোন করে রীতিমতো একটা বোমা ফাটাল। ডিজি রুমী এবং সে এমআই সিক্সের একটা সম্মেলনে অংশ নিতে আগামীকাল যুক্তরাজ্য যাচ্ছে। রুমীর অনুপস্থিতিতে বারী হবে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক।

### ৯. ১. ২০০৭ : মঙ্গলবার

সকাল ১০টায় গেলাম ডিজিএফআই অফিসে। ডিজি অফিসের কো-অর্ডিনেটর মেজর মুনিরের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা নিলাম। কর্নেল ফরিদের সঙ্গে তার কামরায় দেখা করলাম। কয়েক মিনিট পর কর্নেল বাকী এল। বাকী আওয়ামী লীগের অনেক সমালোচনা করে বলল, বর্তমান অবস্থার জন্য ওরাই দায়ী। ফরিদ আমার মতামত জানতে চাইল। আমি বললাম, সেনাবাহিনীর উচিত এখনই ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া এবং যারা জানমালের ক্ষতি করেছে, তাদের ধরা। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করলাম। ব্রিগেডিয়ার বারী ফোন করে পরদিন দেখা করতে বললেন। তিনি জানালেন, বেলা আড়াইটায় তিনি সেনাপ্রধানের সঙ্গে দেখা করবেন।

### ১০. ১. ২০০৭ : বুধবার

বেলা ১১টায় গেলাম ব্রিগেডিয়ার বারীর কাছে। তাঁর কামরায় একটা ছোটখাটো সম্মেলন চলছে। কর্নেল ফরিদ, কর্নেল এনাম, এডি মশিউর, কর্নেল আফজাল উপস্থিত। অবাক হওয়ার মতো বিষয়—তারা ২২ জানুয়ারি সফল এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা আলাপ করছে। আমার মনে হলো, বারী তাঁর কোনো গোপন অ্যাজেন্ডার পক্ষে ওদের নিতে চাইছেন, যেটা তিনিও সবটা জানেন না। বারী ৪৬ পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মাহফুজকে ফোন করলে তিনি তখনই তাঁকে থামিয়ে দেন। এরপর বারী কথা বলেন জামায়াতে ইসলামীর কামারুজ্জামান ও কাদের মোল্লা এবং আওয়ামী লীগের আমির হোসেন আমুর সঙ্গে। এ সময় সেনাপ্রধান ফোন করে বারীকে তখনই দেখা করতে বলেন। তখন বাজে বেলা একটা। আমাদের সবার জন্য লাঞ্চের প্রস্তুতি চলছে। বারী চলে গেলেন এবং ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পর। তাঁকে খুব ক্ষুব্ধ মনে হলো। ফরিদ জানতে চাইল, কী কথা হয়েছে। কিন্তু বারীকে খুব উৎসাহী মনে হলো না। ফরিদ মন্তব্য করল, ডিজি রুমী এবং সেনাপ্রধান ম্যাডামের (খালেদা জিয়া)

নির্দেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার মনে হলো সকালে বারীর ফোন করা নিয়ে ব্রিগেডিয়ার মাহফুজ সেনাপ্রধানের কাছে নালিশ করে থাকতে পারে। বারীকে ডেকে মইন হয়তো ধমকে দিয়েছেন, যাতে তিনি বাড়াবাড়ি না করেন।

এই বৈঠক আর ভালো লাগছিল না। আমি চলে আসতে চাইলাম। বারী বললেন, 'সাজ্জাদ ভাই, আজ আপনার ছেলের পরীক্ষা। তা সত্ত্বেও আপনাকে আটকে রেখেছি। আপনার তো ছেলের কাছে থাকার কথা।' আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম এলিভেটরের কাছে। এমন সময় ফোন বাজল। বারীর কণ্ঠ, তাঁর কামরায় গেলাম। তিনি আমাকে একটা খাম দিয়ে বললেন, এটা নিন। খামের ভেতর দুলাখ টাকা। এর মধ্যে পৌনে দুলাখ হলো *প্রোব* প্রিন্টার্সে ছাপানো পোস্টারের খরচ বাবদ এবং বাকি ২৫ হাজার হলো গাড়ির তেল খরচের জন্য আগাম।

ছেলের পরীক্ষা শেষ হলো বিকেল পাঁচটায়। আমরা পিৎজা হাটে গেলাম। ওই সময় রাজীবের ফোন পেলাম। তিনি জানতেন আমি এ সময় এখানে থাকব। তিনি আমাকে তাঁর অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কফি খেতে বললেন।

হেঁটেই গুলশান-২-এ ভারতীয় হাইকমিশনে ঢুকলাম। ফার্স্ট সেক্রেটারি (এডুকেশন) রাজীব চৌধুরী এবং তাঁর বস কনসুলার উইংয়ের কাউন্সেলর নীরাজ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে আড্ডা হলো। তারাও সম্ভাব্য সেনা হস্তক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছিল।

### ১১. ১. ২০০৭ : বৃহস্পতিবার

আমি তখন বাসায়। বেলা তিনটায় ফোন পেলাম ব্রিগেডিয়ার বারীর। তাঁর স্বর বেশ উত্তেজিত। আশপাশে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তিনি ড. ইউনূসের ফোন নম্বর চাইলেন। আমার কাছে তাঁর নম্বর ছিল না। বললাম, একটু সময় দেন। ১৫ মিনিট পর আবার ফোন করবেন বলে তিনি লাইন কেটে দিলেন। আমি মাহবুবউল্লাহ স্যারকে ফোন করে ড. ইউনূসের নম্বর চাইলাম। স্যার কারণ জানতে চাইলেন। বললাম, ব্রিগেডিয়ার বারী চেয়েছেন। স্যার নম্বরটা দিলেন। আমি বারীকে ফোন করে নম্বরটা দিলাম। বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে আবারও বারীর ফোন। এবার ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নম্বর চাইলেন। নম্বরটা আমার কাছে ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দিলাম। আমি তখনো জানি না, ফোন নম্বরগুলো কেন চাচ্ছেন বারী। ফোনে কথা বলার সময় ওপাশে হইচই, কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল।

বিকেল পাঁচটায় লে. কমান্ডার মিজান ফোন করে বললেন, শিগগিরই জরুরি অবস্থা জারি করা হবে। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সখ্যের কারণে তিনি এটা আমাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করেছেন। এর পরপরই ফোন করলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফরিদ। বললেন, জরুরি অবস্থা জারি হবে। তবে এখনো এটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। ফরিদ অনুরোধ করলেন, আমি যেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোকের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি, যাঁরা জরুরি অবস্থার পক্ষে বলেন। আমি এটা নিশ্চিত করলে ডিজিএফআইয়ের লোকেরা টিভি ক্যামেরা নিয়ে তাঁদের কাছে যাবে। আমি মাহবুবউল্লাহ স্যার, মাহফুজ উল্লাহ, ড. আতাউর রহমান এবং আসিফ নজরুলের সঙ্গে কথা বললাম এবং এ ব্যাপারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুরোধ করলাম। তাঁরা সম্ভবত আমার কাছ থেকেই জরুরি অবস্থার কথা প্রথম শুনতে পান। আমি জানি না, সাক্ষাৎকারে তাঁরা কী বলেছিলেন।[২১]

এক-এগারো নিয়ে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল মইন ইউ আহমেদের নিজস্ব একটি বয়ান আছে, যার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর স্মৃতিকথায়। 'দেশকে এই অবস্থা থেকে টেনে তোলার মানসিক দৃঢ়তা এ সরকারের আছে কি না, তা নিয়ে সর্বত্র দ্বিধা তৈরি হলো। তাহলে কি গৃহযুদ্ধ আসন্ন! দেশ কি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে? দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেমিক একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনীর এখন করণীয় কী? একদিকে দেশ অন্যদিকে দেশের প্রতিভূ সরকার; কী হবে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা?' জেনারেল মইনের মনে হলো, সেনাবাহিনীর 'নিষ্ক্রিয়তায়' দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের হতাশা বাড়ছে। তাদের আক্ষেপ, সেনাবাহিনী দেশের এই দুঃসময়ে চুপচাপ বসে আছে কেন। এমনকি সেনাবাহিনীর ভেতরেও একধরনের হতাশা দেখা যাচ্ছে।[২২]

খুব দ্রুত পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিল। জেনারেল মইনের ভাষ্য অনুযায়ী, 'কয়েকটি ক্ষমতাধর দেশের প্রতিনিধি' তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দেন, সব দলের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো নির্বাচনে সেনাবাহিনী সাহায্য করলে তারা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানাবে। ১০ জানুয়ারি নির্বাচনের কাজে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার আদেশ জারি হলো। সেনাবাহিনীকে নির্বাচনী কাজে বাধাদানকারীদের কোনো পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হলো। জেনারেল মইন ভাবলেন, রাষ্ট্র এ নির্দেশের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে জনগণের প্রতিপক্ষ



সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল মইন
ইউ আহমেদ

হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর দেওয়া বিবরণ থেকে জানা যায় :

> দেশের বাইরে ও ভেতরে থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের এ প্রক্রিয়া স্থগিত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হলো।... ১১ জানুয়ারি খুব ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে কায়মনে আল্লাহর কাছে হাত তুলে বললাম, হে আল্লাহ, জীবনে আমি অনেক ভুল করেছি, তারপরও তুমি আমাকে সব সময় ঠিক রাস্তা দেখিয়েছো।... জাতিসংঘের সদর দপ্তর থেকে টেলিফোন পেলাম। আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মি. গুইহিনো কোনোরকম ভণিতা না করেই জানালো, সব দলের অংশগ্রহণ ব্যতীত নির্বাচন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এরকম একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যদি ভূমিকা রাখে তাহলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে। অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ব্যাপারে জাতিসংঘের এরূপ কঠোর হুঁশিয়ারির পর আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এমন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা আন্তর্জাতিক

অঙ্গনেও সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে বিতর্কিত করে তুলবে।... শুধু তাই নয়, এর ফলে দেশে যে অচিন্তনীয় এক গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হবে তার দায়ভারও আমাদের নিতে হবে। আমি সেনাপ্রধান হিসেবে কিছুতেই এ পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছিলাম না।[২৩]

জেনারেল মইনের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে কথা বলে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক হলো, তিন বাহিনীর প্রধানেরা, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও এবং ডিজিএফআইয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী ফজলুল বারী একসঙ্গে বেলা সাড়ে তিনটায় বঙ্গভবনে যাবেন। বিকেল চারটায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো। তাঁরা 'সংবিধান সমুন্নত রেখে জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা' করার অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রপতি রাজি হলেন। জেনারেলরা সন্ধ্যা ছয়টায় বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে এলেন।[২৪]

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেবেন? জেনারেল মইন ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলে তিনি অপারগতা জানান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে তিনি যেমন দেখতে চান সে রকম বাংলাদেশ গড়তে খণ্ডকালীন সময় যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশকে তিনি আরও দীর্ঘ সময় ধরে সেবা দিতে আগ্রহী।' ড. ইউনূস রাজি না হওয়ায় সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ড. ফখরুদ্দীন আহমদের বাসায় যান এবং তাঁকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। তিনি রাজি হন।[২৫]

এ তো গেল জেনারেল মইনের লিখিত ভাষ্য। এখানে তিনি কতটুকু বলেছেন, কতটুকু উহ্য রেখেছেন আর কতটুকু গোপন করেছেন, তা নিয়ে অনেক কথা থাকতে পারে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট পাম বিচে লেখককে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি এক-এগারোর পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ : আমরা এক-এগারোর প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করব, বিশেষ করে যে ঘটনাগুলো পরিবর্তনের শর্ত তৈরি করে দিয়েছিল ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে। আপনি যেভাবে দেখেছেন।

মইন ইউ আহমেদ : ওই সময়ের অবস্থাটা দেখুন, মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে, মেরে ফেলা হচ্ছে, সম্পদ ধ্বংস করা হচ্ছে, বাসে আগুন

লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সব তো পাবলিক প্রপার্টি। গাড়ি ভাঙা তো ভেরি নরমাল। এ রকম পরিবারও আছে, লাইফে একটা ড্রিম ছিল গাড়ি কিনবে, হয়তো সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটা গাড়ি কিনেছে, সেই গাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল। এভরিওয়ান ওয়ান্টেড আ চেঞ্জ। তারা তাকিয়ে ছিল ল এনফোর্সিং এজেন্সিস বা আর্মড ফোর্সেসের দিকে। এই পরিস্থিতি হলো এক নম্বর কারণ। ইট ওয়াজ গোয়িং ফ্রম ব্যাড টু ওয়ার্স। এর কোথায় শেষ কেউ জানত না। জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে গিয়েছিল। হরতালের পর হরতাল। একটু গ্যাপের মধ্যে বাজার করা, ওষুধ কেনা, হাসপাতালে যাওয়া। এমনও হয়েছে, মানুষ লাশ দাফন করতে পারছে না। হরতালের মধ্যে বের হবে কীভাবে? পরিস্থিতি এ অবস্থায় চলে গিয়েছিল।

এর আগের সরকার যে ইলেকশন কমিশন তৈরি করে গিয়েছিল, ইট ওয়াজ নট একসেপটেবল। যারা সরকারে ছিল, তারা ছাড়া কেউ মেনে নেয় না। ওটা একটা বড় সমস্যা তৈরি করেছিল।

আর এই দুই পার্টি। জনগণ চেয়েছে, বুদ্ধিজীবীরা চেয়েছে, একটা সমঝোতা হোক। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। উনাদের তরফ থেকে, ছোট ছোট পার্টির তরফ থেকে। কিন্তু তারা একমত হতে পারেনি। সমঝোতার কোনো লক্ষণই জনগণ দেখতে পায়নি। ইলেকশনসহ মেজর ইস্যুগুলোতে সমঝোতা হওয়ার দরকার ছিল। জনগণ অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। যদি ওইভাবে ইলেকশনটা হতো, তাহলে এটা ওয়ানসাইডেড ইলেকশন হতো। আপনি যদি বিএনপির প্রথম গভমেন্টের শেষে দেখেন, ওখানেও কিন্তু একটা ওয়ানসাইডেড ইলেকশন হয়েছিল।

মহিউদ্দিন : ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি?

মইন : হ্যাঁ, কিন্তু তারা কনস্টিটিউশন সংশোধন করেছিল, কেয়ারটেকার সরকার তৈরি হয়েছিল এবং একটা ফেয়ার ইলেকশন হয়েছিল। ওই ইলেকশনে আওয়ামী লীগ জিতেছে। আরেকটা ওয়ানসাইডেড ইলেকশন করার জন্য সকল প্রকার গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে সংকট বাড়ত। ওই সময় কেয়ারটেকার গভমেন্ট নিউট্রাল ছিল না। তারা কয়েকবার বসেছিল, কিন্তু কোনো ডিসিশন নিতে পারেনি। সব পার্টিকে নিয়ে একটা ইলেকশন করবে, এমন আভাস পাওয়া যায়নি। আর জনগণ মনে করেছে যে একটা কারচুপির নির্বাচন করার জন্য সবকিছু সেট করা হয়েছে। অপোজিশন থেকে একটা বিরাট ডিমান্ড ছিল, ভোটার লিস্ট নতুন করে করা হোক, ইট শুড বি অ্যাবসলিউটলি ক্লিন ভোটার লিস্ট। ভোটার

লিস্ট ঠিক ছিল না, এটা পরে প্রমাণিত হয়েছে।

আমার অবাক লাগে, কোনো কিছু হলেই দোষ দেওয়া হয় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের। কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কি কোনো দিন বলেছে, আমাদের কী ভুল হয়েছিল, লেট আস ডিসকাস? গণতন্ত্র এস্টাবলিশ করার জন্য নিজেদের ভুল স্বীকার করা, এটা নিয়ে আলোচনা করা, আমার জানা মতে বাংলাদেশের কোনো পার্টি আজ পর্যন্ত করেনি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিল আ ডগ, গিভ আ ব্যাড নেম অ্যান্ড শুট। আপনি ইলেকশনে হারলেন, আপনি খুঁজে বেড়াবেন, কারচুপি। কোনো সময় বলা হয়েছে সূক্ষ্ম কারচুপি, কখনো বলা হয়েছে যে পুরো ভোট রিগিং হয়েছে। নিজের ভুলটা দেখবে না। আমরা যে সরকারে ছিলাম, আমরা কী ভুলগুলো করেছি, কেন মানুষ এভাবে আমাদের রিজেক্ট করল, এটার কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি। কেউ করেনি। আপনি যদি গণতন্ত্র চান, তাহলে অবশ্যই আপনার কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা খুঁজে বের করে সংশোধন করা দরকার।

আরেকটা কথা, ইলেকশন এলেই রাজনৈতিক দল বা যে মোর্চাগুলো আছে, যে করেই হোক ইলেকশনে জিততে হবে। স্পেশালি দ্য লাস্ট সার্ভিং গভর্নমেন্ট। ২০০৭ সালে যে ইলেকশনটা হওয়ার কথা ছিল, তার আগের পরিস্থিতি দেখেন। ইলেকশন কমিশন নিয়ে কন্ট্রোভার্সি ছিল। চিফ অ্যাডভাইজার যাকে করার কথা ছিল, তিনি ছিলেন বিএনপির লোক। বয়স বাড়িয়ে তাকে চিফ অ্যাডভাইজার করার চিন্তা হয়েছিল। কেন? জনগণকে সেটিসফাই করেন, দেশের জন্য ভালো কাজ করেন, তাহলে তো আপনাকে এসব করতে হবে না। জনগণই আপনাদের ভোট দেবে। যে পার্টি ভালো কাজ করেছে তাদের পক্ষে ভোট দেবে। এই কালচারটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। দিস কালচার ইজ ল্যাকিং।

যেদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হ্যান্ডওভার করা হয়, সেদিন থেকেই গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এর আগে থেকেই। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, বায়তুল মোকাররমে মানুষকে কীভাবে পাড়িয়ে মেরেছিল? আপনি কি সে দৃশ্য দেখেছিলেন?

**মহিউদ্দিন**: আমি ওই সময় দেশে ছিলাম না। অনলাইন পত্রিকায় দেখেছি।

**মইন**: আমার কাছে এত খারাপ লেগেছে? ইট ওয়াজ সো ব্যাড। সন্ধ্যার সময় টিভিতে আমি দেখেছি পশু পশুকে যেভাবে মারে না, মানুষ মানুষকে সেভাবে পাড়িয়ে মেরেছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, হোল ওয়ার্ল্ড এই

সিন দেখেছে। দেশ একটা বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বাট লেট মি টেল ইউ, আই হ্যাড নো ইনটেনশন টু ইন্টারভিন। বিলিভ মি।

এটা আস্তে আস্তে গ্রো করা শুরু করল। ওয়ান অব মাই সিনিয়র অফিসার্স কেইম টু মি। বলল, এই সব ঘটছে, আমরা তো অলস বসে থাকতে পারি না। আমি তাকে বললাম, ইউ হ্যাভ নো রাইট টু স্পিক লাইক দ্যাট। তুমি এটা বলেছ এবং দ্যাটস দ্য এন্ড অব ইট। আর কখনো বলবে না। বলেছি এ কথা। সে চলে গেছে। বেশ কিছুদিন পর আবার এসেছে। বলে, স্যার অল অফিসার্স আর...। আমি অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছি, সিনিয়র অফিসার যারা ছিল। থার্ড টাইম হি টোল্ড...। তারপর তো সব দেখে শুনে...। তারপর, এরা ইলেকশন করবে না, প্রেসিডেন্টও বলল, আমি কী করব। এসব দেখেশুনে আস্তে আস্তে ইট স্টার্টেড বিল্ডিং আপ ইন মাই মাইন্ড। এভাবে তো দেশ চলতে পারে না। দেশ তো ধ্বংস হয়ে যাবে। জ্বালাও-পোড়াও তো চলছে। ইফ ইউ রিমেম্বার, কন্টিনিউয়াস হরতাল, এর মধ্যে হয়তো তিন ঘণ্টার গ্যাপ। হুইচ ওয়াজ নাথিং বাট ডেস্ট্রাকশন অব দ্য কান্ট্রি।

মহিউদ্দিন : একটা সিভিল ওয়ার সিচুয়েশনের মতো?

মইন : একজাক্টলি। আপনি ওই সময়ের পেপারগুলি দেখেন। দুই পার্টি, তারা কোনো মীমাংসায় আসতে চায়নি। ইলেকশন হবেই। ইলেকশন হলেই তো বোঝেন, একতরফা ইলেকশন হতো। মাঠপর্যায়ে আওয়ামী লীগ খুবই শক্তিশালী। তারা তো ছেড়ে কথা বলবে না। কিন্তু ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষের আর দেশের। আপনি যদি পুরোনো ইন্টারভিউগুলো দেখেন। ভোটার লিস্টের মধ্যেই প্রবলেম। ওনাদের একটাই কথা, এই ভোটার লিস্টে ইলেকশন হবে না। যখন একটা পর্যায়ে চলে আসল, যেখানে দেশের কোনো মঙ্গল দেখছি না। মানুষ বলতে শুরু করল, আর্মি কেন চুপ করে আছে, সেনাপ্রধান চুড়ি পরে আছে নাকি? এটা আমার কানে এল। আপনার সম্বন্ধে এসব বলাবলি হচ্ছে। সেনাবাহিনী কি জনগণের বাইরে, দেশের এই অবস্থা, এখনই উপযুক্ত সময়, একটা ক্রেডিবল ইলেকশন তো দরকার।

ইউএন থেকে কিন্তু আরেকটা সাইড ছিল। ওরা বলল, তোমরা দেশের অবস্থা ঠিক করো। তোমাদের দেশের ভেতরেই তো গোলমাল। তোমরা কি পিসকিপিং করবে? সো উই হ্যাভ টু টেক সাম অ্যাকশন অ্যাবাউট দ্য পিসকিপার্স হু আর নাও ওয়ার্কিং অ্যাব্রড।

দেখলাম, যদি এটা হয়, ট্রুপস উইল টেক ইট ভেরি নেগেটিভলি। একজন সৈনিক রিটায়ার করলে যে টাকা পায়, তার চেয়ে বেশি টাকা পায়

পিসকিপিংয়ে গেলে এক বছরে। এটা একটা লাইফটাইম সুযোগ। এসব দেখে ভাবলাম...লেটস হ্যাভ আ ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন অ্যান্ড গেট আউট।

আমাকে ইউএন থেকে একটা ড্রাফট চিঠি দিল, যেটা এখন ডিনাই করছে। বাট আই হ্যাভ দ্যাট কপি। ডিনাই করলে তো হবে না? আই ফেল্ট ভেরি ব্যাড। এভাবে একটা মিথ্যা কথা বলে গেল? ড্রাফট লেটার একটা পাঠিয়েছিল ঢাকা ইউএনডিপি অফিস থেকে। ওয়ান ক্যান নট ডিনাই ইট, বিকজ ইট কেম ইন আ ফ্যাক্স।

দে ওয়্যার অলসো প্রেশারাইজিং। সবকিছু যদি একসাথে দেখেন, উই হ্যাড আ লিটল চয়েস। সবার সঙ্গে কথা বললাম। অন্য চিফদের সঙ্গে কথা বললাম। উই শুড হ্যাভ আ কেয়ারটেকার গভমেন্ট হুইচ উইল বি রিয়েলি নিউট্রাল অ্যান্ড হ্যাভ দিস ইলেকশন।

মহিউদ্দিন : ২২ জানুয়ারি যে ইলেকশনটা হওয়ার কথা ছিল, ওটা হলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত?

মইন : ওটা হলে আফটার এফেক্টটা দেখেন, কী হতো? ওরা (আওয়ামী লীগ) তো বলেছিল পুরো দেশ বন্ধ করে দেবে।

ওই সময় প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে যে কেয়ারটেকার গভমেন্ট ছিল, এটা আওয়ামী লীগ ও অন্যদের কাছে ক্রেডিবল ছিল না। সব তাদের লোক রাখা হয়েছে। দে ক্যান নট ডু দ্য জব। প্রেসিডেন্ট ভালো লোক, ভদ্রলোক। ওনার মনে এতটা জোর ছিল না ইনশিয়েটিভ নিয়ে কোনো কিছু করার। আপনি এসে একটা বললেন, অন্যজন এসে আরেকটা বলল, এ রকম তো অনেক হয়েছে। একজন এসে একটা বলেছে, তিনি তাতে সায় দিলেন। আরেকজন এসে আরেকটা বলেছে, তিনি তাতেও রাজি। কোনো ফার্ম ডিসিশন নিতে পারেননি। এদিকে হলো কি, ইমিডিয়েট পাস্ট গভমেন্ট, দে পুট দেয়ার নোজ এভরিহোয়্যার। বঙ্গভবনে একজন জার্নালিস্ট-কাম-সচিব ছিলেন।

মহিউদ্দিন : ওনার প্রেস অ্যাডভাইজার।

মইন : হ্যাঁ, মোখলেসুর রহমান চৌধুরী।

মইন : এই লোক, সে সব সময় ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বসত। তখন অন্য অ্যাডভাইজাররা অবজেকশন দিয়েছিলেন। সে তো অ্যাডভাইজার না? সে কেন এখানে থাকবে? সে তো প্রেস সেক্রেটারি? তারপর হি ওয়াজ মেড...

মহিউদ্দিন : প্রেস অ্যাডভাইজার।

মইন : না, ডেপুটি অ্যাডভাইজার না স্টেট অ্যাডভাইজার, কী যেন

একটা বানিয়ে দিয়েছে। তখন সে মিটিংয়ে বসে এবং হি পাসেস এভরিথিং। সাথে সাথে খবর ওই দিকে চলে যায়। আপনি অবাক হবেন, তার অ্যাকটিভিটিজ আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। ওই তিন মাস বিভিন্ন কাজে প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে হতো আমাকে। হি ওয়াজ অলসো দ্য কমান্ডার ইন চিফ। এ ছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ছিল তাঁর হাতে। আমাকে নানা কাজে যেতে হতো—প্রমোশন, পোস্টিং—ওনার অনুমোদন লাগত। তা ছাড়া উনি মাঝেমধ্যে ডাকতেন। একবার উনি আমাকে এমন একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেললেন! আগের গভমেন্ট থাকার সময় আমরা এক্সারসাইজে ছিলাম। বাইরে ছিলাম। হি গেভ মি আ কল। আমি তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরববাজার এসব জায়গায় এক্সারসাইজ দেখছি। উনি আর্মি ডেপ্লয় করতে বললেন—আর্মস রিকভারি ইনিশিয়েটিভ। তখন আমি এক্সারসাইজ থেকে লোকজন সরিয়ে আনার নির্দেশ দিলাম। উনি সন্ধ্যার সময় বললেন, এটা ক্যানসেল। বললাম স্যার, ইট ক্যান নট বি ডান লাইক দ্যাট। আমি তো ট্রুপস উইড্র করে নিয়ে এসেছি। উইড্র হচ্ছে। আপনি তো অর্ডার দিয়েছেন বললেন, না না, চেঞ্জ করেন। হি থট ইট ভেরি সিম্পল। বললাম, আর হয়ে গেল। আমি তো প্রেসিডেন্টকে বেশি বলতেও পারি না। মানুষ তো বুঝবে না যে প্রেসিডেন্ট অর্ডার দিচ্ছেন। সেনাপ্রধান আদেশ দিচ্ছেন, আর উনি এটা ক্যানসেল করছেন। সকালবেলা উনি আবার আমাকে বললেন যে আর্মি ডেপ্লয় করেন।

মহিউদ্দিন : অন্য জায়গা থেকে উনি সিগন্যাল পান?

মইন : দিস হ্যাপেনড। আমাদের ট্রুপস অলরেডি ডেপ্লয়েড। যখন ওয়ান-ইলেভেন হয়, আমরা কিন্তু আলাদাভাবে ডেপ্লয় করিনি। যাহোক, আমার মনে হলো, বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত তিনি নিজে নিতেন না।

মহিউদ্দিন : আমি শুনেছি, আর্মি ইন্টারভেনশনের মুভটা আপনার ছিল না। হতে পারে যে একটা মুভ হচ্ছে, ইউ অ্যাগ্রিড উইথ দ্যাট। এ রকম কি কিছু ছিল?

মইন : না। আই হ্যাড নো ইনিশিয়েটিভ। দেশ চালানো রাজনীতিবিদদের কাজ। আমাদের কাজ না। সো আই ডিড নট ওয়ান্ট টু গেট ইনভল্‌ভড। বাট সারকামস্ট্যানসেস...আমি কারণগুলো আপনাকে বলেছি। আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু দেশকে রক্ষা করতে হলে, মানুষের খুনাখুনি বন্ধ করতে হলে, একটা ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন লাগবে। এটা এই কেয়ারটেকার গভমেন্ট দিয়ে হবে না। একটা ফ্রেশ কেয়ারটেকার গভমেন্ট নিয়ে, টাইম নিয়ে...। একটা ভোটার আইডি

বানানো—এটা তো আপনি এক দিনে বানাতে পারবেন না? ইট টেকস টাইম। এ জন্যই নতুন কেয়ারটেকার গভমেন্ট আসল এবং দুই বছরের মধ্যে কাজ শেষ করে চলে গেল।

মহিউদ্দিন: আচ্ছা, আমি এটা শুনেছি, প্রেস অ্যাডভাইজারকে কি মারধর করা হয়েছিল?

মইন: না, এটা কিন্তু টোটালি মিথ্যা কথা। টোটালি ফলস। যখন প্রেসিডেন্ট সাইন করে দিলেন, কেয়ারটেকার গভমেন্ট ডিসমিসড, নতুন গভমেন্ট হবে, তখন সে আমাকে ফোন করে বলল, স্যার, সব ঠিক করে ফেলেছি, কোনো অসুবিধা নাই। উনি সাইন করছেন। এটা প্রেসে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে আমাকে বলেছে, সে আমাদের সঙ্গেই আছে। আমার মনে হয় না ওকে মারধর করা হয়েছে।

মহিউদ্দিন: অতি উৎসাহী কেউ থাকতে পারে না?

মইন: এটা বুঝতে হবে, যদি না সে বাড়াবাড়ি করে থাকে, তাহলে এটা আসবে। বাট হি ওয়াজ ভেরি সাবমিসিভ। সে রাতেই তো আমাকে ফোন করেছিল। মারলে কি সে আমার সঙ্গে কথা বলত? পরে সে অনেক কিসসা-কাহিনি তৈরি করেছে।

মহিউদ্দিন: আমি শুনেছি, পড়িনি। উনি বোধ হয় লন্ডনে থাকেন?

মইন: এ রকম হলে সে কি দেশ থেকে বেরোতে পারত ওই সময়? আমরা তাকে কোথাও যেতে বাধা দিইনি। বাইরে গিয়ে সে বাঘ হয়ে গেছে।

মহিউদ্দিন: আপনারা তো ইমার্জেন্সি দিলেন।

মইন: আমরা না। প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন। উই আর নো অথরিটি। প্রেসিডেন্টকে বলেছি, দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন, দিজ আর দ্য ওয়েস। ফর ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন, হ্যাভ আ ফ্রেশ কেয়ারটেকার গভমেন্ট, আপনি ইমার্জেন্সি দেন। ট্রুপস তো অলরেডি ডেপ্লয়েড আছেই।

মহিউদ্দিন: ওই মুহূর্তে, মানে ওই দিন আপনাদের সামনে কি এমন কোনো ভিশন ছিল যে আরেকটা কেয়ারটেকার গভমেন্ট হবে? এবং হু উড বি দ্য চিফ অ্যাডভাইজার? ওই সময় কি এসব চিন্তা ছিল, নাকি চিন্তাটা পরে এসেছে?

মইন: পরে। ওই দিন ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটছিল যে এই জিনিসটা প্রেসিডেন্ট করবেন কি না। উনি যদি না করেন, তাহলে কী হবে? আপনি তো গ্রুপ বানিয়ে কিছু করতে পারবেন না? সো, প্রথম কথা হলো, তাঁকে এই কেয়ারটেকার গভমেন্ট বাতিল করতে হবে। ওই কেয়ারটেকার

গভমেন্টের মিটিং ছিল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। উই অল অয়ার ওয়েটিং। আমি ওনাদের দেখেছি। তারপর হাই-হ্যালো বলে গাড়িতে উঠে চলে গেছে। তারপর প্রেসিডেন্ট নিজেই বলেছেন যে হু উইল বি দ্য চিফ অ্যাডভাইজার? আই সেইড, আপনি প্রেসিডেন্ট, আবার চিফ অ্যাডভাইজারও। এটা ওরা অ্যাগ্রি করে না। সুতরাং একটা ছেড়ে দিন। তাহলে কে হতে পারে? তখন ডিসকাশনে ড. ইউনূসের কথা উঠল।

মহিউদ্দিন : ওই দিনই?

মইন : ওই দিন, ওখানেই। এবং দ্বিতীয় নাম এল ড. ফখরুদ্দীনের। প্রেসিডেন্ট কিন্তু নিজে বলেছেন।

মহিউদ্দিন : এটা প্রেসিডেন্টের প্রপোজাল?

মইন : হ্যাঁ।

মহিউদ্দিন : এটা আমি জানতাম না। আপনারা কি তাঁর অ্যাডভাইস চেয়েছিলেন এ ব্যাপারে?

মইন : প্রেসিডেন্ট বলেছেন, উনি ভালো। নামটা উনিই বলেছেন।

মহিউদ্দিন : ফখরুদ্দীন সাহেবের নাম উনিই বলেছেন?

মইন : উনিই বলেছেন। আমি তো কাউকে চিনি না। আই ওয়াজ নেভার ইন্টারেস্টেট ইন দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড। আমার কাজ ছাড়া জীবনে কোনো দিন পলিটিকস-টলিটিকসে যাইনি, বা কাজের বাইরে কখনো যাইনি। যতটুকু হয়েছি, আল্লাহর রহমত ছিল, বিশ্বাস করি আল্লাহ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আই ওয়ার্কড হার্ড ইন দ্য আর্মি। আমার কোনো দুঃখ নেই। শুধু একবার, আওয়ামী লীগ গভমেন্ট যখন প্রথম আসে, আমাকে প্রমোশন দেয়নি। আমার জুনিয়র একজনকে মেজর জেনারেল বানিয়ে দিয়েছিল। আই টোল্ড মাই ওয়াইফ, কী আছে? আমি তখন কমান্ড্যান্ট, সিলেটে। আই ওয়ান্টেড টু রিজাইন। আই হ্যাভ মাই ওন এথিকস অব ওয়ার্কিং। বলেছি, লুক, ব্রিগেডিয়ার তো হয়েছি, আল্লাহর কাছে হাজার শোকর। আই ওয়ান্ট টু রিজাইন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব। সে আমাকে ভীষণভাবে বলল, আই নো ইয়োর লাইফ। ইউ ক্যান নট সারভাইভ আউটসাইড। ইয়োর লাইফ ইজ মিলিটারি লাইফ। লেটস সি। তার কথাটা ধরেই আমি রেজিগনেশন সাবমিট করিনি। তারপর তো পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিল প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে করে।

আমাদের মাইন্ডে ছিল ড. ইউনূস। আমার সঙ্গে এয়ার চিফ ছিলেন, এয়ার ভাইস মার্শাল ফখরুল আজম। ফার্স্ট আই র‍্যাং আপ। তখন বাজে

রাত ১১টা। ড. ইউনূস ফোনে। বললেন, না, আমি শর্ট টাইমে হতে চাই না। বললাম, না না না, শর্ট টার্ম না, নট ফর থ্রি মানথস। উই আর থিংকিং, দ্য গভমেন্ট ইজ থিংকিং টু ইয়ারস। এর মধ্যে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি—টু ইয়ারস। উনি মনে করেছেন, তিন মাসের মধ্যে চলে যাবে। ওনার মাইন্ডে তখন আছে, ইলেকশন করে হি উইল কাম টু পাওয়ার, টেক ওভার, রুল অব দ্য কান্ট্রি অ্যাজ প্রাইম মিনিস্টার। অনেক বললাম। হি ওয়াজ নট একসেপ্টিং ইট।

মহিউদ্দিন : দুই বছর বলার পরও না?

মইন : না। তারপর সেকেন্ড চয়েস ওয়াজ ড. ফখরুদ্দীন। তখন রাত প্রায় সাড়ে ১২টা বেজে গেছে। বললাম। আসসালামালাইকুম স্যার। প্রেসিডেন্ট চাচ্ছেন আপনি চিফ অ্যাডভাইজার হন। আগেই বলে দিলাম, ইটস ফর টু ইয়ারস। ইফ ইউ কাম, দ্যাট উইল বি আ গ্রেট হেলপ টু দ্য নেশন অ্যান্ড দ্য পিপল। উনি চুপ করে...ঘুমের মধ্যে উঠছে তো? আচ্ছা, লেট মি টক টু মাই ওয়াইফ। আচ্ছা স্যার, উই আর অল ওয়েটিং হিয়ার। বললেন, আধা ঘন্টার মধ্যে জানাচ্ছি। আধা ঘন্টা পর উনি ফোন করলেন, একসেপ্ট করলেন।

মহিউদ্দিন : ১২ তারিখ উনি শপথ নিলেন।

মইন : ১২ তারিখ ১০টায় উনি এসে আমাদের সঙ্গে মিটিং করলেন, ইন চিফ অ্যাডভাইজার্স অফিস। ওখানে আসলাম, কথাবার্তা হলো। আমি সোজাসুজি বলেছি, আপনিই সব। আমরা আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করব না। আমাদের প্রথম কথা হলো, কেয়ারটেকার সরকার একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং আমরা স্বল্প মেয়াদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। পাঁচটা পয়েন্ট বলেছিলাম, আমার এখন স্মরণ নাই। বলেছিলাম, আপনার ক্যাবিনেটের কেউ যদি দুর্নীতি করে, তাকে তাৎক্ষণিকভাবে আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি সম্মত হলেন। বললাম, ভালো এবং এফিশিয়েন্ট এ রকম লোক আমাদের চাই, ১০ জন।

তো খোঁজা শুরু হলো। এর মধ্যে শুরু হলো মানুষের টেলিফোন। সবাই নিজেকে যোগ্যতম দাবি করছে। যাহোক, অ্যাডভাইজাররা তো হ্যান্ডপিকড। যাঁদের সিলেক্ট করা হয়েছে, তাঁরা ভালো লোক, যাঁরা দক্ষতা দেখাতে পারেননি, এক বছর পর তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে, অয়ার ড্রপড। একজন অ্যাগ্রিকালচার অ্যাডভাইজার ছিলেন। এ রকম ভালো লোক আমাদের দেশে আছে? বেশ বয়স হয়েছে। পায়ে একটা প্রবলেম ছিল। উনি ভোররাতে ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টে চলে যেতেন। গিয়ে ওই

পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ইন ফ্রন্ট অব হিম, চুরি-টুরি বন্ধ। খুব পরিশ্রমী ছিলেন। মাই হ্যাডস অব টু হিম।

মহিউদ্দিন : ওই সময় রাজনীতি বন্ধ ছিল।

মইন : ইমার্জেন্সি ছিল।

মহিউদ্দিন : যেদিন চিফ অ্যাডভাইজার শপথ নেন, সেদিন সেখানে শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন।

মইন : আওয়ামী লীগের পুরো টিম উপস্থিত ছিল।

মহিউদ্দিন : বিএনপি নিয়ে লেখা আমার বইয়ে আছে, ওদের দুজন রওনা দিয়েছিল।

মইন : পার্টি সিক্রেট।

মহিউদ্দিন : সাইফুর রহমান এবং সাদেক হোসেন খোকা, সম্ভবত।

মইন : আমি যেটা শুনেছি, ব্যারিস্টার মওদুদ এবং আরেকজন।

মহিউদ্দিন : অন দ্য ওয়ে, দে গট আ ফোন কল—বঙ্গভবনে কি আর কখনো যান নাই? সো, দে গট দ্য মেসেজ। আর যাননি। প্রথমেই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে একটা হোস্টাইল ভাব নিল।

মইন : একজাক্টলি। ধরেন, পাকা ফল পুরা রেডি, খাবেন। এটা যদি কেউ নিয়ে চলে যায়...দিস ওয়াজ হোয়াট হ্যাপেনড।

যখন আমরা আসছি, রাত দশটা থেকে কারফিউ দেওয়া হয়েছে। পরদিন সকালে দেখলাম, নো রিপারকেশন, নাথিং। তারপর আর কারফিউ দেওয়া লাগেনি। পিপল ওয়েলকামড ইট। তাই না? ঘর থেকে বেরোতে পারে না, (হাসপাতালে) রোগী নিয়ে যেতে পারে না, এ অবস্থায় কেউ ইনডিভিজুয়ালি, অর গ্রুপ অর পার্টি কেউ রাস্তায় এসে না বলেনি।

মহিউদ্দিন : জনমনে একটা রিলিফ?

মইন : হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ রিলিফ পেল। তারপর আর কারফিউ দিতে হয়নি। তারপর ওথ হলো। ১০ জন এলেন। ওই যে আমাদের মধ্যে একজন সিনিয়র ছিলেন, হি হ্যাড লিংক। উনি দু-একটা নাম সাজেস্ট করেছেন। এমনকি আত্মীয়ের নামও। আমি যখন এটা জানলাম—আরে, প্রথম দিকেই এসব শুরু করে দিল? ওনার নাম প্রথমে লিস্টে ছিল। আমি বললাম, স্টপ। উনি ওথ টেকিংয়ে যাচ্ছে, ওখান থেকে ওই নামটা ক্যানসেল করলাম।

মহিউদ্দিন : তার রিকমেন্ডেশন সোজা বাদ দিয়ে দিলেন?

মইন : হ্যাঁ। আত্মীয়, মানে ভেরি ক্লোজ রিলেটিভ। তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা তো ভালো কাজ হলো না। ক্রিম খাওয়ার জন্য কাজ

করিনি। আমরা দেশের জন্য কাজ করছি। এ রকম দুজনকে বোধ হয় আমরা ফেরত পাঠালাম। আরেকজন যে, ডিড নট হ্যাভ গুড রেপুটেশন।

মহিউদ্দিন : এরা কি চলে এসেছিল?

মইন : না, অন দ্য ওয়ে ছিল। তাদের স্টপ করা হয়।[২৬]

সাক্ষাৎকারে জেনারেল মইন যে সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, তিনি হলেন নবম পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডার মে. জেনারেল (পরে লে. জে.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে তিনি উপদেষ্টা বানাতে চেয়েছিলেন। মইন রাস্তা থেকেই তাঁকে ফেরত পাঠান। ড. ফখরুদ্দীনকে প্রধান উপদেষ্টা করার প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এসেছিল বলে সাক্ষাৎকারে জেনারেল মইন যে দাবি করেছেন, তার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১১ জানুয়ারি বঙ্গভবনে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল সরওয়ার জাহান নিজাম (পরে ভাইস অ্যাডমিরাল এবং নৌবাহিনীর চিফ অব স্টাফ)। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ওই দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

আমাদের প্রত্যেক মাসে একটা মিটিং হয়, আইনশৃঙ্খলা কমিটির মিটিং। প্রেসিডেন্ট প্রিসাইড করেন। আমরা বসে আছি। হঠাৎ দেখি তাড়াহুড়া। এ সময় নৌবাহিনীপ্রধান বা সেনাবাহিনীপ্রধান বা বিমানবাহিনীপ্রধানের আসার কথা না। তাদের কাছে গেলাম। তারা তিনজন এক রুমে বসে আছে। আমি কী করব? উই অয়ার লয়টারিং অ্যারাউন্ড।

প্রেসিডেন্ট 'একটু আসি' বলে উঠে চলে গেছেন। আর আসেন নাই। এয়ার চিফের সঙ্গে আমি খুব ক্লোজ। তাঁকে বললাম

ঘটনা কী?

ঘটনা তো খারাপ। প্রবলেম।

আমি দেখলাম মইন ইউ আহমেদ প্রেসিডেন্টের রুমে ঢুকছে। প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি ছিল মোখলেস। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। বললাম, কী অবস্থা?

অবস্থা তো সুবিধার না।

তারপর মোখলেসের ছোটাছুটি। হাসান আলীকে (নৌবাহিনীপ্রধান) জিজ্ঞেস করলাম।

স্যার, কী অবস্থা?

বোঝেন না?

বুঝলাম যে সামথিং হ্যাজ হ্যাপেনড। এমএসপি (মিলিটারি সেক্রেটারি টু প্রেসিডেন্ট) মে. জেনারেল আমিনুল করিমকে বললাম, মিটিং-টিটিং তো আর হবে না। কফি-টফি খাওয়াও, নাশতা খাওয়াও।

খাওয়াইতেছি স্যার।

ডাটসে খাইলাম। এক সাইডে আমরা, অন্যদিকে সব চিফ, ডিজিএফআই, এরা। তারপর চলে আসলাম।[২৭]

রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা পর্যালোচনার জন্য একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি নিজেই ছিলেন ওই কমিটির সভাপতি। কমিটিতে কয়েকজন উপদেষ্টাও ছিলেন। বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানেরা ছিলেন এই কমিটির সদস্য। ১১ জানুয়ারি কমিটির একটা সভা ছিল। ওই সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক এস এম মিজানুর রহমান। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ওই দিনের একটা বিবরণ দিয়েছেন :

মিজানুর রহমান : বেলা ১১টা-১২টা, এ রকম সময়। বঙ্গভবনে যাওয়ার জন্য ডাকা হলো। আমরা গেলাম। মিটিং শুরু হলো। নানান প্রসঙ্গ আসতে লাগল। বিভিন্ন জন বিভিন্ন সমস্যার কথা বলল। বন্দরের সমস্যার কথা বেশি করে আসল। রাষ্ট্রপতি জোর গলায় বলছিলেন যে ২২ তারিখ নির্বাচন হবে। এতে কি আপনাদের কারও কোনো সন্দেহ আছে? কেউ কেউ বলল যে সন্দেহ নাই। অধিকাংশই কিন্তু চুপ। হ্যাঁ-না বলে নাই। মিটিং চলা অবস্থায় ডিজিএফআইয়ের অ্যাকটিং ডিজি বারী একবার উঠে বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার আসল। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতির এডিসি রাষ্ট্রপতির কানে কানে কী যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে উনি হঠাৎ করেই মিটিংটা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, মিটিং আজ এখানেই শেষ। দরকার হলে পরে আবার বসব।

আমরা যখন বের হই, তখন দেখি যে আর্মি চিফ, নেভি চিফ, এয়ার চিফ, তারা ঢুকছে। ভেবেছি, তারা হয়তো কোনো কাজে এসেছে। বিকেলে অফিসে গেছি, র‍্যাব হেডকোয়ার্টার্সে। সন্ধ্যার সময় আইজি সাহেব আমাকে ফোন করলেন—সন্ধ্যার সময় সেনাসদরে মিটিং আছে। তুমি চলে আসো। আমি গেলাম। সেখানে খোদা বখশ (আইজি) একই সময় এসে পৌঁছাল। আর্মি চিফ, নেভি চিফ, এয়ারফোর্স চিফ, তাদের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আরও কয়েকজন অফিসার ছিল। আর্মির

কনফারেন্স রুমে আমরা বসলাম। আর্মি চিফ একটা চিঠি দেখালেন। এটা সবাইকে পড়তে দিলেন। মুখে যেটা বললেন, তা হলো এই—ইউএন হেডকোয়ার্টার্স থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি, এতে নির্বাচন করা ঠিক হবে না। আর্মি যদি এতে সহযোগিতা করে, তাহলে জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করা যাবে না। আমাদের অনেক পিসকিপার আছে, যারা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কাজ করে। এদের সংখ্যা অনেক। আর্মি আছে, পুলিশও আছে। যদি কোনো কারণে জাতিসংঘ বাংলাদেশের পিসকিপিং মিশন বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমার এতগুলো ফোর্স ফেরত আসবে। আর্মির মধ্যে একটা রিপারকেশন হবে। ভবিষ্যতেও হয়তো যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আমি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ করেছি। উনি স্টেট অব ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করবেন।

মহিউদ্দিন আহমদ : চিঠিটা কি আপনি পড়েছেন?

মিজান : আমার ঠিক খেয়াল নেই। একটাই চিঠি, হাতে হাতে ঘুরছিল। আমার কাছে আসার পর পাশ থেকে একজন এটা নিয়ে গেল।

মহিউদ্দিন : চিঠিটা ফেইক না তাহলে?

মিজান : বলা মুশকিল। এটা তো প্রিন্টেড চিঠি ছিল। ওখানে আলাপ হলো, প্রধান উপদেষ্টা কাকে করা যায়।

মহিউদ্দিন : ওই মিটিংয়ে?

মিজান : হ্যাঁ। উনি (মইন) সবার কাছে নাম চাইলেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা নাম আসল। ড. ইউনূসের নামও এসেছিল।

মহিউদ্দিন : আর কার কার নাম এসেছিল?

মিজান : খালেদ শামসের নাম এসেছিল। দু-তিনজনের নাম এসেছিল। ফখরুদ্দীনের নাম কিন্তু তখন আসেনি। আমি আমার অফিসে চলে এলাম। শুনলাম, রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেবেন। ভাষণ হলো বেশ রাতে। এর মধ্যে ধরপাকড়ের তালিকা শুরু হয়ে গেল, আমি অফিসে থাকা অবস্থায়ই।[২৮]

১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় চ্যানেল আইয়ের স্টুডিওতে টক শো 'তৃতীয় মাত্রায়' অংশ নিতে সন্ধ্যায় হাজির হয়েছিলেন মে. জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম এবং জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব। এই টক শো প্রচারিত হয় মধ্যরাতে। কয়েক ঘণ্টা আগেই স্টুডিওতে তা ধারণ করা হয়ে থাকে। ওই সন্ধ্যার একটি বিবরণ দিয়েছেন জেনারেল ইবরাহিম :

স্টুডিওর বাইরে বসে আছি, চা-কফি খাচ্ছি। দুজনে আলাপ করছি—দেশের এ অবস্থা চলতে পারে না। এর একটা বিহিত হওয়া

দরকার। সেনাবাহিনী এখানে জড়িত হতে পারলে ভালো। সেনাবাহিনী একা না, নাগরিক সমাজকে নিয়ে। দুজনে বসে ঠিক করলাম, এ লাইনে আজকে বলতে হবে। এর মধ্যেই স্ক্রলে এসে গেল—জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। বললাম, রব ভাই, আর তো কিছু বলার থাকল না। 'বলার কিছু থাকল না মানে? এখন তো এইটা নিয়া আগাইতে হবে।' আমিও বললাম, এইটা নিয়া আগাইতে হবে।

আমরা ওখানে যা বলার তা বলেছি। সারমর্ম হলো, আমি আর রব ভাই স্বাগতম জানিয়েছি। সে রাতের এই টক শোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। কারণ হলো, কারফিউ জারি হয়ে গেছে। সকল টক শো বন্ধ হয়ে গেছে। সব টিভি চ্যানেলে দেশাত্মবোধক গান শোনাচ্ছে। লোক ছোটাছুটি করছে বাড়ি যাওয়ার জন্য। হুকুম হলো, পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো টক শো প্রচারিত হবে না। সেদিন চ্যানেল আইয়ের উপস্থাপক জিল্লুর রহমান কী করেছেন, উনিই জানেন। রাতেই উনি ফোন করে জানালেন, টক শোটা অন এয়ার হবে। ওই সময় টিভি চ্যানেল ছিল ১৭-১৮টা। কোনো চ্যানেলে টক শো ছিল না। দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। মানুষের মনে আগ্রহ। দেশের সব টিভি চ্যানেলের সকল দর্শক ওই দিন চ্যানেল আইয়ের তৃতীয় মাত্রা দেখেছে। এটা হলো বাই ডিফল্ট। এরপর দুদিন সব চ্যানেলে টক শো বন্ধ ছিল। চ্যানেল আইয়ের ওই দিনের টক শো প্রচারের অনুমতি ছিল। আমি শুনেছি, জিল্লুর ওদের কাছে এটা পাঠিয়ে বলেছিলেন, যদি আপত্তিকর কিছু থাকে, তা বাদ দেন। তারা জানিয়েছে, এতে আপত্তিকর কিছু নেই।

এটা ঠিক যে ওই দিন আমরা জরুরি অবস্থা জারির সমালোচনা করি নাই, স্বাগত জানিয়েছিলাম। লাখ লাখ নাগরিক কিন্তু টেলিভিশনের টক শোতে যাওয়ার সুবিধা পাচ্ছেন না। কিন্তু মানুষের মনে আগ্রহ ছিল, কিছু একটা হওয়া প্রয়োজন। এভাবে চলতে পারে না। ২০০৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৭ সালের জানুয়ারির ১০ তারিখ পর্যন্ত সময়টা যদি এখন কল্পনা করি, তাহলে সেটা আসলেই অসহ্য ছিল। মানুষ চাচ্ছিল যে সেনাবাহিনী ইনভল্‌ভড হোক।[২৯]

এক-এগারোর ঘটনাটি যখন ঘটে, ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক মে. জেনারেল সাদিক হাসান রুমী দেশে ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিচালকদের একজন ব্রি. জেনারেল চৌধুরী ফজলুল বারী ডিজিএফআইয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেদিন তিনিও বঙ্গভবনে

সেনাপ্রধান মইনের সঙ্গে ছিলেন। ওই দিনের ক্ষমতার পালাবদলে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৭ সালের ২৬-২৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি খোলামেলাভাবে অনেক কথা বলেন। তাঁর কিছু কথা সেনাপ্রধানের কথার সঙ্গে মিলে যায়। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন এখানে তুলে ধরা হলো :

মহিউদ্দিন আহমদ: এক-এগারোর সময় এবং তার পরের দিনগুলোতে আপনার নাম অনেকবার শোনা গেছে। কোন পটভূমিতে এই পালাবদল ঘটল? কী ছিল আপনার ভূমিকা? আপনি অনেক দিন ধরে জন-আলোচনায় আছেন। একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

চৌধরী ফজলুল বারী: এককথায়, দেশটা অস্থিতিশীল হয়ে গেছে। ইলেকশন হলেও অস্থিতিশীল, না হলেও অস্থিতিশীল। এখন কী করণীয়? আমি কারও বিরুদ্ধে কথা বলতে চাই না। নরমাল ইয়ের বাইরে আর্মি কেন আসবে? সবাই ঠিকমতো বেতন-ভাতা পাইতেছে! দেশ গোল্লায় যাক, নিজের বাচ্চা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে পড়তেছে। আর কী লাগে? আমি বারে বারে ইনসিস্ট করলাম। তারপর সেনাপ্রধানকে নক করলাম। নক করলাম জেনারেল মাসুদকে। জেনারেল মাসুদকে কেন নক করলাম? কারণ, উনি বেগম জিয়ার আত্মীয়। দেখি ওনার মনোভাবটা কী।

মহিউদ্দিন: উনি সাঈদ এস্কান্দারের ভায়রা।

বারী: লেট আস কাম ব্যাক টু দ্য ইমার্জেন্সি। সিচুয়েশন তো ভোলাটাইল হয়ে গেছে। ইমার্জেন্সি দেওয়ার জন্য আমি জেনারেল মাসুদকে জিজ্ঞেস করলাম। বলে, আসলেই তো, দেশের যে অবস্থা হয়েছে, কিছু একটা করা দরকার। আমি বললাম, জেনারেল মইনের কাছে একটু খোঁজখবর নেন। আমি জানি না উনি খোঁজখবর নিয়েছেন কি না। আমি আর জিজ্ঞেস করিনি। জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল।

ওনাকে কয়েক দিন পরে পরেই আমি বলি, স্যার, চিফের কাছে যান, আলাপ-টালাপ করেন। এভাবে তো একটা দেশ চলতে পারে না? বলে, হ্যাঁ, চিফের কাছে গেছিলাম, একটু হালকা উঠাইছি, উনি তো এদিকে যায় না। মানে ডরায়, কথা বলতে চায় না। জেনারেল মাসুদ হইল বেগম জিয়ার আত্মীয়। এ জন্য উনি হয়তো শেয়ার করেন না কিছু।

তারপর আমি চিফের ভাইকে নক করলাম, ইফতেখার আহমেদ ভাই। আমরা বলতাম টিপু ভাই। আমি যখন র‍্যাবে ছিলাম, উনি একবার আমার কাছে এসেছিলেন। ওনাকে বললাম, ভাই, এই অবস্থা। ওনাদের বলেন।

প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে কিছুদিনের জন্য ইমার্জেন্সি দিলে সবারই মুখরক্ষা হবে। আর বিএনপি যদি ইলেকশন করে—আমি এভাবেই বলেছিলাম—দেশে একটা কালো তিলক পড়বে, এ রকম জোর করে একটা ইলেকশন করালে। এর আগে ১৫ ফেব্রুয়ারিতে (১৯৯৬) একটা হয়েছে না? আরও একটা হবে? এগুলো বলে-টলে আমি ওনারে রিকোয়েস্ট করে পাঠালাম। উনি বললেন যে না, সময় হয় নাই এখনো। এত তাড়াতাড়ি এগুলো করা ঠিক না। বুঝলাম, ওনার ইচ্ছা আছে, কিন্তু টাইম হ্যাজ বিকাম আ ফ্যাক্টর।

কিছুদিন পরে আমার ডিজি গেলেন ইউকে। সিচুয়েশন একদম পিকে। আমি অ্যাকটিং ডিজি। আমি গিয়া ওনাকে সিচুয়েশন ন্যারেট করলাম। উনি নিজে থেকেই বললেন যে দেশের কী অবস্থা? বললাম, স্যার, দেশের অবস্থা এখন তো আর লুকানো নাই।

মহিউদ্দিন : এটা চিফকে বললেন?

বারী : চিফকে, চিফের অফিসে। দেশের অবস্থা তো লুকানো নাই। মিডিয়া তো সব পাবলিশ করে। কোনো কিছু তো গোপন থাকে না। দেখছেন তো আপনি, প্রতিদিন কী হচ্ছে না হচ্ছে।

তোমার কী অভিমত?

এটা থেকে নরমালসি আনতে হলে প্রেসিডেন্টকে ইমার্জেন্সির জন্য বলতে হবে।

অন্যরা কী বলে? আর্মির অ্যাটিচ্যুড কী?

আর্মির অ্যাটিচ্যুড হলো, সেনাপ্রধান যা করবে, তারা তো তার বাইরে থাকবে না। সেনাপ্রধানের চিন্তাটা তো আসবে ওখান থেকেই, দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা থেকে।

তুমি আর্মির কাছে গিয়ে খোঁজ নাও।

সব কমান্ডার, জিওসির সঙ্গে কথা বললাম, দু-একজন ছাড়া, যাদের সঙ্গে আমার ভালো ইয়ে নাই। কারণ, এগুলি তো সাংঘাতিক কঠিন প্রশ্ন। আমি কথা বললাম। সবাই মত দিলেন যে কিছু একটা করা উচিত। বাট নো মার্শাল ল। চিফও বলেছেন, আই অ্যাম দ্য লাস্ট ম্যান টু ডিক্লেয়ার মার্শাল ল।

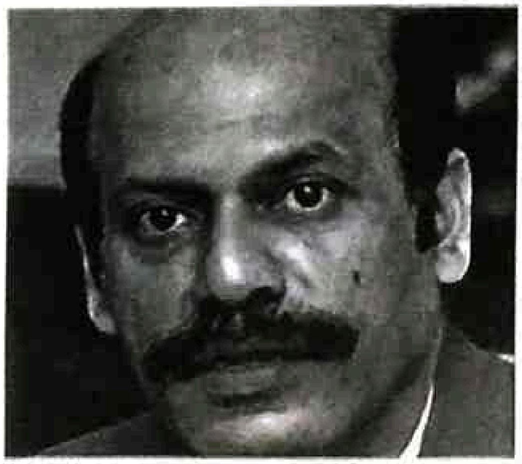
এর মধ্যে আমি অনেকগুলো গ্রাউন্ডওয়ার্ক করেছি। ইমার্জেন্সি প্রক্লেমেশনের জন্য যে একটা গেজেট বের করতে হবে, গেজেটে কী লেখা থাকবে? আমি দেখলাম বঙ্গবন্ধুর আমলে ইমার্জেন্সির গেজেট আছে, এরশাদ সাহেবের আমলের একটা গেজেট আছে। দুইটা এনে দেখলাম—একটা মডারেট ভার্সন তৈরি করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, দেশে

নরমালসি আসবে। তারপর ছোটখাটো কিছু জিনিস আছে—বড় আঙ্গিকের ছোটখাটো জিনিস, দলীয়করণ-টরণ বাদ দিয়ে মেধাবী লোকজন বসানো—এটা বোধ হয় এভাবেই করা হয়েছিল। কেয়ারটেকার গভমেন্টের যে সদস্যরা ছিলেন, অ্যাডভাইজাররা ছিলেন, এটা আপনারা বিচার করবেন এরা ভালো ছিল না খারাপ ছিল। হিউম্যান এরর তো থাকবেই।

ইমার্জেন্সি হলো ১১ তারিখ। ১০ তারিখ রাতে চিফের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়, অ্যাজ ইউজুয়াল, ডিজিএফআইয়ের অ্যাকটিং চিফ হিসেবে সবার সঙ্গেই কথাবার্তা হয়। চিফ ১০ তারিখ রাতে আমাকে ফোন করলেন যে, বারী, একটা জিনিস তো পাওয়া গেছে—ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করার পক্ষে একটা শক্ত ডকুমেন্ট—ইউএন মিশনে বাংলাদেশ থেকে সৈনিকদের আর নেবে না। এটা তো একটা বড় অজুহাত আমাদের জন্য। উদ্দেশ্য তো ইমার্জেন্সি না। উদ্দেশ্য হলো পিসকিপিং রি-এস্টাবলিশ করা। এটা করতে গেলে, আমরা মনে করি যে ইমার্জেন্সি দিতে হবে। ইমার্জেন্সি করতে গেলে এটারও তো একটা সাপোর্টিং ইয়ে লাগবে। এটা আমি দেখিও নাই কোনো দিন। উনি বলেছেন। আর্মিতে তো ওরাল অর্ডার বলে একটা কথা আছে। মৌখিক অর্ডার। এটা আইনসম্মত।

এটা শিওর যে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি জেনারেল মাসুদকে বললাম, স্যার, চিফ তো বলছেন, স্যার আপনি তাড়াতাড়ি আসেন। উনি তখন সাভারে।

উনি রওনা করলেন। আসলেন। এটা ঐতিহাসিক একটা ঘটনা। বললেন, আমিনকে (ডিজিএফআইয়ের আরেকজন পরিচালক ব্রি. জেনারেল এ টি এম আমিন) ডাকো। ব্রিগেডিয়ার আমিন এর মধ্যে ছিল না। দেশের মধ্যে একটা মোড় নিয়া নিল আমিনকে ডাইকা। এই সব লোক— ব্রিগেডিয়ার আমিন, জেনারেল মইন—সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে বসে যে ক্লাস করা, পালস বোঝা, গ্রামে কাদার মধ্যে লুঙ্গি উঠায়া আসা—এ রকম তো দেখে নাই। এদের কাছে চিত্র এক রকম। আমাদের কাছে চিত্র এক রকম। যার ফলে তারা ফুটপাতে বাড়ি দিয়া উঠায়া দাও, মার্শাল ল কইরা ফেলো, ভাইঙ্গা ফেলো, টক শো বন্ধ কইরা দাও। এই টাইপের অ্যাটিচ্যুড। আমি বললাম, আরে, নরমালসি আনতে চাই আমরা। যখন ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হলো, সব টক শো বন্ধ। আমাকে তৃতীয় মাত্রার জিল্লুর সাহেব ফোন করলেন, ভাই, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করব? আমি তখনো বঙ্গভবনে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেনাপ্রধানকে ফোন করলাম। স্যার, এগুলা





ডিজিএফআইয়ের দুই পরাক্রমশালী পরিচালক এ টি এম আমিন এবং চৌধুরী ফজলুল বারী

বন্ধ করবেন না। মানুষকে কথা বলতে দিতে হবে। আমরা যদি খারাপ করি, বলুক। আমাদের বক্তব্য আমরা দিব। ভালো করলে মানুষ সেটা বলবে। মানুষ তো খারাপ বলে নাই প্রথম দিকে।

যাহোক, ব্রিগেডিয়ার আমিনকে আনল জেনারেল মাসুদ। তার সঙ্গে নাইন ডিভে কাজ করেছে, নাইন ডিভের আর্টিলারি কমান্ডার ছিল আমিন। আরও আগে থেকেই হয়তো পরিচয়-টরিচয় আছে। ব্রিগেডিয়ার আমিনরে লাগানো হলো। আমি আমার কাজ করতে থাকলাম।

১১ তারিখ। প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা কমিটির মিটিং, ইলেকশন উপলক্ষে। ইলেকশন তো ২২ জানুয়ারি। মিটিং শুরু হলো। মিটিংয়ের মধ্যে চিফ আমাকে ফোন করে বলল, আমি আসতেছি। তুমি থাইকো। প্রেসিডেন্টকে সবকিছু বুঝায়া বলব। সিচুয়েশন রিপোর্টটা তুমি বলবা, ফ্রম ইন্টেলিজেন্স পয়েন্ট অব ভিউ।

এর মধ্যে গোছগাছ করে আমি রেডি হয়ে গেলাম। চিফ আসলেন, বাহিনীর প্রধানরা আসলেন। রাষ্ট্রপতির কাছে সময় নেওয়া হলো। উনি সময় দিলেন, লাঞ্চের পরে। তারপর ওনারা ওনাদের বক্তব্য দিলেন। সেনাপ্রধান তাঁর বক্তব্য দিলেন। রাষ্ট্রপতি বললেন, কী করা। উনি বললেন, ইমার্জেন্সি দেওয়া।

আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একটু আলাপ-আলোচনা করে দেখি।

কেয়ারটেকার গভমেন্ট পদত্যাগ করতে হবে।

আমাকে পদত্যাগ করতে হবে নাকি?

না, আপনাকে প্রেসিডেন্টশিপ থেকে পদত্যাগ করতে হবে না। বাট অ্যাজ কেয়ারটেকার চিফ ইউ হ্যাভ টু রিজাইন।

তো মেকানিজম যা করার করা হইল। জেনারেল মাসুদ ওই দিকে থাকলেন, নাইন ডিভ নিয়া। ওনাকে রেডি রাখা হইল। এটাই স্বাভাবিক এখানে তো পিজিআর আছে, এসএসএফ আছে। তবে কেউ ইয়া করে নাই। সিচুয়েশন যা হইছিল, এ ছাড়া বিকল্প ছিল না। রাজনীতিবিদরা ব্যর্থ হয়েছেন।

তাঁদের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, তাঁরা যেভাবে আগাইতেছিলেন—দেশের মানুষরে দুই দিন পরে পরে পাছার মধ্যে লাথি দিয়া, সরি মহিউদ্দিন ভাই, আমি এ রকম দু-একটা শব্দ অতি ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করছি। দেশের মানুষের কী হলো না হলো এটা নয়। ৬৮ জন মারা গেছে। হু রিমেম্বারস দেম? হুইচ পলিটিশিয়ান ইজ রিমেম্বারিং দেম?

ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হইল। বক্তৃতা আমরাই লেখায়া দিলাম। উনি কিছু কাটছাঁট করলেন। কট্টরপন্থী কোনো কিছু করা হয় নাই—রাষ্ট্রপতি, আপনাকে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। বাইরে তো নানান ধরনের গুজব, সেনাপ্রধান প্রেসিডেন্টের ইয়েকে চড় মারছেন, মুখলেস সাহেবকে। অল বানোয়াট, বাখোয়াজ। উনিও দেখলাম লেখলেন বিশাল বড় এক পত্রিকার মধ্যে যে আমি ট্রাক-ট্রুক নিয়া রেডি হইয়া আছি। আমি ট্রাক কই পাব? আমার ঢাল-তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার, আমি অ্যাকটিং ডিজি-ডিজিএফআই। আমি এখানে আছি সেনাপ্রধানের সঙ্গে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে, কী হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো নিয়ে।

যাহোক, ওনাকে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করানো হলো। পদত্যাগ করানোর সঙ্গে সঙ্গে—হু উইল বি দ্য কেয়ারটেকার চিফ? নাম আসল ড. ইউনূসের। তখন জেনারেল মাসুদকে বলা হলো, ব্রিগেডিয়ার আমিনকে নিয়ে জেনারেল মাসুদ গেলেন ওনার কাছে। ওনার প্রথম কথা হলো, টাইম ফ্রেম কত দিনের জন্য?

তা তো আমরা বলতে পারি না?

কেউই বলতে পারে না, জেনারেল মইন জানে না, কত দিন।

উনি বললেন, কম সময় যদি হয়, কোনো পরিবর্তন আনা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

তারপর কাকে করা যায়? আমি সার্চ লাগাইলাম। আমার অফিসাররা বলল, স্যার, আরেকজন আছে, ফখরুদ্দীন সাহেব। আমি কল দিলাম ফখরুদ্দীন সাহেবকে।

মহিউদ্দিন : ফখরুদ্দীন সাহেবের নাম কি ড. ইউনূস সাজেস্ট করেছিলেন, নাকি এটা আপনার চয়েস?

বারী : এটা একদম আমাদের সার্চ। আমরা তো দীর্ঘদিন ধরেই কেয়ারটেকার গভমেন্টের নামধাম চর্চা করতেছি। আমি তখন ওনাকে ফোন করলাম। দেখেন, আগে থেকে কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা নাই। এগুলি ইনস্টেন্টলি আসতেছে, একটার পর একটা। যদি ক্যু করার চিন্তা, ক্ষমতার চিন্তা থাকত, তাহলে তো জেনারেল এরশাদের মতো ছক কইরা ফেলতাম—দুই বছর কী করব, তিন বছর কী করব, চার বছর কী করব? এক্সপার্ট লাগাইতাম। এগুলো তো আমরা নিজেরা নিজেরা—নরমালসি আনার জন্য, সবই বহাল থাকবে, সবাই যার যার জায়গায় থাকবে।

ড. ফখরুদ্দীনের বাসায় ফোন করলাম। ড. ইউনূসের বাসা থেকেই তাঁরা সোজা চলে গেলেন। উনি বললেন, আমাকে একটু সময় দেন। উনি ওনার ওয়াইফের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে।

মহিউদ্দিন : একটা গসিপ শুনেছি, আপনারা যখন প্রফেসর ইউনূসকে অ্যাপ্রোচ করলেন, উনি টাইম ফ্রেমের ব্যাপারে অ্যাগ্রি না করায় উনি নাকি ফখরুদ্দীন সাহেবের নাম প্রস্তাব করেছেন?

বারী : না। আমার নোটবইটা আনতে পারলে দেখাইতে পারতাম, এখন পর্যন্ত নামটা লেখা আছে। ফরিদ আর মশিউর সাহেব ছিল আমার অফিসার। ফরিদ ছিল জি-ওয়ান, আর মশিউর ছিল সিভিল। এদেরকে বললাম, নাম বাইর কর। ওরা ওনার নাম প্রপোজ করল।

মহিউদ্দিন : ফরিদ কি আর্মির লোক?

বারী : আর্মির, মশিউর সিভিলিয়ান। আমাকে কোনো কাজ দিলে আমি তো ভিশনটা এদের দিয়া দেই—আমার এই এই দরকার, এটা বাইর কর।

মহিউদ্দিন : ফরিদের পুরো নাম কী।

বারী : ফরিদুল ইসলাম বোধ হয়।

মহিউদ্দিন : উনি কি ওই সময় মেজর ছিলেন?

বারী : না, লে. কর্নেল। তো এরা বাইর করল ওনার নাম। ফোন নম্বর ছিল। ওই নম্বরেই যোগাযোগ করি।

মহিউদ্দিন : তাহলে বলছেন, এটা আপনার ইনিশিয়েটিভে হয়েছে?

বারী : কোনটা?

মহিউদ্দিন : ফখরুদ্দীন সাহেবেরটা।

বারী : না। এরপর যখন প্যানেল করা হইল, প্যানেলের মধ্যে আমরা ২০-২৫ জনের নাম নিয়া আসছি। তারপর চিফের কাছে গিয়া সবাই মিলে

আলোচনা কইরা—ওনাকে দেখ, ওনাকে নক কর।

ইভেন আমি শাইখ সিরাজকে—আমি চাইছি একটা ইয়ং অ্যাডভাইজার গ্রুপ, ডাইনামিক, পরীক্ষিত কাজের লোক। চিন্তাধারা-মতাদর্শ যা-ই হোক হোসেন জিল্লুর রহমান—এগুলি এন্টায়ারলি আমি করছি। ইভেন আনিসুজ্জ হকের কথা আমি বলছিলাম।

মহিউদ্দিন : ইফতেখারুজ্জামানের কথা কি আপনি বলেছিলেন?

বারী : হ্যাঁ, ইফতেখারুজ্জামান আমার লিস্টে ছিলেন। দেবপ্রিয় বাবুও ছিলেন। নন-মুসলিম হিসেবে নাম দরকার ছিল। তারপর তপন বাবুর নাম ছিল। তারপর আরও একজন 'হিন্দু' ছিল। নামটা ভুলে গেছি। মহিলা ছিলেন একজন, সিলেটের। উনি তখন ইন্ডিয়ায় ছিলেন। ইন্ডিয়ায় আমি ফোন করছি। ফোন কইরা বলছি, আপনি চইলা আসেন তাড়াতাড়ি।

মহিউদ্দিন : এ রকম কেউ ছিল লিস্টে, আপনি চাচ্ছিলেন কিন্তু উনি রিফিউজ করেছেন?

বারী : শাইখ সিরাজ।

মহিউদ্দিন : ফাইনাল সিলেকশন তো চিফ করেছেন?

বারী : চিফই করেছেন, তবে অন্যদের সঙ্গে কনসাল্ট করে। আমরা লিস্ট দিছি।

মহিউদ্দিন : অ্যাকাডেমিক কাউকে পান নাই? ঢাকা ইউনিভার্সিটির?

বারী : একজনের নাম ছিল, জেনারেল মাসুদের ভায়রা। এই কারণেই ওনাকে আর করা হয় নাই। যেহেতু তিনি একজন সিনিয়র মিলিটারি অফিসারের আত্মীয়।

মহিউদ্দিন : ওই ক্যাবিনেটে ফখরুদ্দীন সাহেবের তো দুইজন রিলেটিভ ছিল?

বারী : কিন্তু এরা তো নিজস্ব গুণে এসেছিল। ড. ফখরুদ্দীনের আত্মীয় বলে তো বাদ দিয়া দেওয়া যায় না? ফখরুদ্দীনের নিজের আত্মীয় না, ওনার ওয়াইফের দিক দিয়া আত্মীয়।

মহিউদ্দিন : এখানে ফখরুদ্দীন সাহেবের কোনো চয়েস ছিল না?

বারী : না। ফখরুদ্দীন সাহেব তো নিজেই পিকড আপ? হি নেভার নিউ অ্যাবাউট দ্য ইমার্জেন্সি।[৩০]

বিএনপি সরকারের রেখে যাওয়া মহাপুলিশ পরিদর্শককে (আইজিপি) পরিবর্তন করে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার খোদা বখশ চৌধুরীকে পুলিশপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। এক-এগারোর পালাবদলের

অন্য রকম একটি বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে। লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ওই দিনের ঘটনাবলির একটি বর্ণনা দিয়েছেন :

> আওয়ামী লীগ নির্বাচন থেকে উইড্র করার ঘোষণা দিল। রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের সঙ্গে একটা মিটিং ছিল। বেলা একটার দিকে অফিসে ফিরলাম। বেলা দুইটার পর ডিজিএফআইয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্রিগেডিয়ার বারীর ফোন, ইমপেসেন্ট কল, 'আপনি কোথায়? তাড়াতাড়ি বঙ্গভবনে আসেন।' গেলাম বঙ্গভবনে। খোঁজ করলাম 'মহামান্য' কোথায়। রাষ্ট্রপতিকে সবাই এই সংক্ষিপ্ত নামেই সম্বোধন করত। দেখলাম জেনারেল মইনের নেতৃত্বে সবাই দরবার হলের পর বঙ্গভবনের সবচেয়ে পেছনের করিডর দিয়ে বেরিয়ে আসছে—এয়ার চিফ ফখরুল আজম, নেভির চিফ হাসান আলী খান, নবম ডিভিশনের অধিনায়ক মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, ডিজিএফআইয়ের ফজলুল বারী এবং আরও কয়েকজন।
>
> আমি জেনারেলের মুখোমুখি হয়ে সম্ভাষণ করলাম। তিনি বললেন, 'আসেন।' ফখরুল চোখের ইশারায় কী যেন বলতে চাইছেন। মইন বললেন, 'আমরা হেডকোয়ার্টার্সে যাব। একটু তাড়াতাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।' বঙ্গভবনের গাড়ি পার্কিংয়ে আসার পর দেখলাম স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) চিফ মে. জেনারেল ফাতমী রুমী আসছেন। মইন এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দশ মিনিট একান্তে কথা বললেন।
>
> ক্যান্টনমেন্ট সেনাসদরে গেলাম। একের পর এক জেনারেলরা আসছে। সন্ধ্যা হয়ে গেল। অল জেনারেলস, সিভিলিয়ান মাত্র দুজন—আমি আর র‍্যাবের মিজানুর রহমান। মইন সিচুয়েশন ব্যাখ্যা করলেন, 'জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এখানে যদি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও শান্তিশৃঙ্খলা না থাকে, শান্তিরক্ষা মিশন থেকে আমাদের সব ফোর্স ফেরত পাঠাব।' আমাকে বললেন, 'যদি আপনার পুলিশকে ফেরত পাঠায়, আপনি কী জবাব দেবেন? ক্যান ইউ অ্যাকসেপ্ট ইট? আমি কি আমার সেনাদের বোঝাতে পারব? রেনাটা লক (ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী) দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা করে এই চিঠি দিয়ে গেছে।' সংবাদটি জানাজানি হলে তা পুরো পুলিশ বিভাগের ওপর প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমি মন্তব্য করি। মইনের হাতে একটা চিঠি দেখলাম। আমার কী করার ছিল? অলরেডি রেজিম চেঞ্জ ইজ কমপ্লিট। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চিফ অ্যাডভাইজার হ্যাজ অ্যাগ্রিড টু রিজাইন। মইনের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়েছেন, এ সংবাদ জানানোর পর জেনারেল মইন নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান নিয়োগের বিষয় আলোচনায় নিয়ে আসেন। সকলে প্রায় সমস্বরে ড. ইউনূসের নাম বলে। জেনারেল মইন তখন সভাকে জানান যে ড. ইউনূস এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি তখন বিকল্প নাম প্রস্তাব করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। আমি খালেদ শামসের নাম প্রস্তাব করি। এরপরই, সম্ভবত জেনারেল মইনই ড. ফখরুদ্দীনের নাম বলে সকলের মতামত চান। তারপর আলোচনা এ প্রসঙ্গে আর এগোয়নি।

সভা শেষে আমি যখন বেরিয়ে আসি, তখন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জানতে পারি যে স্বরাষ্ট্রসচিব আমাকে খুঁজছেন। আমি তাঁর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি তখনই বঙ্গভবনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরাসরি বঙ্গভবনে যাই। সেখানে গিয়ে আমি নবম ডিভিশনের প্রধান জেনারেল মাসুদ, স্বরাষ্ট্রসচিব, সংস্থাপনসচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব, আইনসচিব এবং আইন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাবিবুল আওয়াল সাহেবকে দেখতে পাই। এ সময় সরকারের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সারা দেশে কারফিউ জারি করা এবং এ সংবাদ দ্রুত প্রচার করার বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পায়। বিশেষ ক্ষমতা আইনপ্রদত্ত এ ক্ষমতা প্রয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্রসচিব সকল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং জেলা প্রশাসককে বার্তা দিতে বলেন। আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে কারফিউ জারির পদক্ষেপ নিতে বলি। পুলিশ সদর দপ্তরের মাধ্যমে সকল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকেও এ বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা করি।

এরপর পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার একপর্যায়ে জাস্টিস কুদ্দুস চৌধুরীর পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ হবে মর্মে সকলে মনে করলেন। আমাকেই এ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। আমি জাস্টিস কুদ্দুস চৌধুরীর ছেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করি এবং আমার অনুরোধ পেয়ে তিনি বঙ্গভবনে আসতে রাজি হন। আমি মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনারকে পাঠাই চৌধুরী সাহেবকে বঙ্গভবনে নিয়ে আসার জন্য। তিনি বঙ্গভবনে এসে পরিস্থিতি জেনে পরবর্তী করণীয় প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলকে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দেন। অতীতের বিভিন্ন উদাহরণ টেনে তিনি কর্মকর্তাদের কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শও দেন। তিনি জরুরি আইন জারির পর সংবিধানের মৌলিক অধিকার চ্যাপ্টারের সকল আর্টিকেল

সাসপেন্ড করার কুফল নিয়ে বেশ কিছু উদাহরণ দেন এবং সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। তারপর বঙ্গভবন থেকে আমি পুলিশ সদর দপ্তরে ফিরে আসি, যেখানে আমার সহকর্মীরা অপেক্ষা করছিলেন।

পরদিন সকালে আমি জেনারেল মাসুদের একটি অনুরোধ পাই, আর তা হলো জাস্টিস কুদ্দুস চৌধুরীকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে গিয়ে সেনাপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার। আমি নিজে কুদ্দুস চৌধুরী সাহেবের বাসায় যাই। অনুরোধ করতেই তিনি যেতে রাজি হন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যাই। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি, তখন জেনারেল মইন ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। জাস্টিস কুদ্দুস চৌধুরীর সঙ্গে জেনারেল মইনের আলোচনার শুরুতেই চৌধুরী সাহেব সরাসরি জেনারেল সাহেবের কাছে জানতে চান, 'জেনারেল, হাউ আর ইউ গোয়িং টু গেট আউট অব ইট (এ অবস্থা থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসার চিন্তা করছেন)।' জেনারেল মইনের কাছে কোনো জবাব ছিল না। তখন জাস্টিস কুদ্দুস পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, রাষ্ট্র পরিচালনা করাসহ পরবর্তী ট্রানজিশনের পথ কী হলে দেশের জন্য ভালো হবে, তা ব্যাখ্যা করতে থাকেন। পাশাপাশি প্রশ্নটি কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা-ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি তাঁর অতীতের বিভিন্ন আলোচনা করেন। এ সভায় জেনারেল মইন ছাড়াও জেনারেল মাসুদ এবং ডিজিএফআইয়ের ব্রিগেডিয়ার আমিন এবং সম্ভবত বারীও উপস্থিত ছিল। সভা শেষে আমরা যখন বেরিয়ে আসছিলাম, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তখন জেনারেল মইনের সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

পরে জেনেছিলাম, জাতিসংঘের চিঠির বিষয়ে অন্য রকম তথ্য পেয়েছিলাম। আমি তখন আফগানিস্তানে জাতিসংঘ মিশনে সিনিয়র পুলিশ অ্যাডভাইজার। ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ছিলেন মনোজ বাসনিয়াত, নেপালি-আমেরিকান। এক-এগারোর সময় ঢাকায় ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর ছিলেন। জাতিসংঘের কথিত চিঠির প্রসঙ্গ আসতেই তিনি জানালেন, 'ইউএন হেডকোয়ার্টার্স থেকে কার্যত চিঠি পাঠানোর বিষয়টা ঠিক নয়। ইউএন থেকে এ রকম চিঠি এলে তা আমার নজরে আসতই। তবে বিষয়টা আমি শুনেছিলাম। ব্রিটিশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর ইউএস অ্যাম্বাসেডরদের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো চিঠির বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হোক, এটা তারা চায় না। বললেন, এই দুই মহিলা গণতন্ত্র এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পথে বাধা। তাদের ভাবখানা এ রকম, এদের সরিয়ে দিতে পারলেই মিল্ক অ্যান্ড হানি উইল ফ্লো।[৩১]

এক-এগারোর পালাবদলে বিমানবাহিনী বা নৌবাহিনীর কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। বিমানবাহিনীর চিফ অব স্টাফ এয়ার ভাইস মার্শাল ফখরুল আজম ছিলেন ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। সেনাপ্রধান মইন এবং তিনি পাকিস্তানের সারগোদায় একই স্কুলে পড়েছেন। ফখরুল অবশ্য সিনিয়র। তিনি ১৯৭০ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কমিশন পান। মইন ফখরুলকে যথেষ্ট সমীহ করতেন এবং ক্ষমতাধর হওয়া সত্ত্বেও ফখরুলকে 'স্যার' সম্বোধন করতেন।

লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফখরুল আজম ঘটনার আনুপূর্বিক একটি বিবরণ দিয়েছেন। এ থেকে উঠে এসেছে সেনা মনস্তত্ত্ব, পালাবদলের পরিকল্পনা এবং ঘটনাপ্রবাহের একটি খণ্ডচিত্র, যা ওই জটিল সময়টিকে বুঝতে সাহায্য করে। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ : এক-এগারোর সময় আপনি বিমানবাহিনীর চিফ ছিলেন। অন্য চিফদের সঙ্গে আপনিও বঙ্গভবনে গিয়েছিলেন। ওই সময়ের একটি বিবরণ দেবেন? কী দেখেছেন, শুনেছেন?

ফখরুল আজম : আমার ইন্টেলিজেন্সের লোকদের কাছে জানতে চাইতাম—কী হচ্ছে? দেশে তো অরাজকতা; রাস্তাঘাটে মারামারি, খুনখারাবি হচ্ছে। কী হচ্ছে, তোমরা একটু খবর-টবর নাও। ওরা তেমন কিছু জানতে পারেনি। তারা এটুকুই জানত যে আর্মির টপ লেভেলে দুইটা গ্রুপ আছে। চিফ, মাসুদ সাহেব, আমিন, বারী—এঁরা বিকেলে সেনাভবনে হাঁটেন আর গল্প করেন। কী গল্প করেন, তারা সেটা জানে না। আরেকটা গ্রুপ হলো জেনারেল জাহাঙ্গীর এবং আই কে বি—ইকবাল করিম ভূঁইয়া। ও তখন সিজিএস ছিল। এরা দুজন আবার একসঙ্গে হাঁটে। এদের মধ্যে সমন্বয় ছিল কি না, আমার ইন্টেলিজেন্সের লোক তা জানে না। তার মানে, অ্যাপারেন্টলি দুইটা গ্রুপ। দ্যাট ওয়াজ বিফোর ওয়ান-ইলেভেন।

ওয়ান-ইলেভেনের দিন সকালবেলায় যখন অফিসে গেলাম, মইন ইউ আহমেদ আমাকে রেড টেলিফোনে বলল, স্যার, আপনি আমার সঙ্গে কফি খাবেন না?

খাব। কী ব্যাপার?

আসেন না আজকে, কফি খান।

কখন আসব? ইউ টেল মি।

আমার এখানে তো ভিজিটর আসবে একজন। হাফ অ্যান আওয়ার টাইম। উনি গেলেই চলে আসেন।

কখন যাবে?

নটার দিকে যাবে।

কে আসবে?

মিসেস রেনাটা, ইউএনডিপির।

যাহোক আমি নটার পাঁচ মিনিট আগেই গেলাম।

মহিউদ্দিন : ১১ তারিখ?

ফখরুল : ১১ তারিখ সকালবেলা। গেলাম ওনার অফিসে। আমাকে রিসিভ করল। কফি-টফি আনাল। খাচ্ছি। প্রচুর গল্প হলো। বলল, স্যার, দেশের অবস্থা ভালো না। প্রতিদিনই রাস্তায় এক-দুইজন মারা যাচ্ছে। এই চিঠিটা দেখছেন? চিঠিটা হলো রেনাটার।

আসলে চিঠিটা কারেক্ট ছিল কি ইনকারেক্ট ছিল, আমার পক্ষে তখন এটা বের করা ডিফিকাল্ট ছিল। আই জাস্ট স দ্য রাইট-আপ। রাইট-আপে ছিল : বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী যদি ২২ জানুয়ারির ইলেকশন করার জন্য সরকারকে সহায়তা করে, তাহলে বিদেশে ইউএন মিশনে বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেসের যত আছে, তাদের ফেরত পাঠানো হবে। শুধু তাই না, এরপরে বাংলাদেশ থেকে আর কোনো পিসকিপিং ফোর্স ইউএনে নেওয়া হবে না। এটা আমাকে দেখাল।

মহিউদ্দিন : সাইনড বাই রেনাটা?

ফখরুল : সাইনড বাই রেনাটা।

মহিউদ্দিন : চিঠিতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছিল?

ফখরুল : এত কিছু আমি দেখিনি। কোথা থেকে এসেছে, এটাও খেয়াল করিনি। আমি শুধু মেইন জিস্টটা পড়েছি। পড়ার পর মইন বলল, 'এটা দিয়ে গেল রেনাটা'।

যেহেতু তার আগে রেনাটা এসেছিল, বুঝলাম কিছুটা কানেকশন আছে। বললাম, এটা তো তোমার আমার ব্যাপার না। এটা তো সরকার বুঝবে। সরকার বলতে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ আর প্রেজেন্ট কেয়ারটেকার গভমেন্ট। তারা বলবে।

না স্যার, চলেন যাই, প্রেসিডেন্টের কাছে যাই। এভাবে চলবে না। আমার ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলে, নাইন ডিভ, অন্যান্য ডিভিশনের জোয়ানরা, দে আর ভেরি আনহ্যাপি উইথ দিস।

এই চিঠি সম্পর্কে ওরা কেমনে জানে?

এইটা জেনে গেছে ওরা। বলে, আমরা এক বছর বাইরে থাকলে পাঁচ লাখ টাকা পাই। এটাও বন্ধ করে দিচ্ছে সরকার? জাস্ট বাই সাপোর্টিং দ্য

ইলেকশন টু বি হেল্ড? এটা যদি হয়, তাহলে তারা ক্যু করে বসবে, তারা অফিসারদের মারবে, আমাদেরকে মারবে। এটা তো হওয়া উচিত না। এখন তো দেখা যাচ্ছে, আর্মড ফোর্সেসের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। চলেন স্যার, যাই।

না, আমি প্রেসিডেন্টের কাছে যাব না। কেননা এটা আমার রেসপনসিবিলিটির বাইরে। প্রেসিডেন্ট যদি আমাকে ডাকে—'তুমি আসো', তাহলে আমি যাব। আমি কেন নিজে থেকে যাব?

ঠিক আছে, আপনাকে প্রেসিডেন্টই ডাকবে।

মানে হি হ্যাজ সো মাচ অব কনফিডেন্স যে বলতে পারে, আপনাকে প্রেসিডেন্টই ডাকবে।

তখন আমি নাশতা-টাশতা করে কুর্মিটোলায় আমার বেস কমান্ডারের অফিসে গেলাম। তখন বেলা সাড়ে দশটা-এগারোটা বাজে। যাওয়ার আধা ঘণ্টা পরেই টেলিফোন আসল, জেনারেল আমিনুল করিমের কাছ থেকে। আমিন ছিল রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব (এমএসপি)।

আমিনুল করিম বলল,

স্যার, আপনি কোথায়? মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনাকে তলব করেছেন।

শুধু আমাকে?

না, তিনজনকেই।

কী ব্যাপার? সাবজেক্ট ম্যাটার কী?

জানি না স্যার। শুধু এটুকুই জানি, আপনাদের আসতে বলেছেন।

কয়টার সময়?

একটা-দেড়টা হলেই হবে স্যার। এখন একটা সিকিউরিটির মিটিং হচ্ছে। ওটার পরপরই।

আমাদেরকে প্রেসিডেন্ট অথবা প্রাইম মিনিস্টার সরাসরি ডাকেন না। দে ডোন্ট কল। তাঁরা তাঁদের এমএসপি বা... দিয়ে ডাকেন। আমি ওখান থেকে নেভি চিফকে ফোন করলাম। সে আমার অনেক ক্লোজ ছিল। বয়সে আমার চেয়ে বড় হলেও সার্ভিসে আমার জুনিয়র।

মহিউদ্দিন : রিয়ার অ্যাডমিরাল হাসান আলী খান?

ফখরুল : হ্যাঁ। টেলিফোন করলাম—হাসান আলী খান, তুমি কি কোনো ফোন পেয়েছ?

হ্যাঁ সার, আমাকে তো ডেকেছে। আপনাকেও ডেকেছে?

হ্যাঁ, ডেকেছে।

কী ব্যাপার স্যার?

আমি তো কিছু জানি না।

চলেন স্যার, আমি আর আপনি একসঙ্গে যাই। রাস্তায় তো অনেক গন্ডগোল?

আমার সামনে তো কনভয় থাকে, পেছনেও থাকে, উইথ আর্মস। ওরও থাকে। আমাদের দুই কনভয় একই টাইমে, বিটুইন ওয়ান অ্যান্ড টু—গেলাম। আমিনুল করিম রিসিভ করল আমাদের। বলল, স্যার আপনারা এখানে বসবেন না। এখানে তো মিটিং হচ্ছে। আপনারা প্রেসিডেন্টের ড্রয়িংরুম আছে পেছনের দিকে, ওখানে বসেন। ওখানে যেতে যেতে দেখি মইন অলরেডি পৌঁছে গেছে। মইন, বারী, জাহাঙ্গীর।

মহিউদ্দিন : জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী তখন পিএসও...

ফখরুল : পিএসও টু আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন (এএফডি)। সিচুয়েশনটা একটু অস্বাভাবিক লাগছে। আমরা বঙ্গভবনের ভেতরে কখনো কোনো সোলজার বা আর্মড ফোর্সের লোককে পিস্তল নিয়ে থাকতে দেখিনি। দেখি যে ওদের দু-তিনজন...। আমার চোখে লাগল। জানি না কী হচ্ছে।

ভেতরে ঢুকলাম। পেছনে বসলাম। পাঁচজন বসে আছি। কিছুক্ষণ পর প্রেসিডেন্ট আসলেন। ওই মিটিং থেকে উঠে এসেছেন। বললেন, কী ব্যাপার? মইন ইউ আহমেদ বললেন, স্যার, আমরা এসেছি, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। সবকিছুই তো ডাউন দ্য লেন। পলিটিক্যাল পিপল হ্যাজ গন, জুডিশিয়ারি হ্যাজ গন। আর্মড ফোর্সেসের অবস্থাও তো খারাপ হচ্ছে। এই দেখেন চিঠি।

হ্যাঁ, এটা তো খুব খারাপ।

ওরা তো স্যার ক্যু-টু করে বসতে পারে। ক্যু তো শুধু না। তারা তো অফিসার মারবে। আপনি কি তা চান? যদি না চান, তাহলে আপনি এখনই ইমার্জেন্সি দিয়ে দিন।

প্রেসিডেন্ট আমাকে একটু রেসপেক্ট দিতেন। তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলেন তো, কী?

মহিউদ্দিন : আমিনুল করিম ছিলেন না?

ফখরুল : না, আমিনুল করিম অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। ওর অফিসে অনেক কাণ্ডকারখানা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ অবস্থায় কী করা যায়? ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, আমি তখন ওনাকে বললাম, স্যার তিনটা জিনিস করতে পারেন আপনি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকেই।

ফার্স্ট হলো, ওনলি টু লিডারস, ওনাদের দুজনকে ডাকেন। ডেকে নিয়ে

বসেন। দরকার হলে আমাদেরকে পেছনে রাখেন। দুজনকে বলেন—যা হবার হয়েছে, আপনারা দুজনে সিদ্ধান্ত নেন, কোন তারিখে আপনারা ইলেকশন করবেন। দুজনে মিলে যদি একটা ডিসিশনে আসেন, তাহলে এখনই আমরা মিডিয়াকে ডাকব। অবরোধ-টবরোধ সব উঠে যাবে। তাহলে অন্য কোনো অ্যাকশন নিতে হবে না। যদি না মানে তাহলে বলবেন, ইমার্জেন্সি দেব।

দ্বিতীয় হলো, আপনি সেটআপ করেন, তিন মাস বা চার মাস পর ইলেকশন দেবেন। সেটা হলে এই অবরোধ, ঝগড়াঝাঁটি চলতেই থাকবে।

আর থার্ড হলো, আপনি আর্মি আর পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে-টিটিয়ে ২২ জানুয়ারি ইলেকশন করাবেন। তাতে অনেক মানুষ মারা যাবে। কত হাজার ইলেকশন সেন্টার আছে? প্রতি সেন্টারে যদি দুজন করে মারা যায় মারামারিতে, তাহলে কত হাজার মানুষ মারা যাবে? এখন আপনার ডিসিশন।

তখন উনি বললেন, তাহলে আমি আমার কলিগদের সঙ্গে বসে একটু আলাপ-আলোচনা করে ডিসিশন দিচ্ছি।

মইন ইউ আহমেদ দাঁড়ায়া গেল। 'না, আপনার কলিগদের এখানে কিছু করার নাই। ডিসিশন ইজ ইয়োরস। ডিসিশন আপনি নেবেন, অথবা নেবেন না। আর আপনি যদি না নেন, তাহলে আমি মাসুদকে ডাকতেছি।' স্ট্রেট ওয়ে হি ওয়েন্ট টু দ্য মোবাইল (ফোন)। হি র‍্যাংগড আপ। আই ডোন্ট নো, হোয়েদার হি র‍্যাংগড আপ মাসুদ। ফোন টিপে, 'মাসুদ, তুমি ট্যাংক নিয়া চলে আসো।' মানে নাইন ডিভিশন থেকে।

মহিউদ্দিন : সাভার থেকে?

ফখরুল : সাভার থেকে। তার চার-পাঁচ মিনিট পরেই মাসুদ ভেতরে ঢুকল। কেমন করে এত অল্প সময়ে ট্যাংক নিয়ে সাভার থেকে আসল?

যখন মইন বলছিল, মাসুদ ট্যাংক নিয়া আসো, তখন আই ওয়াজ লুকিং অ্যাট জাহাঙ্গীর, ট্রাইং টু সি হোয়াট ইজ হিজ রিঅ্যাকশন। সে বলল, 'এইটা কী করতেছ? এইটা কী করতেছ?' ওরা দুজন তো কোর্সমেট।

আমি আর হাসান আলী খান বললাম, 'হোয়াই আর ইউ কলিং ট্যাংকস?'

মইন ওয়াজ রেস্টলেস। সে এসে আমার আর প্রেসিডেন্টের মাঝে বসল। প্রেসিডেন্ট বললেন, তাহলে আর্মড ফোর্সেস বাঁচাতে হলে তো ইমার্জেন্সি দিতে হবে। তাহলে প্রেস সেক্রেটারিকে ডাকি?



নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি জেনারেল
মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী

উনি বলেন প্রেস সেক্রেটারি। কিন্তু প্রেস সেক্রেটারি বলে—আমি মিনিস্টার।

মহিউদ্দিন : মোখলেসুর রহমান চৌধুরী।

ফখরুল : হ্যাঁ। আই নিউ হিম পারসোনালি। বারী ব্রিফকেস খুলছে। 'না স্যার, আমাদের করা আছে অলরেডি। এগুলা লেখা আছে সব। আপনি সাইন করেন।'

তার মানে দে অয়ার অল প্রিপেয়ার্ড। যেটা আমি জানতাম না, নেভি চিফও জানত না। আমার মনে হয়, জাহাঙ্গীরও জানত না। বলে, এইটা কেমন করে হয়?

না স্যার, এইটা কেমন করে হয়—ওই জিনিসটাও লেখা আছে আমাদের কাছে।

মাসুদ এসে আমার পাশে বসল। বললাম, 'কী খবর?' মাসুদ আমাকে বলল, 'ওখানে প্রেস সেক্রেটারি, স্টুপিড চ্যাপ'—এতটুকুই বলল।

তারপর উনি কাগজে সাইন করলেন। বারী ওয়াজ দেয়ার, বিকজ ডিজি-ডিজিএফআই ইংল্যান্ডে গিয়েছিল। যখন আমরা ওখান থেকে বের হলাম, তখন শুনি যে, কে একজন বলছে, প্রেস সেক্রেটারিকে ওখানে

পিটাইছে, পিটায়া নাকি তাকে গাড়ি দিয়ে কোথায় জানি নামায়া দিছে, উত্তরা না কোথায়—যা ব্যাটা!' সামথিং অব দ্যাট... ।

মাসুদ-টাসুদদের কাছে পিস্তল-টিস্তল সবই ছিল। বের হয়ে যখন মেইন করিডরে আসতেছি, যারা সিকিউরিটি নিয়ে মিটিং করছিল, তারা ওখানে সব দাঁড়িয়ে আছে। একটা অ্যাবনরমাল ফিলিং সবার মধ্যে, শুধু আমরা ছাড়া। কিন্তু ওনলি উই নো হোয়াট হ্যাপেনড।

তখন মইন আমাকে বলল, স্যার, 'আমরা আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে যাই। ওখানে ডিসাইড করি কী করব, আজ রাতে এবং কালকে।' তখন ডিজি-এসএসএফ বঙ্গভবনে আসছে। ডিজি-এসএসএফ ছিল জেনারেল ফাতমি রুমী। সে ঢুকে বলে, 'আমি তো কিছু জানি না?'

আমার মনে হয়, আমরা যাওয়ার আগেই বঙ্গভবন ওয়াজ টেকেন ওভার। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে আসলাম। আই ওয়াজ নট ফিলিং কমফোর্টেবল ইন দ্য সেন্স যে, দে অয়ার নট ট্রাস্টিং মি অ্যান্ড হাসান আলী খান, এয়ারফোর্স আর নেভি।

বেগম খালেদা জিয়ার টেনিউরের সময় থেকে ব্রিগেডিয়ার আবু সোহেল ছিল কমান্ড্যান্ট-পিজিআর। তাকে বলা হলো, 'ইউ আর আন্ডার সার্ভিল্যান্স।' মানে, ইউ আর আন্ডার কভার। 'তুমি কোথাও যাবা না। তোমার পোস্ট—আউট অব পিজিআর।' ডিজি-এসএসএফকেও তা-ই বলল। সন্ধ্যার পর শুনলাম যে, রাত্রে ডিজি-ডিজিএফআই রুমী আসতেছে বিদেশ থেকে। মইন বলল, উই শুড বি কেয়ারফুল। উই শুড টেক আওয়ার স্টক, দেখতে হবে যে কী আছে কী নাই। কোথাও যদি কোনো গন্ডগোল হয়, প্লিজ ট্যাকল ইট। বলেই চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটা। দেন আই কলড মাই পিপল। ততক্ষণে তো অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে। আমার সিনিয়র অফিসারদের আমার বাসায়—এয়ারহাউসে ডেকে নিয়ে বললাম, উই আর ওনলি টু লুক আফটার আওয়ার এয়ারফোর্স। কাউকে কোথাও পোক কোরো না। আননেসেসারি মারামারি, ঝগড়াঝাঁটি যেন না হয়। কিপ কোয়ায়েট, লিসেন অ্যান্ড হোয়াটএভার ইনস্ট্রাকশন ইজ গিভেন, ফলো দ্যাট। সবাই চলে গেল। তখন মইন ইউ আহমেদ টেলিফোন করল। 'স্যার, আপনি তো চিটাগাংয়ের মানুষ। তো আপনি ড. ইউনূসকে একটু টেলিফোন করেন। হি শুড বিকাম দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অব দ্য কেয়ারটেকার গভমেন্ট।'

আমি কীভাবে বলব? আই ডোন্ট নো হিম। আই নিউ হিম যে, হি ইজ

নোবেল লরিয়েট। সবকিছু জানি ওনার সম্বন্ধে। তবে কখনো আলাপ হয়নি।

না স্যার, আপনি চিটাগাংয়ের মানুষ। একটু-আধটু চাঁটগাইয়া কথা বললেই উনি খুশি হবেন।

সো আই গেভ হিম আ কল, আটটা-সাড়ে আটটার দিকে। ওনার মেয়ে ধরছে। টেলিফোন ধরে বলে যে, সরি, উনি তো মিটিংয়ে আছেন।

ওনাকে কি একটু বলা যায় যে, আই উড লাইক টু টক, বিমানবাহিনীপ্রধান?

আমি জানাব। আপনার নাম্বার দেন। আই উইল কল ইউ ব্যাক।

আমার নাম্বার নিল। কিন্তু কল আর আসল না। আমি আবার কল দিলাম। বললাম, ওনাকে কি জানানো হয়েছে?

উনি মিটিংয়ে আছেন। আপনি বারোটা-সাড়ে বারোটার দিকে কল করেন।

আমি সাড়ে বারোটা-একটার দিকে ফোন করলাম। তখন উনি ফোন তুললেন। কয়েকটা কথা বলল। আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগল কথাগুলো। উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন, আই ডোন্ট নো। বাট ভেরি ইন্টারেস্টিং টক। উনি বললেন, হাউ আর ইউ চিফ? এই সব বলে-টলে, 'আই নো ইউ গেইভ কল অ্যাট এইট-থার্টি। আই ওয়াজ ভেরি বিজি। সরি, আই কুড নট টক টু ইউ। আই হ্যাভ টু জেনারেলস সিটিং হিয়ার হোয়াট ইউ আর ট্রায়িং টু টেল।'

আমি বললাম, স্যার, দ্য হোল কান্ট্রি ইজ লুকিং অ্যাট ইউ। ইউ আর দ্য ওয়ান হু ক্যান গাইড আস টু দ্য রাইট...। হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম অ্যান্ড টেকওভার অ্যাজ চিফ অ্যাডভাইজার?

থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার দ্বারা এটা হবে না। আই অ্যাম নট ক্যাপেবল।

স্যার, ইউ আর ক্যাপেবল। ইউ আর দ্য রাইট পারসন।

মানেটা কী, বুঝতে পারলাম না। ওই কথা বলার পর ওনার সঙ্গে শেষ। রাত দেড়টা-দুইটার দিকে মইনকে ফোন করলাম।

মইন, হবে না। হি ইজ রিগ্রেটিং টু টেকওভার অ্যাজ চিফ অ্যাডভাইজার।

বাদ দেন স্যার। উই হ্যাভ অলরেডি সিলেক্টেড। আপনি চেনেন নাকি? ফখরুদ্দীন আহমদকে?

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন যিনি? চিনি না ও রকম। জানি আদারওয়াইজ।

ওনাকে ডাকছি। সকাল নটার সময় আপনিও আসেন।

কোথায় আসব?

প্রাইম মিনিস্টারের অফিসে। আমি অন্যদেরকে বলেছি। আপনি আসবেন।

ওয়ান-ইলেভেন চলে গেল। পরদিন সকাল নটায় ওই মিটিংয়ে গেলাম। মিটিংয়ে আমরা তিন চিফ, ডিজি-ডিজিএফআই রুমী, মাসুদ, বারী—এরা ছিল। আমিন ছিল না। তখন হঠাৎ দেখি, ফখরুদ্দীন সাহেব আসলেন। সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। বললেন, জেনারেল মইন হ্যাজ সাজেস্টেড মি টু টেকওভার অ্যাজ চিফ এক্সেকিউটিভ। বাট আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি, আই ডু নট লাইক টু টেকওভার অ্যাজ চিফ এক্সেকিউটিভ, ইফ ইট ইজ ফর টু মান্থস-থ্রি মান্থস। যেটা অনেকে বলাবলি করছে, তিন মাসের মধ্যে ইলেকশন দিতে হবে। আমি তিন মাসের জন্য হতে।

তখন মাসুদ আর মইন বলল, না না না, তিন মাস না, দুই বছর।

আই ওয়াজ সো টেকেন অ্যাব্যাক! আমি তো জীবনেও চিন্তা করতে পারি নাই যে এভাবে দুই বছর, তিন বছর, পাঁচ বছর...! বাট আই ওয়াজ থিংকিং, ইট ওয়াজ আ গুড মুভ অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, বিকজ দেশে একটা অরাজকতা চলছিল। তখনই যদি একটা ইলেকশন দিয়ে দিত... আইডি কার্ড বানাতে কয় মাস লাগবে? বলল ছয় মাস। আমি বললাম, আইডি কার্ড বানালেই ইলেকশন দিয়ে দাও। মইনকে ওখানে বসেই বললাম।

বলল, দেখা যাবে। আপনি দুই বছর—চিন্তা করবেন না।

এটা বলার পর আমি বললাম, তাহলে আমি এর মধ্যে নেই। অকারণে ঝামেলায় পড়ব। উনি বলছেন, দুই বছর থাকবেন। তারপর বলবেন চার বছর থাকবেন। তারপর একটা পলিটিকাল পার্টি বানাবেন। তারপর দশ বছর থাকবেন। মনে মনে চিন্তা করতেছি, হোয়াট ইজ দিস?

তখন বলল যে উই হ্যাভ টু সিলেক্ট পিপল ফর কেয়ারটেকার গভমেন্ট। মইন বলল, 'আমরা ডিজিএফআইকে বলব শর্টলিস্ট করার জন্য। তারপর উই উইল ডিসাইড।'

ফখরুদ্দীন সাহেব বললেন যে 'আমারও একজন-দুইজন আছে', মানে ওনার ক্যান্ডিডেড।

আমি আর হাসান আলী খান শুধু শুনলাম।

মহিউদ্দিন : ওনার দুজন আত্মীয় ছিল।

ফখরুল : হ্যাঁ, মইন বলল, 'আপনার ক্যান্ডিডেডদের নাম দেন। আমরা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করব।' তারপর আমি আর হাসান আলী

খান চলে আসলাম। ওরা মিটিং করতে থাকল।[৩২]

২০১০ সালের ১৮ এপ্রিল ঢাকায় *দ্য ডেইলি স্টার*-এ ছাপা হওয়া এক সাক্ষাৎকারে রেনাটা লক ডেসালিয়ান জাতিসংঘের কথিত চিঠির বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জাতিসংঘ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কখনোই হস্তক্ষেপ করেনি। জাতিসংঘ চেয়েছিল একটি অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হোক। ২২ জানুয়ারির প্রস্তাবিত নির্বাচনে সেনাবাহিনী ভূমিকা রাখলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তারা চাকরি হারাবে—জেনারেল মইনের এ কথা কখনোই আলোচিত হয়নি বলে রেনাটা লক দাবি করেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব বা কোনো কর্মকর্তা যদি কোনো বিবৃতি দেন, ওই বিবৃতি গণমাধ্যমে প্রচারের আগে তার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সরকারকে পাঠানো একটি আন্তর্জাতিক রেওয়াজ। তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব রাস্তাঘাটে চলমান সহিংসতার ব্যাপারে একাধিকবার উদ্বেগ জানিয়েছিলেন এবং তিনি বড় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে দেখা করে সংঘাত কমিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় আসতে বলেছিলেন।[৩৩]

জেনারেল মইন ও ব্রিগেডিয়ার বারীর সাক্ষাৎকারে উভয়েই—তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে সেনাবাহিনীর প্রস্তাবে ড. ইউনূস কেন রাজি হননি—এ বিষয়ে অভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেছেন যে কেয়ারটেকার সরকার স্বল্প মেয়াদে সীমাবদ্ধ থাকায় ড. ইউনূস তাঁর দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা জানান। এ জন্য তাঁদের ড. ফখরুদ্দীনকে বেছে নিতে হয়েছিল।

সেনাবাহিনীর প্রস্তাবে ড. ইউনূস কেন রাজি হননি, এ বিষয়ে তাঁরা যে কারণের উল্লেখ করেছেন তা 'একেবারেই কল্পনাপ্রসূত' বলে মন্তব্য করেছেন স্বয়ং ড. ইউনূস। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কেয়ারটেকার সরকার গঠনের আগে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছিল, তা উঠে এসেছে তাঁর (ইউনূসের) ভাষ্যে :

> শুরু করছি জানুয়ারি ১০, ২০০৭ দিয়ে। ওই দিন বিকেল ৫.৩০টা নাগাদ আমি সেনাপ্রধানের নিকট থেকে একটি টেলিফোন পাই। আমি সে সময়ে আমার অফিসে গ্রামীণ ব্যাংকের দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করছিলাম। সেনাপ্রধানের সঙ্গে আমার কোনো পূর্বপরিচয় ছিল না। তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন। তিনি বললেন, দেশকে এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে রক্ষা করতে দেশ পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনী একটি নতুন কেয়ারটেকার সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাঁরা আমাকে এই সরকারের প্রধান করতে চান। এ বিষয়ে

প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলো সম্পন্ন করার জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। আমি তাঁর সদয় প্রস্তাবের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, তবে একই সঙ্গে এ কথা বলি যে তাঁরা এ জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিলে ভালো করবেন, কেননা আমি এ প্রস্তাবে সম্মত নই। বোধ হয় তিনি এমন একটি জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, এমনটি আশা করছিলেন যে আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাব। তিনি তাঁর প্রস্তাবটা আবারও ঘুরিয়ে করলেন; সম্ভবত এমনটা ভেবে যে আমি বোধ হয় তাঁর প্রস্তাবটি বুঝতে পারিনি। আমি আবারও প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলাম এবং বললাম যে তাঁরা তাঁদের দ্বিতীয় পছন্দের ব্যক্তিকে নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। তিনি বললেন যে তাঁদের কোনো দ্বিতীয় পছন্দের ব্যক্তি নেই এবং তাঁদের পুরো পরিকল্পনাটিই আমাকে সরকারপ্রধান হিসেবে নিয়ে তৈরি করা। আমি তাঁকে নিরাশ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম, তবে এটা সুস্পষ্ট করলাম যে কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান হওয়ার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। তিনি বোধ হয় বুঝতে পারলেন যে আমার মত পরিবর্তন করানোটা সহজ হবে না; তাই তিনি বললেন যে তিনি পুরো বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর সহকর্মীদের আমার কাছে পাঠাবেন। আমি বললাম যে আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বললে খুশি হব, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হবে না।

আমাদের কথাবার্তা সেখানেই শেষ হলো। এটা বুঝে উঠতে আমার কয়েক মিনিট লেগে গেল যে সেনাবাহিনীর প্রধান সত্যি সত্যি আমাকে ফোন করে দেশের সরকারপ্রধান হতে প্রস্তাব দিচ্ছেন!

ঘটনার আকস্মিকতা ও তাৎক্ষণিক হতবিহ্বলতা কাটিয়ে আমি আমার সহকর্মীদের কাছে, যাঁরা পুরো আলোচনার সময়ে আমার সামনেই বসে ছিলেন এবং আমার পুরো ফোনালাপ শুনছিলেন, বিষয়টা বললাম। সেনাপ্রধান আমাকে কী বলেছেন, তা আমি পুরোটা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলাম। তাঁরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে আমি এমন একটা প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছি, যা কিনা অন্য যে কেউ হলে তাৎক্ষণিকভাবে লুফে নিত। আমি আমার সহকর্মীদের বললাম যে আমি একেবারে সঠিক কাজটিই করেছি। কিন্তু তাঁরা আমার জবাবে খুবই বিস্মিত ও হতাশ হলেন।

কিছুক্ষণ পর আমি আরেকটি টেলিফোন পেলাম। আমি তখনো অফিসে। জেনারেল মাসুদ বললেন যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাসায় আসতে চান। যেহেতু সাক্ষাৎ করতে 'না' করার কোনো

উপায় ছিল না, আমি তাঁকে আটটায় আসতে বললাম। জেনারেল মাসুদ ব্রিগেডিয়ার আমিন ও পাঁচ-ছয়জন জওয়ানসহ গ্রামীণ ব্যাংক কমপ্লেক্সে আমার বাসভবনে এলেন। আমি তাঁদের স্বাগত জানালাম এবং একটি ছোট কক্ষে নিয়ে গেলাম। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁদের আসার উদ্দেশ্য জানালেন। আমি আমার অপারগতার কথা যতবারই বলতে থাকলাম তাঁরাও তত বেশি বিনয়ী ও নাছোড়বান্দা হতে থাকলেন। তাঁরা তাঁদের পুরো পরিকল্পনা আমার কাছে তুলে ধরলেন। মত পাল্টাতে পারি, এমন কোনো ধারণার যাতে সৃষ্টি না হয়, সেটা বজায় রেখে তাঁরা কীভাবে তাঁদের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে চান, তা বোঝার জন্য আমি বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকলাম। আমি আশা করছিলাম, তাঁরা একবার যদি বুঝে যান যে আমি আমার মত পরিবর্তন করব না, তাহলে তাঁরা চলে যাবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। তাঁরা বললেন যে তাঁদের আসার উদ্দেশ্যই হলো আমাকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করা এবং তাঁদের প্রস্তাবে গ্রহণ করে তাঁদেরকে সহায়তা করতে আমাকে রাজি করানো। তাঁরা সংশ্লিষ্ট সব বিষয় এবং এগুলোর সমাধানে তাঁদের পরিকল্পনাগুলো আমাকে জানান। আমি বারবার বলতে থাকি যে আমি তাঁদের যুক্তিগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কিন্তু তাঁদেরকে আমাকে ছাড়াই অগ্রসর হতে হবে। তাঁরা অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করলেন, সেনাবাহিনীর পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট এই নতুন উদ্যোগের নেতৃত্ব দিতে আমার রাজি হতে বাধা কোথায়। তাঁরা বললেন যে সরকারের বাইরে থেকে দরিদ্র মানুষদের জন্য আমি যা করতে চাইছি, তা বাস্তবায়নে এটা বরং আমার জন্য একটা চমৎকার সুযোগ; আমি একবার রাজি হলে সরকারের বিশাল ক্ষমতা ব্যবহার করে এই লক্ষ্যে আমি সবকিছুই করতে পারব।

আমার পক্ষ থেকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে 'আপনাদের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার গুরুত্ব আপনারা ভালোভাবেই আমার কাছে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আমি তো রাজি হতে পারছি না।' আমি আরও বলি যে আমার জন্য তাঁদের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কেননা দেশে অনেক যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ লোক আছেন—যাঁরা হয়তো তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে খুশি হবেন। তাঁরা আমার কাছে এমন কয়েকজনের নাম জানতে চান। আমি আমার কিছু বন্ধু এবং পরিচিত কয়েকজনের নাম বলি। এর মধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. ফখরুদ্দীনের নামও ছিল।

তাঁরা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আমার মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। শেষমেশ তাঁরা এই বলে উঠে পড়েন যে 'আমরা সকালে আবার আসব।

প্লিজ, আমরা যা আলোচনা করলাম, তা সর্বদিক থেকে ভালোভাবে ভেবে দেখুন এবং আপনার সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করুন। আশা করি কাল সকালে আপনার কাছ থেকে আমরা একটা সুসংবাদ পাব।' আমি বললাম যে আমি নিশ্চয়ই বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবব, কিন্তু তাঁদের আর সময় নষ্ট করে আসার প্রয়োজন নেই। কেননা আমার জবাব একই হবে। তাঁরা বরং তাঁদের পরবর্তী পছন্দকে নিয়ে অগ্রসর হলেই ভালো করবেন।

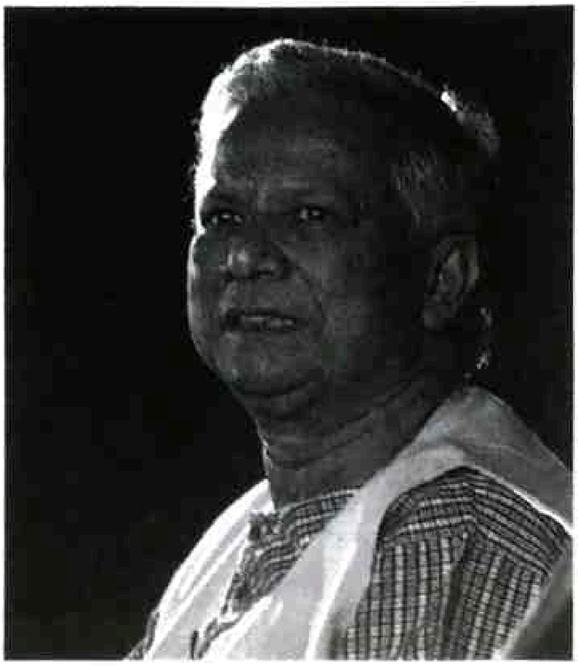
তাঁরা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খুব বিমর্ষ চিত্তে বিদায় নিলেন।

পরদিন ১১ জানুয়ারি আমি যথারীতি অফিসে যাই। আমি খুশি ছিলাম যে তাঁরা সকালে আর আমাকে ফোন করেননি। সকাল প্রায় ১০টার দিকে আমার সহকর্মীরা আমাকে উত্তেজিতভাবে জানান যে তাঁরা এইমাত্র শুনতে পেয়েছেন যে আমার বন্ধু ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নতুন কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন। আমি স্বস্তি পেলাম।[৩৪]

ড. ইউনূসের ভাষ্যে তারিখ-বিভ্রাট আছে। জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল ১১ জানুয়ারি এবং তারপরই ড. ইউনূসের সঙ্গে সেনাপ্রধানের যোগাযোগ হয়। ড. ফখরুদ্দীন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ১২ জানুয়ারি, ১১ জানুয়ারি নয়। ড. ইউনূসের এই তারিখ-বিভ্রাটের বিষয়টি জেনারেল মইনও নিশ্চিত করেছেন। মইন লেখককে বলেছেন, ড. ইউনূসের সঙ্গে ফোনে তাঁর কথা হয় ১১ তারিখ রাত দশটা-এগারোটার দিকে।

জেনারেল মইনের ভাষ্যে মনে হয় অধ্যাপক ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার বারীর ভাষ্যমতে, তাঁর লোকেরা অনেক দিন থেকেই সম্ভব্য উপদেষ্টাদের নামের তালিকা তৈরি করছিলেন। ইউনূস ছিলেন তাঁদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে। এ জন্য জরুরি অবস্থা জারির পর প্রথমেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তাঁকে রাজি করানো যায়নি।

১১ জানুয়ারি সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে সরকারের সূচনা হলো, তা কি কোনো সুচিহ্নিত পূর্বপরিকল্পনার ফসল, নাকি চলমান কোনো ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল? সামরিক বাহিনী যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত থাকত, তবে ডিজিএফআই প্রধানের, এই পরিবর্তনের সময় দেশে উপস্থিত না থাকার ব্যাখ্যা কী? পরবর্তীকালে দেখা গেছে, ডিজিএফআইয়ের দুজন ব্রিগেডিয়ার সেনা অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে এই সরকারের কাজ দেখাশোনার দায়িত্বে ভয়ানক রকম প্রভাব রাখছিলেন। অর্থাৎ



অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস

এই গোয়েন্দা বিভাগটি সামরিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। যদি এ তত্ত্ব সঠিক হয়, তবে এর প্রধান কেন মাহেন্দ্রক্ষণে অনুপস্থিত? এটা সামরিক অভ্যুত্থানের কোনো প্রকার তত্ত্বের সঙ্গে মিলবে না।

এনএসআই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স) নামক জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাটি একটি বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকারান্তরে পুরো অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ ছিল সামরিক বাহিনীর হাতে। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণের সব পদ্ধতিও সংগত কারণে সামরিক বাহিনীর অনুসৃত পদ্ধতি। এই পরিবর্তনের সময় প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ছিলেন মে. জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে দেখা যায় যে তিনি না ছিলেন এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, না এর সম্পর্কে ছিল তাঁর কোনো পূর্ব তথ্য বা সন্দেহ। যদি তিনি বা তাঁর সংস্থা এ বিষয়টির ওপর কোনো তথ্য পেতেন, তবে তিনি তো নিজেকে প্রথমে ঝুঁকিমুক্ত করতেন। এই পরিবর্তনের পর প্রথম যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হয়, তা হলো তাঁকে কর্মচ্যুত করা। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তথ্যটি জানিয়েছেন পুলিশের তৎকালীন মহাপরিদর্শক খোদা বখশ চৌধুরী।[৩৫]

পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা কার্যক্রমের দায়িত্ব বিশেষ শাখার (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ওপর ন্যস্ত। যেকোনো গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারীরা অথবা সুবিধাভোগীরা প্রতিষ্ঠানটিকে

যে দায়িত্ব দেয় বা টাস্কিং করে, তার ওপর। বিশেষ শাখা কখনো তেমন কোনো দায়িত্ব পায় না, যা তাদেরকে বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্দীপনা জোগাবে। রুটিন কাজকর্ম করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিনের গুরুত্বহীন অবস্থানের ফলে তথ্যভান্ডার গড়ার কাজে পিছিয়ে পড়ে। তারপরও এ প্রতিষ্ঠাটি সে সময়ের এ পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো প্রকার আগাম সংবাদ পায়নি বলে জানিয়েছেন খোদা বখশ চৌধুরী।[৩৬]

এক-এগারোর পরিবর্তনের জন্য যে জেনারেলকে সবচেয়ে বেশি নেতৃস্থানীয় বলে কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য এবং অধিকাংশ গুজব কৃতিত্ব দেয়, তিনি (জেনারেল মাসুদ) সেদিন সন্ধ্যার পর কারফিউ জারির বিষয়টি নিয়ে বঙ্গভবনে আলোচনা করার সময় বোঝা যাচ্ছিল যে পূর্বপ্রস্তুতির ঘাটতি ছিল। এখানে মনে রাখতে হবে, সামরিক বাহিনীর অফিসাররা কোনো অপারেশন পরিচালনা করলে সেই কাজের বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং সে পরিকল্পনায় আগপাছ সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে পরবর্তীকালে কী কী করা প্রয়োজন, তা স্থির না করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে, এমন সরল চিন্তা করা বাস্তবসম্মত নয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিচারপতি কুদ্দুস চৌধুরীর প্রশ্নের (জেনারেল এই পরিস্থিতি থেকে বের হবেন কীভাবে?) কোনো স্পষ্ট জবাব সেনাপ্রধান পরদিন সকালেও দিতে পারেননি। পাশাপাশি সেনাসদরে ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় ইউএনডিপির রেনাটার তথাকথিত পত্রটিই ছিল হস্তক্ষেপের পক্ষে একমাত্র প্রকাশিত সূত্র।

রাষ্ট্রপতির তথ্য উপদেষ্টা মোখলেসুর রহমান এক-এগারোর পালাবদলের পরপরই চাকরি হারিয়েছিলেন। বঙ্গভবনের অনেক ঘটনার সাক্ষী তিনি। তিনি বিএনপির অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। এক-এগারো নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য একটু ভিন্ন ধরনের। নিউইয়র্কের প্রবাসীবার্তা ডটকমের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মতিউর রহমান লিটুকে টেলিফোনে ২০ অক্টোবর ২০০৯ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'মইন প্রতারক, সংবিধান ও গণতন্ত্রবিরোধী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও মিথ্যাবাদী।'[৩৭]

মোখলেসুর রহমানের দাবি, মইন ২০০৬ সালের ২৯ অক্টোবর বিএনপি সরকারের বিদায়ের আগে এক ঘণ্টার নোটিশে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হওয়ার পর থেকেই মইন রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য মার্শাল ল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং মইনের এই উদ্যোগ মোখলেস রুখে দিয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটিনেসের সঙ্গে বঙ্গভবন ও তাঁর বাসা

হাবিব ভিলায় মোখলেসের একাধিক বৈঠক হয়েছিল। মোখলেসের দাবি, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, চৌধুরী ফজলুল বারীসহ অনেক জেনারেল মইনের 'রাষ্ট্রপতি হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টার কথা' জানেন। সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন :

> আমি যখন জেনারেল মইনের রাষ্ট্রপতি হওয়ার বিষয়টি অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিকে বোঝাতে পারিনি, তখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটিনেস, যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচার এবং আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল নিকোলাস বার্নসসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করে জেনারেল মইনের রাষ্ট্রপতি হওয়ার খায়েশ বিনষ্ট করে দিয়েছিলাম। আমি বঙ্গভবনে থাকাকালীন জেনারেল মইনের রাষ্ট্রপতিকে কন্ট্রোল করতে সমস্যা হতো বলে তারা আমাকে সরিয়ে দেয়... ।[৩৮]

তবে ক্ষমতা নিয়ে জেনারেলরা স্বস্তিতে ছিলেন বলে মনে হয় না। জনমনে এর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তা নিয়ে তাঁদের দুর্ভাবনা ছিল। সে জন্য তাঁরা গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবরের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা চালান।

সরকারের তথ্য অধিদপ্তর ১১ জানুয়ারি রাত নয়টায় *প্রথম আলো* কার্যালয়ে টেলিফোন করে রাজনৈতিক সংবাদসহ সরকারের সমালোচনামূলক কোনো সংবাদ প্রকাশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। 'তথ্য ও সংবাদ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য নয়' শিরোনামে ১২ জানুয়ারি *প্রথম আলোর* প্রথম পাতায় সম্পাদক মতিউর রহমানের এক মন্তব্য প্রতিবেদনে বলা হয় :

> ... জরুরি অবস্থা ঘোষণায় শুরুতেই সরকারের তথ্য অধিদপ্তর যেভাবে লেখালেখি না করার জন্য প্রেস অ্যাডভাইস দিয়েছে, তা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।...এ রকম প্রেস অ্যাডভাইস আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা অতীতের মতো সামরিক শাসনের সময়ের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।...এটা দেশের ভেতরে ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ভুল বার্তা পাঠাবে।[৩৯]

টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর সংবাদ প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে জনমনে তৈরি হলো কৌতূহল, উত্তেজনা ও আতঙ্ক। সবার মনে জিজ্ঞাসা—কী হয়েছে? কী হবে? ওই সময়ের একটি বিবরণ পাওয়া যায় সাংবাদিক মনজরুল আহসান বুলবুলের সাক্ষাৎকার থেকে। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা ছিল এ রকম :

> মনজুরুল আহসান বুলবুল : হঠাৎ করেই টেলিভিশন নিউজ ব্ল্যাকআউট হয়ে

গেল। তখন আমি এটিএন-এ হেড অব নিউজ।

মার্শাল লর সময় কাজ করেছে এমন লোকদের মধ্যে এটিএন-এ সাইফুল বারী সাহেব আর আমি সিনিয়র। বারী ভাই আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র। আমি তার পরের জেনারেশন। তখন কারফিউ হচ্ছে, কারফিউ পাস লাগবে, এসব করছি। হঠাৎ দুপুরবেলায় বারী ভাই ডেকে বললেন, একটা ইনফরমেশন এসেছে, সব নিউজ বন্ধ। আমি বললাম, কে বলেছে? উনি বললেন, যেখান থেকেই বলুক, খুব উঁচু জায়গা থেকে বলা হয়েছে। নিউজ-টিউজ দেওয়া যাবে না।

মহিউদ্দিন আহমদ: এটা কি ১১ তারিখের পরপর?

বুলবুল: ১২ তারিখ দুপুরের দিকে। তো হি ইজ দ্য বস, চিফ অ্যাডভাইজার। উনি যা বলেন, তা তো আমাদের জন্য গাইডলাইন। ভাবলাম, একটা পরিবর্তন তো হয়েছে। পরিবর্তনের প্রথম শক এটা। আমরা আর চ্যালেঞ্জ নিলাম না। সব নিউজ বন্ধ। নিউজ রুমের মধ্যে একটা ছুটি ছুটি ভাব। আমি খুব সিরিয়াসলি নেই নাই। টেকওভার হয়েছে। চেঞ্জ হয়েছে। চেঞ্জটা হয়তো এভাবে অ্যাফেক্ট করছে। অন্য টেলিভিশনগুলোতে খোঁজ নিলাম। সবার একই অবস্থা। কিন্তু কে বলছে, এটা কেউ জানে না। কেউ বলে, ডিজিএফআই বলেছে। কেউ বলে, প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিনের যে প্রেস সেক্রেটারি ছিল, মোখলেস, সে বলেছে। কেউ বলে, বঙ্গভবন বলেছে। একেকজন একেকজনের নাম বলে। সবাই কিন্তু নিউজ বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিউজ নাই।

এভাবে সারা দিন গেল। সারা দেশ থেকে, দেশের বাইরে থেকে, শত শত ফোন আসতেছে—নিউজ বন্ধ কেন? নিউইয়র্ক থেকে আমাদের বন্ধুরা বলতেছে, তোমাদের অফিস নাকি আর্মি টেকওভার করছে। বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অর্গানাইজেশনগুলো, যাদের সঙ্গে আমি কাজ করি, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস, বলেছে, তোমাদের নাকি কনফাইন করে রাখছে। তোমাদের নাকি হাউস অ্যারেস্ট করছে। মানে নানা ধরনের গুজব। কত আর ব্যাখ্যা দিব। হু স্টপড দ্য নিউজ—এটা একটা প্রশ্ন ছিল।

—সামবডি ফ্রম দ্য গভমেন্ট?

—কোন গভমেন্ট? আর্মি নাকি ইয়াজউদ্দিন সাহেব?

কিন্তু আমাদের কাছে তো কোনো তথ্য নাই।

১২ তারিখেই বঙ্গভবন থেকে ইনফরমেশন এসেছে, ওই দিন ফখরুদ্দীন সাহেবের শপথ। ততক্ষণ পর্যন্ত—মানে ১০-১২ ঘণ্টা যাবৎ

নিউজ বন্ধ। তখন আমার মনে হলো, আমি চুপচাপ বসে আছি কেন? আমি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব। আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। এটিএনের চেয়ারম্যানকে বললাম, আমি বঙ্গভবনের অনুষ্ঠানে যাব। উনি বললেন, দেখেন আর্মির লোকজনের সঙ্গে বেশি উল্টাপাল্টা কইরেন না।

—যাই। নিউজ কেন বন্ধ হইছে, একটু জিজ্ঞেস তো করব। কবে চালু হয়, এটা জিজ্ঞেস করব।

তারপর গেলাম বঙ্গভবনে। ব্রিগেডিয়ার বারীকে দেখলাম। জেনারেল মাসুদ উদ্দিনকে প্রথম দেখলাম ওখানে। মইন ইউ আহমেদ তো ওই পাশে। শপথ হওয়ার পরে ইয়াজউদ্দিন সাহেব ফখরুদ্দীন সাহেবকে নিয়ে তাঁর খাসকামরায় যাচ্ছে। তাদের পেছনে পেছনে আরও অনেকই যাচ্ছে। এর মধ্যে দেখলাম মাহ্ফুজ আনাম সাহেব ওখান দাঁড়ানো।

—আচ্ছা, মাহ্ফুজ ভাই, প্রেসিডেন্টকে একটু জিজ্ঞেস করতে হয়। টেলিভিশনে খবর বন্ধ করে দিয়েছে। এটা কখন চালু হবে?

তখন সবাই লাইনে—ইয়াজউদ্দিন সাহেব আর ফখরুদ্দীন সাহেব সামনে। তার পেছন পেছন জেনারেল মইন ইউ আহমেদ। তার পেছনে জেনারেল মাসুদ, তার পেছনে মাহ্ফুজ ভাই, তার পেছনে আমি। মাহ্ফুজ ভাই ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে বললেন :

—স্যার, আপনি টেলিভিশনের নিউজ বন্ধ করেছেন কেন?

—কী হয়েছে, আমি জানি না তো?

মানে উনি কিছুই জানেন না। আমি বুঝলাম যে, সামথিং রং। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি যে, ব্রিগেডিয়ার ফজলুল বারী দাঁড়িয়ে আছে। বারীকে চিনতাম। সে র‍্যাবে ছিল, বিডিআরে ছিল। সাংবাদিক হিসেবে একটা যোগাযোগ ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম :

—বারী ভাই, এটা কী? নিউজ বন্ধ করে দিছে?

—কে বন্ধ করছে? ঠিক আছে। এখন তো গভমেন্ট ফর্ম হয়ে যাচ্ছে। অর্ডিন্যান্স-টর্ডিন্যান্স থাকবে। একটু অপেক্ষা করেন। আমরা ছেড়ে দেব। এখন তো নতুন সরকার। অল্প সময়ের মধ্যেই গাইডলাইন চলে আসবে। আপনারা পাবেন।

আমাদের কথোপকথনের সময় দূর থেকে মাসুদ উদ্দিন সাহেব দেখেছে। আমার সঙ্গে তখনো কথা হয়নি। বড় বড় পকেটওয়ালা ড্রেস পরা। ধীরস্থির প্রকৃতির লোক। উনি এসে আমাকে কিছু বললেন না। বারীকে বললেন :

—কী হয়েছে?

—এই যে, বুলবুল সাহেব বলতেছেন, সাংবাদিকদের ইয়ে হইল যে নিউজ ছেড়ে দিতে হবে।

তারপর তাঁরা এগিয়ে গেলেন। ওনাদের মধ্যে কী কথা হলো, জানি না। বারী সাহেব বললেন :

—আসেন। এটা তো আমরা অর্ডার দিতে পারব না? এখন তো গভমেন্ট, তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়ে গেছে। আপনারা তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানতে পারবেন। অ্যাই, তথ্যসচিব কোথায়?

তথ্যসচিব কাছেই ছিলেন। বারী আমার সামনেই ওনাকে বলল :

—দেখেন, সমস্ত মিডিয়াকে বলে দেন, তারা নিউজ করতে পারবে। বাট দে মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে, একটা চেঞ্জ হইছে। চেঞ্জটা তাদের মাথায় রাখতে হবে।

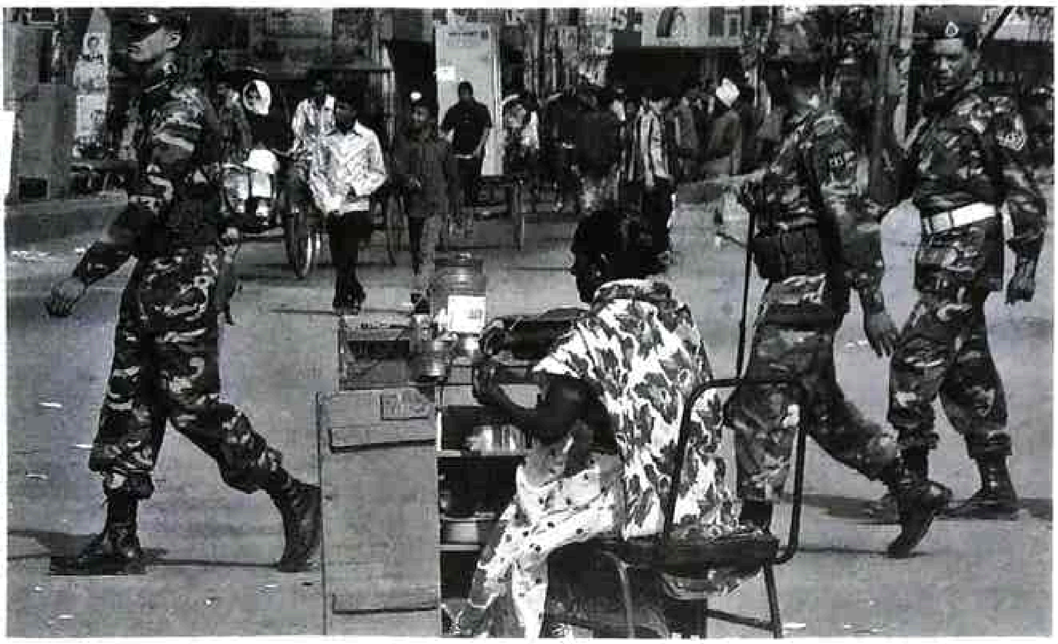
মহিউদ্দিন : এটা বারী বলেছে?

বুলবুল : বারী তথ্যসচিবকে বলেছে। তথ্যসচিব কিন্তু এতক্ষণ চুপ ছিল। ওই অনুষ্ঠানে শাইখ সিরাজ আর এনটিভির এনায়েতুর রহমান বাপ্পী ছিল। বাপ্পী বলল যে আমি এর মধ্যে নাই। শাইখ সিরাজ বলল, তুমি সাংবাদিক। আমি তো সাংবাদিক না। তুমিই কথাবার্তা বলো। তারা দুজনই আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু কথা বলেছি আমিই। তথ্যসচিব তখন বলল :

—এদিকে আসেন আপনারা। আপনারা নিউজ শুরু করে দেন। বারী সাহেব যা যা বলেছে, হুবহু একই কথা। একটি শব্দও বেশি বলে নাই।

তখন শাইখ সিরাজ তার ফোন বের করল। তার চ্যানেল আইকে বলল, সাতটা থেকে নিউজ যাবে। তার ফোন থেকেই আমি এটিএনকে বললাম। আর বাপ্পী ভাই এনটিভিকে বলল। ততক্ষণে অন্য যারা সাংবাদিক ছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই সব জায়গায় খবরটা চলে গেল। এভাবেই ১৭-১৮ ঘন্টা পরে নিউজ স্টার্ট হলো।

জেনারেল মইন একটু দূরে ছিলেন। তিনি এর মধ্যে ঢোকেন নাই। এটা একটা মিস্ট্রি, নিউজটা কে বন্ধ করেছিল। ডিজিএফআই? ফজলুল বারী বলেছিল, আমরা এটা করি নাই। পরে নানা অকেশনে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। জেনারেল মাসুদের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয় নাই। জেনারেল মইনের সঙ্গে কথা হয় নাই। কেউ কেউ মনে করে, বঙ্গভবন থেকে মোখলেস এটা করেছে। প্রেসক্লাবে যখন দেখা হয়েছে, মোখলেস বলেছে, আমি তো তখন আউট অব দ্য সিন। মনে হয়েছে, তখন বঙ্গভবনে না থাকলেও পলিটিক্যাল কারণে সে হয়তো এটা করতে পারে। কিন্তু



জরুরি অবস্থা জারির পর ১২ জানুয়ারি সকালের ঢাকা

ইয়াজউদ্দিন সাহেব মাহ্ফুজ ভাইকে বলেছে, উনি কিছুই জানেন না।[৪০]

প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের পদত্যাগ সাধারণ মানুষ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতার অবসান হবে ভেবে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছিল। প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৩ জানুয়ারি 'বিলম্বিত হলেও ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের ইস্তফা সঠিক' শিরোনামে *প্রথম আলোর* এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় :

> তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে আমরা স্বাগত জানাই। তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সর্বশেষ ভাষণে পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর ভাষণে তিনি বিস্ময়করভাবে জনগণের মনের কথার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। জাতীয় সংকট মোচনে তাঁর উদ্যোগকে আমরা সমর্থন করি। তবে জরুরি অবস্থার নামে গণমাধ্যমসহ বাক্স্বাধীনতায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। ইতিমধ্যেই আমরা সরকারের তথ্য অধিদপ্তর থেকে যেটুকু মৌখিক নিষেধাজ্ঞা পেয়েছি তা হয়তো অত্যুৎসাহী মন্ত্রণাদাতাদের অপরিণামদর্শী তৎপরতা। আজকের যুগে এ ধরনের সেন্সরশিপ সর্বার্থে অর্থহীন ও অকার্যকর হতে বাধ্য।[৪১]

যে ভুলের সূত্র ধরে ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সুযোগ তৈরি হয়, বিএনপি সেটাকে ভুল হিসেবে বুঝতেই পারেনি। বিএনপি শুরু থেকেই ফখরুদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে শেখ হাসিনা এই সরকারকে তাঁদের 'আন্দোলনের ফসল' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নতুন সরকারের প্রতি আস্থা জানিয়ে দেন। যেদিন ফখরুদ্দীন শপথ নেন, সেদিন শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতারা বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন। শপথ অনুষ্ঠানে বিএনপির নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হয়েছিল। সাবেক মন্ত্রী সাইফুর রহমান এবং ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। পথে তাঁরা একটি ফোন পান। তাঁদের বলা হয়, 'বঙ্গভবনে কি আর কখনো যাননি?' বার্তা বুঝতে পেরে তাঁরা বাসায় ফিরে যান। কেন তাঁদের এই ফোন করা হয়েছিল, এ নিয়ে বিএনপির ভেতরে নানা আলোচনা হয়েছে। জানা যায়, বিএনপির থিংকট্যাংকের দুজন সদস্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বলেছিলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে ক্যু হয়েছে, এখন আমাদের বঙ্গভবনে যাওয়া মানে ওই ক্যুকে সমর্থন করা।' কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, এটা ছিল একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এর ফলে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোপানলে পড়েছিল।[৪২]

প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিচারপতি লতিফুর রহমান, কয়েকজন সাবেক উপদেষ্টা, সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা, এলডিপির সভাপতি ও সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননসহ মহাজোটের কেন্দ্রীয় নেতারা। অনুষ্ঠানে চারদলীয় জোটের কোনো নেতা যোগ দেননি।[৪৩]

১২ জানুয়ারি ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৩ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট তাদের সব কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়। ফখরুদ্দীন আহমদ ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। এঁরা হলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, মে. জেনারেল (অব.) আবদুল মতিন, মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, তপন চৌধুরী, গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী, আইয়ুব কাদরী, মে. জেনারেল (অব.) ডা. মতিউর রহমান, আনোয়ারুল ইকবাল, ইফতেখার আহমদ চৌধুরী ও সি এস করিম।[৪৪]

দায়িত্ব নেওয়ার পর ২১ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, নির্বাচনকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে



বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদকে শপথ পড়াচ্ছেন

তাঁর সরকার ওয়াদাবদ্ধ।[৪৫]

১২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত তাঁর দ্বিতীয় ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা দেন যে ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার আগেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[৪৬]

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ কখনোই জন-আলোচনায় ছিলেন না। হঠাৎ করেই তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এলেন। এক-এগারোর মূল হোতারা তাঁর কথা আগেই ভেবে রেখেছিলেন কিংবা ড. ইউনূসের বিকল্প হিসেবে তালিকায় তিনি দুই নম্বরে ছিলেন—এ রকম একটি সরল গল্প অনেকেই বিশ্বাস করেননি। জানা যায়, ড. ইউনূসের পরামর্শেই ড. ফখরুদ্দীনকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় আওয়ামী লীগের ওই সময়ের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্নার কথায়। মান্না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. ইউনূসের ছাত্র ছিলেন।

ড. ইউনূস পরবর্তীকালে যখন রাজনৈতিক দল তৈরির উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে এলেন, তখন মান্না একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়। মান্নাকে তিনি বলেন, ১১ তারিখ রাতে সেনাবাহিনীর লোকেরা তাঁর কাছে এসেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে মান্না লেখককে জানিয়েছেন, কারা এসেছিল, ড. ইউনূস তাদের নাম বলেননি,

মান্নাও জিজ্ঞেস করেননি। ওদের বক্তব্য হলো, 'আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে।' ইউনূস-মান্না কথোপকথন ছিল এ রকম :

ইউনূস : ওরা এসেছিল। আমি দায়িত্ব নেই নাই।

মান্না : কেন স্যার?

ইউনূস : তিন মাসের জন্য নিয়ে কী করব? কিছু তো করতে পারব না? আমি যদি জানতাম, দুই বছর থাকা যাবে, তাহলে তো নিতাম।

মান্না : তখন কেউ বোঝেননি। তাহলে ফখরুদ্দীনের কাছে ওরা গেল কেমনে?

ইউনূস : আমিই বললাম ফখরুদ্দীনের কথা। ফখরুদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল। ফখরুদ্দীন, মির্জ্জা আজিজ, আমি—আমরা তো একসঙ্গে ছিলাম। ফখরুদ্দীন ছিল ফার্স্ট বয়, মির্জ্জা আজিজ সেকেন্ড হলো, ওদের কথা আমি বলেছি।

মান্না : ওনাদের যদি আপনি নেওয়ালেন, আপনি তো হেল্পও করতে পারতেন?[৪৭]

মান্না লেখককে আক্ষেপ করে বলেছেন, 'মানে ওনাকে যদি আগে বলত অনেক সময় দেওয়া যাবে, তাহলে হয়তো উনি যেতেন। কিন্তু এটা কেউ জানে নাকি? পলিটিকস এভাবে হয় নাকি? পলিটিকসে প্রো-অ্যাকটিভ হতে হয়। কেউ কি দিয়ে দেয়? উনি পলিটিকসও বোঝেন না, প্রো-অ্যাকটিভ হওয়াও বোঝেন না।'[৪৮]

ড. ইউনূসের পরামর্শে ড. ফখরুদ্দীনকে প্রধান উপদেষ্টা করা হয়েছে, এ কথা সেনা কর্মকর্তারা কখনোই প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি। ফখরুদ্দীন নিজেও বলেননি।

শেখ হাসিনা উপদেষ্টাদের তালিকা দেখে হতাশ হন। সরকারের তরফ থেকে কেউ তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করে না, পরামর্শ নেয় না। তাঁকে বলা হলো, আগে জঞ্জাল সাফ হোক, তারপর নির্বাচন। তিনি বুঝতে পারলেন, বিজয় হাতছাড়া হয়ে গেছে, বর্তমান শাসকেরা দেশ সাফ করার নামে নির্বাচন বিলম্বিত করবে। দলের পাঁচজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে তাঁর এপিএস ড. আওলাদও ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই নতুন সরকার এগোচ্ছে। দলের বেশির ভাগ নেতা বাড়িঘর ছাড়া, ৪২০ জনের গ্রেপ্তারের তালিকায় অর্ধেকের কাছাকাছি তাঁর লোক।[৪৯]

বেগম খালেদা জিয়ার দিন কাটে উদ্বেগ আর অনুশোচনায়। দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন, কে কোথায় গ্রেপ্তার হলো, কার বিরুদ্ধে কী মামলা

হলো—এটা জানার চেষ্টা করেন, বলেন, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের জন্য এমনটা হয়েছে। দুজনেই বেগম জিয়াকে হার্ডলাইনে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিচারপতি কে এম হাসানকে বিরোধীরা মেনে না নিলে বিকল্প কাউকে এই পদে দায়িত্ব না দিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এই দুজন। তাঁরা মনে করেছিলেন, বিচারপতি হাসান তাঁদের জন্য ভালো না-ও হতে পারেন। রাষ্ট্রপতিকে চাপে রেখে অনেক কাজ করানো যাবে। বিএনপির মডারেট গ্রুপ চেয়েছিল ড. আকবর আলি খানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতে। জামায়াতে ইসলামী এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। মহাজোটের সঙ্গে সংলাপ থেকে বেরিয়ে আসার বুদ্ধি-পরামর্শও দিয়েছিলেন সাকা চৌধুরী ও মুজাহিদ। তাঁরা বলেছিলেন, এভাবে সংলাপ চলতে থাকলে বিরোধীরা, বিশেষ করে শেখ হাসিনা বেশি লাভবান হবেন। বিচারপতি এম এ আজিজ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। খালেদা জিয়া দলের কয়েকজন নীতিনির্ধারকের পরামর্শে তাঁকে পদত্যাগ করতে দেননি। তাঁদের যুক্তি ছিল, আজিজ পদত্যাগ করলে দলের সর্বনাশ হবে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতে যাবে অনায়াসে।[৫০]

এরশাদের সঙ্গে বিএনপির সমঝোতার পথে বাধা হয়েছিল জামায়াত। তারা এরশাদকে চারদলীয় জোট নেওয়ার বিরোধী ছিল। তারা মনে করত, এরশাদ জোটে ঢুকলে জামায়াতের কদর কমে যাবে। বেগম জিয়া নিজেও এরশাদকে বলতেন 'বিশ্বাসঘাতক'। এরশাদের সঙ্গে সমঝোতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন বিএনপির দুজন জুনিয়র নেতাকে তিনি টাকা দিয়ে পাঠান। তাঁরা এরশাদের হাতে টাকা না দিয়ে সরাসরি প্রার্থীদের হাতে টাকা দিতে চান। এতে এরশাদ অপমানিত বোধ করেন এবং খেপে গিয়ে ১৪ দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই যোগাযোগে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন জাতীয় পার্টির নেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু। খালেদা একবারও ভাবেননি, রাজনীতিতে তিনিই একমাত্র খেলোয়াড় নন, অন্যরাও খেলতে জানে। সাজানো স্বপ্ন ভেঙে গেলে আক্ষেপ করে তিনি বলতেন, বিদেশিরা তাঁর সর্বনাশ করে দিয়েছে।[৫১]

রাজনীতির অন্দরমহলে সামরিক বাহিনীর ঢুকে পড়া বাংলাদেশে নতুন নয়। এর আগে ১৯৭৫ ও ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রক্ষমতার নাটাইটা রাজনীতিবিদদের হাত থেকে ছিটকে সেনাছাউনিতে চলে গিয়েছিল। দেখা গেছে, যাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, তাঁরা ছাড়া অন্য সবাই এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাৎক্ষণিক জনসমর্থন পেতেও দেরি হয়নি।

এক-এগারোর অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল বিভাজনের

রাজনীতি। সাধারণ মানুষ সংঘাতের রাজনীতি থেকে মুক্তি চেয়েছে। অনেকের মনে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে সামরিক বাহিনী নিছক ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং সংকট থেকে দেশ ও মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। ২০ জানুয়ারি ২০০৭ *প্রথম আলো* আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা কয়েকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তার খোলামেলা আলোচনায় এক-এগারোর 'অনিবার্যতা এবং বৈধতার' সুরটি বেশ স্পষ্ট। সম্পাদক মতিউর রহমানের সঞ্চালনায় 'দেশের পরিস্থিতি, জরুরি আইন ও আমাদের করণীয়'—এ বিষয়ে তাঁদের আলোচনা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

ব্রি. জে. এম সাখাওয়াত হোসেন : দেশে যে জরুরি অবস্থা আছে, তা কিন্তু সংবিধানের মধ্য থেকেই আছে এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, সংবিধানের ধারায় রেখে। এখানে একটু তফাত আছে, এটা কোনো সামরিক টেকওভার নয়। যদিও জরুরি অবস্থা দেশে আছে, একটা পার্লামেন্ট নেই, কোনো কেবিনেট নেই। সে জন্য সামরিক বাহিনীর একটা রোল আছে এবং সেটা থাকবে। এখানে সামরিক বাহিনী এ জরুরি অবস্থায় ইন এইড অব সিভিল পাওয়ারে আছে, বাইরে অবশ্য বিভিন্ন ধরনের কাজ তাদের দেওয়া যেতে পারে এ জরুরি অবস্থার মধ্যে এবং সেটাই তারা করছে।

আমি মনে করি, এই মুহূর্তে যেসব কাজ রাজনৈতিক দলগুলো করতে পারেনি বা করেনি বা করার সদিচ্ছা রাখেনি, সেগুলো করে নির্বাচনটা দেওয়া উচিত। যদি আমাদের সময় লাগে ছয় মাস, এক বছর বা এক বছরের বেশি, এমনই করতে হবে। কারণ, এর পরে রাজনীতিবিদেরা সদিচ্ছা থাকলেও করতে পারবেন না। সেটার একটি বিষয় হচ্ছে বিচার বিভাগ পৃথক্করণ, আজকে সাত বছরেও কিন্তু করতে পারেনি। একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুরু করেছিল, আরেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথম কাজটি করেছে, অন্তত প্রক্রিয়াটাকে চালু করেছে। এ জিনিসগুলো, যেগুলো গণতন্ত্রকে একটা ভিতের ওপর দাঁড় করাতে গেলে প্রয়োজন, সেগুলোর সংস্কারের আগে নির্বাচন করা হবে জনগণের সঙ্গে হঠকারিতা।

লে. জে. মাহবুবুর রহমান : সেনাবাহিনী ইন এইড অব সিভিল পাওয়ার ভূমিকায় এসেছে, তারা নিয়োজিত হয়েছে। তো এটা আমি নিশ্চয়ই একটা পজিটিভ দিক মনে করি। বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিন্তু ক্ষণকালীন। তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য

আসতে পারে না, সেটারও কোনো বিধান নেই সংবিধানে। তো এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়া এবং নির্বাচনে যারা জিতে আসবে, তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং সেই লক্ষ্যে একটা পরিবেশ তৈরি করা।

আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে এটুকু বলতে চাই যে এটা পেশায় দক্ষ সেনাবাহিনী নিশ্চয়ই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সূতিকাগারে এর জন্ম এবং এই সেনাবাহিনী দেশের অনেক বিপর্যয়, অনেক দুর্যোগ, সেটা মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক যা-ই হোক, জনগণের পাশে সব সময় ছিল। এ জন্যই আমি মনে করি সেনাবাহিনীর বর্তমান ভূমিকা ইতিবাচক। তারা নিশ্চয়ই যেগুলো অন্তরায় আছে, যেমন আইনশৃঙ্খলা, গডফাদারদের ধরা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা, এগুলো তারা করে চলেছে। ভোটার তালিকা ঠিক করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করে জনগণের ক্ষমতা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

মে. জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম: বাংলাদেশ নামক একটা রুগ্‌ণ দেশ যখন ১১ তারিখে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে গিয়েছিল, এমন বিপদ যে যেখান থেকে ফেরত আর না-ও আসতে পারে, সে রকম পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তো আমি বলতে চাই, আমরা সবাই এর জন্য কিছু না কিছু দায়ী অবশ্যই। তবে সবচেয়ে বেশি দায়ী দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল।

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, দেশ চালানোর দীর্ঘ দায়িত্ব কখনোই তত্ত্বাবধায়ক বা অনির্বাচিত সরকারের না। কিন্তু যাদের দেশ চালানোর জন্য পুনরায় দায়িত্ব দিতে চাই, যাদের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি, সংস্কারবিহীন অবস্থায় যদি তাদের ক্ষমতায় আনি, তাহলে পুনরায় যে ২০০৬ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বর হবে না, তার কী গ্যারান্টি। এটা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার করতে হবে।

শেষ কথা বলতে চাই সামরিক বাহিনীকে নিয়েই। যে ১২ হাজার লোক ধরা হয়েছে সাত দিনে, এর মধ্যে আমার অনুমান অর্ধেকের মতো লোক নির্দোষ হবে। আমরা সব সময় বলি, গডফাদারদের ধরতে হবে। কিন্তু এই ৩৬ বছরে কোন সরকার গডফাদারদের তালিকা বানিয়েছে? আমরা ১২ হাজার কেন ধরতে যাব, ১২টা গডফাদার ধরলে তো দেশের সমস্যা ১২ ভাগের ১১ ভাগ শেষ হয়। কিন্তু এদের নাম বলতে জাতীয় সংসদের লোক, এনএসআইয়ের লোক, ডিজিএফআইয়ের লোক—তত্ত্বাবধায়ক সরকার এত লজ্জা পায় কেন আমি বুঝতে পারি না। সাহস

থাকলে বাপের বেটা হলে, আল্লাহর বান্দা হলে তুমি বলবা এরাই গডফাদার।

মে. জে. আমীন আহম্মেদ চৌধুরী : দুজন গৃহবধূ নয় বছর ধরে একজন মিলিটারি শাসকের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করে দুটি দলকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ওই দুজনকে আমরা যেভাবেই মূল্যায়ন করি না কেন, ওনাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বা প্রজ্ঞাকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। আমি শুধু এটুকু বলব, পশ্চিমা গণতন্ত্র বলতে যেটা বোঝান, সেটাকে নীতিগতভাবে যা-ই বলেন না কেন, সেটা হলো ভোটের রাজনীতি। ভোট হলো গাণিতিক হিসাব। সেই হিসাব করতে গিয়ে ওনারা যে বুদ্ধির খেল দেখাচ্ছেন, '৯৬ সালে নানা রকম হিসাব করা হয়েছে এবং বর্তমানেও একই ধরনের হিসাব করা হয়েছে। সে করাটা করতে গিয়ে ওনারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছেন। এই মনোভাবের ফলে রাজনৈতিক আচরণরীতিকে তাঁরা পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন। এর ফলে এ ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

যাঁরা এ মুহূর্তে একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা সদিচ্ছা নিয়ে এ ধরনের জরুরি অবস্থা করিয়েছেন, তাঁরাই ইচ্ছা করলে এক ধাক্কাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যেগুলোতে মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে, যেগুলোর ভেতরে ক্যানসারের মতো ঢুকে গেছে, সেগুলো থেকে কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা আপনারা পাবেন না। সংশোধন করতে পারেন। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, সেটা করতে হলে রাতারাতি প্রয়োজনবোধে সংবিধানবহির্ভূতভাবে করতে হবে। সংবিধানবহির্ভূতভাবে ছাড়া তাড়াতাড়ি কিছু করা যাবে না।

লে. জে. হাসান মশহুদ চৌধূরী : প্রচ্ছন্নভাবে আমার মনে হচ্ছিল, সেনাবাহিনীকে দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল কোনো এক পক্ষকে এবং সেটা যদি হয়ে থাকে, তবে আমি মনে করি, সেটা সেনাবাহিনীর জন্য কল্যাণকর ছিল না, দেশের জন্য কল্যাণকর ছিল না। এসব বিবেচনাতেই আমরা সেনাবাহিনী নামানোর বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি যেটা দেখছি, জরুরি অবস্থা ঘোষণা কোন পর্যায়ে জরুরি হয়ে পড়েছিল এবং এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর কী ভূমিকা ছিল, খুব প্রকটভাবে তা দৃশ্যমান হয়নি এবং এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটাই কাম্য। সেনাবাহিনীকে দূরে রেখে সেনাবাহিনী দ্বারা কাজগুলো করিয়ে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে। যেহেতু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, সেনাবাহিনীকে এনে আবার তাকে

নিন্দিত বা বিতর্কিত করার কোনো চেষ্টা যেন না করি।

আমি মনে করি, কোনো না কোনোভাবে গণতন্ত্র বাংলাদেশে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই করতে হবে। ক্রমান্বয়ে তাদের বোঝাতে হবে যে গণতন্ত্র বলতে তারা 'ফ্রি ফর অল' মনে করবেন না এবং গণতন্ত্র বলতে যেকোনো সময় জনগণের ইচ্ছার কথা তুলে যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা রাখেন, তা সমীচীন হবে না এবং তার জন্য যে পরিণতি হবে, সে জন্য তাদেরই দায়ী থাকতে হবে।

মে. জে. গোলাম কাদির : জাতির এখন যে অবস্থা—ট্রেনটা রেল থেকে পড়ে গেছে। ট্রেনটাকে লাইনে তুলতে হলে একটা বাইরের শক্তি প্রয়োজন। সেই কাজটাই সেনাবাহিনী করছে, জরুরি অবস্থার মাধ্যমে ট্রেনটা এখন রেলের ওপরে আসছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমরা সবাই যদি তাদের সহায়তা করি, তাহলে সম্মিলিতভাবে তারা এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। সমস্যাগুলো হলো—এক. নির্বাচন কমিশন, দুই. ভোটার লিস্ট। ভোটার আইডি আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগে শুরু হয়েছিল, এরপর কেন যেন পরপর দুই সরকার এটা করল না। ভোটার আইডি করলে আরও অনেক নাগরিক-কাজ করা যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটা করতে পারে।

এখন কথা হলো, সেনাবাহিনী কত দিন থাকবে, সেটা ঠিক বলা যাবে না; কিন্তু কাজটাকে ঠিক করে না গেলে ট্রেনটা যে লাইনে আছে, সেটা আর থাকবে না। নির্বাচন কমিশন, আইডি কার্ড, সরকারি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করতে সময় লাগলেও কাজগুলো করতে হবে।

লে. জে. হারুন-অর-রশিদ : সশস্ত্র বাহিনীর কাছে কোনো ট্যাবলেট নেই যে তারা ট্যাবলেট খাইয়ে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সশস্ত্র বাহিনী একটা শক্তি। কারণ তাদের সংগঠন, তাদের নেতৃত্ব; তাদের লজিস্টিকস ইত্যাদি দিয়ে তারা কিছু কাজে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যেটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর করতে হবে, সেটা তো সেনাবাহিনী করতে পারবে না।

আমি ভবিষ্যতে জরুরি আইন চলাকালে সশস্ত্র বাহিনী কী করতে পারে, সে ব্যাপারে বলতে চাই—তাদের সামনে যে লক্ষ্য, সবাই যেটা চায়, তা হলো সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। আর সেটার মাধ্যমে যে সরকার আসবে, তাদের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী তারা কাজ করবে। এখন চাচ্ছি কোনো সুবিধাবাদী দল যেন ক্ষমতায় না আসে। সেনাবাহিনী যেন অবশ্যই বেসামরিক লোক ও প্রশাসনকে সহায়তা করে, মানবাধিকার

লঙ্ঘন না করে, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে, শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাহায্য করে।

ব্রি. জে. শাহেদুল আনাম খান : সবাই আজকে বলছে, জরুরি অবস্থা ভালো হয়েছে। একটু আগবাড়িয়ে বলছে, সামরিক শাসন কি করা যেত না? ১৫ থেকে ১৬ বছর আমাদের গণতান্ত্রিক চর্চা হচ্ছে। ১৬ বছর পর জনমতনির্বিশেষে সবাই আবার বলে যে না, আমাদের এই গণতন্ত্রের দরকার নেই। সেটা যে আমাদের রাজনীতির ওপর কত বড় চরম আঘাত, তা আমাদের মানতে হবে। এর মূলে কী, সেটাও আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং মূলে গিয়ে আমাদের সমাধান করতে হবে। এখন কথা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা আছে কি না। সেনাবাহিনীর হাতে আলাদিনের চেরাগ নেই। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সব করতে হবে।

আমরা যখন বলছি যে আমরা সবকিছু ঠিক চাই, তখন দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে—আমাদের হাতে সময় কতখানি আর কারা করতে পারবে। রাজনৈতিক ইস্যু কিন্তু রাজনীতিবিদেরাই সমাধান করবেন।

মতিউর রহমান : আমরা সবাই মনে করি, ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনা করবে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা। আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরের-বাইরের সন্ত্রাস-দুর্নীতি বন্ধ হোক। আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলো আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়ে তাদের কাজকর্ম তারা পরিচালনা করবে। একই সঙ্গে আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমরা দেশে কোনো সেনাশাসন চাই না। তবে সামরিক বাহিনী দেশপ্রেমিকের ভূমিকা পালন করুক, এটা আমরা চাই।[৫২]

আলোচকদের বক্তব্যের মূল সুরটি স্পষ্ট। তাঁরা ১১ জানুয়ারি পটপরিবর্তনকে দীর্ঘদিনের সংঘাতের রাজনীতির এক অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখেন এবং সেনাবাহিনীর কাছে একটি ইতিবাচক সহায়ক ভূমিকা আশা করেন। সবাই একমত যে সমস্যাটি রাজনীতিবিদেরাই তৈরি করেছেন এবং এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। তাঁরা এ বিষয়েও একমত যে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সেনাশাসন কোনো বিকল্প নয় এবং রাজনীতিবিদদেরই দেশ পরিচালনা করতে হবে। জবাবদিহির রাজনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া দেশ এগোবে না।

১৪ জানুয়ারি *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক মন্তব্য প্রতিবেদনে সম্পাদক মতিউর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদকে তাঁর 'সব শুভ উদ্যোগ ও ভালো কাজে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন'

দেওয়ার কথা বলেন এবং 'সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে, কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলে' দেশবাসীর কাছে জোরেশোরে তা তুলে ধরে প্রতিবাদ জানাবেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। নতুন উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে অসন্তোষ জানিয়ে তিনি ডিজিএফআই ও দুদকের সাবেক মহাপরিচালক মে. জে. (অব.) আবদুল মতিন এবং ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।[৫৩]

পালাবদলের চার দিনের মাথায় ১৫ জানুয়ারি এটিএন বাংলার বিশেষ অনুষ্ঠান 'মিট দ্য প্রেস' সরাসরি সম্প্রচারিত হয় চ্যানেলটির বসুন্ধরা স্টুডিও থেকে। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান। তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য প্যানেলে উপস্থিত ছিলেন বার্তা সংস্থা এপির ঢাকা ব্যুরো চিফ ফরিদ হোসেন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিশেষ প্রতিনিধি শফিকুল করিম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন এটিএন বাংলার বার্তাপ্রধান মনজুরুল আহসান বুলবুল। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মতিউর রহমান দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা মত দেন। আলোচনায় কয়েকজন দর্শক-শ্রোতাও অংশ নেন। ওই অনুষ্ঠানের কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো :

মনজুরুল আহসান বুলবুল : মতিউর রহমান, আমি আপনাকে একটি সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই। গত দুই মাসের মাথায় দেশে দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেখলাম এবং তারপরও পরিস্থিতি স্থিতিশীল, এ রকম বলা যাবে না। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আপনি একটি সূচনা বক্তব্য দিন। এরপর আমরা প্যানেলের কাছে যাব।

মতিউর রহমান : এটা সত্যি যে আমরা বেশ একটা জটিল এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম বা এখনো আছি—তা আমরা বলতে পারি। কারণ, আমরা দেখলাম, প্রথম যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে, সেটা কোনো কাজ করতে পারেনি, সেটা ব্যর্থ হয়েছে, ভেঙে গেছে সম্পূর্ণভাবে। নতুন আরেকটি সরকার হয়েছে। তাকে আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলবেন, নাকি অন্য কোনো নাম দেওয়া হবে—এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে এখনো সরকারটা পুরোপুরি গঠিত হয়নি। সে জন্য সরকারের গঠন, তার অবস্থান, তার ভূমিকা, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা বেশ কঠিন এখনো। আমার মনে হয়, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে পরিষ্কার একটা চিত্র পাওয়ার জন্য।

শফিকুল করিম : আপনার এ সূচনা বক্তব্য থেকে আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি বলছেন যে সময় লাগবে এটা সম্পর্কে কিছু বলতে। কিন্তু পরের দিন যে লেখাটি লিখেছেন, সেখানে কিন্তু আপনি প্রথম দিনেই তাদের সমালোচনা করেছেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছে এবং অনেক পাঠকের কাছে সেটা মনে হয়েছে। তাহলে আপনি সেটি করলেন কেন?

মতিউর রহমান : আমি এটি করলাম এ জন্য যে ধরুন, পাঁচ বছর একটা দল ক্ষমতায় ছিল এবং তাদের ক্ষমতায় থাকাকালীন অপশাসন, দুর্নীতি, ব্যর্থতা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেশবাসীকে একটা ভয়ংকর জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে এ থেকে আমাদের কিছুটা সরিয়ে নেবে। একটু সামনের দিকে এগিয়ে দেখলাম যে নানামুখী চেষ্টা সত্ত্বেও এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছু করতে পারল না, বরং দিনের পর দিন এ সমস্যাটাকে বাড়িয়ে দিল এবং শেষ পর্যন্ত তা ভেঙে পড়ল। তারপর নতুন একটা সরকার গঠিত হলো। আমি আশা করি, নতুন সরকার যাঁরা হবেন, যাঁরা দায়িত্ব নেবেন, তাঁরা দেশের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে বুঝে নেবেন। কাজটা কঠিন-জটিল এবং একধরনের দুঃসাধ্য। সে জন্য এই প্রথম যে পাঁচজন নেওয়া হলো তার মধ্যে একাধিক ব্যক্তি সম্পর্কে আমি লিখেছি, সেটা নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে আমি তেমনভাবে খুব একটা উৎসাহিত হতে পারিনি। আমি মনে করি, এটাকে আরও জোরালো ও শক্ত করতে, যাঁরা দেশ বোঝেন, জানেন, যাঁরা সত্যিকারের পথ প্রদর্শন করতে পারবেন, কাজ করতে পারবেন—এ রকম ব্যক্তি হলে আমি খুশি হতাম।

মনজুরুল আহসান বুলবুল : মতি ভাই, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। সেটি হচ্ছে, আপনি একটি প্রেক্ষাপট বলেছেন যে ড. ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাজ করতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে এবং যে সরকারটি গঠিত হলো সেই সরকারটিও এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি। আপনি যদি আমাদের একটু পেছনে, একটু খোলাখুলি বলেন, আপনার কী মনে হয়, কেন অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হলো?

মতিউর রহমান : একটা কথা প্রথমেই বলতে হবে যে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ খুব দুর্বল ব্যক্তি ছিলেন। এত বড় একটা সরকার পরিচালনা করা, একটা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় সমাধান করা, এগিয়ে যাওয়া এবং সবাইকে মিলিয়ে চলা, দেখা গেল যে তিনি এককভাবে সবকিছু করছেন। তিনি প্রথমেই বলেছিলেন, এটা একটি রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ তিনিই

সবকিছু। এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, যেটা আমরা পরিষ্কার দেখলাম, তাঁর পেছনে যে সরকার ছিল, আমি বলব যে বিএনপি এবং তার নেতৃত্ব সরাসরি প্রতিটি কাজে তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তার ইঙ্গিতে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ চলেছেন। এই চলতে গিয়ে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সম্পূর্ণটাই গোলমাল করে ফেলেছেন।

ফরিদ হোসেন: জনাব মতিউর রহমান, আপনাকে আপনার রোববারের লেখাটার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েই আমি শুরু করছি। আপনার এই বিশ্লেষণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বলে আমি মনে করি এবং অনেকে এটা নিয়ে আলোচনাও করছে। আপনার এ লেখাটির মধ্যে একটি কথা বলেছেন, যেটা অন্য অনেকেই লেখেনি। এটা হচ্ছে, এই যে পরিবর্তনটা হলো, নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো, সেখানে সশস্ত্র বাহিনী একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমরা কিন্তু কোনো জায়গায়ই জানি না যে তাদের ভূমিকাটা কী? আপনি আরও লিখেছেন, দাতাদেশগুলোও একটা ভূমিকা পালন করেছে। আমি বিনীতভাবে আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি কি বলবেন যে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকাটা কী ছিল?

মতিউর রহমান: দেখুন, এটা আপনি, আমি এবং আমরা মোটামুটি সব জানি, বুঝি। ব্যাপারটা ছিল যে দুটি দল, দুটি জোট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ রকম জায়গায় পৌঁছেছিল যে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, রক্ত, সংঘাত। গৃহযুদ্ধের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এ অবস্থা পেছনে ফেলে দেশকে ফিরিয়ে আনার মতো শক্তি না আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের ছিল, না বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের ছিল। আমার জানামতে, তারা সরাসরি ভূমিকা নিয়েছে। তারা এ অবস্থার পরিবর্তন করেছে। তারা ইয়াজউদ্দিনকে পদত্যাগ করতে সহায়তা করেছে বা বাধ্য করেছে। দেশকে যে একটা স্বস্তির জায়গাতে নিয়ে আসা হলো এবং মানুষ যে একটা স্বাভাবিকতার মধ্যে ফিরে এসেছে, তার পেছনে তাদের উদ্যোগ, চেষ্টা আছে বলে আমি মনে করি।

ফরিদ হোসেন: আমরা কি, এই যে বড় ঘটনাটি ঘটল বৃহস্পতিবার, এই বড় ভূমিকা রাখার বিষয়টা বললেন—অবশ্যই একটা বড় ভূমিকা রেখেছে—আপনি কি আপনার পাঠকদের জানাবেন, সেদিন আসলে কী ঘটেছিল বঙ্গভবনে?

মতিউর রহমান: সেটা একজন সংবাদপত্রকর্মী হিসেবে জানানো উচিত, যদিও আমরা বলব, পুরোটা আমরা জানি না। জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি যদি জানতে পারি, এটা অবশ্যই পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে

জানানো উচিত হবে। তবে এটুকু তো আমরা জানি যে সেনাবাহিনীসহ তিন প্রধান এবং অন্যান্য শক্তিশালী ব্রিগেড কমান্ডাররা গিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন, তাঁকে সাহায্য করেন এই পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে এবং বক্তৃতা দিতে ও জাতির উদ্দেশে জানাতে যে দেশে এ পরিস্থিতি চলতে পারে না। যে কথাটা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন গত তিন মাস ধরে বলে আসছিলেন, আর সেদিন রাতে তিনি যা বললেন, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

শফিকুল করিম : তাহলে, জনাব মতিউর রহমান, আমরা কি প্রতিবারই আশা করব যে আমাদের রাজনীতি ব্যর্থ হবে এবং সামরিক বাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনী এসে আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করবে?

মতিউর রহমান : আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার বলতে চাই। আমি মনে করি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবশ্যই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত-পরিচালিত হতে হবে। এটাকে আমি একটা সাময়িক ব্যবস্থা বলব। স্বল্প সময়ের ব্যবস্থা, বাধ্য হয়ে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সবাই এটা মেনে নিয়েছেন।

ফরিদ হোসেন : আমরা অনেক জিনিস দেখেছি, একসঙ্গে অনেক নাটকীয় ঘটনা। একটি হচ্ছে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো হঠাৎ করেই, একটি হচ্ছে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল, আরেকটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে পদত্যাগ করলেন। এ ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণভাবে জরুরি অবস্থা যেটা হয়, এ ধরনের অবস্থা জনগণ তো বটেই, কোনো সাংবাদিকেরও সাধারণত স্বাগত জানানোর কথা নয়। কারণ, জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পরে আমরা যেটা দেখলাম যে বেসরকারি টেলিভিশনগুলো তাদের খবর প্রচার বন্ধ করে দিল এবং পত্রিকাগুলোতে ফোন এল, 'আপনারা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে বা এ ধরনের সমালোচনা করে কিছু লিখবেন না।' তারপরও কেন পরিবর্তনটাকে স্বাগত জানানো হলো?

মতিউর রহমান : আপনি যদি বলেন, সরাসরি আমরা কোনো স্বাগত জানাইনি। বাস্তবতা এই ছিল, দেশ চলছিল না। একটা যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। তা থেকে একটা স্বস্তিকর অবস্থায় ফিরে এসেছে। এ স্বস্তিকর অবস্থাকে অবশ্যই স্বাগত জানাই আমি। কারণ, আমাদের স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট সব খুলেছে। এগুলো তো মানুষ চায়।

ফরিদ হোসেন : আমি আপনার রোববারের লেখাটিতে আবার ফিরে আসি। এ লেখাটির মূল সুর যেটা আমি দেখেছি, আপনি বলেছেন যে

বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক জোট বা দলগুলো যে আছে বা যে দুই নেত্রী আছেন, তাঁরা বাংলাদেশকে চালাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখানে একটি সমালোচনা আছে যে আপনি দুটো দলকে একই পাল্লায় ফেলেছেন। আমি একটু ব্যাখ্যা দিতে চাই এ জায়গায়। সেটা হচ্ছে, গত পাঁচ বছর বিএনপি ও জামায়াত জোট ক্ষমতায় ছিল এবং ১৪-দলীয় জোট, পরবর্তীকালে যা মহাজোট হয়েছে, তারা ক্ষমতার বাইরে ছিল। আজকে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেটা আপনারাও স্বাগত জানাচ্ছেন, আমরাও স্বাগত জানাচ্ছি। কীভাবে নির্বাচনটা বাতিল হয়েছে—একটা ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা করতে হবে, আইডি কার্ড করতে হবে, স্বচ্ছ ভোট বাক্স থাকতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনে পুরো একটা সংস্কার করতে হবে। এ কাজটা যে হলো, আপনি কি মনে করেন, মহাজোট আন্দোলন না করলে এ পর্যায়ে আমরা পৌঁছাতে পারতাম?

মতিউর রহমান : খুব ভালো প্রশ্ন আপনার। আমি বলব যে দেখেন, আমাদের ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। দুটি দল দুবার ক্ষমতায় ছিল, দুবার বিরোধী দলে ছিল। তাদের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা বা সংসদ বর্জন, সংসদে যাওয়া, হরতাল, অবরোধ, বয়কট ইত্যাদি করা, এগুলোর মধ্য দিয়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ দল দুটির কাছ থেকে ভবিষ্যতের কল্যাণমুখী ভাবনা-চিন্তা, উদ্যোগ আমরা দেখতে পাইনি। আপনি যদি আমাকে এখন বলেন, সাম্প্রতিক অবস্থার জন্য দায়ী কারা, অবশ্যই বিএনপি সরকার, চারদলীয় জোট। তারাই পেছন থেকে ইয়াজউদ্দিনকে চালিয়েছে। তারাই চাবিকাঠি ঘুরিয়েছে। ঘুরিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যার পক্ষে বিএনপি জোটেরও দাঁড়ানো আজ খুব কঠিন।

দর্শক : মতিউর রহমান ভাইয়ের কাছে আমার একটি প্রশ্ন যে চারদলীয় ঐক্যজোট এবং মহাজোটের মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে যে জোটই ক্ষমতায় আসুক না কেন, আমি মনে করি, আরেকটা জোট বিরোধিতা করবে। হরতাল, অবরোধ লেগেই থাকবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ মানুষের খুব ভোগান্তি হবে। সাধারণ মানুষ এ থেকে কীভাবে স্বস্তি ফিরে পেতে পারে?

মতিউর রহমান : যে কথাটায় আমার এ দুই বন্ধু বারবার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, আমি মনে করি, আজকে দেশের যে পরিস্থিতি, যে সংকট, যে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই সমস্যা, সংকট, অচলাবস্থা

থেকে দেশকে মুক্ত করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করার মতো শক্তি বর্তমান দুই রাজনৈতিক শক্তির নেই। তবে দেশে সামরিক শাসন চাই না এবং সামরিক বাহিনীকে দেশ পরিচালনা করা, রাষ্ট্র পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

মনজুরুল আহসান বুলবুল : তার যে প্রশ্ন, তাতে তার আশঙ্কা যে আবার জরুরি অবস্থা উঠে গেল, নির্বাচন হলো, তখন যারা পরাজিত হলো, তারা আবার একটি অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করবে। সেখান থেকে উত্তরণের পথ কী?

মতিউর রহমান : একদম সঠিক বলেছেন আপনি। ইতিমধ্যে আমি আপনাকে বলতে পারি যে আওয়ামী লীগ উৎসাহের সঙ্গে বঙ্গভবনে গিয়েছে। বিএনপি যায়নি। শুধু যায়নি না, তারা প্রবলভাবে উত্তেজিত যে তাদের সাজানো সংসার ভেঙে গেল। সর্বত্রই বাগান সাজানো ছিল এবং সেনাবাহিনীর ভেতরেও সেটা ছিল। ভেঙে গেছে, তারা ক্ষুব্ধ। নির্বাচনে যাবে কি না, তারা নানা কথা বলে, তারা বলে যে যাব না।

দর্শক : জনাব মতিউর রহমান সাহেবের কাছে একটি বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ আগে আপনি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, নতুন একটি সরকার গঠিত হয়েছে, তাকে আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলবেন, নাকি অন্য কোনো সরকার বলবেন, তার জন্য কয়েক দিন সময় লাগবে। আসলে অন্য কোনো সরকার বলতে আপনি কি পরোক্ষভাবে সামরিক সরকারের কথা বোঝাতে চাইছেন? আমরা কিন্তু এখনো নিশ্চিন্ত নই যে বর্তমানে দেশ চালাচ্ছে কে—তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নাকি সামরিক সরকার।

মতিউর রহমান : আমি বলি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার চালাচ্ছে, পেছনে অবশ্যই সেনাবাহিনীর সমর্থন আছে।

মনজুরুল আহসান বুলবুল : প্যানেলের কাছে যাচ্ছি। আপনি লেখায় লিখেছেন যে দাতাদেশগুলোর ভূমিকার কথাও আসছে।

ফরিদ হোসেন : আজকেই দেখলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, না, জরুরি অবস্থা ঘোষণার পেছনে আমরা কোনো ভূমিকা পালন করিনি। তবে দেখেছি যে তারা সেই সময়টায় খুব দৌড়ঝাঁপ করেছে এবং বেশ কয়েক দিন যাবৎ করছিল তারা এবং ওই দিন বেশি করেছে। এই যে তারা বলছে যে আমরা কোনো ভূমিকা পালন করিনি, এ ধরনের ক্ষেত্রে, সেটা কেন বলছে তারা?

মতিউর রহমান : দেখুন, এ বিষয়ে খুব পরিষ্কারভাবে আমার পক্ষে বলা কঠিন, তবে এটুকু বলতে পারি যে আমাদের দাতাদেশগুলোর ব্যাপারে

তাদের অবস্থান, তাদের ভূমিকা, বর্তমানে দেশের ভেতর নানা কথাবার্তা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। অনেকে পছন্দ করেন এবং অপছন্দ করেন। তবে আমি বলব, আমরা যে জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলাম, সেখানে জাতিসংঘ বলুন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইইউ, এই দেশগুলোর প্রতিনিধি বা তাদের সরকারের অবস্থান আমাদের পরিস্থিতিকে কিছুটা সামলে উঠতে সহায়তা করেছে। এখন তারা কীভাবে সামলে দিয়েছে, বলা কঠিন। কিন্তু আমি বলব, নিশ্চয়ই তারা একটা কথায় পরিষ্কার ছিল যে দেশে সেনাবাহিনী ক্ষমতা নেবে না, সামরিক শাসন জারি করা যাবে না, হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত হবে না। শেষ পর্যন্ত এ রকম একটি সমাধানের কথা তারা বলে থাকতে পারে বা আপনারা শুনে থাকতে পারেন। যা-ই হোক, একটা শান্তিপূর্ণ ভালো অবস্থার পরিবর্তন এবং দেশটা যাতে আবার ফিরে নির্বাচনমুখী একটা গণতান্ত্রিক ধারায় যেতে পারে; সেই ক্ষেত্রে যদি তারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনো ভূমিকা নিয়ে থাকে, আমি এতে কোনো আপত্তি দেখি না।

শফিকুল করিম : আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, সামরিক বাহিনীর ব্যাপারে। আপনি বলেছেন যে এখানে একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই পরিবর্তন যেটা হয়েছে, তাতে তারা সহায়তা করেছে। আপনি যদি জাতিসংঘের যে স্টেটমেন্টটা ঢাকা থেকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা লক্ষ করেন; সেখানে লিখেছে '২২ জানুয়ারি নির্বাচনে আর্মি যদি সহায়তা করে, তাহলে তাদের শান্তিরক্ষার ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে। আমরা বিবেচনা করব তাদের নেব কি নেব না।' এখন পেছন থেকে যদি তারা সরকার পরিচালনায় থাকে, যেটা আপনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাহলে শান্তি মিশনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে কি না!

মতিউর রহমান : আমি বলব যে এটা খুবই সাময়িক ব্যবস্থা। একটা জরুরি আপৎকালীন অবস্থায় তারা একটা ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছে দেশকে একটি স্থিতিশীল একটা নির্বাচনমুখী ধারাতে নিয়ে আসার জন্য। এটার সঙ্গে সরকার পরিচালনা, সামরিক বাহিনীর দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রণ করা অথবা সামরিক সরকার—এ রকম আমি একদমই বলতে চাই না। বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর পক্ষে সেনাশাসন জারি করে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এটা আমাদের কাম্যও নয়।

মনজুরুল আহসান বুলবুল : এখানে আমি দুটি সমস্যা দেখতে পাচ্ছি। একটি সমস্যা হচ্ছে, যেটি ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর বারবারই বলা হচ্ছে যে ২২ জানুয়ারি বা ২৫ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন না হলে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়ে যাবে, সংবিধান থাকবে না। ব্যারিস্টার মওদুদ

আহমদ বলছিলেন যে কে করবে? কারও কোনো উপায় নেই। কেউ কিছু করতে পারবে না। এখনো তো সংবিধান থাকল না। কাজেই একটা অসাংবিধানিক কাজে আমরা এলাম। আরেকটি হচ্ছে, আমরা বলছিলাম সারা দুনিয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা মডেল হিসেবে করলাম, সেটিও ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আমাদের সংবিধানও থাকল না, একটা মডেল প্রতিষ্ঠা করলাম সেটাও থাকল না। তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কোন জায়গায়?

মতিউর রহমান: এটা ঠিক যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, সেটা থাকল না। বা যে তারিখ নিয়ে আলোচনা করলাম, সেটাও থাকল না। কিন্তু আমাদের দেশ আছে, জনগণ আছে, ভবিষ্যৎ আছে। আমাদের তো একটি পথ বের করতে হবে। কথা আছে, একটি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে। আগামী নির্বাচন হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে এবং তার আইনগত সমাধান আমাদের আইন বিশেষজ্ঞদের বের করে আমাদের সামনে দিতে হবে।

মনজুরুল আহসান বুলবুল: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ্ধতি কি আপনার মনে হয় শেষ হয়ে গেল?

মতিউর রহমান: আমার মনে একটি বিরাট প্রশ্ন জেগেছে যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাটা আদৌ টিকবে কি না, চলবে কি না। কারণ, যে কৌশলে এটাকে ধ্বংস করা হয়েছে, বিশেষ করে বিচারপতিদের মধ্য থেকে দলীয় লোকদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দিয়ে, এর মানমর্যাদা-সম্মান সেই '৯৬ সাল বা ২০০১ সালের অবস্থায় আর নেই। এটাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে এটার মধ্যে আরও বড় একটা জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন আছে। দেশের সকল দল, নাগরিক সমাজ, জনগণ বা সেনাবাহিনী মিলে এটা করতে হতে পারে।

মনজুরুল আহসান বুলবুল: আবার একটু দর্শকদের কাছে যাই।

দর্শক: আমি একটু ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। আমি ১৯৮৪ সাল থেকে আপনার লেখা পড়ি, সাপ্তাহিক *একতা* থেকে। সব সময় একটা নিরপেক্ষতার মধ্য থেকে আপনি আপনার লেখা শুরু করেন এবং এভাবেই শেষ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে যে বর্তমান বাস্তবতা, চারদলীয় জোট এবং সম্প্রতি যারা বিরোধী দলে ছিল ১৪-দলীয় জোট, এই দুইটির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা দেখাতে গিয়ে কি দুই দলকেই এক করে ফেলা হচ্ছে না লেখার মধ্য দিয়ে? সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ,

ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, সেই জায়গাটায় আপনার অবস্থান; আবার একই সঙ্গে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন—এ ব্যাপারগুলোকে কীভাবে দেখছেন?

মতিউর রহমান : আমি, আমরা, আমাদের সময়ের যারা মানুষ, আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোকে স্মরণ করি। আমরা মনে করি, অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র—এগুলো আমাদের মানুষের, দেশবাসীর অতি প্রিয় আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। কিন্তু গত ৩৫ বছর ধরে আমরা দেখছি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো, শক্তিগুলো এই আদর্শ, এই লক্ষ্যকে ভূলুণ্ঠিত করে চলেছে। সবশেষে আপনি যদি ১৪-দলীয় জোটের কথা বলেন, তারা যে মহা-ঐক্য গড়ে তুলেছে, তারা এরশাদের সঙ্গে যেভাবে লেনদেন করে সমঝোতা করেছে, যেভাবে শায়খুল হাদিসের দলকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে, তারপর তো আমাদের সেই আশার জায়গাটা আর থাকছে না। সেখানে তো আমরা বিভ্রান্ত, হতাশ, দুঃখিত, ব্যথিত। এখন আমাদের সামনে একটা নতুন কর্তব্য হয়তো আসছে। আমাদের নতুন করে এই গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রগতি—এ কথাগুলো নিয়ে ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে।

মনজুরুল আহসান বুলবুল : আমরা দর্শকসারি থেকে আরেকটা প্রশ্ন নেব।

দর্শক : আজকের ছাত্ররাই ভবিষ্যতে জাতির কর্ণধার হবে। কিন্তু আমাদের দেশে যেভাবে রাজনীতির চর্চা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে কি কোনো ভদ্র পরিবারের সন্তান রাজনীতিতে যুক্ত হতে উৎসাহ পাবেন?

মতিউর রহমান : আমি একদম পরিষ্কার। আমি নিজে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম দীর্ঘকাল, পুরো ষাটের দশক। বর্তমানে যে অবস্থাতে এসে পৌঁছেছে ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র বন্ধুদের ও ছাত্রসমাজকে বলব, এ ধরনের ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত না হতে, এই ছাত্র আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করতে। আমি সব সময় বলি, এ ধরনের ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করে দিতে।

দর্শক : গত তিন-চার মাস ধরে আমি যা দেখলাম আমাদের সুশীল সমাজের অনুষ্ঠানগুলোতে, তারা কিন্তু খুব ভালো ভালো কথা বলেছেন, নির্বাচন চাই, নিরপেক্ষ লোক চাই। আমরা সবাই জানি, এগুলো খুব বিষয়নির্ভর কথা। জিতলেই দেখা যায় সব ঠিক। মহিউদ্দিন যখন চট্টগ্রামে জিতলেন, তখন কিন্তু ভোটের কারচুপি নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন যখন দেখা যাচ্ছে বিএনপি ক্ষমতায় নেই, এখন কমবেশি সবাই

চলে গিয়েছে, তারপর আওয়ামী লীগ রাজি হয়েছে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত তাদের যতগুলো দাবি ছিল, সেটা আসলেই কি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার জন্য, নাকি তারা হিসাব করে ফেলেছে যে আমরা ১৫১ আসন পাব না বলেই আমরা নির্বাচন করব না। তাই আমাদের প্রথমে এ ব্যাপারটার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেন এবং পরে অন্য কিছু ভাবি। আসলেই কি তা, নাকি অন্য কিছু।

মতিউর রহমান : এ কথাটা আলোচনায় ছিল, বলতে পারেন আছে। যারা নির্বাচনে যাবে, তাদের মধ্যে আলোচনাটা ছিল। আমরা ১৫ বছর পরে একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছি, যখন প্রধান দুটি দল বা জোট তারা কেউই পরাজিত হতে চায় না। উভয়কেই জিততে হবে। এটা সম্ভব নয়। কাউকে হারতে হবে, কাউকে জিততে হবে—এ অবস্থাটাও বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো মানতে চায় না এবং সেটাও আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ বলে আমি মনে করি।

ফরিদ হোসেন : আমার যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে আমরা কী চেয়েছিলাম আর কী পেলাম! নাকের বদলে নরুন। আমরা চেয়েছিলাম যে একটি সরকার পাঁচ বছর থাকার পর চলে যাবে এবং আরেকটি নির্বাচন হবে। আপনিও বলেছেন আপনার লেখায় যে আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্র এবং সেই গণতন্ত্রের লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য আপনি বেশ কতগুলো অ্যাজেন্ডার কথা বলেছেন। কিছু কাজ করতে হবে, কিছু সংস্কার করতে হবে এবং আপনি এ-ও বলেছেন যে এটা বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে সম্ভব নয়। নতুন যাঁরা উপদেষ্টা হয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন 'আমরা জানি না যে আমরা তিন মাস থাকব না ছয় মাস থাকব, কত দিন থাকব আমরা জানি না, সেটা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা বলতে পারব।' তাহলে কি আমরা একটা দীর্ঘস্থায়ী জরুরি অবস্থা এবং এই ধরনের একটা অনির্বাচিত সরকার দ্বারা দেশ শাসনের ব্যবস্থায় পড়ে গেলাম?

মতিউর রহমান : না। সংবাদপত্রকর্মী হিসেবে কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, দল করা বা অংশ নেওয়ার প্রশ্ন আসে না। আমি বলব যে আমরা একটা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেছি। আজকে আপনি যদি আমাকে বলেন যে তিন মাসের মধ্যে একটি ভোটার তালিকা হবে, একটা নির্বাচন হবে, সেটা আমরা গ্রহণ করব, গ্রহণ করে সরকার পাব—এটা আমার কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। আজকে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, কালোটাকার দৌরাত্ম্য,

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতিবাজদের যে অবস্থান—এসব রেখে কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক নির্বাচন সম্ভব নয়। তারপর আপনি যদি বলেন যে একটা ভালো শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন, একটা সুষ্ঠু ভোটার তালিকা, একটা পরিচয়পত্র—এগুলো ছাড়া আপনি নির্বাচনে যেতেই পারেন না। এটা সম্ভব নয়, এটা হবেই না। একই সঙ্গে আমাদের অর্থনীতিকে চাঙা করতে হবে। এই যে কাজগুলো, আমি মনে করি, এ কাজগুলো যথাসম্ভব পুরোপুরি হয়ে যাবে, একসঙ্গে হয়ে যাবে সেটা আমি বলি না। কিন্তু একটা পর্যায় পর্যন্ত হতে হবে। তখন আমরা মনে করব যে একটা নির্বাচন গ্রহণযোগ্য এবং মোটামুটি স্বীকৃত হবে। এটুকু সময় হয়তো আমাদের দিতে হতে পারে। এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আমি কোনো উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলিনি, সেনাবাহিনীর কারও সঙ্গে আমার কথা হয়নি, এটা আমার সাধারণ ধারণা থেকে বললাম।

ফরিদ হোসেন: আপনার লেখাতে আপনি রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান নেতৃত্বকে ধোলাই করেছেন। বাস্তব চিত্রটি কিন্তু আমি ভিন্ন দেখি। এই যে আমরা সাংবাদিক, এই যে চিকিৎসক, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক—তাঁদের যতগুলো পেশাজীবী সংগঠন আছে, তাদের কেউ শেখ হাসিনার, কেউ বেগম খালেদা জিয়ার। মাঝখানে কারও সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী, কারও সঙ্গে বামপন্থী দলগুলো আছে। এই অবস্থায় এটাকে যদি একটা পরিমাপ ধরি, তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে তো দেশের জনগণ আছে। কিন্তু আপনার লেখায় স্পষ্ট হচ্ছে যে তাঁদের কেউ নেই।

মতিউর রহমান: তাঁদের সঙ্গে কেউ নেই, এটা খুব ভুল ব্যাখ্যা হবে। জনগণের একটা বড় অংশ দুই দলের সঙ্গে আছে। লাখ লাখ লোক তাদের মিছিলে জমায়েত হয়। যেকোনো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি লোক তাদের ভোট দেয়। তারা নিশ্চিতভাবে দেশের অত্যন্ত বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি। আবার এটা ঠিক, আপনি যেটা বললেন, কোনো পেশা, কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো জায়গা নেই যেখানে ভাগাভাগি নেই। এবং দেশের একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে যে রাজনৈতিক দলের বাইরেও যে নাগরিক সমাজ বলি—লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, সাংবাদিক—সবাই বিভক্ত। একটা বড় প্রশ্ন আমাদের সামনে যে এ রকম একটা বিভক্ত সমাজ তো চলতে পারে না। এখন একে মেলাবে কে? সমবেত করবে কে? সমঝোতায় নিয়ে আসবে কে? এভাবে সমস্যাগুলো আরও বড় হচ্ছে।

মনজুরুল আহসান বুলবুল: এর সঙ্গে আমি একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে চাই যে এ সরকারটি যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, লোকজন বলাবলি করছিল যে

যারা সুশীল সমাজ, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর আবেদন করছে—তারা, বিদেশি কূটনীতিক, সেনাবাহিনী সবাই মিলে কাজটি করল। কতটা সত্যি?

মতিউর রহমান: এর সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ, কোনো ক্ষেত্রেই নেই।

মনজুরুল আহসান বুলবুল: আমরা যত দূর জানি, এ সরকার এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কিন্তু এ সরকার নির্বাচনের জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এবং তার মধ্যে একটি উদ্যোগ হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু যে নির্বাচন কমিশনকে একটি জোট প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আজকে যখন আলোচনায় সেই প্রসঙ্গটি এসেছে, মহাজোট কিন্তু বলেছে এই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসবে না। কাজেই আমরা যদি দ্রুততম সময়ে একটি নির্বাচনের দিকে যেতে চাই, তাহলে কাজটি কোত্থেকে শুরু করা উচিত?

মতিউর রহমান: আমি বলব যে অবশ্যই এই নির্বাচন কমিশনকে ভেঙে দ্রুত একজন বা দুজন নিয়ে শক্তিশালী, যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে নির্বাচন কমিশন করা উচিত।

শফিকুল করিম: আপনি কি ভাবছেন যে এই নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য, যেটা বললেন যে যোগ্য, সৎ ও নিরপেক্ষ লোককে দিয়ে, এটা খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হবে? এই যোগ্য লোককে বাছাই করা সম্ভব হবে সব রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে?

মতিউর রহমান: এটা একটু গোলমেলে। সব দলের গ্রহণযোগ্যতা আমার কাছে বড় নয়, সত্যিকার অর্থে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ড. ফখরুদ্দীনের সরকার যদি বলেন, তারা যদি একটা সত্যিকারের একজন সাহসী, দক্ষ ব্যক্তিকে দিয়ে নির্বাচন করায়, তাহলে আমরা সবাই মেনে নেব। তিনি তাঁর কাজ দিয়ে প্রমাণ করবেন যে তিনি একটি ভোটার তালিকা করতে পারেন, একটি নির্বাচন পরিচালনা করতে পারেন, তিনি একটি ভালো নির্বাচন দেশবাসীকে উপহার দিতে পারেন, আমরা গ্রহণ করব।

মনজুরুল আহসান বুলবুল: এখানে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুন্দরভাবে একটি নির্বাচন পরিচালনা করবে, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর মনোনয়ন দেবে দলগুলো, কিন্তু দলগুলোর তালিকা ইতিমধ্যে আমাদের সামনে চলে এসেছে এবং সে তালিকাই আপনাকে সম্ভবত হতাশ করেছে। সে অর্থে নির্বাচনটি খুব ভালো হলো, কিন্তু যাঁদের মনোনয়ন দিলেন, তাঁদের তালিকা আপনাকে হতাশ করল। তাহলে সেই

সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর স্বপ্নটার বাস্তবতা আমরা কোথায় খুঁজে পাব?

মতিউর রহমান : সে জন্যই আমার মনে হয় যে আমাদের কিছু সময় নেওয়া ভালো। না হলে এ থেকে আমরা বের হতে পারব না।

দর্শক : জনাব মতিউর রহমান, একটি ভালো নির্বাচন হয়ে গেলে তারপরে আমাদের দেশে একটি সুন্দর অবস্থা বিরাজ করবে—এ কথা আমরা কেউ বলতে পারছি না। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও যদি সহিংসতা বিরাজ করে বা তার আভাস আমরা আগে থেকেই পেয়ে থাকি—সে মুহূর্তে আমাদের কী করণীয়? আমরা কি পারি না দুটি জোট—চারদলীয় ঐক্যজোট কিংবা মহাজোটকে একত্রে এনে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে আগামী পাঁচ বছর, দশ বছর বা তিন বছর বা দুই বছর নিশ্চিন্তে কীভাবে থাকতে পারি, এ ব্যবস্থা নিতে? এ ব্যাপারে আপনারা যাঁরা নাগরিক আন্দোলন করছেন, তাঁরা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না? পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা বারবার ব্যর্থ হচ্ছি এবং এ মুহূর্তে যে জরুরি অবস্থায় আছি, সেটা একটা সাময়িক অবস্থা, এটির সময় খুব কম। সাংবিধানিকভাবে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই এটির স্বীকৃতি নিতে হবে। সবকিছু মিলিয়ে এখন এ অবস্থায়, আমাদের এ মুহূর্তে কী করণীয়?

মতিউর রহমান : আপনার প্রথম প্রশ্নটি হলো, গত ২০ বছর ধরে বাংলাদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সমঝোতার চেষ্টা করেছেন। আপনার মনে আছে, কমনওয়েলথের পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর জেনারেল স্যার নিনিয়ান এখানে এক মাসের বেশি সময় ধরে ছিলেন। আপনার মনে আছে যে আরও বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিছু হয়নি। আমি মনে করি, আজকে আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছি, এই দুই দল বা জোটকে সমঝোতায় নিয়ে আসা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

দর্শক : বিভিন্ন মিডিয়া এবং সুশীল সমাজ সবাই বলছে যে কালোটাকার মালিক যারা, তাদের মনোনয়ন দেওয়া বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয়। আমার প্রশ্ন হলো, কালোটাকার মালিক কারা? যদি আমরা জানি যে আমাদের দেশে কালোটাকার মালিক আছে, তাহলে এ ব্যাপারে কোনো তালিকা আপনার পত্রিকা থেকে প্রকাশ করেন না কেন?

মতিউর রহমান : আমি আপনার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যেকোনো সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এনবিআর চেয়ারম্যান—তাঁদের কাছে দাবি জানাই। এটা তাঁদের দায়িত্ব।

তাঁরা এই কালো তালিকা আমাদের কাছে জানিয়ে দিন, কারা কালোটাকাকে সাদা করে, কোন এমপি-মন্ত্রীরা টাকার হিসাব দেন না, কোন মন্ত্রী-এমপিরা ট্যাক্স দেন না—এ হিসাব দেখা সরকারের দায়িত্ব। আমরা চেষ্টা করি। কিছু করি, কিছু পারি না। এ চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে।

দর্শক: আওয়ামী লীগ শায়খুল হাদিসের সঙ্গে যে চুক্তিটা করেছে, সেই চুক্তিতে আমাদের কোনো দলের বিশেষ করে বাম দলগুলোর কোনো নেতাই কোনো প্রতিবাদ করেননি। সে ক্ষেত্রে আমরা যারা চিন্তাশীল চেতনা লালন করি বা চিন্তা করি, আমরা কোথায় যাব? আপনি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজ আছে। আমরা কি নিশ্চিত যে সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজ ভবিষ্যতে কোনো জোটে যাবে না?

মতিউর রহমান: আওয়ামী লীগ এবং খেলাফত মজলিস যে চুক্তি করেছে, এর জন্য ১৪ দলের অভ্যন্তরে বাম দলগুলো প্রতিবাদ করেছে, নাগরিক সমাজ, সুশীল সমাজ প্রতিবাদ করেছে, আমরা সাংবাদিকেরা বিভিন্নভাবে কথা বলেছি। মিটিং, মিছিল, জমায়েত ইত্যাদি হয়েছে। এ প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে হবে। আমি মনে করি, সুশীল সমাজ, নাগরিক সমাজ, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক—আমাদের কোনো রাজনৈতিক দলে যাওয়া উচিত নয়।

দর্শক: আমি গতকালের *প্রথম আলো*তে মনোনয়ন-বাণিজ্য নিয়ে একটা লেখা দেখেছি। এই মনোনয়ন-বাণিজ্যের বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক দিন ধরেই। গতবার বিএনপিরটা প্রকাশ্যে বলা হয়েছিল। এবার আওয়ামী লীগেরটা প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে, বিএনপিরটা পেছনে বলা হয়েছে। এই মনোনয়ন-বাণিজ্যে আমরা কীভাবে দূর করতে পারি এবং কীভাবে এটা প্রতিকার করে আমরা ভালো ও যোগ্য প্রার্থী পেতে পারি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। আপনারও ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো ইচ্ছা আছে কি না?

মতিউর রহমান: আমি একসময় রাজনীতি করতাম। আগামীতে কোনো দিন কোনো রাজনৈতিক দল করব না, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। মনোনয়ন-বাণিজ্য বন্ধ হওয়া জরুরি দরকার। প্রত্যেকটি দলের ভেতরে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত। এটা বন্ধ না করলে কোনো সুষ্ঠু ও ভালো নির্বাচন হতে পারে না।

দর্শক: স্বাভাবিকভাবে সবাই ভাবেন, সেনাবাহিনী অনেকটাই বিএনপি-ঘেঁষা। এই ভাবকেন্দ্র পরিবর্তনের কারণটা কী? ছাত্রদের ব্যাপারে আপনি যেটা বলেছেন যে ছাত্ররাজনীতির দরকার নেই, কিন্তু আমরা শামসুন্নাহার হলে একটা আন্দোলন দেখেছি। তো ছাত্রদের ব্যাপারে আপনি কি কনসেপ্টটা একটু পরিষ্কার করবেন? কেন আপনি এটা বলছেন?

মতিউর রহমান: শামসুন্নাহার হলের আন্দোলনে ব্যাপক ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। কোনো বিশেষ দল, গোষ্ঠী বা সংগঠনের আন্দোলন ছিল না। আমিও সেই আন্দোলন সমর্থন করেছি। এ ধরনের যেকোনো আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করব। সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগ-বিএনপির নয়। যে সমস্যাটা আমাদের এখানে দেখা যায়, যখন একটা সরকার পরিবর্তন হয়, যাঁরা সরকার গঠন করেন, তাঁরা চান যে শক্তি, সংগঠন, সংস্থার ওপরে তাদের প্রভাববলয় সৃষ্টি করে রাখতে, তাদের পছন্দমতো লোকগুলোকে নিয়ে আসতে। কেউ সেটা পারেন, কেউ পারেন না। এটা দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো কাজ হয় না।

দর্শক: আমি মুহাম্মদ জসিমউদ্দিন। কালকিনি পৌর কমিশনার। আমি একটা জিনিস বলতে চাই, এম এ আজিজ সাহেব তিন মাসের ছুটিতে গিয়েছিলেন। তিন মাস তো শেষ হয়ে এল। উনি যদি আবার আসেন নির্বাচন কমিশনে, তখন দেশে কি স্বস্তি থাকবে, না আগের মতো হবে?

মতিউর রহমান: এম এ আজিজকে নিয়ে দেশে কোনো নির্বাচন করা সম্ভব নয়। এম এ আজিজকে যেতে হবে। সে জায়গায় নতুন কোনো প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করতে হবে।

শফিকুল করিম: এই অবস্থায় আপনি কি একজন আশাবাদী, না নিরাশাবাদী?

মতিউর রহমান: আশাবাদী, কিছুটা নিরাশাবাদীও। কিন্তু আশার দিকে লক্ষ রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, সামনে যেতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে, সাংবাদিক হিসেবে আমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

শফিকুল করিম: এতক্ষণ যা আলোচনা হলো, আপনি কিন্তু বারবার নিরাশার কথাই বলেছেন আমাদের কাছে।

মতিউর রহমান: ওই যে বললাম, আশার সঙ্গে নিরাশা। নিরাশা আছে, আশাও আছে। না হলে বেঁচে থাকব কীভাবে? কাজ করব

কীভাবে? এগোব কীভাবে?

মনজুরুল আহসান বুলবুল : আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন যদি আমি বলি যে আমরা যত আলোচনাই করি না কেন সামরিক বাহিনী একটি বাস্তবতা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি বাস্তবতা, চারদলীয় জোট একটি বাস্তবতা, মহাজোট একটি বাস্তবতা। এ চারটি বাস্তবতা সামনে রেখে রাজনৈতিক শক্তিগুলো চাচ্ছে দ্রুততম সময়ে নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। এটা কত দ্রুত, কীভাবে, কত সুন্দরভাবে করা সম্ভব?

মতিউর রহমান : একটা মহাসংকটের একটা মহাসমাধান প্রয়োজন আমাদের। সে সমাধানে রাজনৈতিক শক্তি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, সামরিক বাহিনী—সবাইকে মিলেই পথটা খুঁজতে হবে। তবে কতটুকু সময় লাগবে, এটা বলা কঠিন। খুব দ্রুতও সম্ভব নয়, আবার বিরাট লম্বা সময় দেওয়াও ঠিক নয়। আমি মনে করি, যত দ্রুত করতে পারি, আমাদের জন্য তত ভালো। কিন্তু একটা কথা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা, কালোটাকা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক দৌরাত্ম্য বন্ধ করা এবং ভালো, শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন করা, ভালো ভোটার তালিকা করা—এগুলো জরুরি। এগুলো ছাড়া নির্বাচনে গিয়ে কোনো সমাধান হবে না।[৫৪]

৩১ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। ওই দিন ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আমি রাজনীতিতে স্বস্তিবোধ করি না। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি বাধ্য করলে রাজনীতিতে যোগ দেব। আমি রাষ্ট্রপতি হতে চাই না। কারণ, এটা হচ্ছে আলংকারিক পদ। আমি কাজের মধ্যে বেঁচে আছি।'[৫৫]

৫ ফেব্রুয়ারি সরকারের সাবেক সচিব এ টি এম শামসুল হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে শপথ নেন।[৫৬] কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান সাবেক জেলা জজ ছহুল হোসেন ও ব্রিগেডিয়ার (অব.) সাখাওয়াত হোসেন।

রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী জোর কদমে সরাসরি ঢুকে পড়ছে, এমন আলামত পাওয়া যাচ্ছিল। ৫ এপ্রিল ২০০৭ ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পাঠানো তারবার্তায় বলা হয়, মইন ও অন্য সামরিক নেতারা সামরিক সমর্থনপুষ্ট রাজনীতিকদের নিয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক দল বানানোর উপায় খুঁজছেন। গুঞ্জন আছে যে এ ধরনের একটি দলে ভেড়ানোর

জন্য সামরিক বাহিনী দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা দুর্নীতির মামলাগুলোকে ভয় দেখানোর কাজে ব্যবহার করছে। বার্তায় আরও বলা হয়, সংসদ নির্বাচনে যাওয়ার আগে সামরিক বাহিনী একটি 'জাতীয় ঐকমত্যের সরকার' তৈরির চেষ্টা করছে এবং অব্যাহত গুঞ্জনের সঙ্গে 'কিংস' পার্টি গঠনের উদ্যোগ খাপ খায়। মইনের গলায় 'নতুন ধরনের গণতন্ত্রের' কথা শোনা যাচ্ছে এবং এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নতুন ধরনের ভারসাম্য তৈরি করতে সরকারকাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবা হচ্ছে। দুই 'পরিবারতান্ত্রিক' রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে 'দুই ভদ্রমহিলাকে' স্থায়ীভাবে দেশত্যাগের জন্য সামরিক বাহিনী তাঁদের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে।' বার্তায় রাষ্ট্রদূত বলেন :

> '...আমরা একটি নির্বাচনী রোডম্যাপ ও সময়সূচির জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছি...। রাজনৈতিক দল সংস্কারের প্রতি আমরা সমর্থন অব্যাহত রাখব এবং এভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞার দ্রুত অবসানের জন্য চাপ দেব। সামরিক বাহিনীর যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক ভূমিকা—মইনকে রাষ্ট্রপতি করে কোনো ধরনের সামরিক সরকার গঠন করা হলে তা হবে একটা ভুল। সাধারণভাবে, আমরা জরুরি অবস্থা তাড়াতাড়ি প্রত্যাহারের জন্য তাগিদ দিচ্ছি।...সামরিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে এবং আমরা বেশ পরিষ্কার ভাষায় আমাদের বার্তা তাঁদের জানিয়ে দিচ্ছি।[৫৭]

১২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত তাঁর দ্বিতীয় ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ ঘোষণা দেন যে ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার আগেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; 'প্রয়োজনের চেয়ে এক দিনও বেশি ক্ষমতায় থাকতে চায় না বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার।'

# দমকা হাওয়া

নির্বাচনী প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলো জনতুষ্টির স্লোগান দেয়। উদ্দেশ্য একটাই—নানান ওয়াদার জালে ভোটারের মনটাকে ধরা। ৮ অক্টোবর ২০০৬ ঢাকায় 'কমনওয়েলথ ও গণতন্ত্র: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

> ডালভাতের স্লোগান দিয়ে একদল ক্ষমতায় আসে। যখন অন্য দল মাছভাতের কথা বলে তখন ভোটাররা কৌতূহলী হয়ে ওঠে, সন্দেহ করে। আর দুধভাতের কথা বললে—যা মায়েরা ছেলেমেয়েদের জন্য সব সময় আশা করে থাকেন—ভোটাররা অবিশ্বাসে ফেটে পড়বেন। তাদের হয়ে আমি শুধু বলি—
>
> আমি জানি না স্বাধীনতা কী,
> দিনে চারবেলা খাবার বা চারটা স্যান্ডউইচ—
> এসব আমি কোনো দিন শুনিনি।
> আমি খুব খুশি হব
> শুধু ভাত
> দিনে তিনবার নয়
> দুবেলা পেলেই।
>
> ...নবম জাতীয় সংসদের জন্য দেশ অস্থির, চঞ্চল। সাধারণ মানুষ নির্বাচন চায়। একদিনই তো তারা স্বাধীন।[১]...

'জনগণের ক্ষমতায়ন' নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো এবং নাগরিক সমাজ অহরহ কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ শুধু নির্বাচনের দিনটিতেই নিজেদের ক্ষমতা বুঝতে পারে, কিছুটা হলেও। নির্বাচনের সময় একবার

হলেও প্রবল ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা নাগরিকদের ঘরের দরজায় টোকা দেন, ভোট চান। ভোটাররা 'এক দিনের বাদশাহ'। ভোটার তথা নাগরিকদের কাছে রাজনীতিবিদদের সব সময়ের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করার মতো অনুকূল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে জনমনে সাধারণ আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এ ব্যাপারে ধারাবাহিক রাজনৈতিক উদ্যোগ ছিল না। এ ধরনের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরির ঘোষণা দিল এক-এগারোর সরকার।

এক-এগারোর কারিগররা কয়েক দিন সময় নিলেন একটু গুছিয়ে বসতে। তাঁরা ভাবলেন, সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটু বসা দরকার, দরকার মতবিনিময়ের। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাবের গ্রিন রেস্তোরাঁয় তাঁরা সমবেত হলেন দুপুর সাড়ে বারোটায়। উপস্থিত সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মইন ইউ আহমেদ, নবম ডিভিশনের অধিনায়ক মে. জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক মে. জেনারেল সাদিক হাসান রুমী, এনএসআইয়ের ব্রিগেডিয়ার লোদি, ডিজিএফআইয়ের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার এ টি এম আমিন এবং সেনাসদরের অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল। এ ছাড়া সাবেক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার (অব.) সাখাওয়াত হোসেন, মে. জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের এবং ব্রিগেডিয়ার (অব.) শাহেদ আনামও উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবদুল আউয়াল মিন্টু (সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই), মাহবুবুর রহমান (আইসিসি), মিজানুর রহমান শেলী (সাবেক মন্ত্রী), অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ (অর্থনীতিবিদ), আবুল হাসান চৌধুরী (সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী), অধ্যাপক আতাউর রহমান (সভাপতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি), হোসেন জিল্লুর রহমান (গবেষক), নুরুল হুদা (সাবেক আইজিপি), আবদুল হাই শিকদার (কবি), ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক (জামায়াতে ইসলামী), শাহ আবদুল হালিম, শাহাবুদ্দিন এম আমিনুজ্জামান এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান।[২] তিনটি দৈনিক এবং একটি সাময়িকীর সম্পাদক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন মতিউর রহমান (*প্রথম আলো*), মাহ্‌ফুজ আনাম (*দ্য ডেইলি স্টার*), মতিউর রহমান চৌধুরী (*মানবজমিন*) এবং ইরতিজা নাসিম আলী (*প্রোব* ম্যাগাজিন)। কলাম লেখক সাদেক খানও এসেছিলেন।

আলোচনার সূত্রপাত করেন জেনারেল মইন। তিনি বলেন, 'সভ্য সমাজের সব নিয়ম-নীতির বাইরে চলে গেছে দেশ। বিগত বছরগুলোতে অনেক জঞ্জাল জমেছে এবং কোনো সিস্টেমই কাজ করছে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই জঞ্জাল সাফ করে দেশকে ঠিক পথে নিয়ে আসাটা খুবই দরকার।' তিনি আরও বলেন, দেশকে ঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছে

বর্তমান সরকার। এটা দেশবাসী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রশংসা পেয়েছে। উপস্থিত সবার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এই উদ্যোগে আপনাদের সবার সমর্থন দরকার, যাতে করে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ চলতে পারে। আশা করি আপনারা সবাই সমর্থন দেবেন।'[৩]

ওই সভায় আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক সংস্কার এবং এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়। মইন বলেন, বিভিন্ন খাতের জন্য কয়েকটি টিম কাজ করবে। তারা আলোচনা করে ওই খাতের সমস্যা কী, তা বের করে সমাধানের জন্য সুপারিশ তৈরি করবে। এ জন্য সাত থেকে দশ দিন সময় লাগবে। পরে এই সুপারিশমালা সরকারকে দেওয়া হবে বাস্তবায়নের জন্য। এই টিমগুলোকে নিয়ে তৈরি হবে মনিটরিং অ্যান্ড অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল। এটা থাকবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের (এনএসসি) অধীনে। শিগগিরই এনএসসি গঠন করা হবে।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখটি উল্লেখ করে মইন বলেন, ওই দিনই দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে অনেকেই, এমনকি তাঁর কয়েকজন সহকর্মীও জানতে চেয়েছিলেন—'দেশে কী হচ্ছে, সেনাবাহিনী কী করছে, আপনি চুপচাপ বসে আছেন কেন?' তাঁর জবাব ছিল—'সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা জাতির সেবায় যথাসম্ভব নিজেদের নিয়োজিত রাখব।' এখন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তাঁরা কাজ করছেন।[৪]

সভায় কেউ কেউ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আরও উপদেষ্টা নেওয়ার অনুরোধ জানান। মইন বলেন, এ নিয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক বাধা থাকতে পারে। হয়তো বিশেষ সহকারী বা উপ-উপদেষ্টা হিসেবে কয়েকজনকে নেওয়া যেতে পারে।

দুর্নীতির অভিযোগে রুই-কাতলা না ধরে চুনোপুঁটিদের কেন ধরা হচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাবে মইন বলেন, 'এ নিয়ে কাজ হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, দুর্নীতিবাজরা খুবই চালাক এবং তারা যথেষ্ট প্রমাণ রাখে না। তবে তাদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আপনারা শিগগিরই এর ফল দেখবেন।' ভোটার পরিচয়পত্রের প্রসঙ্গ উঠলে মইন জাতীয় পরিচয়পত্রের ওপর জোর দেন।[৫]

সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ী নেতা আবদুল আউয়াল মিন্টু লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই সভার প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> আবদুল আউয়াল মিন্টু : যখন ওয়ান-ইলেভেন এল, আমার ধারণা, বাংলাদেশের একটা বৃহদংশ লোক এর প্রতি সাপোর্টিভ ছিল। মানুষ

ভেবেছিল, এবার বোধ হয় একটা রাজনৈতিক সংস্কার হবে।

আমি দেখেছি যে ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা নিয়োজিত, তারাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার চাচ্ছিল, যাতে করে দেশের উৎপাদনশীলতা আরও বাড়ে, যাতে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়। সে জন্য অনেকেই উৎসাহী ছিল ওয়ান-ইলেভেনের প্রতি।

একদিন হঠাৎ জেনারেল আমিন আমাকে কল করল। বলল, আগামী পরশু কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাবে আমাদের জেনারেল সাহেব...

মহিউদ্দিন আহমদ : ডিজিএফআইয়ের আমিন?

মিন্টু : হ্যাঁ। বলল, জেনারেল মইন ইউ আহমেদ একটা প্রেজেন্টেশন দেবে। সাথে অন্য লোকজনও থাকবে। যদি আপনি আসতে পারেন। বললাম, আমার তো কাজ নাই। যখন বলবেন তখনই আসতে পারব।

কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাবে গিয়ে দেখি, ব্যবসায়ী সেক্টরে আমি একা। আর উকিল আছে, সাংবাদিক আছে, অমুক আছে, সবাই আছে। ওনারা একটা প্রেজেন্টেশন দিল। কী প্রেজেন্টেশন বলে এগুলিকে?

মহিউদ্দিন : পাওয়ার পয়েন্ট।

মিন্টু : পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন।

মহিউদ্দিন : জেনারেল মইন নিজেই দিলেন?

মিন্টু : মইন সাহেব বলছিলেন, আরেকজন এটা দেখাচ্ছিল। অ্যাকচুয়ালি যে কথাগুলো ওনারা বলেছেন, আমি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাবস্ক্রাইব করি। আমাদের এখানে সংস্কার লাগবে—এসব নতুন কথা না। আমরা চাচ্ছিলাম এটা। সবাই চাচ্ছিল। লাস্টে বলল যে আপনাদের দায়িত্ব-টায়িত্ব নিতে হবে। তারপর আমরা চলে এসেছি।

আমি দুদিন ধরে চিন্তা করেছি। দায়িত্ব নেওয়া তো পরে আসবে। কিন্তু ওনারা যে প্রেজেন্টেশন দিল—ওনারা এই করবে, সেই করবে। এটা সবাই জানে যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা মিলিটারি সাপোর্টেড। এটা আমরা সবাই জানি। জানা এক জিনিস, আর ওনাদের একটা লিগ্যাল ভিত্তি—রাষ্ট্র পরিচালনার—রাষ্ট্র পরিচালনায় ওনাদের ইনক্লুশনের একটা লিগ্যাল ভিত্তি ছাড়া কার সাথে আপনি কথা বলবেন।[৬]

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস কি রাজনীতিতে আসছেন—এমন একটা প্রশ্ন ছিল জনমনে। ভারত ও বাহরাইন সফর শেষে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ফিরে এসে ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি মন্তব্য করেন, 'দেশ ও মানুষের প্রয়োজনে আমি রাজনীতিতে

নামতে রাজি আছি। মনে হচ্ছে, আমার রাজনীতিতে যাওয়ার দরকার আছে। তবে এ জন্য জনগণের সমর্থন ও মতামতের অপেক্ষায় আছি।...দেশে একটা ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে স্বস্তি এসেছে। এখন আমি মনে করছি আরও কাজ করার সুযোগ ও সময় এসেছে। এ জন্য রাজনীতিতে নামতে হলে আমি নামব।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দল গঠনের জন্য যে ব্যাকরণ মানতে হবে, এমনটি তিনি মনে করেন না। তিনি বলেন, দুর্নীতিবাজ কেউ যেন রাজনীতিতে ঢুকতে না পারে। 'দুর্নীতিমুক্ত যারা আছে, তাদের নিয়ে নতুন রাজনীতি এবং নতুন বাংলাদেশ শুরু করতে হবে।'[৭]

ড. ইউনূস ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা যাওয়ার আগে ঢাকা বিমানবন্দরে 'দেশবাসীর কাছে একটি খোলা চিঠি' দিয়ে রাজনৈতিক দল তৈরির আগ্রহের কথা জানান এবং সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা, সমর্থন, পরামর্শ ও অংশগ্রহণ কামনা করেন। খোলা চিঠির শিরোনাম ছিল, 'আপনার উদ্দেশে আমার ব্যক্তিগত চিঠি'। চিঠিতে তিনি 'কী পরিস্থিতিতে দেশের বহু মানুষ আমাকে রাজনীতিতে আসার অনুরোধ করে আসছেন এবং কেন আমাকে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হয়েছে'—এর ব্যাখ্যা দেন। নাগরিকদের কাছে চিঠি মারফত পরামর্শ চেয়ে তিনি বলেন :

> অতীতের হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ উদ্যমে আমাদের সকলের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার কর্মযজ্ঞ সৃষ্টির উপযুক্ত রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার এখনই উপযুক্ত সময়। এ কাজে যদি আমাকে অগ্রসর হতে হয় তাহলে আপনার এবং আপনার মতো আরও সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন।...নতুন রাজনীতি সৃষ্টির প্রচণ্ড একটা উদ্যোগ সৃষ্টি করতে না পারলে পুরনো রাজনীতি থেকে পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। হাল্কা সমর্থনে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।[৮]

১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ইটিভি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি'র পুরস্কার তুলে দেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইউনূস বলেন, তিনি বাইরের কোনো চাপে দল গঠন করছেন না; দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি নতুন দল করার চিন্তাভাবনা করছেন। জাতীয় সরকারের মডেল অনুসরণ করবেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'দেশে রাজনৈতিক সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য চুক্তি করার কথা আমি বলেছি। তারপর নির্বাচন। নির্বাচনে যে দল জয়ী হবে, তারা পাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ। আর যাঁরা পরাজিত হবেন, তাঁরা পাবেন উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ। সরকার চলবে যৌথ পরিচালনায়।'[৯] ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি 'নাগরিক শক্তি' নামে

একটি দল তৈরির ঘোষণা দেন।

গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'কেউই আইনের উর্ধ্বে নন। আমাদের দেশের এটা তো গণতন্ত্র না। এটা দলীয়তন্ত্র। জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় চিন্তাভাবনা ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আইনকে সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হলো জাতীয় সরকারের কাজ। নির্দলীয় সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমি মনে করি, সফলভাবে এগোচ্ছে।...তাদের গোছানোর জন্য কিছু সময় দেওয়া প্রয়োজন।' ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে রাজনীতিতে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা রাজনীতিকে ট্রেড ইউনিয়ন মনে করি। এখানে কারও প্রবেশাধিকার নেই। এটা ঠিক না। আমি মনে করি, এ দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির চর্চা হলে সব দল গিয়ে ড. ইউনূসকে বলত আপনি আমাদের দলে আসেন এবং দীর্ঘদিন ধরে ড. ইউনূসের সৎ-যোগ্য প্রার্থীর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে রাজনীতিতে আসাকেও নেওয়া যেতে পারে।...যারা অসৎ রাজনীতি ও দেশের সম্পদ চুরি করে, তারা রাজনীতিবিদ না। তারা চোর।'[১০]

১৭ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডির দলীয় কার্যালয়ে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা কারও নাম উল্লেখ না করে বলেন, সুদখোর দিয়ে দারিদ্র্যমুক্তি হয় না। তবে দারিদ্র্য লালন করে অনেক কিছু পাওয়া যায়। তাঁর মতে, সুদখোর, ঘুষখোর আর দুর্নীতিবাজের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দেশে যা কিছু অর্জন, তা ত্যাগী রাজনীতিবিদদের মাধ্যমেই হয়েছে। গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অক্ষুণ্ন রাখার দাবি জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ঢালাওভাবে রাজনীতিবিদদের গালি দেওয়া ঠিক নয়। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উঠে আসা রাজনীতিবিদেরা দেশের কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। তবে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা রাজনীতিবিদেরাই সর্বনাশের মূল। ইউনূসকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'রাজনীতিবিদদের গালি দিলেও অনেকেরই আবার রাজনীতি করার খায়েশ জাগতে দেখি। যদি খারাপই হবে তবে রাজনীতি করার খায়েশ হবে কেন।'[১১]

২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় আবুল মাল আবদুল মুহিতের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে যায় এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ টি এম শামসুল হুদা ও নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে সোয়া এক ঘণ্টা কথা বলে।[১২]

মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানালেও জোটের শরিকেরা প্রকাশ্যেই এই মতের বিরোধিতা করতে শুরু করে। এলডিপির নির্বাহী সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ ২ মার্চ তাঁর দলে কয়েকজনের

যোগদান করার সময় সাংবাদিকদের বলেন, তাড়াতাড়ি নির্বাচন দিয়ে দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিয়ে লাভ নেই। আগে ভালো, শিক্ষিত ও দক্ষ লোকদের জন্য নির্বাচনপ্রক্রিয়া সোজা করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের বিচার ও ভোটার আইডি কার্ড না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন না দিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।[১৩]

৪ মার্চ বরিশাল সার্কিট হাউসে এক সুধী সমাবেশে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্দেশ্য, যেখানে কালোটাকা কিংবা পেশিশক্তি নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। ফলে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচনে এগিয়ে আসবেন। সরকারের নেওয়া সংস্কারমূলক পদক্ষেপের কথা বলতে গিয়ে তিনি সুশীল সমাজকে এর কৃতিত্ব দেন। তিনি বলেন, এসব সংস্কারের দিকনির্দেশনা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা দীর্ঘদিন ধরে দিয়ে আসছেন। তিনি আরও বলেন, জনগণই হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস এবং এ সরকার জনগণের সরকার। 'রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রজাতন্ত্রের প্রভু নয়। বিগত দিনে প্রজাতন্ত্রের বেশির ভাগ কর্মকর্তা শুধু রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির কারণে বিতর্কিত হয়েছেন। আজ সময় এসেছে আত্মশুদ্ধির।...দুর্নীতি দমন করাই বর্তমান সরকারের প্রধান কাজ।...আমাদের সুযোগ এসেছে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলার। তাহলেই আগামী নির্বাচনে সৎ, যোগ্য প্রার্থীরা এগিয়ে আসবেন।[১৪]

শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার কর্মসূচি দ্রুত শেষ করে জুনের (২০০৭) মধ্যে নির্বাচন দাবি করেন। অন্যদিকে বিএনপি চায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদের ছয় মাসের মধ্যে, অর্থাৎ ১১ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন। এত অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন দাবি করায় শেখ হাসিনা দলের মধ্যে সমালোচিত হন। ৪ মার্চ দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, এ সরকার ভোটার আইডি কার্ডসহ বিভিন্ন সংস্কার করছে, সব দাবি মানছে। এ কাজগুলো শেষ করার জন্য সরকারকে সময় দেওয়া দরকার। জুনের মধ্যে নির্বাচন করা বাস্তবসম্মত নয়। প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাকও শেখ হাসিনার সমালোচনা করে বলেন, 'দেশি-বিদেশি সব মহলেই যোগাযোগ রেখে আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা উচিত ছিল।' আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এ এইচ এন আশিকুর রহমান দলের মধ্যে যৌথ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় অংশীদার। তাই তাদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। 'কারণ আমরা বঙ্গভবনে গিয়ে তাদের বৈধতা

দিয়ে এসেছি।' প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন, 'দেশের সুশীল সমাজ প্রগতিশীল। তারা সব সময়ই আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে ছিল। আমাদের সঙ্গে যেন কোনোভাবেই তাদের ব্যবধান তৈরি না হয়। এখন কোনো রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় নেই। এ পরিস্থিতিতে সুশীল সমাজ বড় ভূমিকা রাখতে পারে।' যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুকুল বোস শেখ হাসিনার উদ্দেশে বলেন, 'নেত্রী, আপনার বক্তব্য দেওয়ার সময় সতর্ক হওয়া উচিত।' জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, 'তাদের সময়সীমা বেঁধে না দিলে আরও কালক্ষেপণ করতে পারে। আমরা তাদের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছি। তাদেরও উচিত সংস্কারের পাশাপাশি মূল কাজ নির্বাচনপ্রক্রিয়া শুরু করা।'[১৫] (সূত্র : *মানবজমিন*)

শেখ হাসিনার সমালোচনা করে কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হয় ভীষণ। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ঢাকার বাইরের কয়েকটি জেলার কর্মীরা আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি অফিসের বাইরে বিক্ষোভ করেন এবং সমালোচনাকারীদের দল থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানান। তাঁরা হাসিনার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে বলেন, যাঁরা নেত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা দলের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। হাসিনা মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কথা শোনেন, তবে কোনো মন্তব্য করেননি। এই ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়, আওয়ামী লীগের মধ্যে দুটো প্রবণতা তৈরি হয়েছে—একটি হাসিনার পক্ষে, অন্যটি বিপক্ষে।[১৬]

শেখ হাসিনা ১৩ মার্চ ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে সে দেশের ভিসা সংগ্রহ করেন। ভিসা নেওয়ার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত গীতা পাসির সঙ্গে বৈঠক করেন।[১৭]

১৪ মার্চ বিকেলে ধানমন্ডির সুধা সদনে তাঁর সঙ্গে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট কথা বলেন ভারতের হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী। ১৬ মার্চ ভোরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন। রওনা হওয়ার আগে ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল সুধা সদনে এসে সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে আবার হাসপাতালে ফিরে যান। সভানেত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রেসিডিয়াম সদস্য জিল্লুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।[১৮]

এক-এগারোর পালাবদলে অনেকের মতো ব্যবসায়ী নেতা আবদুল আউয়াল মিন্টুও বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত এবং কীভাবে সামনের দিকে এগোনো যাবে, এ নিয়ে তিনি রীতিমতো কিছু হোমওয়ার্ক করেন। ১১ মার্চ ২০০৭ সেনাপ্রধান জেনারেল

মইনকে একটি লিখিত চিঠির মাধ্যমে তিনি অনেকগুলো পরামর্শ দেন এবং কিছু পর্যালোচনামূলক মন্তব্য করেন। তাঁর মন্তব্যগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো :

ক. বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশ পরিচালনা করেছেন বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা। তাঁদেরকে কোনো মরমি সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। জনসাধারণকে প্রভাবিত করার অসাধারণ ক্ষমতার নেপথ্যে ছিল একধরনের কিংবদন্তিতুল্য ঐতিহ্য। যে কিংবদন্তি-ঐতিহ্যকে জীবন্ত রাখা হয়েছে নিরন্তর প্রচার-প্রচারণা ও 'দৈব' আচার-আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে। এতে জনগণের মাঝে নিজস্ব ক্ষমতা ও দায়িত্বের সাথে নিজ ক্ষমতা ব্যবহারের বুনিয়াদ গড়ে ওঠেনি। অতএব প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃত্ববিহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে ঐ কিংবদন্তিসুলভ নেতাদের হঠাৎ করে স্থলবর্তী হওয়া যেমন কঠিন, তেমনি জবরদস্তিসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে খুব বেশি দিন টিকে থাকাও সম্ভব নয়। ধরে নেয়া যায় অসম্ভব।

খ. জবরদস্তিমূলক ক্ষমতার ব্যবহার বা দমনমূলক নীতির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কোনো স্থিতিশীল ব্যবস্থা নয়। এ ধরনের ব্যবস্থা কোনোভাবেই ক্ষমতার ভিত্তিকে মজবুত বা স্থায়ী করে না। মনে রাখা ভালো, ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার বা জবরদস্তিমূলক শক্তি প্রয়োগ অস্থায়ীভাবে কর্তৃত্ব সৃষ্টি করে, কিন্তু এর একটা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আছে। এসব প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় কারণ বদলে যায়। কারণ বদলে গেলে ফলাফলও বদলে যায়।

গ. যদি বর্তমান অবস্থাকে দীর্ঘদিন একইভাবে চলতে দেয়া হয় তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন অনেক লোক বা গোষ্ঠী যারা প্রতিনিধিত্ববিহীন এই সরকারের আওতায় যৌথ বাহিনীর হাতে নিগৃহীত হয়েছে, তারা সম্মিলিতভাবে ভাবনাহীন হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠবে। কেননা তারা যদি এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নেতিবাচক কিছুতে সহায়তা করে বা কোনো গোলযোগ ঘটায়, তাহলেও তাদের হারানোর কিছু নেই। তাই তারা সুযোগ পাওয়ামাত্রই যেকোনো গোলযোগপূর্ণ অবস্থাকে লুফে নেবে ও সুযোগকে কাজে লাগাবে। উচ্চাভিলাষী গডফাদাররা এর নেপথ্যে থাকবে। এমনকি বিদেশি চরদের মদদও থাকতে পারে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে বর্তমান প্রতিনিধিত্ববিহীন কর্তৃপক্ষকে অমান্য করার প্রবণতা হঠাৎ করে বেড়ে যাবে। এমনকি তারা বলার সুযোগ পাবে যে তারা যা করছে তা

সম্মানজনক। কারণ, তারা মরিয়া হয়ে কাজ করছে গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য।

ঘ. যেসব গোষ্ঠী বর্তমানে কর্তৃপক্ষের জন্য অদূর ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে :

১. ধারা-ঐতিহ্য ও পারিবারিক ঐতিহ্যের আনুকূল্যে সবচেয়ে দুই শক্তিশালী দলের দলনেতার অত্যন্ত অনুগত ও জোরালো সমর্থকরা;

২. গ্রেপ্তার হওয়া রাজনীতিক ও তাদের একান্ত সহযোগী ও পুঁজিপতিরা;

৩. অবৈধ স্থাপনা, বাড়িঘর উৎখাত ও ধ্বংস; অর্থাৎ দেশব্যাপী উচ্ছেদ অভিযানে অসন্তুষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ :

৪. পল্লী অঞ্চলে ইউএনও, ডিসি ও সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতাদর্পীসুলভ আচরণে ক্ষুব্ধ জনসমাজ;

৫. যে সমস্ত লোক পালিয়ে বেড়াচ্ছে, যেমন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্য ও তাদের সমর্থকেরা, পৌরসভার চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ ও তাদের সহযোগীরা ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ ও তাদের সমর্থকরা, স্বার্থান্বেষী মহল ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ;

৬. কায়েমি স্বার্থে আবদ্ধ যেমন বন্দর, পরিবহন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ব্যাংক, সিটি করপোরেশন, স্থলবন্দর, বিমানবন্দর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা।

উল্লিখিত দুই শক্তিশালী নেতা যদি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পান, তাহলে তাঁরা রাজনৈতিক দলের সাথে উল্লিখিত নিদারুণ হতাশায় ভয়ভাবনাহীন জনগোষ্ঠীগুলোর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনের জন্য আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ প্রয়াসে তারা বহু ব্যবসায়ী, বিশেষ করে যারা হুমকির মুখে রয়েছে এবং যারা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রচ্ছায়ায় বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেছে, তাদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এসব বিত্তবান ব্যবসায়ী নিজ স্বার্থেই এ দুই নেতার পাশে জড়ো হয়ে সমর্থন জানাবেন।

- এ জন্যই এই দুই নেতার (নেত্রীর) সাথে অতি দ্রুত একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে। সমঝোতা হলে তাঁদের যেকোনো একজনকে বেছে নিয়ে এক সাথে কাজ করলে বর্তমান সরকারের জন্য ভালো হবে।
- কোনো সরকারের পক্ষেই কেবলমাত্র শক্তি ও নৈতিকতার ওপর নির্ভর করে কোনো দিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। শাসনের কর্তৃত্ব অবশ্যই

কোনো না কোনো আকারে প্রতিনিধিত্বশীল ও বৈধতার সিলমোহরযুক্ত হতে হবে।

- এ কথা সত্য যে এ পর্যন্ত সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তার প্রতি মোটামুটি পর্যায়ে জনসমর্থন রয়েছে। আর তার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটা নৈতিক অধিকার তৈরি হয়েছে যার সুবাদে এই সরকার আপাতত তাদের শাসন পরিচালনায় সমর্থ হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও যথেষ্ট আকারের কর্তৃত্ব কখনো তৈরি হবে না বা যথেষ্ট মেয়াদের জন্য বৈধতা তৈরি হবে না, যা জনপ্রতিনিধিত্বের সুবাদে তৈরি হয়।

উপসংহার :

সবচেয়ে ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাধরও কখনো যথেষ্ট ক্ষমতাবান নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ক্ষমতা ও শক্তিকে তিনি সুসংগতি ও বৈধতায় রূপান্তর করতে না পারেন।

'ভীতি' যদি জনক হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত 'কর্তৃত্ব' হলো জননী। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যকে হাতের মুঠোয় আনতে ও রাখতে হলে 'ভীতি' ও 'কর্তৃত্বের' মধ্যে অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত মিলন হতে হবে। নইলে আনুগত্য অবিরামভাবে বহাল থাকে না। জনসমর্থন অবিরামভাবে বজায় রাখতে হলে সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা, জনসাধারণকে সেবাপ্রদান প্রতিষ্ঠানসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা ও শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির সঠিক মিশ্রণ প্রয়োজন। এ ধরনের মিশ্রণের মিথস্ক্রিয়ায় মানুষের জন্য যে সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে, সেগুলো সাধারণ মানুষের মনে আশা-প্রত্যাশা সৃষ্টি করবে। যে আশা-প্রত্যাশা সাধারণ জনগণকে সামনের দিকে তাকাতে ও এগিয়ে যেতে প্রেরণা জোগাবে। এগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সামান্য পরিমাণ হলেও আশু স্বস্তি আনবে। এগুলো করা হলে আনুগত্যের বিষয়টি দীর্ঘায়ু হবে।[১৯]

মিন্টু খোলামনেই তাঁর মনের কথাগুলো তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। তিন সপ্তাহের মাথায় তিনি গ্রেপ্তার হন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস আবারও সংবাদ শিরোনাম হন। তাঁকে অনেকেই সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে ভাবছিলেন। আমেরিকার প্রভাবশালী দৈনিক *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ ইউনূসকে নিয়ে 'বাংলাদেশি প্ল্যানিং রান ফর প্রেসিডেন্ট' শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ১৬ মার্চ ঢাকার *মানবজমিন* একটা সংবাদ ছাপে। ঢাকা থেকে টেলিফোনে নেওয়া মতামতের ভিত্তিতে নোরা বাস্তানি লেখেন, এটা সত্য না-ও হতে পারে, তবে এটা ঠিক যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে

সম্পর্ক মন্দ নয়। তাঁকে (ইউনূসকে) বিএনপি ও আওয়ামী লীগের একটি বিকল্প ভাবা হতে পারে, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ভিশন ও ক্যারিশমার অভাব রয়েছে।[২০]

ইউনূসের সমর্থনে এগিয়ে আসেন জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে। ১১ জানুয়ারি যদি রাষ্ট্রীয় জরুরি আইন জারি করা না হতো, তাহলে দেশটা আজ কোথায় যেত, তা কল্পনা করতে পারেন?...সেনাবাহিনী দেশটাকে রক্ষা করেছে।' যারা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে রাজনীতিতে নামাচ্ছে, তিনি কি তাদের একজন, এই প্রশ্নের জবাবে সিরাজুল আলম খান বলেন, 'ইউনূস রাজনীতিতে জনপ্রিয় না হতে পারেন, এ জন্য সময় লাগতে পারে। তবে তিনি অনেক গুণের সমন্বয়ে একজন মানুষ।'[২১]

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সামনে রেখে বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি ২ এপ্রিল ঢাকায় 'রিথিংকিং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট : সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' শিরোনামে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। প্রবন্ধ উপস্থাপন ও প্রশ্নোত্তরকালে মইন বলেন, 'দেশকে পরিবারতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করা হয়েছে। জনগণই নির্ধারণ করবে তাদের ভাগ্য উন্নয়নে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন রয়েছে কি না। তবে এখন সময় এসেছে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য কাজ করা।' মঞ্চে উপবিষ্টদের মধ্যে ছিলেন প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, বিশেষ অতিথি তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আতাউর রহমান এবং অধ্যাপক জিল্লুর রহমান খান।[২২]

সম্মেলনের আয়োজক ও আলোচকদের কেউ কেউ ছিলেন বিগত চারদলীয় সরকারের গোঁড়া সমর্থক। আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসেবে প্রচার করা হলেও একজন পাকিস্তানি কলাম লেখক ছাড়া আর কোনো বিদেশি এতে যোগ দেননি। এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এবং সেনাপ্রধানের অংশগ্রহণ ছিল দৃষ্টিকটু।

জেনারেল মইনের ভাষণটি ছিল লিখিত। অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন, ভেবেচিন্তেই বলেছেন। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'দ্য চ্যালেঞ্জিং ইন্টারফেস অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড সিকিউরিটি।' বক্তৃতার একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত ইলেকটিভ ডেমোক্রেসিতে যেতে পারি না।' মইনের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ১১ এপ্রিল *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক মন্তব্য প্রতিবেদনে সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন :



দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

পরিবারতন্ত্রের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা হয়েছে
—সেনা প্রধান

৬ মন্ত্রীসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু। গ্রেফতার ৭

আমিনুল দুলু নাদিমের বিরুদ্ধে আরো দুটি মামলা

জ্বালানি তেলের দাম আরেক দফা বাড়লো

নয়াদিল্লীতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধন

পরিবারতন্ত্রের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার দাবি জেনারেল মইনের

> তাঁর ২ এপ্রিলের বক্তৃতা আমাদের অতীতের সামরিক নেতাদের বক্তব্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।...অতীতেও সেনাশাসকেরা ধীরে ধীরে সরাসরি রাজনীতিতে এসেছেন। কিন্তু এতে করে সেনাবাহিনীর বা দেশের কোনো মঙ্গল হয়নি। কারণ, তার ফলে সামরিক বাহিনীর পেশাদারত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।...মইন ইউ আহমেদ নিশ্চয় তাঁর পূর্বসূরিদের ইতিহাস জানেন। জনগণ চায় না সেই অতীত ফিরে আসুক।[২৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আতাউর রহমান সভাপতির ভাষণে ১১ জানুয়ারির পরিবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, 'এক অসহিষ্ণু ও ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতির করাল থাবায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যখন গভীর সংকটের মুখে পতিত, সেই অবস্থায় দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ১১ জানুয়ারিতে জরুরি অবস্থার মাধ্যমে এক নতুন বাংলাদেশের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আরেকটি মাইলফলক।' তিনি আরও বলেন :

> দুই প্রধান বিরোধী দলের অসুস্থ রাজনৈতিক চর্চা, অবিশ্বাস এবং বৈরিতা

বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে কলুষিত করেছে।...রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তন ও দলের সংস্কার বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার জন্য অপরিহার্য।...'একটি জ্ঞানভিত্তিক এবং সৎ' নেতৃত্বের মাধ্যমে জনকল্যাণকে নিশ্চিত করা আজ বাংলাদেশের নতুন অভিযাত্রার প্রধান চ্যালেঞ্জ।[২৪]

অধ্যাপক আতাউর রহমান হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠায় জল্পনা শুরু হয়, নতুন সরকার হয়তো বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আস্থাভাজন গোষ্ঠী তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে এটা ছিল কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর সুবিধাবাদের পেছনে ছোটার একটা আলামত। বিশেষ করে অধ্যাপক আতাউর রহমানের মতো ব্যক্তির সেনাপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টার পেছনে 'মতলব' থাকতে পারে বলে কেউ কেউ সন্দেহ করেন। অধ্যাপক আতাউরের কর্মকাণ্ড যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল না। ১ মে ২০০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের অভিযোগ ছিল। ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৫২ জন ছাত্রকে প্রথম শ্রেণি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে জড়িত থাকার জন্য ওই বিভাগের চারজন শিক্ষককে আজীবনের জন্য পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। এই চারজনের একজন হলেন আতাউর রহমান। তিনি পরীক্ষা কমিটির প্রধান ছিলেন। শাস্তিপ্রাপ্ত অন্য তিনজন হলেন পরীক্ষা কমিটির সদস্য মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, এ কে এম শহীদুল্লাহ ও শহীদুল হক মুন্সি।[২৫]

৮ এপ্রিল ঢাকায় দুটি আলাদা আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বিরাজমান পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। গভর্ন্যান্স কোয়ালিশন নামের একটি এনজিও আয়োজিত স্থানীয় সরকারবিষয়ক এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, বাংলাদেশ শুধু রাজনীতিবিদদের জন্য নয়, এ দেশ সকলের; অথচ রাজনীতিবিদেরা কখনোই সাধারণ মানুষকে ক্ষমতার অংশীদার হতে দিতে চান না। এই মনোভাব পাল্টাতে রাজনীতিবিদদের বাধ্য করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের অভিন্ন স্বার্থ ও মিলিত বাধার কারণেই এ দেশে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী হয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরা যে গণতন্ত্র বিশ্বাস করে, সাধারণ নাগরিকেরা সেই গণতন্ত্র চায় না।[২৬]

একই দিন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসে 'উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য বিশ্বায়নকে



যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী

কার্যকর করা' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, দুর্নীতিপরায়ণতার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা শক্তি জোগাচ্ছে। তবে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে 'রোগী যেন এত বড় সার্জারি সহ্য করতে পারে।' বর্তমান সরকারকে হতে হবে দুর্নীতিবিরোধী, কিন্তু ব্যবসাবান্ধব। অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড যেন সচল থাকে।[২৭]

এক-এগারোর পালাবদলের পর 'রাজনৈতিক সংস্কার' নিয়ে খোলামেলা আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এই আলোচনায় রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও বেশ উচ্চকিত ছিলেন। যদিও এ ধরনের আলোচনা ও সংলাপ কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে, এক-এগারোর পর তা নতুন মাত্রা পায়। মানুষ রাজনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী—এ রকম একটা ধারণা থাকায় সংস্কার প্রশ্নে আলোচনার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয়। ৬ মে ২০০৭ *প্রথম আলোর* উদ্যোগে ঢাকায় 'রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার' শিরোনামে একটি নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে অংশ নেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলি খান, এম হাফিজউদ্দিন খান ও সুলতানা কামাল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

দিলারা চৌধুরী, সাবেক সেনা কর্মকর্তা মে. জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম এবং সিপিডির নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তাঁদের বক্তব্য এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম : যদি আমরা '৮১ সালের আওয়ামী লীগকে এবং '৮২ সালের বিএনপিকে এতিম মনে করি, তাহলে সেই এতিম অবস্থায় তাদের পরিচর্যার জন্য, লালন-পালনের জন্য দুজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে যার যার দল ডেকে এনেছিল—সেই দলগুলো তো এখন আর এতিম নেই। তারা বড় হয়েছে, তারা নিজেরাই নিজেদের দেখভাল করতে পারে। এখনো বলা হয় যে খালেদা জিয়া না থাকলে কী হবে বা শেখ হাসিনা না থাকলে কী হবে—এটা বাতুলতা মাত্র। এটা কি তাঁদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না যে তাঁদের অবর্তমানে দলগুলো কেমনভাবে চলতে পারে—তার বন্দোবস্ত আগে থেকে করে রাখা?

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হলে এই মুহূর্তে সংস্কার কারা করবেন—এই প্রশ্নটা আসে। অফিশিয়ালি দায়িত্ব দাঁড়াচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আর আন-অফিশিয়ালি দাঁড়াচ্ছে তাদের সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, সমর্থক যারা—তাদের ওপর। সুতরাং এ সংস্কার করতে হলে তাদের নিজেদের দুর্বলতাটা কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এবং জিয়াউর রহমানের পত্নী খালেদা জিয়ার একেকটি উক্তি ১০ লাখ বাঙালির সম্মিলিত উক্তির সমান। এটা মনে রেখেই আমাদের আগাতে হবে। যত কিছুই বলি না কেন, তাঁরা নেত্রী ছিলেন, দেশ শাসন করেছেন, তাঁদের পেছনে মানুষ আছে।

দিলারা চৌধুরী : বিগত ১৫ বছর সেনাবাহিনী কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা বলা যেতে পারে। বরং এ দুই নেত্রীই নিজেদের সমর্থনটাকে বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনীর যে প্রশাসন, তাদের সে জায়গায় অনেকটা হস্তক্ষেপ করেছেন পরোক্ষভাবে। তাঁদের ব্যর্থতার জন্যই আমাদের গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়েছে। দ্বিমতটা এখানেই যে গণতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে যখন সমস্যা দেখা দেয় তখন তারা নিজেরাই সেই নেতা বা নেত্রীকে কিন্তু সরিয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক দলই যদি না চায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, তাহলে আমরা সিভিল সোসাইটি বলুন আর সেনাবাহিনী যা-ই বলুন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এটা সম্ভব না। দলকে অবশ্যই লাগবে। আমাদের জনশক্তি বা রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক তাঁরা। কিন্তু দলের ভেতর থেকেই তাঁদের

কোনো প্রকার চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে না।

এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়া এবং সমন্বয়টা নেই। সেনাবাহিনী একটা চিন্তা করছে, সরকার একটা চিন্তা করছে। এটাও তো সরকারের মাথায় আছে যে তাদের এক্সিট রুটটা কোথায় হবে, কী করে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। সুতরাং পদক্ষেপ নিতে হবে অত্যন্ত সতর্কভাবে এবং এই দুই নেত্রীকে মাথায় রেখে, যেন তাঁরা কোনোমতেই জনগণকে সরকার ও সেনাবাহিনীর মুখোমুখি করতে না পারে।

এম হাফিজউদ্দিন খান: একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে, যে পরিস্থিতিতে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সে সমস্যাগুলোর সমাধান না করলে আবার পুরোনো অবস্থায়, আগের সেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, দুর্নীতি ইত্যাদি যে আবার শুরু হবে—সে পরিস্থিতি কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ এ সরকারের ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ব্যর্থ হলে সেটা দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য ভালো হবে না। তাহলে তারা কী করবে? তারা রাজনৈতিক সংস্কারগুলো করবে। এত দিন আমরা যে গণতন্ত্র পেয়ে এসেছি, এটা একটা নির্বাচিত একনায়কতান্ত্রিক সরকার ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটার জন্য শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়া দায়ী নন। আমাদের সাংবিধানিক বিভিন্ন দোষত্রুটি আমরা গত ২০-৩০ বছর দেখেছি বা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য যেসব উপকরণ দরকার, সেগুলো আমাদের নেই।

এই ওয়ান-ইলেভেনের মাধ্যমে সমস্যাগুলো সমাধান না করে, যতই আমরা একে অগণতান্ত্রিক বলি, নির্বাচন দিলে ঠিক হবে না। এ অবস্থার জন্য দায়ী এ দলগুলোই। তারাই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এ দায় তাদেরই বহন করতে হবে। সুতরাং তারা বলতে পারবে না যে নির্বাচন দাও। যাহোক, সংস্কারের মাধ্যমে আমরা এমন গণতন্ত্র চাই, যেটা আসলেই গণতন্ত্র। তবে হ্যাঁ, এটা করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে, এতে যেন বেশি সময় না লাগে। অ্যাভয়েডেবল ডিলেকে দূর করতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আর্থসামাজিক উন্নয়নটা যতখানি হওয়া দরকার ছিল ততখানি হলো না কেন? এবং সেটার উত্তর সবাই সোজাসুজিভাবে দিয়েছে—সুশাসনের অভাব। আমরা যাদের হাতে দায়িত্ব দেই, তারা যথাযথভাবে আমাদের দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারছে না। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি বিকৃত পরিস্থিতিতে আছে। সেই কারণে আমাদের নির্বাচকমণ্ডলী সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারছে না। বাংলাদেশের

গণতন্ত্র একটি দুষ্ট রাজনীতির বাতাবরণে আটকে আছে। দলগুলোর ভেতরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি না থাকার কারণে নীতিভিত্তিক না হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় একটি নেতিবাচক অপঘাত পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর এসে পড়ছে। যদি আমি অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে দেখি, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভাবনা আমাদের প্রচলিত রাজনৈতিক আচার-আচরণের কাছে জিম্মি হয়ে আছে।

এই অবস্থাকে ভাঙার জন্য আমাদের যে রাজনীতি, তা তার সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। কারণ, এই দুর্বলতাগুলো তো এই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটাকে নিরসন করার জন্য একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব ছাড়া আর কোনো সমাধান আমরা খুঁজে বের করতে পারিনি। যখন পারলাম না, এবারের ১১ জানুয়ারির পরিবর্তনটা আসতে হলো। আমাদের বাইরের সংগঠিত শক্তির সহযোগিতা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ল। এটাই সত্য। এটার ভেতর দিয়েই রাজনীতির কাঠামোর দুর্বলতাটা প্রকাশ পেয়েছে। যে ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখছি এই সরকারের আমলে, সেই পদক্ষেপগুলো, উদ্যোগগুলো আগামী দিনে স্থায়ী হবে কি না—এই আশঙ্কা এখন মনের মধ্যে এসেছে।

রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয়টা যেভাবে এসেছে, সেটার কিন্তু তিনটা দিক আছে। একটা হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা, একটা হলো দলের ভেতরকার সম্পর্ক আর একটা হলো দলের সঙ্গে তার নির্বাচকমণ্ডলী বা জনগণের সম্পর্ক কী এবং দলের সঙ্গে রাষ্ট্রের কী সম্পর্ক হবে; তার ভেতরে নির্বাচন কমিশনও একটা। এই তিনটা অংশে সংস্কারের জায়গা আমি দেখছি।

সুলতানা কামাল : সাধারণত একটি প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই থাকে জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ নিরাপত্তাবোধ দেওয়া। আমার ভেতরে যদি আমি কোনো প্রক্রিয়ার ভেতর নিরাপত্তাবোধ না পাই, তাহলে সে প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা আমার জীবনে নেই। অতএব এত দিন ধরে আমরা গণতান্ত্রিক ধারার যে ব্যবস্থার মধ্যে থেকেছি, সে ব্যবস্থার অনেক কিছুই আমার জন্য অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যবস্থার কোনো সুফল আমার জীবনে আসছে না। আমি যদি গণতন্ত্রের আদর্শ দৃষ্টিকোণ নিয়ে থাকি, সেখানে আমি বলতে বাধ্য, বিগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ভালোভাবে কাজ করেনি। অতএব সেখানে সংস্কারের প্রয়োজনটা আসছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন তিন মাসের জন্য আসত, তাদের নির্দিষ্ট একটা কাজ ছিল, তারা এসে একাই সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ করে দেবে; বাকি

যা কিছু তা নির্বাচিত সরকার করবে। কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রকৃতিটা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। তারা ১৮ মাস পদে থাকবে। তারা নিজেরাই এই সময় দিয়েছে। এরপরও আমরা জানি না যে তাদের মেয়াদ কবে শেষ হবে। কাজেই বর্তমান সরকারের জন্য কিন্তু একটা দায়বদ্ধতা আসবে। এখানে এসব সমস্যায় ব্যাপারটিও চলে আসবে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান কারা করবে? এটা যদি বর্তমান সরকার পরিষ্কার না করতে পারে—আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, আমরা আজকে যে অবস্থায় এসে পড়েছি সেটা কিন্তু গণতান্ত্রিক পন্থায় একটা 'দুর্ঘটনা'। এ অবস্থা থেকে আমাদের উঠে আসতে হবে। যারা এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের টেনে তুলতে এসেছিল, যে জন্য তাদের আসাটা আমরা সমর্থন করেছিলাম, সে সমর্থনটা কিন্তু আর থাকবে না। ব্যাপারটায় স্বচ্ছতা থাকতে হবে। দায়দায়িত্বটা থাকতে হবে।

আকবর আলি খান: তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদের সামনে মোটামুটি ছয়টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটা হলো দেশের আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই কাজটি তারা মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে করেছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম (জবাবদিহি ব্যবস্থা), গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবাইকে কাজ ঠিকমতো করতে বাধ্য করা। তার মধ্যে আছে দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল, মানবাধিকার কমিশন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র ও জনগণের অধিকার রক্ষার কবচ। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সবই পচে গিয়েছিল অথবা এদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাদের দায়িত্ব ছিল। এ ব্যবস্থার পুনর্বাসনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

তিন নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অনেক অর্থনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন এবং সেখানেও ইতিমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাজ শুরু করেছে। চতুর্থ সংস্কার হলো রাজনৈতিক সংস্কার। রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে ইতিমধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। পঞ্চম সংস্কার হলো প্রশাসনিক সংস্কার এবং ষষ্ঠ সংস্কার হলো সাংবিধানিক সংস্কার।

রাজনৈতিক দলের সংস্কার আইন করে বিশেষ কিছু করা যাবে না। আমরা এ আইনটা নিয়ে যেতে চাচ্ছি রাজনৈতিক দলের সংস্কারে, নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে (রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপলস অর্ডারে অন্তর্ভুক্ত করে)। এই আইনের ভিত্তি খুব দুর্বল হবে। আমার মনে হয় না যে এমন আইন

করা যাবে, যে আইনগুলো প্রয়োগ করে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কার করতে বাধ্য করা যাবে। কাজেই রাজনৈতিক দলের যে সংস্কার, এটা রাজনৈতিক দলের ভেতর থেকে আসতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বড়জোর জনমত সৃষ্টি করতে পারে। আমরা যদি আমাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা শক্ত রাখি, আমাদের আদালত, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে এর কোনো না কোনোটাতে দুর্নীতিবাজরা আটকে যাবে।[২৮]

রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে ড. ইউনূস আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার তোপের মুখে পড়েছিলেন। এ ছাড়া নাগরিক সমাজের যাঁরা প্রথম দিকে তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন, পরে তাঁরা অনেকেই থাকেননি। এ অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য সুখকর হয়নি। ৩ মে ২০০৭ তিনি প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করেন এবং এর পরপরই জানিয়ে দেন যে কোনো রাজনৈতিক দল তৈরির ইচ্ছা তাঁর আর নেই। 'রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হলাম' শিরোনামে তাঁর একটি বিবৃতি ৪ মে ২০০৭ *আমার দেশ* পত্রিকায় ছাপা হয়। বিবৃতিতে দল তৈরির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে সেই উদ্যোগ থেকে সরে আসার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন :

আমার ধারণা মতে, নতুন ধারার একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত সফল রাজনৈতিক দল গঠন করতে যে সব উপাদান দরকার, তার থেকে বিচ্যুত হব না—এই দৃঢ় সংকল্প অটুট রেখে আমি দল গঠনের চেষ্টা করে গেছি। যে ভঙ্গিতে অগ্রসর হলে একটি নতুন রাজনৈতিক ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে বলে মনে করেছি, সেভাবেই আমি এগিয়েছি। এ কাজ করতে গিয়ে ক্রমেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, যাদের সঙ্গে পেলে এ রকম দল গঠন করে জনগণের সামনে একটি সবল ও উজ্জ্বল বিকল্প রাখা সম্ভব হতো, তাদের আমি সঙ্গে পাচ্ছি না। এদের মধ্যে কেউ বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন, আবার কেউ রাজনৈতিক দলে না থেকেও দেশের রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহী। তাঁরা সবাই নতুন ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হোক—এটা চান। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনে তাঁরা উৎসাহী প্রবক্তা। কিন্তু আমি তাঁদের সঙ্গে আনতে পারিনি। যাঁরা প্রথম থেকে উৎসাহ দেখিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের উৎসাহও দেখলাম ক্রমে কমতে শুরু করেছে।

তখন নিজেদের মধ্যেই একটি প্রশ্ন উচ্চারিত হতে আরম্ভ করল—আরও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, নাকি প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে অপেক্ষা করব? নাকি দল গঠনের উদ্যোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেব? আমি দুর্বল দল গঠনের বিরোধিতা

করলাম। দুর্বল দল নিয়ে দেশে নতুন ধারার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির চেষ্টা না করে বরং আমরা অপেক্ষা করি অন্য কেউ এই প্রচেষ্টা নিক এবং সফল হোক।

আমি চেষ্টা করেছি। আমার সঙ্গে যে যেখানে ছিলেন, তাঁরা চেষ্টা করেছেন। আমরা আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন ধারার রাজনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা আবার তুলে ধরলাম। এখন অন্য কাউকে এ শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা বিপুলভাবে সফল হোক—এটাই কামনা করি।[২৯]

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের রাজনীতিতে আসা বা না আসা নিয়ে আলোচনা ইউনূসকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। মূলধারার বড় রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে বিকল্প একটি ধারার চিন্তা ছিল নাগরিকদের একটি অংশের মধ্যে। ৬ মে ২০০৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সংলাপে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নোবেল বিজয়ের পর ড. ইউনূস জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে একটা দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন। এবং সেই দায়িত্ববোধ থেকেই হয়তো তিনি রাজনীতিতে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেটা করে দেখাতে পারলেন না। 'কিন্তু বাংলাদেশে নতুন দলের চাহিদাটা রয়েই গেল। এটা ব্যক্তির বিষয় নয়'।[৩০]

দল তৈরির ব্যাপারে ড. ইউনূস যথেষ্ট পেশাদারত্বের পরিচয় দেননি বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের ওই সময়ের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না। লেখকের সঙ্গে মান্নার কথোপকথনে বিষয়টি উঠে এসেছে :

মহিউদ্দিন আহমদ : ওই সময় প্রফেসর ইউনূসের সঙ্গে কি আপনার কোনো ইন্টারেকশন হয়েছিল?

মাহমুদুর রহমান মান্না : পরে হয়েছে। প্রফেসর ইউনূস আমার ডাইরেক্ট টিচার ছিলেন। আমাকে চিনতেন, জানতেন, স্নেহ করতেন। তখন এ রকম বুঝি নাই। ওনার বাসায় কাউকে অ্যালাউ করতেন না। আমার এক সিনিয়র ফ্রেন্ড ছিলেন, গার্মেন্টসে, দেলোয়ার ভাই। উনি যখন জানলেন যে আমার টিচার, আমাকে বললেন, 'আমাকে ওনার কাছে একবার নিয়া যান। এত বড় একজন মানুষ, আমি দেখব।' নিয়ে গেছি। অনেকক্ষণ ছিলাম। দেলোয়ার ভাই জিজ্ঞেস করছে, 'করলেন কী আপনে, কিছু তো বুঝলাম না। দায়িত্ব নিলেন না। পার্টি করতে গেলেন, মান্না ভাইকে নিলেন না।'

আমি বলি, তখন ইউনূস সাহেব যদি বলতেন দলে আসতে, আমি কিন্তু হয়ে যেতাম। এ রকম একটা ইয়েতে ছিলাম। কিন্তু উনি তো আমাকে

বলেননি। ওনার ভাই জাহাঙ্গীর আমার ব্যাচমেট। সে-ও আমাকে কিছু বলেনি। আনিস মাঝে মাঝে যায়। আনিস আর আমি একসঙ্গে পড়তাম। আনিস আমাকে কোনো দিন কিছু বলেনি।

মহিউদ্দিন : কোন আনিস?

মান্না : ওই যে সিটি মেয়র। যেহেতু বলেননি, আমি আর আগ্রহ করে যাইনি। আমি ড. কামালের দলে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। উনি তখন কেবল গণফোরাম করে। উনি আমাকে ডাকেন-টাকেন নাই। তো আমি কীভাবে যাব। দুইটাই—আল্লাহ আমারে বাঁচায়া দিছে। যা-ই হোক, আমি তখন বুঝতাম না।

দেলোয়ার ভাই ড. ইউনূসকে উল্টা বললেন, 'মান্না ভাইকে বললেন না? ওনাকে তো সব পার্টি পছন্দ করে? আপনাকে উনি পছন্দ করে। আপনি বললে উনি... ।'

—আমি তো তখন খবর দিয়েছিলাম?

—আমাকে খবর দিয়েছেন? কই, না? আমাকে তো কেউ খবর দেয়নি?

—কেন, আনিস কিছু বলে নাই?

মহিউদ্দিন : এটা ইউনূস সাহেব বলেছেন?

মান্না : হ্যাঁ। আমি বললাম যে আনিস কী বলবে। কিছু বলেনি। কী প্রসঙ্গে যেন আসল, বা আমিই বললাম যে আপনি বললে হয়তো যাব কি যাব না ভাবতাম।

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তার মানে আমার সম্পর্কে উনি জানেনই না বোধ হয়। হলে উনি আমাকে স্পেস দেবেন না কেন? যদি দল করতে চান?

ইউনূস সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমার একবারও মনে হয় নাই যে উনি সেই সময় ক্ষমতার জন্য কিছু করেছেন। আমার এখনো মনে হয় না। পরবর্তীকালে উনি যখন পার্টি করতে গেলেন, এটা তিনি কী করলেন, তা আমি বুঝলাম না। এসএমএস পার্টি আবার হয় নাকি?

মহিউদ্দিন : এটা কি একটা বিশাল ব্লান্ডার হয়েছে?

মান্না : জাহাঙ্গীরকে (ইউনূসের ছোট ভাই) আমি বললাম, কী করলা? ইব্রাহীম ভাইয়ের (ইউনূসের ছোট ভাই) সঙ্গে দেখা হয়েছে। সবার কাছে ঘুরে ঘুরে গেছি যে এই প্রশ্নটা করি। স্যারকে আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি। বরং পরবর্তীকালে একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে, ড. কামাল তো ড. ইউনূসকে গাইডেন্স দিতে পারতেন—'আপনাকে ফুল রাইট দিচ্ছি, আপনি কী করবেন, করেন।' উনি পারতেন। হি ইজ আ ডুয়ার, আ

পারফরমার। কিন্তু পলিটিকস কেন করতে গেলেন? ড. কামাল তো কনস্টিটিউশন বোঝেন!

মহিউদ্দিন: বঙ্গবন্ধু তো ড. কামালকে ওভাবেই রেখেছিলেন, অ্যাডভাইজারি রোলে।

মান্না: ওটা ভালো করেছিলেন। হি ওয়াজ ডেফিনিটলি আ ব্রিলিয়ান্ট ম্যান। শুধু এইটুকু রাখেন, তার চেয়ে বেশি কিছু না।[৩১]

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের রাজনৈতিক দল তৈরির চেষ্টা এবং পরে সেখান থেকে সরে আসার বিষয়টি ছিল রীতিমতো অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স। তাঁর দল বানানোর উদ্যোগ যে সফল হবে না, এ ব্যাপারে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী শুরুতেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ইউনূসের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর কথাও হয়। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাফরুল্লাহ এ প্রসঙ্গে খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম:

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: ওনার পার্টি করার শখ ছিল। প্রথমে উনি এটা প্রকাশ করলেন কামাল হোসেনের গণফোরামের এক মিটিংয়ে। এটাই ছিল ওনার রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রথম প্রকাশ। দ্বিতীয়টা হলো, উনি বললেন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটাবেন।

মহিউদ্দিন আহমদ: এসএমএস পার্টি।

জাফর: আমি ভাবলাম, এসব হবে না। জনসাধারণ তো এসএমএস দেখে না। রাজনৈতিক দলের যে তিতিক্ষা থাকে, কষ্ট থাকে, তা ওনারা করতে পারবে? হবে না।

আমার শাশুড়ির খুব শখ, সবাই ইউনূসের পাশে দাঁড়াও। উনিই ফোন করে আমার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করলেন। ব্রেকফাস্ট মিটিং হলো।

মহিউদ্দিন: আপনার বাসায়?

জাফর: না, ওনার বাসায়। অনেকক্ষণ আলাপ হলো। আমি পরিষ্কারভাবে বললাম, ইউনূস ভাই, আপনি সত্যিই পলিটিক্যাল পার্টি করবেন? এটা কিন্তু কঠিন কাজ। দুই ঘণ্টার মতো আলাপ হয়। উনি পার্টি করতে চান।

মহিউদ্দিন: আপনাদের মধ্যে দুই ঘণ্টার আলাপের রেজাল্ট কী?

জাফর: এ নিয়ে আমি দুবার বসেছিলাম। বললাম, ইউনূস ভাই, আপনার পয়লা কাজ হবে, আপনাকে 'আমি' বলা ছাড়তে হবে। পাঠ তৈরি করবেন আপনিই। কিন্তু বলবেন, 'আমরা করেছি'। এটা হলো রাজনীতির পয়লা পাঠ। আর আপনার বিদেশ যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

—আমার তো দুইটা ইমপর্ট্যান্ট ইয়ে আছে। একটা ভেনেজুয়েলায়।

—ঠিক আছে, এটা ইমপর্ট্যান্ট। শাভেজের সঙ্গে দেখা করবেন।

—চায়নায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। প্লেন পাঠাবে বিল গেটস।

হোসেন জিল্লুরকে উনি কাজে লাগিয়েছেন। বললাম, অন্যদের দায়িত্ব দেন। বলুক, তারা কী পরিবর্তন আনবে, লোকের হাতে কী ক্ষমতা থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনাকে এখানে থাকতে হবে। আপনাকে অনেকে চেনে। তারপরও পাঁচ বছর আপনাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে।

মহিউদ্দিন : হোসেন জিল্লুর ছাড়া আর কে কে ছিলেন?

জাফর : চিটাগাংয়ের আরও কয়েকজন ছিলেন।

আমি হোসেন জিল্লুরকে বললাম, কত দূর কী করলা? জনগণের কাছে তো যেতে হবে? আমার পার্টি আমার পার্টি বললে তো হবে না?

ইউনূস ভাইকে বললাম, শাভেজের কাছে যাবেন, চায়না যাবেন, পদত্যাগ করে যান।

মহিউদ্দিন : গ্রামীণ ব্যাংক থেকে পদত্যাগ করতে বলেছেন?

জাফর : হ্যাঁ। বললাম, গ্রামীণ তো সাপোর্টিভ হবেই। আপনি ওখান থেকে পদত্যাগ করেন।

আমি পারস্যু করে ওনাকে পদত্যাগ করালাম।

মহিউদ্দিন : উনি কি পদত্যাগ করেছিলেন?

জাফর : এটাও ইতিহাস। বিল গেটসের প্লেনে চায়না যাওয়ার আগে উনি পদত্যাগ করলেন। তবারক হোসেন হলো তাদের চেয়ারম্যান। আমি তাদেরকে ধরলাম। ওরা বলল, আমাদের গ্রামীণ ব্যাংক চলবে কী করে?

দেখেন, আপনারা চালিয়ে নেন। ওনাকে জাতির জন্য ছেড়ে দেন। নেশনকে লিড করার মতো আমাদের কোনো লোক নেই। উনিই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। ওনার ট্যালেন্ট আছে, সারা পৃথিবী চেনে। ওনাকে আপনারা টাইনেন না।

তবারক হোসেন সাহেব বোর্ডে পাস করিয়ে ফেললেন। তারপর আমাকে ফোন করলেন—এটা হইছে।

উনি ফিরে এলেন চায়না থেকে। এয়ারপোর্টে নেমেই বললেন,

—ওটা কি করেছেন?

—ওটা তো পাস হয়ে গেছে?

—না না, ওটা পাস করাবেন না।

ওটা যদি উনি মেনে নিতেন, তাহলে আমার মনে হয় এটা একটা ঐতিহাসিক কাজ হতো।

মহিউদ্দিন : উনি তো মে মাসেই (২০০৭) ডিক্লারেশন দিলেন যে পার্টি করবেন না।

জাফর : উনি খুব ভালো লোক, সজ্জন। ওনার হলো কি, উনি একলা চলার লোক। গ্রামীণ ব্যাংকের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো খালেদ শামসকে রিটায়ার করিয়ে দেওয়া। সরকারি চাকরি থাকা সত্ত্বেও, হি ওয়াজ অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আদর্শগত কারণে এসেছিল। লেখাপড়া জানা লোক।

মহিউদ্দিন : সিএসএস পরীক্ষায় উনি সারা পাকিস্তানে ফার্স্ট হয়েছিলেন বলে শুনেছি।

জাফর : হ্যাঁ, আমাদের গৌরব। গ্রামীণ ব্যাংকের আজকের যে বৈভব, তার পেছনে কিন্তু খালেদ শামস। রেলওয়ে দিয়ে সাইবার অপটিক লাইন এখানে গ্রামীণফোনের জন্য আনা হয়েছিল। এটা কিন্তু এনেছে খালেদ শামস, পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে।[৩২]

রাজনৈতিক সংস্কারের ঢেউ আছড়ে পড়েছে আওয়ামী লীগে। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা মনে করছেন, দলের ভেতরে সংস্কার ছাড়া বর্তমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। দলের মধ্যে এ নিয়ে চলছে কানাঘুষা, গুঞ্জন ও কথাবার্তা। দলের তিন প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ঘন ঘন বৈঠক করছেন। অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য আরেক প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু সিঙ্গাপুরে। সেখান থেকে তিনি দলের সংস্কার প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে দল বাঁচানোই মুখ্য বিষয়। দলের সংস্কার প্রশ্নে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তিনি অবান্তর হয়ে পড়বেন।[৩৩]

সরকারের সঙ্গে সমঝোতা তৈরির ব্যাপারে সংস্কারপন্থী নেতারা আগ্রহী। তাঁরা মনে করেন, শেখ হাসিনার 'ভুল সিদ্ধান্ত ও অতিকথনের কারণে' আওয়ামী লীগ এখন বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। ১২ জুন ২০০৭ রাতে গুলশানে দলের অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক আলী আশরাফের বাসায় এক দফা বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের মতামত নেওয়া হয়। বৈঠকে তাঁরা বলেন, 'শেখ হাসিনার ভুল নেতৃত্বের কারণে আওয়ামী লীগ নেতাদের মাশুল দিতে হচ্ছে। সবার মতামতের গুরুত্ব দিলে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতো না।'[৩৪]

রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নে বিএনপিও বেশ উত্তাল। এ ব্যাপারে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে অনুকূল সাড়া না পাওয়ায় কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা বেশ ক্ষুব্ধ। দলের অন্যতম নেতা লে. জেনারেল (অব.)

মাহবুবুর রহমান ও আশরাফ হোসেন জানিয়েছেন, সংস্কারপন্থী প্রায় ৫০ জন সাবেক মন্ত্রী-সাংসদ মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার কাছে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। বেগম জিয়ার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে তাঁরা সংস্কারের পক্ষে শতাধিক সাবেক মন্ত্রী-সাংসদের সই জোগাড় করেছেন। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য জেনারেল মাহবুবুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, মে. জে. (অব.) জেড এ খান, যুগ্ম মহাসচিব আশরাফ হোসেনসহ কয়েকজনকে নিয়ে একটি ছায়া কমিটি তৈরি হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সৎ, যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের সই জোগাড়ের কাজ চলছে। দলের দুর্নীতিবাজদের একটি তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে।[৩৫]

সংস্কারের চূড়ান্ত রূপরেখার প্রথম পর্যায়ে বিএনপির শীর্ষ পদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। প্যানেলে জাতীয় সংসদের স্পিকার জমির উদ্দিন সরকার, স্থায়ী কমিটির সদস্য সাইফুর রহমান, মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও ভাইস চেয়ারম্যান এম কে আনোয়ার আছেন। ১২ জুন আশরাফ হোসেন, সেলিমা রহমান, নজরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক রেজাউল করিম, গৌতম চক্রবর্তীসহ দলের প্রায় এক ডজন নেতা মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে দেখা করে আর কালক্ষেপণ না করে তাঁকে দলের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানান।[৩৬]

১৬ জুন রাতে সংস্কারপন্থী নেতারা মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে তাঁর বাসায় দফায় দফায় বৈঠক করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দলের সহসভাপতি চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, উপদেষ্টা জেড এ খান, যুগ্ম মহাসচিব আশরাফ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম, সাবেক অর্থ প্রতিমন্ত্রী শাহ মোহাম্মদ আবুল হোসেন, সাবেক সাংসদ সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, জহিরউদ্দিন স্বপন, নজির হোসেন, সৈয়দ আবুল হোসেন, জিয়াউল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার শহিদুজ্জামান, মাসুদ অরুণ, দপ্তর সম্পাদক মফিদুল হাসান তৃপ্তি, সহপ্রচার সম্পাদক আহমেদ মুসা প্রমুখ। মান্নান ভূঁইয়া সংস্কারের পক্ষে সারা দেশে মাঠপর্যায়ের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এ সময় নেতারা ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, বেগম জিয়া দলকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে এখন নীরব সময় কাটাচ্ছেন। যেখানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছেন, সেখানে বেগম জিয়া নিশ্চুপ। এ অবস্থায় আর যা হোক, তাঁর নেতৃত্বে আর রাজনীতি করার ইচ্ছে তাঁদের নেই। তা ছাড়া মাঠপর্যায়ের নেতাদেরও বেগম জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা নেই। তাই তাঁদের মতামতকে সম্মান জানিয়ে ও দলকে দুর্নীতির বলয় থেকে মুক্ত করতে বেগম জিয়াকে দল

থেকে সরে যেতেই হবে বলে তাঁরা মত দেন।[৩৭]

বিএনপির দপ্তর সম্পাদক মফিদুল হাসান তৃপ্তি, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক জহিরউদ্দিন স্বপন এবং সহপ্রচার সম্পাদক আহমেদ মুসা সংস্কার প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে ১৫ জুন রাতে মান্নান ভূঁইয়ার বাসায় যান। মান্নান ভূঁইয়া প্রস্তাবে কিছু সংশোধনের কথা বলে জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেন।[৩৮]

খালেদা জিয়ার অনুগত হিসেবে পরিচিত যুগ্ম মহাসচিব গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বেগম জিয়াও সংস্কার চান। তিনি স্বেচ্ছায় চেয়ারপারসনের পদ ছাড়বেন না। দলীয় কাউন্সিল ছাড়া কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারবে না।[৩৯]

সংস্কারপন্থীদের তৎপরতার ফলে শেখ হাসিনা দলের মধ্যে যে খুব কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, তা বলা যাবে না। তিনি হয়তো এভাবে সমালোচিত হতে চাননি। কিন্তু দলের ভেতরে তাঁর অনুগত সমর্থকের অভাব ছিল না। সংস্কারপন্থী নেতারা এটা হিসাবের মধ্যে রাখেননি।

১৫ জুন প্রথম মুখ খোলেন মতিয়া চৌধুরী। একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে তিনি বলেন, 'কিসের সংস্কার? যাঁরা সংস্কারের কথা বলছেন, তাঁদের মতলব কী।' তাঁর এই বক্তব্যের পর ১৭ জুন মুখ খোলেন কর্নেল (অব.) ফারুক খান এবং দীপু মনি। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না এত দিন সংস্কারপন্থী হিসেবেই পরিচিত হয়ে এসেছেন। ১৭ জুন তিনি সুধা সদন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি দলে সংস্কার চাই। তবে শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে সংস্কারের পক্ষে নই।... সংস্কার নিয়ে দলে আন্দোলন শুরু হয়েছে—এমন ভাবা ঠিক হবে না। এখন আমাদের সামনে অনেক বড় বড় সমস্যা রয়েছে। যখন ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হবে, তখন আলোচনা করেই এক জায়গায় আসতে হবে। আমি মনে করি, পুরো দলেরই গণতন্ত্রায়ণ হোক। আওয়ামী লীগের যে গঠনতন্ত্র রয়েছে, তা মোটামুটি পর্যাপ্ত বা সময়োপযোগী। তবে দুই-তিনটি ধারা সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে।'[৪০]

একই দিন দলের শিল্পবিষয়ক সম্পাদক কর্নেল ফারুক খান বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সংস্কারবাদী নেতাদের চেয়ে সভানেত্রী আরও বেশি সংস্কার চান; সংস্কার করতে হলে দলগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। মুখে মুখে সংস্কার হবে না।' শেখ হাসিনা নিজেই বলেন, তিনি দলের মধ্যে যেকোনো নেতার চেয়ে বেশি সংস্কার চান। দলে যে সংস্কার প্রয়োজন, এটা অনেক আগেই তিনি উপলব্ধি করেছেন।[৪১]

২৩ জুন আওয়ামী লীগের ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শেখ হাসিনাসহ দলের নেতারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে

একত্র হন। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তাঁরা ওই বাড়িতে বৈঠকে বসেন। অনেক দিন মুখ-দেখাদেখি বন্ধ থাকার পর আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থী নেতারা দলের সভানেত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। আলোচনার সময় তাঁদের মধ্যে বিতর্ক এবং কথা-কাটাকাটি হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মতিয়া চৌধুরী, মুকুল বোস, মাহমুদুর রহমান মান্না, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, সাহারা খাতুন, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বঙ্গবন্ধু ভবনে ঢুকতে নেতাদের বাধা দেয়। বাধা পেয়ে আবদুর রাজ্জাক চলে যান। পরে শেখ হাসিনা অন্য নেতাদের ভেতরে নিয়ে যান। গেটের সামনে সংস্কারপন্থী এক জ্যেষ্ঠ নেতাকে টিপ্পনী কেটে তিনি বলেন, 'সরকারের সঙ্গে কী লাইন করলেন? আমাকেই তো আপনাদের ভেতরে নিতে হলো!'[৪২]

বৈঠকে নেতারা শেখ হাসিনাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন, তাঁর দেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দাবি করেন। একপর্যায়ে আমির হোসেন আমুর দিকে তাকিয়ে হাসিনা বলেন, 'আমার প্রয়োজন না থাকলে আপনার হাতে দায়িত্ব দিয়ে চলে যাব।' তখন তোফায়েল আহমেদ হাসিনাকে বলেন, 'আপনাকে বাদ দিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাচ্ছি না।' আমু ও তোফায়েল জানতে চান, হাসিনা আমেরিকা যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে সরকারের সব কাজে আইনি অনুমোদন দেওয়ার কথা বললেন; কিন্তু পরে কী এমন ঘটনা ঘটল যে ওয়াশিংটনে গিয়ে তিনি সরকারবিরোধী বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন। জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর নামে চাঁদাবাজির মামলা দেওয়ায় তিনি সরকারবিরোধী অবস্থান নেন। ওই সময় আমু বলেন, 'আপনি যুক্তরাষ্ট্রে ছয় মাস থাকলে দলের কী এমন ক্ষতি হতো?' এ সময় নেতারা জুনের মধ্যে নির্বাচন দাবি করাটাও ঠিক হয়নি বলে মন্তব্য করেন এবং দলীয় ফোরামে আলোচনা না করে এটা বলার সমালোচনা করেন। খেলাফত মজলিসের সঙ্গে চুক্তির সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়ার সমালোচনা করে নেতারা বলেন, এতে দলের ক্ষতি হয়েছে। জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, ভোটের রাজনীতির প্রতি লক্ষ রেখে খেলাফত মজলিসের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই এ চুক্তি করা হয়। তবে নেতারা তাঁর এ যুক্তি মেনে নেননি। ষাটোর্ধ্বদের নেতৃত্বে না রাখার প্রসঙ্গ তুলে তোফায়েল আহমেদ দলীয় সভানেত্রীকে বলেন, 'আপনি রাজনীতি থেকে অবসর নিতে পারেন। কিন্তু আমি সক্ষম। আমি রাজনীতি করব।' এ পর্যায়ে হাসিনা বলেন, 'আপনারা না চাইলে এটা হবে না।'[৪৩]

জুনের মধ্যে নির্বাচন চাওয়া প্রসঙ্গে নেতারা বলেন, 'নির্বাচন আমরাও চাই। কিন্তু এভাবে কেন? এ নিয়ে দলে আলোচনার দরকার ছিল। আর সরকার যেহেতু নির্বাচনের সময়সীমা দিয়েছে, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার ছিল।' নেতারা সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করার জন্য শেখ হাসিনাকে পরামর্শ দেন। খালেদা জিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনার কথা হয়েছে বলে শোনা কথার সত্যতা জানতে চান তোফায়েল। একটু অস্পষ্টভাবে শেখ হাসিনা বলেন, খালেদা জিয়াই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।[৪৪]

বৈঠকে সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া মতিয়া চৌধুরী সংস্কারপন্থী নেতাদের তোপের মুখে পড়েন। সংস্কারপন্থী নেতাদের সম্পর্কে টিভি চ্যানেলে দেওয়া তাঁর বিরূপ বক্তব্যের প্রসঙ্গ তোলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এ সময় মতিয়া তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন।[৪৫]

আওয়ামী লীগের ভেতর সংস্কারের দাবিতে জ্যেষ্ঠ নেতারা মুখ খুলতে শুরু করেন। এত দিন যা ছিল গুঞ্জন, এবার তা প্রকাশ্যে চলে এল। ৩০ জুন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক তাঁর ধানমন্ডির বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণা করেন। লিখিত প্রস্তাবে বলা হয়, একই ব্যক্তি পরপর দুবারের বেশি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা উভয় পদে থাকতে পারবেন না; গোপন ব্যালটের মাধ্যমে দলের সকল স্তরে কমিটি গঠন করা হবে; তৃণমূল থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রার্থী বাছাইয়ের বিধান বাধ্যতামূলক করা হবে; বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিপন্থী খেলাফত মজলিসের সঙ্গে পাঁচ দফা চুক্তি বাতিল করতে হবে; দলের তহবিল কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা থাকবে ইত্যাদি। রাজ্জাক বলেন, এই প্রস্তাব তাঁর ব্যক্তিগত এবং রাজনীতি শুরু হলে দলের নির্বাহী কমিটিতে এটা তোলা হবে।[৪৬]

রাজ্জাকের প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান প্রেসিডিয়াম সদস্য জিল্লুর রহমান ও মতিয়া চৌধুরী এবং উপদেষ্টা সুবিদ আলী ভূঁইয়া। মতিয়া চৌধুরী বলেন, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা না করে রাজ্জাক নীতিবহির্ভূতভাবে প্রস্তাব দিয়ে দলের নিয়ম ভেঙেছেন। রাজ্জাকের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'এখন তো মুক্তিযুদ্ধ চলছে না। কাজেই এভাবে গেরিলা কায়দায় সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশ করার কোনো কারণই ছিল না।'[৪৭]

রাজ্জাককে অনুসরণ করে এবার মুখ খুললেন প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ। ২ জুলাই তাঁর বনানীর বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিপক্ষ নয়। সময়ের প্রয়োজনে দলে সংস্কার হতেই হবে। 'সভানেত্রী শেখ হাসিনা কেন



দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

ংস্কার প্রস্তাব ঘোষণা করলেন আওয়ামী লীগ নেতা রাজ্জাক

● একই ব্যক্তি দুইবারের বেশি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হতে পারবেন না

● গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংগঠনের সকল স্তরের কমিটি গঠন করা হবে

বিএনপি অভ্যন্তরীণ পার্টি নয়, কাউন্সিল হবে প্রকাশ্যে

অবশেষে সরে দাঁ

...টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ...র্ত বন্ধের নির্দেশ

ভোটার তালিকা প্রণয়নে শ্রীপুর টেস্ট শতভাগ সফল : সিইসি

১৫ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ

আওয়ামী লীগের আব্দুর রাজ্জাকের সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণা

সরকারের বিরোধিতা করলেন, তা আমি বুঝি না। বাইরে থেকে উসকানিদাতা ও দলের ভেতরে অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে দলকে বাঁচাতে হবে। সরকারের পদক্ষেপ যেহেতু আমাদের দাবির প্রতিফলন, তাই সরকারের বিরোধিতা না করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।' রাজ্জাকের প্রস্তাবের অনুকরণে তোফায়েল একই ধরনের চারটি প্রস্তাব দেন। তিনি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদকে যুগোপযোগী করতে বলেন।[৪৮]

রাজ্জাক ও তোফায়েলের সুরে এবার সুর মেলালেন আওয়ামী লীগের আরেক প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। ৪ জুলাই নিজের বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, কর্তৃত্ববাদী, আধিপত্যবাদী, একক নেতৃত্ব গণতন্ত্রে অচল। তিনি এর আগে দেওয়া রাজ্জাক ও তোফায়েলের সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত বলে জানান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতির মাজার জিয়ারত করারও ক্ষমতা নেই। কোন মাজার জিয়ারত করবেন, তা ঠিক করারও ক্ষমতা নেই। তাই এ ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে না রেখে রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা যেতে পারে এবং সে ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী নয়, কেবল কেবিনেটই তা প্রয়োগ করতে পারে।

প্রেসিডেন্সিয়াল আদলের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ভেঙে দিতে হবে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেবল কেবিনেট সভায় নিতে হবে।'[৪৯]

আওয়ামী লীগের মধ্যকার গৃহবিবাদ তখন অনেকটাই প্রকাশ্য। সংস্কারপন্থী ও হাসিনাপন্থী নেতারা মুখোমুখি অবস্থানে। দুই পক্ষই নিজ অবস্থান ভারী করে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। জ্যেষ্ঠ নেতাদের বাক্‌যুদ্ধে মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীরা বিব্রত ও দিগ্‌ভ্রান্ত। দলে বিভেদ ও অনৈক্যের জন্য পরস্পরকে দায়ী করছেন তাঁরা।

চার জ্যেষ্ঠ নেতা আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত দলীয় সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁরা দলের গণতন্ত্রায়ণ ও যৌথ নেতৃত্বের কথা বলছেন। অন্যান্যের মধ্যে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, আলী আশরাফ, মুকুল বোস, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন, হাবিবুর রহমান খান প্রমুখ চার জ্যেষ্ঠ নেতাকে সমর্থন করছেন। এ ছাড়া ৩ ও ৪ মার্চের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, সাবের হোসেন চৌধুরী, আবদুল মান্নান, মাহমুদুর রহমান মান্না, ড. আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ দলীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন। অন্যদিকে হাসিনার সঙ্গে রয়েছেন জিল্লুর রহমান, সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, আবদুল মান্নান খান, দীপু মনি, হাছান মাহমুদ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে জিল্লুর রহমান ও মতিয়া চৌধুরী প্রকাশ্যে সংস্কারপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। জিল্লুর রহমান বলেন, কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন ছাড়া এভাবে প্রস্তাব বাজারে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। এতে দলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।[৫০]

দলীয় ফোরামের বাইরে প্রস্তাব দেওয়া সম্পর্কে তোফায়েল আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, তাঁদের আগে দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলও তাঁর ব্যবসায়িক কার্যালয়ে দলীয় ও প্রশাসনিক সংস্কারের কথা বলেছিলেন। এ ছাড়া শেখ হাসিনা তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে দিয়ে ষাটোর্ধ্বদের দলের নেতৃত্বের বাইরে রাখার প্রস্তাব দেন। দুটো প্রস্তাবই দলীয় ফোরামের বাইরে দেওয়া, অথচ আব্দুর রাজ্জাক ও তিনি বলায় নানা সমালোচনা হচ্ছে। আবু সাইয়িদ সাংবাদিকদের বলেন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু প্রথমে দলীয় ফোরামে না বলে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মতিয়া চৌধুরী বলেন, ছয় দফা ছিল রাজনৈতিক কর্মসূচি। দলীয় সংস্কারের বিষয়টি দলীয় ফোরামেই বলা উচিত।[৫১]

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ৫ জুলাই তাঁর স্ত্রী রেহেনা জলিল এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার কাছে

পাঠানো কারাবন্দী জলিলের ২ জুলাই ২০০৭ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পড়ে শোনান। চিঠিতে জলিল বলেন:

> সকলে মিলে সভানেত্রীকে তোষণ করে তাকে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়ার ফলে দলে গণতান্ত্রিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে শেখ হাসিনা এককভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে দল পরিচালিত করার ফলে দলে গণতান্ত্রিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়।...কারও আপত্তি শুনতে তিনি রাজি ছিলেন না। ফলশ্রুতিতে আজকে দলের এই অবস্থা, এই বিপর্যয়।...বিদেশে যাওয়ার প্রাক্কালে বিমানবন্দরে তিনি সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে ভবিষ্যতে বৈধতা দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বিদেশে গিয়েই উল্টাপাল্টা বক্তব্য দিতে শুরু করেন, যাতে দেশের এবং দলের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।...[৫২]

১২ জুলাই বিকেলে গুলশানের ন্যাম ভবনের গাড়িবারান্দায় এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ১৪ দফা 'পূর্ণাঙ্গ সংস্কার প্রস্তাব' তুলে ধরেন। প্রস্তাবের মধ্যে ছিল রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, হরতাল-অবরোধ বন্ধ, বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে পারবে না, দুজন ডেপুটি স্পিকারের একজন হবেন বিরোধী দল থেকে, ৩০ দিনের বেশি সংসদে না গেলে সদস্যপদ বাতিল, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন ইত্যাদি। তিনি চেয়ারপারসন ও মহাসচিবের দুই মেয়াদের বেশি না থাকার প্রস্তাব দেন। তাঁর অনুসারী নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব দিয়েছেন দাবি করে মান্নান ভূঁইয়া বলেন, 'এটা বিএনপির নয়, আমাদের প্রস্তাব।' সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতাদের মধ্যে মাহবুবুর রহমান, এম কে আনোয়ার, হাফিজউদ্দিন আহমদ, আশরাফ হোসেন, জেড এ খান, বিচারপতি মোজাম্মেল হক, ইনাম আহমদ চৌধুরী, মোফাজ্জল করিম, রেজাউর রহমান ডিনা, অধ্যাপক রেজাউল করিম, নাজিমউদ্দিন আলম, মনির হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[৫৩]

অনেকেই মনে করেন, সমাজে যে ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল এবং যে পরিস্থিতিতে এক-এগারোর পালাবদল হলো, তা ছিল সংঘাতময় রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি। এখানে সংগঠিত কোনো রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতিতে অনুঘটকের ভূমিকায় নেমেছিল সেনাবাহিনী। ওই সময় সেনা-মনস্তত্ত্ব কেমন ছিল, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। একটি প্রতিপাদ্য হলো: সব মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল এবং সেনাবাহিনী জনদাবির বা জন-আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ রেখে ক্ষমতার নাটাইটা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। সেনাবাহিনীর



সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণা করলেন বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া

জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা লে. জে. এ টি এম জহিরুল আলমের একটি মন্তব্য এখানে বেশ প্রাসঙ্গিক। ১০ নভেম্বর ২০০৭ ঢাকায় আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও গণতন্ত্রকে রাহুমুক্ত করতে একটি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দরকার ছিল।' তাঁর সরল স্বীকারোক্তি হলো :

> আমরা ১১ জানুয়ারির পর সেই ঝাঁকুনি পেয়েছি। যারা এ কাজ করেছে, তাদের ওপর এটা বর্তেছে, আমাদের সেটা বুঝতে হবে। তারা দেশের মঙ্গলের জন্যই এবং আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যই করছে। তাই আমাদের সবাইকে তাদের সহায়তা করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের উত্তরণে কোনো সমস্যা হবে না। আমি এ-ও মনে করি, বেশির ভাগ রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলই এটা উপলব্ধি করতে সমর্থ হচ্ছেন।[৫৪]

জেনারেল জহিরের আশাবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর থেকে নিজেদের রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষার মিল দেখা যায়। দলগুলোর কোনো কোনো নেতা নিজে দলের সংস্কার করার কাজে নেমে পড়েন। তবে এই কাফেলায় সবাই শামিল হননি। শুরু থেকেই প্রশ্ন ছিল, এই সংস্কার-চেষ্টা কতটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং কতটা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া।

# ধরপাকড়

সামরিক বাহিনী যখনই ক্ষমতা নেয়, রাজনীতিবিদদের ওপর একটা ঝড় বয়ে যায়। অতীতে এমনটি ঘটেছে বারবার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমলা এবং ব্যবসায়ীরাও বাদ পড়েন না। গ্রেপ্তার, মামলা, চাকরি হারানো—এসব ঘটেছে, যখনই দেশে সামরিক আইন জারি হয়েছে। ১৯৫৮, ১৯৬৯, ১৯৭৫ ও ১৯৮২ সালে একই নাটকের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এবার সামরিক শাসন না এলেও জরুরি অবস্থা জারির মধ্য দিয়ে বড় রকমের একটি পরিবর্তন হলো। শুরু হলো ধরপাকড়। গ্রেপ্তার এড়াতে অনেকেই গা ঢাকা দিলেন, কেউ কেউ চলে গেলেন বিদেশে।

১১ জানুয়ারি রাতেই গ্রেপ্তার পর্ব শুরু হয়। ডিজিএফআইয়ের উদ্যোগে র‍্যাব নেমে পড়ে গ্রেপ্তার অভিযানে। র‍্যাবের তৎকালীন মহাপরিচালক এস এম মিজানুর রহমান এক সাক্ষাৎকারে এর শুরুর পর্বটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

মহিউদ্দিন আহমদ : তালিকা এল কোথা থেকে?

মিজানুর রহমান : ডিজিএফআই থেকে। বারী আমাকে ফোন করে বলল, 'একজন অফিসার পাঠায়া দেন, কয়েকটা নাম দিব।' আমি একজন অফিসার পাঠালাম। সে একটা তালিকা নিয়া আসল। টাইপ করা। এর মধ্যে পলিটিক্যাল লিডারদের নাম ছিল। দুই পার্টিরই ছিল—বিএনপির ছিল, আওয়ামী লীগের ছিল, বেশ কিছু নাম। বলে দিল, প্রতিদিন কিছু কিছু তালিকা যাবে।

মহিউদ্দিন : সে রাতেই কি অ্যারেস্ট করা শুরু হলো?

মিজান : হ্যাঁ। সে রাতেই কিছু অ্যারেস্ট করা হয়। তবে উল্লেখযোগ্য কাউকে পাওয়া যায়নি। তালিকার মধ্যে সিনিয়র লিডারও ছিল, আবার ফিল্ড লেভেলের—তৃণমূলের লোকও ছিল। দুই দলেরই ছিল। ওয়ার্ড কাউন্সিলর

টাইপের লোকজনও ছিল। প্রথম দিন এভাবেই গেল। সেকেন্ড ডেতে আমাকে খুব একটা ইনভলভ করে নাই। আমার যে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিল, অ্যাডিশনাল ডিজি ব্রিগেডিয়ার মাহবুব, ও-ই ওদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করত। ওর কাছে তালিকা দিত। তবে মাহবুব আমাকে ইনফর্ম করত।[১]

এক-এগারোর দুই সপ্তাহ পর মুখ খুললেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৬ জানুয়ারি ধানমন্ডিতে তাঁর অফিসে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে আমাদের সংস্কার প্রস্তাব ও জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে ইতিমধ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই সপ্তাহ চলে গেছে। আর কালক্ষেপণ না করে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী দ্রুত জনমতের বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হোক—এটাই জনগণের প্রত্যাশা।' তিনি আরও বলেন, 'রাষ্ট্রীয় সম্পদ পাচারকারী, সম্পত্তির দখলকারী ও সন্ত্রাসের মূল গডফাদারদের গ্রেপ্তার ও বিচারের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে।' তিনি 'অপরাধীদের' বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।[২]

২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা ধানমন্ডির দলীয় অফিসে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় অভিযোগ করে বলেন, সরকার দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করলেও 'মহাচোর' ও শীর্ষস্থানীয় গডফাদারদের ধরছে না। তিনি এসব অপরাধীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।[৩]

শেখ হাসিনা বরাবরই সদ্য বিদায়ী বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সমালোচনা করে আসছিলেন এবং তাঁর অভিযোগের তির ছিল বিএনপির 'অপরাধী'দের বিরুদ্ধে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'অভিযান'। এই অভিযানে যাঁদের ধরা হয়, তাঁদের অনেকেই ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা।

১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি জরুরি আইন জারির পরপর জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আইনে সরকারি 'দায়িত্ব পালনকারী' কর্মকর্তাদের যেকোনো বিচারিক কাজ থেকে দায়মুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। বলা হয়, তাঁদের কোনো আদেশ-নিষেধের বৈধতা নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সবচেয়ে বড় অভিযানে বিএনপির ১০ জন ও আওয়ামী লীগের ৫ জন

নেতাকে আটক করা হয়। অভিযান চলে রাত দেড়টা থেকে ভোর পর্যন্ত। বিএনপির আটক নেতারা হলেন নাজমুল হুদা, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ইকবাল মাহমুদ হাসান টুকু, মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, আমান উল্লাহ আমান, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাসের রহমান, মনজুরুল আহসান মুন্সী, আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও মো. ফিরোজ মিয়া। আওয়ামী লীগের আটক নেতারা হলেন মোহাম্মদ নাসিম, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সালমান এফ রহমান, আ হ ম মোস্তফা কামাল ও পঙ্কজ দেবনাথ।[৪]

সমানে ধরপাকড় চলছিল। ৫ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটি তারবার্তায় জানা যায়, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীগুলোর হাতে ৪৩ হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছেন; স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এ রকম সময়কালে মোট যত লোক গ্রেপ্তার হন, এই সংখ্যা তার চেয়ে প্রায় ১৩ হাজার বেশি। আনুমানিক ১৯ ব্যক্তি আটক অবস্থায় মারা গেছেন।[৫]

যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের অনেককে নিয়েই জনমনে ও গণমাধ্যমে আলোচনা ছিল এবং তাঁদের কথিত দুর্নীতির অনেক কাহিনি লোকমুখে শোনা যেত। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটিনেসের তারবার্তায় তাঁদের কয়েকজনের উল্লেখ ছিল। যেমন :

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে

ক. সাবেক সাংসদ ও দলনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আস্থাভাজন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে 'যুদ্ধাপরাধের' অভিযোগ করেন; কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ এই যে তিনি অস্ত্র পাচার, সোনা চোরাচালান, চাঁদাবাজি ও রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত।

খ. সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ও খালেদা জিয়ার বিগত সরকারের মন্ত্রিসভার সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ সদস্যদের একজন হিসেবে পরিচিত নাজমুল হুদা। তিনিও খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ।

গ. সাবেক সাংসদ, মিডিয়ামোগল, ব্যাংকার ও বিজনেস টাইকুন মোসাদ্দেক আলী ফালু। তিনি শুরু করেছিলেন খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনামলে তাঁর একজন চা পরিবেশনকারী হিসেবে (টি সার্ভার)। খালেদা জিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুবাদে তাঁর রাজনৈতিক

সচিবদের অন্যতম হয়ে ওঠা পর্যন্ত নিজের পথ করে নিয়েছেন।

ঘ. সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ। বলা হয়, তারেক রহমানের আর্থিক সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্যুৎ উৎপাদন-সংক্রান্ত চুক্তিগুলোতে তিনি কারসাজি করেছেন।

ঙ. সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী এবং ২০০৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাপক সন্ত্রাসী হামলাগুলোর সময় জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জিএমবি) একজন জ্যেষ্ঠ নেতা হিসেবে আবির্ভূত নিজস্ব ধারার ইসলামি জঙ্গি বাংলা ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক নেতা হিসেবে তিনি খালেদা জিয়ার সুরক্ষা পান। তাঁকে আটক করা হয়েছে সম্ভবত দুর্নীতির কারণে নয়, বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কারণে।

চ. সাবেক অসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাছির। একজন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও সৌদি আরবে সাবেক রাষ্ট্রদূত, যিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌদিদের অর্থ ও বার্তা আদান-প্রদানের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। খালেদার ঘনিষ্ঠ; ২০০৫ সালে চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে ভরাডুবির পর তিনি মন্ত্রিসভার পদটি হারান।

ছ. সাবেক সাংসদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেলে নাসের রহমান। দলীয় প্রতিপক্ষদের দ্বারা প্রকাশ্যে ব্যাপক দুর্নীতিবাজ হিসেবে অভিযুক্ত; এই ছেলের পক্ষে সাইফুরের প্রবল সুরক্ষার কারণে বাংলাদেশের জনগণ ও বিদেশি দাতাদের কাছে সাইফুরের পরিচিতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জ. সাবেক সাংসদ ও তারেক রহমানের ডিল-মেকার হিসেবে পরিচিত আমানউল্লাহ আমান।

আওয়ামী লীগ থেকে

ক. আওয়ামী লীগের বিগত শাসনামলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দুর্নীতি ও সহিংসতার জন্য মোহাম্মদ নাসিম।

খ. উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সালমান রহমান। দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পপতিদের একজন সালমান রহমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঋণখেলাপি বলেও অভিযোগ রয়েছে।

গ. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী।

তারেক গ্রেপ্তার নন—এখনো

তারেক রহমান গ্রেপ্তার হয়েছেন—৩ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রচারিত এই খবরটি ভুল। দল ও সংবাদমাধ্যমে আমাদের সূত্রগুলো বলছে, তারেক কয়েক দিন ধরে নিজের বাসায় ঘাপটি মেরে আছেন, সম্ভবত তাঁর গ্রেপ্তার আসন্ন।[৬]

বার্তায় বলা হয়, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধি হুয়া দু এসব গ্রেপ্তারকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকেরা তাঁর ব্যাংকের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন আটকে দিয়েছিলেন।[৭]

গ্রেপ্তার হওয়া রাজনীতিকেরা সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে খালাস পেয়ে যাবেন বলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বিচারক থাকাকালের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকায় সরকারি আইনজীবী আদালতে নিরুত্তর থাকেন। ফলে আটকাদেশ বেআইনি হয়ে যায়। বর্তমানে যাঁরা আটক হয়েছেন, এগুলোর পরিণতিও ওই রকম হবে। তিনি বলেন :

> যাঁরা হঠাৎ নবাব হওয়ার মতো হঠাৎ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, ক্ষমতার এই আত্মম্ভরিতা তাঁদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলেছে।...আমাদের দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড এতই প্রকাশ্য হয়ে পড়েছিল যে তাঁদের এ কর্মকাণ্ডগুলো সংগ্রহ করা কিংবা লিপিবদ্ধ করা কোনোক্রমেই কঠিন নয়। এগুলোই নিবর্তনমূলক আটকাদেশে উল্লেখ করলে তাঁদের আসল দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তখন আটকাদেশ কখনোই অস্পষ্ট থাকবে না।
>
> জনস্বার্থেই এখন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের শাস্তি হওয়া উচিত এবং রাজনীতি থেকে নির্বাসন দেওয়া উচিত। তাঁরা যদি কোনোক্রমে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে ছাড়া পেয়ে যান, তাহলে তাঁরা আবারও জনগণের দুর্ভোগের কারণ হবেন এবং সেটা আরও গুরুতর হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের যদি রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় দেওয়া যায়, তাহলে সৎ ব্যক্তিরা রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে আসবেন। রাজনীতি হচ্ছে আবেগ ও বিচারবোধ প্রয়োগ করে কাজ করারই পথ।...এ কাজটি যে মানুষ করতে পারে, তিনিই রাজনৈতিক জননেতা।[৮]

নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ার জনৈক মো. শহিদউল্লাহর একটা চিঠি একটি

পত্রিকায় ছাপা হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল, 'আগে গডফাদারদের নির্মূল করুন'। চিঠিতে বলা হয় :

> পঁয়ত্রিশ বছর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তি আমরা অর্জন করতে পারিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার ফলে। পালাক্রমে রাজনৈতিক দলগুলো জন্ম দিয়েছে গডফাদারদের। গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবিদার প্রতিটি সরকারের আমলেই এলাকায় এলাকায় সৃষ্টি হয়েছিল এ সকল কুখ্যাত তথাকথিত নেতা নামধারী গডফাদারদের। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাপটে হয়ে উঠেছিল সবকিছুর নিয়ন্ত্রক।...সাধারণ মানুষ দূরে থাক, বিরোধী রাজনৈতিক দলীয় নেতা-কর্মী এমনকি স্ব-দলীয় প্রতিবাদী নেতা-কর্মীরাও তাদের বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দটিও উচ্চারণ করতে পারতেন না।...দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, অধুনা বাতিলকৃত নির্বাচনে দেশের বড় দুটি দলই ঐ সকল গডফাদারকে দলীয় মনোনয়ন দান করে জাতির সঙ্গে মহা প্রতারণা করেছিল। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আজ আমরা দু'চোখ ভরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। আমরা চাই গডফাদারমুক্ত বাংলাদেশ। চাই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। প্রত্যাশা করি আদর্শবাদী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে দেশ পরিচালিত হোক।
>
> এমতাবস্থায় জননন্দিত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন—আগে এ সকল নিন্দিত গডফাদারদের মেরুদণ্ড চিরতরে ভেঙে দিন। পরে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব, তাদের মন্ত্রী-আমলা-কর্মচারী নামধারী ছিঁচকে সন্ত্রাসীরা খালে-বিলে-নদীতে এমনকি নর্দমায় পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে নিয়তির অলঙ্ঘনীয় লিখন হিসেবেই।[৯]

রাজনীতিবিদেরা যখন ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছেন, তখন জাতীয় পার্টির (জেপি) সভাপতি আনোয়ার হোসেন মঞ্জু কৈফিয়তের সুরে বক্তব্য দেন। রাজনীতিবিদদের এককভাবে সমালোচনা করা নিয়ে আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন :

> রাজনীতিবিদরাই দেশ পরিচালনা করেন এবং পৃথিবীতে যত কল্যাণকর কাজ আছে তার সবই রাজনীতিবিদদের করা।...রাজনীতিবিদদের চরিত্রহননের পেছনে একটি কারণ আছে। যারা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক

> ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না, যারা পরাজিত রাজনৈতিক আদর্শের ব্যক্তিত্ব, তারা আমাদের এই দুর্জয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আঘাতের পর আঘাত করছে। যাতে তারা প্রমাণ করতে পারে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করছে না।[১০]

খবরের কাগজে রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্যদের দুর্নীতির চমকপ্রদ সব সংবাদ ছাপা হতে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সূত্রে জানা যায়, পঞ্চম সংসদের মেয়াদে ৩০১টি, সপ্তম সংসদের মেয়াদে ১৭৬টি এবং অষ্টম সংসদের মেয়াদে ৩১১টি গাড়ি আমদানি করা হয়। বিলাসবহুল এসব গাড়ি আমদানিতে প্রকৃত দামের চেয়ে অনেক কম দাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গাড়ি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে সঠিক দামই দেওয়া হয়েছে। ফলে ১৫০ কোটি টাকা অবৈধ পথে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বড় বোন ও সাবেক মন্ত্রী প্রয়াত খুরশীদ জাহান হকের ৪৫১১ সিসি ক্ষমতার ২০০৬ মডেলের 'পোরশে ক্যানি' জিপ গাড়ির আমদানি মূল্য দেখানো হয় সাড়ে ৩০ হাজার ইউরো বা প্রায় ২৮ লাখ টাকা। শুল্ক কর্তৃপক্ষ এই গাড়ির আমদানিমূল্য নির্ধারণ করেছে (শুল্কায়িত মূল্য) ৯৫ হাজার ২৮০ ইউরো বা ৮৭ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ এই গাড়ি কেনার জন্য হুন্ডি অথবা ব্যাংক-বহির্ভূত চ্যানেলে অন্তত ৬০ লাখ টাকা পাঠাতে হয়েছে।[১১]

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে বিজয়ী সাংসদদের জন্য এরশাদ সরকার শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ দেয়। কিন্তু তখন দামি গাড়ি আনার সুযোগ ছিল না। শর্ত ছিল সর্বোচ্চ ১৩০০ সিসির গাড়ি আনা যাবে। কিন্তু বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০০২ সালে এই সুবিধা বাড়িয়ে দেয় এবং পরবর্তী তিন বছরে তিনটি সরকারি আদেশ জারি করে অত্যাধুনিক ও বিলাসবহুল গাড়ি আমদানির পথ খুলে দেওয়া হয়।[১২]

৯ মার্চ ২০০৭ ঢাকায় 'প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগে দলীয়করণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্তরায়' শিরোনামে নাগরিকদের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী। সভায় মূল প্রবন্ধ পড়েন বিলিয়ার পরিচালক ওয়ালি-উর-রহমান। সভায় সাংবাদিক এবিএম মূসা, সাবেক রাষ্ট্রদূত কামাল উদ্দিন, সাবেক সেনাপ্রধান এম হারুন-অর রশিদ এবং ডেমক্রেসিওয়াচের প্রধান তালেয়া রহমান উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোকে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চায় বাধ্য করতে হবে;

কোনো আমলা অবসরের চার বছরের মধ্যে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না; দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে নির্বাচন করতে হবে; গডফাদার, কালোটাকার মালিক, দুর্নীতিবাজ ও ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে নিষিদ্ধ করতে হবে; হাইকোর্টের নির্দেশিত প্রার্থীদের আটটি তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক করতে হবে; নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে; আইনের মাধ্যমে হরতাল নিষিদ্ধ করতে হবে। সভায় ২২০ জন সাবেক সংসদ সদস্যের আমদানি করা শুল্কমুক্ত গাড়ির ব্র্যান্ড এবং দামের তালিকা দেওয়া হয়। তালিকার শীর্ষ দশজন হলেন ডা. মোহাম্মদ সিরাজুল আকবর (আওয়ামী লীগ), মার্সিডিজ বেঞ্জ, ১ কোটি ৯৩ লাখ ২১ হাজার ১৩৩ টাকা; মো. জাহিদ আহসান রাসেল (আওয়ামী লীগ), মার্সিডিজ বেঞ্জ, ১ কোটি ৯৩ লাখ ২১ হাজার ১৩৩ টাকা; মো. আবু হেনা (বিএনপি/স্বতন্ত্র), পোরশে, ৯২ লাখ ৯৬ হাজার ৩৪৫ টাকা; সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ), পোরশে, ৮৪ লাখ ৬৬ হাজার ৩১৫ টাকা; মো. আবদুল মোতালেব আকন্দ (বিএনপি), পোরশে, ৭৯ লাখ ৪৪ হাজার ৫২২ টাকা; মো. আতিউর রহমান আতিক (আওয়ামী লীগ), পোরশে, ৭৫ লাখ ৫২ হাজার ৩৮১ টাকা; শামসুর রহমান শরীফ (আওয়ামী লীগ), পোরশে, ৭৪ লাখ ৭০ হাজার ২৭৭ টাকা; মো. মোসাদ্দেক আলী (বিএনপি), পোরশে, ৭৪ লাখ ৪০ হাজার ৩১২ টাকা; মো. মাহমুদুল হক রুবেল (বিএনপি); নিউ ভেহিকেল, ৭২ লাখ ২২ হাজার ৫৯০ টাকা এবং মো. গিয়াস উদ্দিন (বিএনপি), বিএমডব্লিউ, ৭১ লাখ ৭ হাজার ৮৯০ টাকা।[১৩]

দুদককে ঢেলে সাজানো হয়। সাবেক সেনাপ্রধান এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা লে. জে. (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী দুদকের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১১ মার্চ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানান, ৬৪ জেলায় দুর্নীতি দমন টাস্কফোর্সের কাজ চলবে। এখন ঢাকায় ২০টি টিম কাজ করছে। এটা বাড়িয়ে ৪০টি করা হবে। তাঁর কথাবার্তা ছিল বেশ খোলামেলা। তিনি বলেন :

> ১৪ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ৫০ জন ব্যক্তি দুর্নীতিবাজ হলে ওই দেশ দুর্নীতিতে প্রথম হয় না। তার মানে আরও লোক আছে। দেশের একজন ব্যক্তিও যাতে মনে না করেন তিনি আইনের ঊর্ধ্বে। আমরা জাল ফেলব। রুই-কাতলা যদি আসে খুশি হব। তবে চুনোপুঁটি এলেও সেটাকে ফেলে দেব না। কারণ, এটারও দাম আছে।[১৪]

দুর্নীতির দায়ে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁদের একজন ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুন। ঢাকার রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে একসঙ্গে পড়ার সময় তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ১৯৮৫ সালে তাঁরা ওই কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন, যা গণমাধ্যমে ছাপা হয়। মামুন তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেন, সুবিধা পাওয়ার বিনিময়ে তারেককে মামুন ব্যক্তিগত খরচের নামে টাকা দিতেন। জিজ্ঞাসাবাদে দেওয়া বক্তব্যে মামুন বলেন, ক্ষমতার কেন্দ্র বলে পরিচিত হাওয়া ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারেক একই ধরনের লোকের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করেন, যারা তাঁর কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে সুবিধা নিত। এসব লোকের মধ্যে ছিলেন ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম, বসুন্ধরা গ্রুপের মালিক আহমেদ আকবর সোবহান (শাহ আলম) এবং জিলেট গ্রুপের বাংলাদেশ এজেন্ট ও রেডিও ফুর্তির মালিক আনিস আহমেদ। তাঁরা বড় বড় প্রকল্পের কাজ পেতেন। আমিন কনস্ট্রাকশনের মালিক আমিন উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া ব্যক্তিগত খরচের নামে তারেককে মাসে ২৫ লাখ টাকা দিতেন। এই টাকা দেওয়া হতো সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদার মাধ্যমে। মন্ত্রীর কাছাকাছি আসায় আমিন উদ্দিন মেঘনা-গোমতী টোল প্লাজা, ভৈরব ব্রিজ টোল প্লাজা ও রূপসা ব্রিজ টোল প্লাজার ইজারা পেয়েছেন।[১৫]

মামুনের বিবৃতি অনুযায়ী, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো ১৯৯৫ সালে তারেক, মামুন ও মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দারের সঙ্গে লঞ্চ ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ২০০১ সাল থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বর্তমানে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর) থেকে সোনারগাঁও হোটেল পর্যন্ত সড়কের সব বিলবোর্ড তাঁর বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যাডভান্স অ্যাড ফার্মের নিয়ন্ত্রণে নেন। ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সব প্রকল্প ছিল কোকো, সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেলে বাবু এবং সাবেক নৌমন্ত্রী আকবর হোসেনের ছেলে সায়মনের কবজায়।

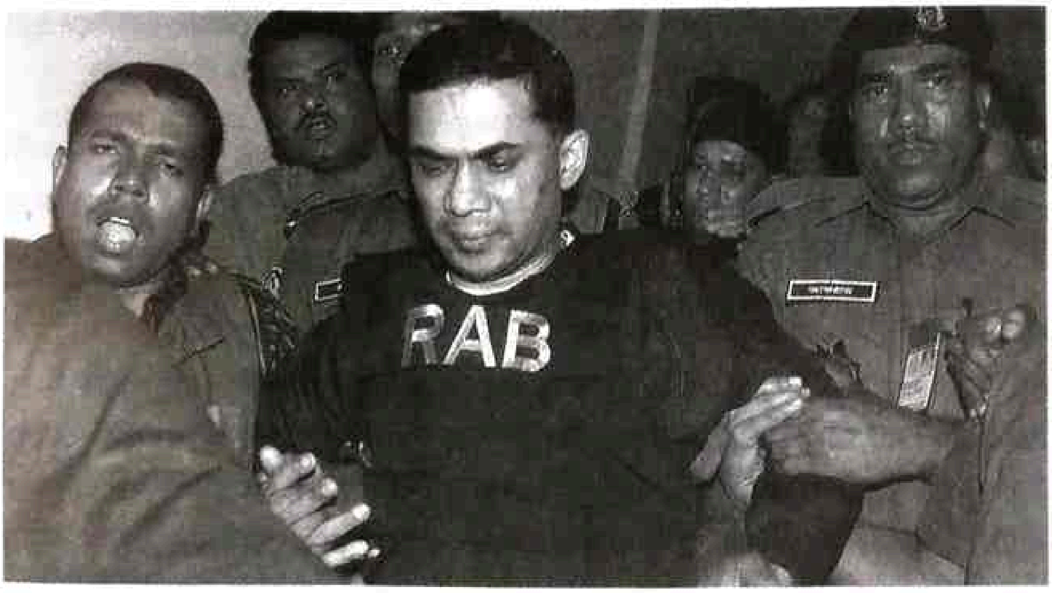
মামুনের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, মোসাদ্দেক আলী ফালু তাঁর চাচাতো ভাই মির্জা আব্বাসের মাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পিএস হিসেবে চাকরি পান। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হন। তিনি একটি পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেলসহ বেশ কিছু কারখানার মালিক হন। ফালু দলের তহবিল দেখাশোনা করতেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প থেকে কমিশন নিয়ে দলের তহবিলে জমা করতেন।

মামুনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী সরকারি কর্মকর্তাদের বদলি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সুপারিশ এনে ঘুষ নিতেন এবং সরকারি বড় বড় প্রকল্পের ঠিকাদারি থেকে কমিশন আদায় করতেন। যোগাযোগমন্ত্রী থাকাকালে নাজমুল হুদা সিএনজিচালিত অটোরিকশা আমদানি ও নিবন্ধন বাবদ উত্তরা গ্রুপের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়েছেন। খুলনার পাকশী ব্রিজ ও মেঘনা ব্রিজের টোল আদায়ের ইজারা পাইয়ে দিয়ে তিনি ওরিয়ন গ্রুপের ওবায়দুল করিমের কাছ থেকে মাসে ২৫ লাখ টাকা নিয়ে মামুনের মাধ্যমে তারেক রহমানকে দিতেন।

মামুনের ভাষ্যমতে মির্জা আব্বাস গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার এবং বৈশাখী টেলিভিশনের পরিচালক এম এন এইচ বুলুকে নামমাত্র দামে খাসজমি লিজ দিয়ে অনেক টাকা বানিয়েছেন। পরে ওই টাকার ভাগ নিয়ে বুলুর সঙ্গে আব্বাসের তিক্ততা তৈরি হয় এবং তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। রাজউকের নিচু জমি ভরাটের কাজের ঠিকাদারি আদায় করতে আব্বাস নিজের লোক ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাই ঢাকা পরিবহন সমিতির সভাপতি মির্জা খোকন এবং গয়েশ্বর রায়ের মাধ্যমে আব্বাস টোল আদায় করতেন। গত সরকারের শাসনামলে তিনি ২৯টি সরকারি বাড়ি নামমাত্র দামে বিভিন্নজনকে বরাদ্দ দিয়েছেন।

মামুনের দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, সাবেক বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মো. নাছির উদ্দিন চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর পরিচালনার দায়িত্ব থাই এয়ারওয়েজকে এবং ফয়'স লেকের ব্যবস্থাপনা কনকর্ড গ্রুপকে দিয়ে মোটা অঙ্কের কমিশন নিয়েছেন। এ ছাড়া সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বিদ্যুৎ বিতরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ থেকে অনেক টাকা মেরে দিয়েছেন। তবে সিনিয়র মন্ত্রীরা জড়িত থাকায় বিদ্যুৎ খাতের বড় বড় প্রকল্প থেকে তিনি খুব বেশি সুবিধা নিতে পারেননি।

জবানবন্দিতে মামুন বলেন, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন তাঁর মন্ত্রণালয়ের সব প্রকল্প থেকে কমিশন নিতেন। সাবেক জ্বালানিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প থেকে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। বিদ্যুৎসচিব থাকাকালে আ ন হ আখতার হোসেন বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল থেকে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সাইফুর রহমান অর্থমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর ছেলেদের পছন্দের লোকদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং কাস্টমস বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া




তারেক রহমানকে আটক অবস্থায় আদালতে আনা হচ্ছে

হয়েছিল।[১৬]

খালেদা জিয়ার বড় ছেলে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে যৌথ বাহিনী আটক করে ৮ মার্চ ২০০৭ সালে। আটক অবস্থায় তারেক রহমানকে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। তারেক 'দুর্নীতিবাজ' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয় 'হাওয়া ভবনে' তিনি দলের একটি সমান্তরাল কেন্দ্র চালাতেন। তাঁর 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ' আচরণ নিয়ে দলে এবং সেনাবাহিনীতে ক্ষোভ ছিল। এ প্রসঙ্গে লে. জে. জহিরুল আলমের মন্তব্য হলো :

> জিয়া ওয়াজ অনেস্ট। উনি ওনার বাচ্চা, ওনার ওয়াইফকে কোনো দিন সরকারি গাড়ি চড়তে দেন নাই। আমরা বলতাম, এ রকম একটা অনেস্ট লোকের ছেলে কীভাবে এ রকম হতে পারে! আর্মির মধ্যে এটা নিয়ে বিরাট একটা প্রশ্ন ছিল যে জেনারেল জিয়ার ছেলে এত করাপ্ট হতে পারে! যখন ওকে ধরেছে, ওকে তো ভালোই পিট্টি-টিট্টি দিছে। মারার সময় বলেছে, 'জিয়ার ছেলে হয়ে এগুলো করছ?' হি হ্যাজ টার্নিশড ইমেজ অব দ্য আর্মি।[১৭]

তারেক গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর খালেদা জিয়ার আশঙ্কা ছিল তাঁকে আটক অবস্থায় নির্যাতন করা হতে পারে। কয়েক মাস পর খালেদা জিয়া গ্রেপ্তার হন। ওই সময় তিনি ফোনে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ

করে তাঁর শঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন। জাফরুল্লাহ লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন :

খালেদা জিয়া একটা রিকোয়েস্ট করল। তারেককে যেন না মারে। সেটা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বলার জন্য। আমি বললাম, দেখেন, এটা বলে লাভ হবে না। ইউনূস ভাই কাজটা করবেন না। আপনি বললে আপনার মেসেজ আমি পৌঁছে দিতে পারি।[১৮]

যে সময় তারেক রহমান গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে ডিজিএফআই অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, সে সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। ইন্টারোগেশন বা জিজ্ঞাসাবাদ একটি উচ্চমানের আর্ট। পেশাদার পুলিশ অফিসাররা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই কঠিন কাজটির কিছু কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনেকের মাঝে সাধারণ বিশ্বাস এই যে নির্যাতন করলেই সকল মানুষ সত্য কথা পইপই করে বলে দেয়। এই বিশ্বাস থেকেই তারেককে ডিজিএফআইয়ের কর্মকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। দুর্নীতি দমনের মতো জটিল বিষয়ে এবং ইন্টারোগেশনের মতো উচ্চমানের দক্ষতার বিষয়ে একটি সরলীকৃত ধারণা বা পারসেপশন থেকে ডিজিএফআইয়ের অফিসাররা তখন কাজ করেছিলেন। এঁদের ধারণাটি নিছক অজ্ঞতা থেকেই তৈরি হয়েছিল। বাস্তবে ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ভিকটিম সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদকারীর লিড প্রশ্নের মাধ্যমে যা জানতে চান, সেই অনুযায়ী জবাব দিয়ে প্রশ্নকারীকে সন্তুষ্ট করে নির্যাতনের যন্ত্রণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন।

তারেক রহমানকে পুলিশ আদালত থেকে রিমান্ডে নিয়ে ডিজিএফআই অফিসে দিয়ে আসে। ডিজিএফআইয়ের অফিসাররা তখন তাঁর অর্জিত সকল 'অবৈধ' সম্পদের তথ্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। ভদ্র জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাঁদের চাহিদা এবং পারসেপশন অনুযায়ী বিশাল সম্পদের কোনো বিবরণ না পেয়ে তাঁরা 'এক্সট্রিম টর্চারের' পদ্ধতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।

তারেককে বন্দী অবস্থায় কীভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে কী ধকল গেছে, তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক বিভাগের তৎকালীন সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাজহারুল ইসলামের ভাষ্যে। তারেকের চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

তারেক রহমান সাহেব প্রথম যখন এখানে আসেন, তখন সিম্পলি তাঁর

পায়ে ব্যথা। ডান পায়ে দাঁড়াতে পারছেন না। পায়ে ভর দিতে পারছেন না। সিভিয়ার ব্যথা নিয়ে কোঁকড়াচ্ছেন, কুঁজো হয়ে গেছেন একেবারে। চেয়ারম্যান সাহেবের রুমে আমরা ওনাকে রিসিভ করলাম। ইনভেস্টিগেশন করলাম। পেছনে একটা বেড ছিল। সেখানে শুইয়ে দেখলাম তাঁর কী অবস্থা। তখন মনে হয়েছিল, তাঁর স্পাইনে কোনো ইনজুরি।

যেকোনো রোগী আসলে প্রথমে আমরা জিজ্ঞেস করি, প্রথম কথা, কত দিন আগে আপনি ভালো ছিলেন, আপনার এ ইনজুরিটা কীভাবে হলো। তখন সামনে অনেক লোক, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোক। অনেক চাপ ছিল। তিনি কিছু বলছিলেন না। পরে ওনাকে আরেক রুমে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেছি, কীভাবে এই ব্যথাটা পেয়েছেন? কোথায় ব্যথা?

আমরা দেখেছি যে মেরুদণ্ডের মাঝামাঝি ব্যথা। ওখানে হাতই দেওয়া যাচ্ছিল না, এ রকম সিভিয়ার পেইন। ওখানে অনেকটা ফুলে ছিল। এগুলো সাধারণত পড়ে গেলে বা কেউ যদি কোনো কিছু দিয়ে জোরে আঘাত করে, তাহলে এ রকম হয়। ঘুমের মধ্যে তো এ রকম হয় না?

আমরা তাঁকে ভর্তি করলাম। তাঁর এক্স-রে, এমআরআই সবই করলাম। 'ডরসাল সিক্স/সেভেন' বলি আমরা। বুকের পেছন দিকে যে হাড়গুলি, ছয় আর সাত নম্বর হাড়, এ জায়গাটি সংকুচিত হয়ে আছে, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। চেপে আছে যাকে বলে—কমপ্রেশন ফ্র্যাকচার। আমাদের সন্দেহ হলো, এই মাঝামাঝি বরাবর, যেখানে রিব্‌স আছে, প্রটেক্টেড থাকে অন্য হাড় দিয়ে, এ জায়গায় এত জোরালো আঘাত তিনি কীভাবে পেলেন।

যারা এনেছিল, তারা তাঁকে ভর্তি করাতে চাচ্ছিল না। অথচ এখানে ভর্তি না করালে কোনো চিকিৎসা করা যাবে না। আঘাত পাওয়ার ডেটটা বলে নাই ওরা। আঘাত পাওয়ার অনেক পরে ওনাকে এনেছিল। প্রথম দিন থেকে চিকিৎসা করলে এখানেই হয়তো আরও অনেক ভালো হতেন। তারপরও এখানে যত দিন ছিলেন পুরো পিরিয়ডে আমাদের ভালো করে চিকিৎসা করতে দেওয়া হয়নি।

মাঝে মাঝে ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনার আসলে কী সমস্যা হয়েছিল? উনি বেশি কিছু বলতে চাইতেন না। বিব্রতবোধ করতেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়তেন। যার জন্য বারবার আর জিজ্ঞেস করতাম

না। আগে তো সুস্থ হোক। পরে একসময় শোনা যাবে। পরে ওনার কাছে শুনেছি। উনি বললেন, চোখ বাঁধা ছিল। হাত পেছন দিকে বাঁধা ছিল। এ অবস্থায় কিছুদূর ওপরে ওঠানো, লটকানো ছিল। ঝুলে ছিলেন বলে ওনার ধারণা। যখন ওনাকে ওপর থেকে ছেড়ে দিয়েছে, উনি নিচে পড়েছেন, তখন উনি টের পেয়েছেন যে উনি পড়ে গেছেন।

ওই সময় আমরা মনে করেছি, ওপরে ঝুলিয়ে রাখার ফলে টেনশন বা যেকোনো কারণে—একটা স্বাভাবিক মানুষকে ঝুলিয়ে রাখলেও সে অজ্ঞান হয়ে যেতে পরে। হয়তো উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। হয়তো উনি বলতে পারছেন না কতক্ষণ লটকানো ছিলেন। পড়ার পর উনি টের পেয়েছেন, ওপর থেকে ওনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছেড়ে দেওয়ার পর আশপাশে যারা ছিল, তারা উল্লাস প্রকাশ করেছে। উনি বলেছেন, ওনার পরনে ছিল টি-শার্ট। টি-শার্টটার পেছনে ধরে এমনভাবে তাঁকে ছুড়েছে যে পাশের ওয়ালে বাড়ি খেয়ে আবার ওপাশের ওয়ালে গিয়ে পড়েছে। ডিসট্যান্সটা—তাঁর কাছে মনে হয়েছে রুমটা খুব সরু। সরু রুম বলেই এই সাইডের ওয়ালে বাড়ি খেয়ে ওই দিকে আসা সম্ভব। এসব এজেন্সির রুমগুলো কেমন, এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। যাহোক, তাঁকে ওপর থেকে ছেড়ে দিয়েছে, ইনটেনশনালিই হয়তো ছেড়ে দিয়েছে। তা না হলে সবাই এত উৎফুল্ল হবে কেন? তারপর পেছন থেকে ধরে এভাবে যখন বাড়ি দিল—উনি আর কিছু বলতে পারছিলেন না। প্রচণ্ড ব্যথা। তখন একজন ঠাট্টা করে বলল, স্যার কি ব্যথা পেয়েছেন? পানি খাবেন স্যার? এ রকম টিজ করছিল। এই হিস্ট্রিটা উনি আমাকে বলেছেন। বলেছেন, 'বাকিটা এখন শোনার দরকার নেই। পরে একসময় বলব।'[১৯]

২০ জুন দৈনিক *মানবজমিন*-এ তারেক রহমানের ১২ মার্চে সই করা একটি হলফনামা ছাপা হয়। হলফনামায় জেলে আটক তারেক তাঁর বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের সঙ্গে অজান্তেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে কবুল করেন। হলফনামার বক্তব্য ছিল এ রকম :

> আমি তারেক রহমান নিম্নে বর্ণিত ঘটনার জন্য আমার পরিবার, দেশের মানুষ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সকল শ্রেণির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।
>
> আমি গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের প্ররোচনায় তার বহু অবৈধ আয় সম্পর্কে জ্ঞাত হইলেও তা থেকে তাকে বিরত হইতে নিষেধ করি নাই, যা পরোক্ষভাবে তাকে সমর্থন দেওয়া হয়। তার ওয়ান গ্রুপ-এর সকল

প্রতিষ্ঠানে সে আমাকে মৌখিকভাবে সাথে রাখে এবং ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়তে সে বিভিন্নভাবে অবৈধ আয় করে। এই অবৈধ আয় থেকে সে আমাকে আমার রাজনৈতিক খরচের নামে বিভিন্ন সময়ে অর্থ প্রদান করেছে, যা নীতিগতভাবে অন্যায়। কিন্তু আমি তাকে বারণ করি নাই।

গিয়াসউদ্দিন আল মামুন তার বৈধ ও অবৈধ উপার্জনের একটি অংশ বিদেশে গচ্ছিত করে একটি ব্যাংকে রাখে। যার সঠিক পরিমাণ আমার জানা নেই। সেখানে গচ্ছিত অর্থ সম্পর্কে যাতে আমি কোনো অনুসন্ধান বা আপত্তি না করি তার জন্য সে আমাকে তার সেই ব্যাংক-এর একটি Supplementary Debit Card তৈরি করে দেয়, যা থেকে বিভিন্ন সময়ে আমি কিছু অর্থ নিজ প্রয়োজনে খরচ করেছি।

বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের অবৈধ আয় সম্পর্কে জানলে আমি তাকে প্রশ্ন করি, কিন্তু সে অস্বীকার করে। সরল বিশ্বাসে আমি তার কথা বিশ্বাস করেছি। যার ফলে তার এই দুর্নীতির একটি পরোক্ষ অংশে আমি পরিণত হয়েছি। পরিশেষে আমি আবারও দেশের সকল মানুষের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতভাবে মামুন এবং তার সহযোগীদের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি আমার পরিবার এবং দেশের মানুষের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার সর্বশেষ অনুরোধ দেশের মানুষের কাছে, আমি ভুল করেছি, আমাকে একটিবারের মতো আপনারা ক্ষমা করুন।

তারেক রহমান
পিতা-শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান
মাতা : বেগম খালেদা জিয়া
৬, শহীদ মঈনুল রোড
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬
তারিখ : ১২ মার্চ, ২০০৭[২০]

গিয়াসউদ্দিন আল মামুন এবং তারেক রহমানের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে, জোর করে তাঁদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁরা এসব কথা বলবেন বলে বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁদের স্বীকারোক্তি ডিজিএফআই থেকে গণমাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল।

১৫ মার্চ শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে যান। যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরতে পারলে বর্তমান সরকারের সব কাজকে তিনি বৈধতা দেবেন। আগের দিন সন্ধ্যায় ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ অফিসে অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন *আমাদের সময়*-এর সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান। নাঈমুল ইসলামের বর্ণনায় জানা যায় :

> ...দু'একদিন আগেই দৈনিক *আমাদের সময়ে* শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দুর্নীতি ও অবৈধ অর্থসম্পদের মালিক হওয়ার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেসব প্রতিবেদনে দেশী-বিদেশী ব্যাংকে তাদের টাকা গচ্ছিত থাকার কথা উল্লেখ ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই শেখ হাসিনা সে প্রসঙ্গ টেনে আমাকে বললেন, 'ব্যাংকের একাউন্ট নম্বরটাও ছেপে দিলে ভালো হতো।' বুঝলাম তিনি এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করছেন, এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন...
>
> তখনই আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল এই চিন্তা—এই যে আমাদের নেতানেত্রীদের সহনশীলতা বাড়ছে, এটাও সম্ভবত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ডের ফল।...
>
> কিন্তু তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকাকালে কীভাবে দেশে বড় বড় দুর্নীতি হলো? কেন তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ আহরণের অভিযোগ ওঠে? তাহলে কি এমন হতে পারে, খুবই সাদাসিধে শেখ হাসিনা অনেকের প্ররোচনা আর প্রভাবে দুষ্ট হয়েছেন? এটা কি সম্ভব যে তিনি উপলব্ধিই করতে পারেন না সরলতার আড়ালে কী সর্বনাশ তিনি করেছেন দেশ, জাতি ও আমাদের সময়ের? আমার আসলেই সন্দেহ হয়, শেখ হাসিনা সংকটের গভীরতা বুঝতে পারেন কি না। এটা সরলতা মনে হলেও সহনীয় নয় কিছুতেই। এটা মেনে নেওয়া যায় না আর।[২১]

১০ এপ্রিল গণমাধ্যমে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিন কোটি টাকা চাঁদাবাজির মামলা দায়েরের খবর ছাপা হয়। মামলাটি দায়ের করেন বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার যৌথ মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টমন্ট বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম ফারুক। মামলার এজাহারে ফারুক উল্লেখ করেন, তিনি তাঁর মালয়েশিয়ান অংশীদারসহ সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীতে বার্জ-মাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ঠিকাদারি পান। ১৯৯৭ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁদের একটি লিখিত চুক্তি হয়। বাদী এজাহারে দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী মানু মজুমদার ২২

ও ২৪ জুলাই তাঁকে ফোন করে 'নেত্রী'র সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু ১৯৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে প্রকল্পের কার্যাদেশ বাতিল করতে পিডিবি থেকে চিঠি পাঠানো হয়। পরে কার্যাদেশটি আর বাতিল করা হয়নি। শেখ হাসিনা ৩ আগস্ট ১৯৯৯ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। এজাহারে তিনি বলেন, ভয়ে এত দিন তিনি মামলা করার সাহস পাননি।[২২]

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি *ডেইলি স্টার*কে বলেন, গত পাঁচ বছর অন্য একটি সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কেন এই মামলা করা হলো না, তার কারণ আমরা খুঁজে দেখছি। দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ এই মামলাকে একটি 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে উল্লেখ করেন। হাসিনা এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। দলের পক্ষ থেকে একটি সূত্র *ডেইলি স্টার*কে জানিয়েছে, হাসিনা এটাকে তাঁর বিরুদ্ধে 'চলমান ষড়যন্ত্রের' একটি অংশ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, এ মাসের শেষে তিনি দেশে ফিরে আসবেন এবং সবকিছুই তখন স্বাভাবিক হয়ে যাবে। *ডেইলি স্টার*-এর পক্ষ থেকে যোগাযোগের চেষ্টা হলে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু এবং শেখ ফজলুল করিম সেলিম ফোন ধরেননি; প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ মন্তব্য করতে রাজি হননি। অপর প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, সংবাদটি পত্রিকায় ছাপা হলে পরে তিনি মন্তব্য করবেন। জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু *ডেইলি স্টার*কে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত এই মামলার প্রেক্ষাপট খুঁজে দেখা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। এই মামলার পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না জানতে চাইলে ইনু বলেন, 'সরকার আগে তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটন করুক, এরপর তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করবেন।'[২৩]

১০ এপ্রিল এক যুক্ত বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল মামলাটিকে 'হাস্যকর' ও 'বানোয়াট' বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, মামলাটি 'ভিত্তিহীন এবং ষড়যন্ত্রের অংশ...শেখ হাসিনা পাঁচ বছর সততা, আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করেছেন। তাঁর পরম শত্রুও গত পাঁচ বছরে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি।...এমনকি তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তিও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরকে দান করেছেন।...তাঁর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্যেই এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।'[২৪]

১২ এপ্রিল রাতে যৌথ বাহিনীর একটি দল বিএনপির নেতা মওদুদ আহমদের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে কয়েকটি মদের বোতল ও ২০০টি সিল্কের শাড়ি পায়। ১৩ এপ্রিল সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে চোখ বেঁধে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে চার দিনের রিমান্ডের আদেশ দেওয়া হয়। তারপর চোখ বাঁধা অবস্থায় তাঁকে 'অজ্ঞাত স্থানে' নিয়ে যাওয়া হয়। যৌথ বাহিনীর হাতে আটক অবস্থায় যে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তার একটা খোলামেলা বর্ণনা দিয়েছেন তিনি :

> পিঁপড়া, তেলাপোকা ও ইঁদুরের সরব অস্তিত্ব আমি সহজেই টের পাচ্ছিলাম। রাত আসার সাথে সাথে মশককুলও রক্তের সন্ধান পেয়ে ক্রমশ সজাগ হতে শুরু করছিল। তবু এর চাইতে বিরক্তিকর ও আতঙ্কজনক ব্যাপার ছিল পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা আর্তনাদ ও গোঙানির শব্দ। আমি নিজের কাছেই জিজ্ঞেস করলাম, ওদের কি মানুষের ওপর নির্যাতন চালানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই?...
>
> আমি জানতাম যে আমাকে সাধারণ কোনো পুলিশ-রিমান্ডে আনা হয়নি—আনা হয়েছে টর্চার রিমান্ডে।...সেনাবাহিনীর লোকজন চোখ বাঁধা অবস্থায় আমাকে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করছে যার সাথে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এবং আমাকে এমন এক জায়গায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যেখানে পুলিশের কোনো কর্তৃত্ব নেই। আসলে জায়গাটা ছিল ডিফেন্স ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের একটা টর্চার সেন্টার।
>
> খুব কাছেই আমি আরেকজনের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, হয়তো আরেকজন রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী কিংবা সিভিল সার্ভেন্টকে মারধর করে এমন সব অভিযোগের ওপর তাদের স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চলছে যেসব অভিযোগের সাথে তাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আমার সামনে বসা একজন আরেকজনের কাছে বলে চলছিল যে আর্তনাদটি আসছিল একজন ব্যবসায়ীর গলা থেকে, ওরা জানতে চাইছিল তার কাছে কত টাকা আছে, কত রকম ব্যবসায়ের সাথে সে জড়িত এবং 'গরীবদের জন্য হাসপাতাল' বানিয়ে দিতে সে কী পরিমাণ ক্যাশ টাকা সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে রাজি আছে। 'ইতিমধ্যে আমরা ৫০০ কোটি টাকার বেশি আদায় করেছি এবং ৫৫টি অত্যন্ত দামি গাড়ি এ উদ্দেশ্যে বাজেয়াপ্ত করেছি', অন্য একজন বলল।

'আসলে আমাদের চিফ চাচ্ছেন দুর্নীতিবাজ এসব রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের অবৈধ পথে রোজগার করা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে', অভিমত প্রকাশ করল অপরজন। তার কণ্ঠ ছিল আক্রমণাত্মক।...

আমার চোখ থেকে কালো কাপড় খুলে ফেলা হলো। আমাকে বসানো হলো একটা টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে। আমার সামনে দাঁড়ানো ছিল একজন ক্যামেরাম্যান, হাতে মুভি ক্যামেরা তাক করা ঠিক আমার বরাবর। আমাকে বলা হলো, আমি যেন টেবিলের ওপর রাখা টাইপ করা কাগজটা হাতে নিয়ে ক্যামেরার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাই যেন মনে হয় আমি দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশে কথা বলছি। আমি বললাম, এই কাগজে কী লেখা আছে তা আগে আমি পড়ে নিতে চাই।

কিন্তু কাগজের লেখা পড়ার পর আমি যেন এক প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। তারা আমাকে আমার সব দোষ স্বীকার করে নিয়ে আমি যে অপরাধ করেছি তার সব বর্ণনা দিয়ে স্বেচ্ছামূলকভাবে এমনভাবে একটি ভিডিও রেকর্ড করার প্রস্তাব দিচ্ছে যাতে মনে হবে অন্তরীণ থাকাকালে আমার সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সবকিছু স্বীকার করে নিয়ে আমার বিবৃতি ভিডিওতে রেকর্ড করতে দিয়েছি।...

ওদের প্রস্তাব আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলাম এবং সাথে সাথে আবার আমার চোখ দুটো বেঁধে ফেলা হলো।...একজন বলল, আমি যদি তাদের কথামতো কাজ না করি তাহলে আবার আমাকে রিমান্ডে এনে পুরনো সেই বন্দীঘরে রাখা হবে এবং তখন আমাকে বোঝানো হবে কাকে বলে শারীরিক অত্যাচার। ওরা সরাসরি আমাকে জানিয়ে দিল যে যতজনকে এখানে ধরে আনা হয়েছে তাদের সবাইকে ক্যামেরার সামনে বসে কাগজ পড়তে ও কাগজে সই দিতে বাধ্য করা হয়েছে।...[২৫]

নতুন সরকারের সঙ্গে যে কয়েকজন কূটনীতিকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, তাঁদের মধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটিনেস অন্যতম। এক-এগারোর পালাবদলের নেপথ্যে অন্যতম কুশীলব হিসেবে তাঁকে মনে করেন কেউ কেউ। পেশাদার কূটনীতিকেরা সাধারণত তাঁদের কথাবার্তা ও আচরণের মাধ্যমে এমন কোনো ধারণা দিতে চান না যে তাঁরা কর্মস্থলের দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছেন। প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা আচরণে, আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এবং শব্দচয়নে সাধারণত খুবই সতর্ক থাকেন। তারপরও কারও কারও 'অতি উৎসাহ' দৃষ্টিকটুভাবেই ধরা পড়ে।

জনমনে একটা পারসেপশন তৈরি হয়েছিল যে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সবুজ সংকেতের বাইরে গিয়ে সেনাসমর্থিত সরকার কোনো কিছু করবে না। এ প্রসঙ্গে বিএনপি নেতা মওদুদ আহমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। মওদুদ ১৩ এপ্রিল গ্রেপ্তার হয়ে কয়েক মাস জেলে আটক ছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কারাস্মৃতিতে :

> মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটিনেস মাত্র ১৪ মাস দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে সংঘটিত ঘটনাবলির জন্য তাঁকে বহুলাংশে দায়ী করা হয়। তিনি ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত করিতকর্মা (প্রো-অ্যাকটিভ) একজন কূটনীতিবিদ এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাৎকরণে তাঁর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকবে। যদি এই কারণে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ভালো কথা। তিনি ছাড়া আগের প্রায় সকল মার্কিন রাষ্ট্রদূতই ছিলেন সজ্জন কূটনীতিবিদ।...বিউটিনেস ছিলেন নিচু মনের রাষ্ট্রদূতগণের মধ্যে একজন। আমি খুশি যে উনি চলে যাচ্ছেন।[২৬]

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের একজন ছিলেন সাবেক সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম। তিনি নৌবাহিনীর প্রধান সরওয়ার জাহান নিজামের বড় ভাই। এ নিয়ে সরওয়ার জাহানের মনে ক্ষোভ ছিল। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> মহিউদ্দিন আহমদ : পলিটিশিয়ানদের অ্যারেস্ট করা নিয়ে আপনার কী অভিমত?
>
> সরওয়ার জাহান নিজাম : আচ্ছা, শোনেন। আমার বড় ভাই বিএনপির এমপি ছিলেন, সরওয়ার জামাল নিজাম।
>
> মহিউদ্দিন : আচ্ছা, ও আর নিজাম আপনার কী হন? ওনার নামে তো রোড আছে চিটাগাংয়ে?
>
> সরওয়ার : আমার জ্যাঠা, আব্বার বড় ভাই।
>
> মহিউদ্দিন : তাহলে তো আপনারা চিটাগাংয়ের শেঠ?
>
> সরওয়ার : ওয়ানস আপন আ টাইম। সময়ের পরিবর্তনে সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায়।
>
> মহিউদ্দিন : আপনার ভাইয়ের কথা বলেন।
>
> সরওয়ার : টেকওভার করার তিন মাস পরের ঘটনা। আমি তখন ইস্কাটনে নৌ ভবনে থাকি। ভোর পাঁচটায় ভাবি টেলিফোন করছে, আমার

ভাইয়ের ওয়াইফ। কানতেছে। আমি ভাবছি, ভাই বোধ হয় মারা গেছে।

সরওয়ার, জানো না কী ঘটছে? তোমার ভাইকে তো গত রাতে অ্যারেস্ট করছে চিটাগাং ক্লাব থেকে। মেহেরুনের কাছ থেকে জেনে নাও, কেমনে অ্যারেস্ট করছে।

মেহেরুন আমার ছোট বোন। তাকে রিং করলাম। সে যা বলল—চিটাগাং ক্লাব থেকে যে রাস্তাটা নেমে আসছে, সেখানে একটা বড় গাছ আছে। সেখানে গাড়ি থামায়া গাড়ির ভেতরে কিছু বোতল ঢুকায়া দিছে।

মহিউদ্দিন : মদের বোতল?

সরওয়ার : হ্যাঁ। ওইটা দেখায়া—এসব পাওয়া গেছে। ব্যস। করছে কে? অর্ডারটা আসছে আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে। তারপর গেছে ২৪ ডিভ হেডকোয়ার্টার্স—ওরা করছে এই কাম।

আমার আপন ভাই। আমি নেভি চিফ। আমি তো বলতেও পারতেছি না। এরপর থেকে মইন ইউ আহমেদ আমাকে টোটালি অ্যাভয়েড করে। পাঁচ দিনের মাথায় আমি তাঁকে রিকোয়েস্ট করলাম—আমার আপন বড় ভাই—কিছু করা সম্ভব? এইটুকু তো তাঁর বলা উচিত ছিল, হ্যাঁ, আমি দেখতেছি। বললাম, আমি জানলাম না? আমি তো ফ্যামিলির কাছ থেকে একটা প্রেশারের মধ্যে আছি? বলল, রিপোর্ট আছে। কিছু না পেলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিসের রিপোর্ট? কী রিপোর্ট? আমি জানলাম না কেন? আমার ভাই তো? নেভির চিফের বড় ভাইকে আপনারা হেস্তনেস্ত করবেন, নেভির চিফের সঙ্গে একটু আলাপ করবেন না?

না না, কিছু হবে না। ছেড়ে দেওয়া হবে।

এক বছর চার মাস ছিল জেলে, ফর নো রিজন। আমার আপন ভাইকে অ্যারেস্ট করছে উইদাউট মাই নলেজ। এর চেয়ে বড় ক্ষোভ, বড় দুঃখ, এর চেয়ে অপমানকর কাজ আমার লাইফে হয় নাই।

মহিউদ্দিন : এ রকম তো অনেককেই করেছে?

সরওয়ার : অনেককেই অ্যারেস্ট করেছে। আমি শুধু আমার উদাহরণটা দিচ্ছি। অন্যদেরটা আমি জানব কেমনে?

মহিউদ্দিন : ওনার কনস্টিটুয়েন্সি কোনটা?

সরওয়ার : চট্টগ্রাম-১২।[২৭]

যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে

নেওয়া হয়। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়—এ রকম অভিযোগ বরাবরই ছিল। এবার রিমান্ডের শিকার হলেন বিএনপি সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। অতীতে তাঁর নির্দেশে বা তাঁর অনুমোদন নিয়ে অনেকবারই রিমান্ড-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, এবার তিনি নিজেই এই ফাঁদে আটকে গেলেন।

বাবরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ২০০৬ সালের ৪ জুলাই বসুন্ধরা গ্রুপের নিহত পরিচালক হুমায়ুন কবির সাব্বিরের খুনের জন্য দায়ী বলে সন্দেহভাজন বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকের ছেলে শাফিয়াত সোবহানকে ২০ কোটি টাকা ঘুষের বিনিময়ে তিনি এ মামলায় না জড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন। যৌথ বাহিনীর কাছে বসুন্ধরা গ্রুপের একজন পরিচালকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শাফিয়াত সোবহানকে বাবর দেশের বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাবর নিজে সরাসরি ওই টাকা না নিয়ে জিকিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক কাজী সালিমুল হকের কাছে ওই টাকা দেওয়ার জন্য বলেন। প্রাইম ব্যাংকের পরিচালক ও বিএনপির সাবেক সাংসদ সালিমুল হক বাবরের এই ঘুষের টাকা নগদে এবং চেকের মাধ্যমে নিয়েছিলেন। পরে এই টাকা বাবরকে দেওয়ার কথা। যৌথ বাহিনী সালিমুল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই টাকা উদ্ধার করেছে। সালিমুল হক তিনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নয়টি পে-অর্ডারের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়েছেন। ১ জুন ২০০৭ *যুগান্তর* এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপে। প্রতিবেদনে বলা হয়, চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে এ পর্যন্ত পৌনে চার শ কোটি টাকা সরকারের কোষাগারে জমা পড়েছে। আটক রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের অর্থবিত্তের অনুসন্ধান ও স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এই টাকা আদায় করা হয়েছে।[২৮]

রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করে টর্চার সেলে চোখ বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। কোনো কোনো সময় ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা বিরতিহীন জিজ্ঞাসাবাদ চলত। অফিসাররা তাঁদের সব সময় স্যার সম্বোধন করে কথা বলতেন। এক অফিসার চলে যাওয়ার পর আরেক অফিসার আসার মধ্যবর্তী সময়ে নিচু পদের কর্মচারী এসে তুই-তোকারি করত। এ সময় পাশের কামরায় ভুয়া চিৎকার-মারধরের শব্দ শোনানো হতো। চোখ বাঁধা থাকায় বন্দীরা ভয় পেতেন। অনেক সময় ভেঙে পড়তেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পরবর্তী অফিসার এলে জেরার একপর্যায়ে তাঁরা অনেক 'সত্য' কথা বলে দিতেন বা বাঁচার জন্য বানিয়ে বানিয়ে জবাব দিতেন, শারীরিক নয়, মানসিক

নির্যাতনই ছিল প্রচণ্ড রকম।

যৌথ বাহিনীর হাতে আটককৃতদের অন্যতম ছিলেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু। গোয়েন্দাসূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ ২ জুন ছাপা হওয়া এক প্রতিবেদনে জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে মিন্টুর বক্তব্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী '৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনের সময় তিনি আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেন; ঢাকা শহরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্কের চাঁদা তুলেছেন। ২০০১ সালে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন। কিন্তু মেয়র নির্বাচনে নমিনেশন না পেয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং সরকার পতনের 'ষড়যন্ত্রে' যুক্ত হন। গোয়েন্দাদের প্রশ্নের জবাবে মিন্টু বলেন, কথা ছিল বিএনপির রাজশাহী অঞ্চলের একজন সাংসদ সরকারি দল থেকে ৭০ জন সাংসদকে ভাগিয়ে আনবেন; এ জন্য প্রত্যেককে ১ কোটি করে ৭০ কোটি টাকা দিতে হবে। আর মাহী বি চৌধুরী নিয়ে আসবেন ২০ থেকে ২৫ জন সাংসদ। অন্যদিকে প্রশিকাকে (এনজিও) ঢাকায় ১০ লাখ লোক জড়ো করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একদিকে এমপিদের বিদ্রোহ, অন্যদিকে ১০ লাখ লোকের মাধ্যমে রাজধানীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সরকারের পতন ঘটানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড়ের কাজটি তিনি নিজেই করেছেন। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের বহুল আলোচিত 'ট্রাম্পকার্ড' কাহিনি, যা তিনি জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেন।[২৯]

বিএনপির সাংসদদের বিদ্রোহ-পরিকল্পনার কারণ সম্পর্কে মিন্টু বলেন, তারেক রহমানের প্ররোচনায় যাঁদের মন্ত্রী করা হয়েছিল, বিদ্রোহ-পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত সাংসদরা তাঁদের মনে করতেন 'কম শিক্ষিত ও সন্ত্রাসী টাইপের'। অথচ 'শিক্ষিত ও যোগ্য' লোকেরা দলে ছিলেন কোণঠাসা ও উপেক্ষিত।[৩০]

মিন্টুর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ আমলে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সাড়ে পাঁচ শ কোটি টাকা খরচ করে নৌবাহিনীর জন্য একটি ফ্রিগেট কেনার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রসঙ্গ ছিল এবং অভিযোগ ছিল যে ফ্রিগেট কেনায় বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছিল। মিন্টু বলেছেন, তিনি রাজসাক্ষী হতে চান, তবে কোন মামলার রাজসাক্ষী হবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়।[৩১]

এক সাক্ষাৎকারে তিনি ওই সময়ের একটা বিবরণ দিয়েছেন। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

আবদুল আউয়াল মিন্টু : ইতিমধ্যে তারা এমন ভাঙচুর আরম্ভ করল। এটা অনেকেই চেয়েছে যে রাস্তা প্রশস্ত হোক, বাট নট অ্যাট দ্য কস্ট অব দ্য...

মহিউদ্দিন আহমদ : পুওর পিপল।

মিন্টু : থাউজেন্ডস অব পুওর পিপল। যেখানে দরকার, ভাঙেন। যারা নরম্যালি ইমপোর্ট করে, তারা হয়তো মাল গুদামে রাখছে। শুধু যে তাদের অ্যাটাক করতেছে সেটা না। যে গুদামটা ভাড়া দিছে, তাকেও তারা ধরে ফেলতেছে। এটা তো একটা হীরক রাজার দেশের মতো মনে হলো আমার। আপনি আমার কাছে বাড়ি ভাড়া চেয়েছেন, আমি ভাড়া দিছি। আপনি সেখানে মাল রাখছেন, সেখানে আমার কী আসে যায়? এখন আমাকেও ধরতেছে। আমার মনে হলো, এরা তো একেবারে ব্রেইনলেস, পারসোনাল থিংস...। আমি সবকিছু এক্সপ্লেইন করে জেনারেল মইনকে একটা চিঠি দিলাম। চিঠি দেওয়ার পরেই আমি নেগেটিভে চলে এসেছি। কিছুদিন পরে আমাকে তো অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। আমি জেলে ছিলাম পাঁচ মাস।

মহিউদ্দিন : কীভাবে অ্যারেস্ট হলেন?

মিন্টু : আমি যাচ্ছিলাম বগুড়া আর জয়পুরহাটে। কয়েকটা ফারমার্স মিটিং ছিল আমার। এর মধ্যে দুই-তিনটা ছিল ভেজিটেবল-সংক্রান্ত, আর একটা ছিল রাইস। বগুড়ায় দুইটা মিটিং শেষ করে আমি জয়পুরহাটে গেছি। তার আগেই, আমি যখন যমুনা ব্রিজের ওখানে। রাতে আমি যমুনা রিসোর্টে ছিলাম। সকালে একজন কল করে আমাকে কর্নেল পরিচয় দিল, কর্নেল অমুক। বলল যে আমার সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে কয়েক মিনিট কথা বলতে চায়। ঠিক আছে। আমি তো এখন শহরের বাইরে আছি। আমি তো আসব রাতে। বলল, ঠিক আছে, রাতেই দেখা করব। বললাম, অসুবিধা নাই। আমি যখন ফেরত আসব, যমুনা ব্রিজ ক্রস করব, তখন আপনাকে জানায়া দেব, সেখান থেকে আড়াই ঘণ্টা লাগবে ঢাকা যেতে।

এক ঘণ্টা পরে, অসংখ্য সাংবাদিক আমাকে কল করতেছে, আমাকে নাকি আটক করে ফেলেছে। মানে গুজবটা হলো, আমাকে আটক করা হয়েছে। বললাম, আমাকে তো আটক করে নাই। বোধ হয় আটক করবে রাতে।

আমি বগুড়া-জয়পুরহাটে কাজ সেরে যমুনা রিসোর্টে খানা খেয়ে রাত দশটায় রওনা হয়েছি। আমি টেলিফোন করে দিয়েছি যে আই অ্যাম অন দ্য ওয়ে। ওরা কিন্তু আমার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেছে—আমি কোথায় আছি। চন্দ্রার কাছে এসে আমি বললাম, আমি আশুলিয়া হয়ে

আসতেছি। উনি তো বলে দিয়েছেন যে উনি ডিজিএফআইয়ের কর্নেল। বললাম, আপনার অফিসে আসি?

না না, এখন রাত বারোটা। অফিস তো বন্ধ। অফিসে কেউ নাই।

তাহলে কোথায়?

আপনার বাসায় আসি?

না। আমার বাসায় এত রাতে তো মিলিটারি আসার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি বলেছেন দুই-তিন মিনিটের কথা। আপনি তো রাস্তার ধারেও কথা বলতে পারেন?

আমি তো জানি, হোয়াট ইজ কামিং। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, আমার বাসায় গিয়ে নাটক করার তো কোনো দরকার নাই। ইচ্ছা করলে আমি কিন্তু ধরাটাকে অ্যাভয়েড করতে পারতাম। আমার কাছে মেকানিজম ছিল। আমি কোনো তদবিরও করি নাই। কারণ আমি জানি, হঠকারী লোকের পাল্লায় বাংলাদেশ পড়ে গেছে। এদের কাছ থেকে সহসা বের হওয়া মুশকিল কি না জানি না। কিন্তু কীভাবে বের হবে কেউ জানে না এখন। ভাবলাম, আমাকে ধরলে একটা লাভই হবে। প্রচারটা বেশি হবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে, এরা আসলে হঠকারী। এরা দেশের কিছু ভালো করতে পারে বলে মনে হয় না।

বলল যে নেভাল হেডকোয়ার্টার্সের সামনে দাঁড়াবে। তো সেখানে দাঁড়াইছি। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই আগে-পিছে দুইটা গাড়ি আসল। জিপ। আমাকে বলল, স্যার, আমাদের গাড়িতে একটু আসেন। আমার ছোট ছেলেটা চেয়েছিল একটু কথাবার্তা বলতে। তাকে বললাম এদের সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নাই। এদের গাড়ির নম্বর নিয়াও কোনো লাভ নাই। আমি শিওর, ওই নাম্বারগুলো ঠিক না। আমাদের দেশে প্রাথমিক সমস্যা হলো, যারা লিগ্যালি আপনাকে প্রটেক্ট করার কথা, তারাই ইললিগাল কাজগুলো করে। যেসব প্রতিষ্ঠান আপনাকে সিকিওর করার কথা, তারা যদি ইললিগ্যাল কাজ করে, দেখবেন তারা উল্টা পথ দিয়া চলে। তাদের গাড়িতে যে নাম্বারটা আছে, ওটা ঠিক নাম্বার না। তাদের টেলিফোন নাম্বারগুলি কিন্তু অন্য রকম। যত দিন বাংলাদেশে এই সব প্রতিষ্ঠান, যেগুলি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত, জনগণের টাকায় প্রতিষ্ঠিত, ইললিগাল কাজ করবে, তত দিন পর্যন্ত দেশে শান্তি আসবে না। ইউ ক্যান নেভার বি সিকিওর ইন দিস কান্ট্রি।

তো আমাকে ধরে নিয়ে গেল। পাঁচ মাস ছিলাম জেলে।

মহিউদ্দিন: আপনাকে কি ডাইরেক্ট জেলে নিয়েছে, নাকি ওদের

ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে গেছে?

মিন্টু : না না, ওরা ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিছে, সাত দিন রাখছে ওখানে। আমাকে কিন্তু যথাসময়ে দ্বিতীয় দিনে কোর্টে হাজির করেছে। হাজির করে আবার রিমান্ডে নিছে। রিমান্ডে নিছে পুলিশ। কিন্তু পুলিশের কোনো খবর নাই ওখানে। নিয়ে গেছে অন্য গ্রুপ। এগুলি দিয়া বুঝি দেশে আপনি আইনকানুন প্রতিষ্ঠা করবেন? এখানেই কিন্তু ওদের প্রতি আমার অবজেকশনটা ছিল। তারপর আবার চার দিনের রিমান্ড নিছে। আপনি তো জানেন, রিমান্ডে যে দিন নেয়, আর যেদিন ফেরত দেয়, ওই দিন গোনা হয় না। তার মানে, চার দিন মানে ছয় দিন। একটা কাজ করেছে যে যেদিন ধরছে, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে যে হাজিরা দেওয়াতে হয়, সেটা করছে। সেটা ওরা স্বেচ্ছায় করে নাই। দেয়ার ওয়ার মেনি প্রেসার অন দেম। দেশি ছিল, বিদেশি ছিল। এর আগে তো অনেককে ধরে নিয়ে গিয়ে—পঞ্চাশ দিন, ষাট দিন—কেউ জানে না কোথায় রাখছে তাদের। আমার বেলায় ওই জিনিসটা করে নাই।

মহিউদ্দিন : ইন্টারোগেশনের সময় ওরা কি আপনার সঙ্গে মিসবিহেভ করেছে?

মিন্টু : অন্য যাদের কথা শুনি, তাদের তুলনায় আমার সঙ্গে মিসবিহেভ করেছে, এটা বলব না। প্রথম কথা হলো, আমার গায়ে হাত দেয় নাই। এটা ক্লিয়ার। কিন্তু আমার সামনে টেবিলের ওপর লাঠি-টাঠি অনেক পিটাপিটি করেছে, অনেক গালিগালাজ করেছে। আবার আধা ঘণ্টা গালি দিয়া, অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া আবার আধা ঘণ্টা খুবই ভদ্র-মার্জিতভাবে, চা খাওয়ানো। চা খেতে তো অসুবিধা। আমার তো চোখ বান্ধা। ভালো করে খাওয়াইয়া দিছে। আধা ঘণ্টা গালি দিয়া আধা ঘণ্টা খুব ভালো ব্যবহার করত। 'স্যার, আপনি শিক্ষিত, আপনি বড় ব্যবসায়ী, আপনি ব্যবসায়ীদের নেতা...।'

কোনো কেইস ফাইল করে নাই। স্ট্রেঞ্জ এনাফ, আমাকে ডিটেনশনও দেয় নাই। কোর্টে আমার ফাইটটা হয়েছে, আমাকে ডিটেনশন দিয়েছে কি দেয় নাই। সরকার বলে ডিটেনশন দিয়েছে। কিন্তু কোর্টে কোনো কাগজ দিতে পারে নাই। যেহেতু কাগজ দিতে পারে নাই, বুঝছে যে আমাকে তো কোর্ট রিলিজ করে দেবে, তখন ওই রাত্রে ডিটেনশন দিয়েছে। যে রাতে ডিটেনশন দিয়েছে, পরদিন বেলা এগারোটায় আমি ওটা ইললিগাল ডিক্লেয়ার করিয়েছি। তারপর ৫০ হাজার টাকার চাঁদাবাজির কেইস দেখায়া, শোন অ্যারেস্ট দেখায়া বাকি দুই মাস রাখছে। তখন হাইকোর্ট

বন্ধ হয়ে গেল। লোয়ার কোর্টে তো জামিন নাই। হাইকোর্ট খুলতে খুলতে, জামিন পেতে পেতে আরও দুই মাস লেগে গেছে।

মহিউদ্দিন : ওরা আপনার কাছে কী চেয়েছিল? প্রেশারটা কী ছিল?

মিন্টু : ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন হলো রিলেটেড টু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা)। তাঁর ছেলে, তাঁর মেয়ে, চলে কেমনে, যায় কেমনে, টাকা কোথায় পায়, কী চুরি করছে, কোথায় চুরি করছে, কোথায় টাকা রাখছে, এই সব।

মহিউদ্দিন : আপনার কাছ থেকে কিছু কথা আদায় করতে চেয়েছিল।

মিন্টু : টোয়েন্টিফাইভ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন হলো রিগার্ডিং হাওয়া অফিস। এই একই জিনিস। আর টেন পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন হলো—বেগম খালেদা জিয়া—এ সম্বন্ধে কিছু জানি কি না। আমার নিজের সম্বন্ধে হার্ডলি ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন। একটা কথা আমাকে বারবার বলছিল রাশিয়ান মিগ কেনার ব্যাপারে। আমার ব্যাপারে একটাই ইস্যু। আমি ফ্ল্যাটলি বলেছি, আমি কিছুই জানি না। আসলে আমি কিছু জানি না। মিগের কেইসে আমার নাম দিয়েছিল। শেখ হাসিনা এক নম্বর অ্যাকিউজড। আমি ছিলাম ছয় নম্বর। আমি লোয়ার কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট—সব জায়গা থেকে বিনা কসুরে খালাস পাইছি। একটা কাগজ তো দূরের কথা, একটা লোকের মুখ দিয়েও আমার নাম বের করতে পারেনি। আমি কিন্তু সবার আগে (জেল থেকে) বের হয়েছি। এই যে ২৫-২৬ হাজার লোক ধরে নিয়ে গেছে, আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, যে বেরিয়ে এসেছি।

মহিউদ্দিন : মিগ-রিলেটেড কেইস তো বিএনপি গভমেন্টের আমলে করা?

মিন্টু : হ্যাঁ, আমার বিরুদ্ধে করেছে। বিএনপি আমার নাম দিছে। তারপর আমাকে বলেছে রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য।

মহিউদ্দিন : আপনি রাজি হন নাই?

মিন্টু : কেন রাজি হব? আমি তো এটা জানিই না? এটা নিয়া আমি বহুত ফাইট করছি। শুনতে গেলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

মহিউদ্দিন : আমরা তো শুনেছি, আপনি মিগ সাপ্লাই দিয়েছেন।

মিন্টু : আমি ভাই এটা জানিও না। বাংলাদেশে কোনো সরকার কোনো দিন বলতে পারবে না, তাদের সঙ্গে আমি কোনো ব্যবসা করেছি। সরকারের সাথে। সরকারের সঙ্গে ব্যবসা না করলে করাপশনের স্কোপটা কই? এই কথা তো আমি বুঝাইতে পারি নাই।

মহিউদ্দিন : পাবলিক পারসেপশন যে একটা আছে, এটা তো আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে।

মিন্টু : আমার ব্যাপারে পাবলিক পারসেপশন, মে বি, ডাবল আছে। একদিক দিয়া পাবলিক মনে করে যে লোক ঠিকই আছে। আরেক দিক দিয়ে মনে করে যে কিছু চুরিও করে। আরেক দিক দিয়া মনে করে সরকারের সঙ্গে থাইকা কিছু লুটপাটও করে। এই তিনটা মিলায়া আমার পারসেপশন। আমি কয়জনের কাছে ক্লিয়ার করব? কিন্তু একটা কথা—আমি সরকারের সঙ্গে কোনো দিন ব্যবসা করি নাই। একবার একটা গাড়ির ব্যবসা করেছি। আমার কথা শুনে সরকার এক-দেড় শ গাড়ি কিনেছিল। আমার লস হয়েছিল। এই একটা ছাড়া সরকার যেখানে জড়িত, সেখানে ব্যবসা করি নাই। এই যে পারসেপশনের কথা বললেন—সরকার যদি জড়িত না হয়, তাহলে করাপশন কীভাবে আসে? এখানে শুধু টাকার করাপশনের কথা হচ্ছে না। ব্যাড ইনফ্লুয়েন্সেও করাপশন হতে পারে। কিন্তু আমি তো কোনো দিন পাবলিক অফিস হোল্ড করি নাই? ইলেক্টেড অফিসও হোল্ড করি নাই, সিলেক্টেড বা নমিনেটেড পাবলিক অফিসও হোল্ড করি নাই। সরকারের সঙ্গে ব্যবসা না করলে আবার করাপশন করার সুযোগটা কোথায়?

মহিউদ্দিন : আপনি অ্যারেস্ট হলেন কোন মাসে?

মিন্টু : মইনের সঙ্গে মিটিং ছিল ১১ মার্চ ২০০৭। আমি অ্যারেস্ট হয়েছি ২৮ মার্চের শেষে বা এপ্রিলের শুরুতে।

মহিউদ্দিন : রিলিজ হলেন কবে?

মিন্টু : রিলিজ হলাম অক্টোবরে। এই যে ২৬-২৭ হাজার লোককে ধরেছে, আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু বি রিলিজড। আমি পদে পদে ফাইট করছি।

মহিউদ্দিন : বের হওয়ার পর এদের কারও সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে?

মিন্টু : বেইল হওয়ার পরে আমাকে *নিউইয়র্ক টাইমস* কল করল। সান ফ্রান্সিসকোতে এশিয়া ব্যুরোর যে হেড বসে, ও নিজে আসছে। আর দুবাইতে যে বাংলাদেশ দেখে, একজন মহিলা, নাম ভুলে গেছি। এরা দুজন এসেছে আমাকে ইন্টারভিউ করার জন্য। আমি একটা ইন্টারভিউ দিলাম। ওটা বের হওয়ার পর, আবার আমাকে ধরার জন্য... দেখলাম যে বাড়ির সামনে আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে, পুলিশ-টুলিশের। তখন কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিলাম।

আগে তো তাদের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলাম। চিঠি লিখে তো জেলে গেছি। এখন বলছে, ওয়ে আউট কী? বাংলাদেশের ওয়ে ফরোয়ার্ডটা কী? তখন এটা লিখলাম।

মহিউদ্দিন : এ কাগজটা খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে আপনি কয়েকটা অপশনের কথা বলেছেন।

মিন্টু : ঘরে বসে বসে লিখেছি। বলছে, এটা দিলে আমাকে আর ধরবে না। তারপর বলেছে, বাইরে যেতে পারব চিকিৎসা করার জন্য। পাঁচটা কন্ডিশন—আমাকে সাইন করিয়েছে। এক. যদি রাজনীতি করি, ওদের পরামর্শ নিয়া করব; দুই. ওদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলব না; তিন. কোনো ইনভেস্টমেন্ট উইড্র করব না; চার. বাংলাদেশে আরও ইনভেস্টমেন্ট আনার চেষ্টা করব; পাঁচ. দুই নেত্রীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখব না। এই সব ছোটখাটো জিনিস। নেত্রী জেলে আছে, যোগাযোগ রাখব কীভাবে?

মহিউদ্দিন : এটা কি মৌখিক?

মিন্টু : কাগজটা সাইন করে দিয়েছি। কাগজটা আমার কাছে নাই।[৩২]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাংবাদিক সুমিনী সেনগুপ্তকে দেওয়া এই সাক্ষাৎকার ২৬ নভেম্বর ২০০৭ 'রাজনৈতিক ঝড়ের মুখে বাংলাদেশ' শিরোনামে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ এক প্রতিবেদন ছাপা হয়। ঢাকার কয়েকটি দৈনিক ২৮ নভেম্বর এটি উদ্ধৃত করে। সাক্ষাৎকারে মিন্টু বলেছিলেন, টেলিফোন সংযোগ এবং আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি দ্রুত ছাড়িয়ে নিতে আর দশজন ব্যবসায়ীর মতো তাঁকেও নানা পথ অনুসরণ করতে হয়েছে। এটাই যদি তাঁকে গ্রেপ্তারের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তথা পাঁচ কোটি মানুষকেই গ্রেপ্তার করতে হবে। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তিনি বাংলাদেশে তাঁর বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন। 'আমি কোনো ঝুঁকি নিতে বা অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাসও করতে চাই না।' এর কিছুদিন পর তিনি যুক্তরাষ্ট্র চলে যান।[৩৩]

জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে লুৎফুজ্জামান বাবরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে রাতারাতি বিএনপির টিকিটে সংসদ সদস্য, জিয়া পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, প্রতিমন্ত্রী হওয়া, ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার এবং টাকা বানানোর বয়ান উঠে এসেছে। চার দিনের রিমান্ডে বাবর তদন্ত কর্মকর্তাদের বলেছেন, হাওয়া ভবনের (বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়) জন্য তিনি অনেক টাকা চাঁদা তুলেছেন। তিনি বলেন, ওয়ারিদ টেলিকমকে টিঅ্যান্ডটির ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ

করার ব্যাপারে এক কোটি ডলারের লেনদেন হয়, এর মধ্যে আলী আসগর লবী ১০ লাখ ডলার এবং খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো ৯০ লাখ ডলার পেয়েছেন। খালেদা জিয়ার সম্মতিতে এই লেনদেন হয় এবং তাঁর জ্ঞাতসারেই লবী ও কোকো ওয়ারিদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। র‍্যাব ও পুলিশের জন্য কেনাকাটা থেকে তিনি অনেক টাকা বানিয়েছেন বলে স্বীকার করেন। এর মধ্যে ১২টি এপিএস এবং ১ হাজার ১০০টি গাড়ি কেনার ঠিকাদারি টেন্ডারে সর্বনিম্ন দরদাতাকে না দিয়ে তিনি বেশি দামে অন্য কোম্পানিকে পাইয়ে দেন। বিএনপির একজন মন্ত্রীর মালিকানাধীন গাড়ি-ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে গাড়ি কেনার এই কাজটি পাইয়ে দেন বলে বাবর স্বীকার করেন। এর ফলে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংকে বাবরের ঋণ মওকুফ হয়ে যায়। তিনি দাবি করেন, দলের খরচ ও নির্বাচনের জন্য দলীয় তহবিলে টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারেক রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি টাকা জোগাড় করতেন।[৩৪]

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল জিজ্ঞাসাবাদে তদন্ত কর্মকর্তাদের কাছে দুর্নীতি ও দলীয় তহবিলসংক্রান্ত নানা বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন বলে গণমাধ্যমে খবর ছাপা হয়। জলিল বলেন, শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগে এককভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ নেই; তবে যৌথ নেতৃত্বে দল চলতে পারবে।[৩৫]

আওয়ামী যুবলীগের কয়েকজন নেতা আটক অবস্থায় শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে যেসব কথা বলেছেন, শেখ হাসিনা তাতে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জেএমবি নেতাদের গ্রেপ্তারের পর তাদের জবানবন্দি জনগণ জানতে চাইলেও তা প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু যৌথ বাহিনী কর্তৃক আটককৃত মো. আব্দুল জলিল ও শেখ ফজলুল করিম সেলিমের জবানবন্দি সিডি আকারে কীভাবে বাইরে এল তা বোধগম্য নয়; এটা খুবই রহস্যজনক ও দুঃখজনক। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'জীবনে এক টাকাও কাউকে দিতে বলিনি। কারও কাছে টাকা দাবি করেছি এমন প্রমাণও দিতে পারবে না কেউ। অথচ আজ আমাকে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বানানো হচ্ছে।' ৬ জুন বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জিল্লুর রহমানকে দেখে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার টাকা কোথায় আছে, আর সেই টাকার সন্ধান কেউ যদি বলতে পারে, তাহলে পুরোটাই তাকে দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'পাঁচ বছর আমাদের অনেক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আমরা কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে জোট সরকার ছেড়ে দিত না। এখন মিথ্যা

অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। এটা বড়ই দুঃখজনক। মানুষ জানে, আমরা কীভাবে চলি, কী কাজ করি।...মহাচোর ধরা হচ্ছে। এটাকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু মহাচোরদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের লোকজনকে "চোর" বানানোর চেষ্টা দুঃখজনক।'[৩৬]

জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল বা টাস্কফোর্সের জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরকে খালেদা জিয়া বানোয়াট, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক বলে মন্তব্য করেন। ৭ জুন হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। এ জাতীয় খবরে বিভ্রান্ত না হয়ে দলের নেতা-কর্মীদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি।[৩৭]

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ও ঢাকা-১০ আসনের সাবেক সাংসদ মোসাদ্দেক আলী ফালু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১১ জুন তাঁকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তদন্ত কর্মকর্তাদের কাছে খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান, রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এবং তারেকের ব্যবসার অংশীদার গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেন। ফালু বলেন, তাঁরা জোট সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আয় করেছেন। ফালু স্বীকার করেন যে ওরিয়ন গ্রুপের কাছ থেকে তিনি নিজেও মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন। *ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ফালুর বরাত দিয়ে এসব তথ্য দেওয়া হয়।[৩৮]

*ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে গ্রেপ্তারকৃত ইউনিক গ্রুপের চেয়ারম্যান নূর আলীর বক্তব্যও তুলে ধরা হয়। তদন্ত কর্মকর্তাদের তিনি বলেছেন যে স্থগিত হয়ে যাওয়া নবম সংসদ নির্বাচনে ঢাকার নবাবগঞ্জে আসনে তিনি টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। ফালুর উপস্থিতিতে নূর আলী তদন্ত কর্মকর্তাদের বলেন যে জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তিনি মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছেন। এমনকি ফালুও তাঁর কাছ থেকে এককালীন এক কোটি টাকা নিয়েছেন বলে ফালু স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।[৩৯]

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিমকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মন্ত্রী থাকাকালে প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় হিসেবে প্রভাব খাটিয়ে সেলিম বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে অভিযোগ ছিল।[৪০]

টিএফআইয়ের (টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন) কাছে তিনি স্বীকার করেছেন বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, মন্ত্রী থাকাকালে তিনি ইস্ট কোস্ট গ্রুপের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন। সিদ্ধিরগঞ্জে ২ কোটি ৭০ লাখ ডলারের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির জন্য রাশিয়ার একটি কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি ইস্ট কোস্ট গ্রুপের কাছ থেকে তিনি বিনিয়োগকৃত অর্থের ২ শতাংশ টাকা নিয়েছেন। এ ছাড়া কুমিল্লার বরুড়া আসনে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী করার বিনিময়ে নাসিমুল আলম চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছেন বলে স্বীকারোক্তি দেন।[৪১]

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। টিএফআই সেলের জিজ্ঞাসাবাদে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে যে রশি টানাটানি হয়েছিল, সে ব্যাপারে তিনি তথ্য দেন বলে গণমাধ্যমে সংবাদ ছাপা হয়। কাদের বলেছেন, মহাজোটে টানতে আওয়ামী লীগ এরশাদকে বিএনপির চেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদে ওবায়দুল কাদের জানান, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সব সিদ্ধান্ত হতো সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের মাধ্যমে এবং জলিল সবকিছুই করতেন শেখ হাসিনার নির্দেশে। এরশাদকে জোটে আনার জন্য হাসিনা দলের নেতা-কর্মীদের মতামত নেননি বলে কাদের উল্লেখ করেন।[৪২]

ওবায়দুল কাদের বলেন, যেকোনো বিষয়ে নেত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জলিল সাহেব কিছুই করতে পারতেন না; তোফায়েল আহমেদ নেত্রীর বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁর বিরাগভাজন হয়েছেন।'[৪৩]

যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই আদালতে বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দেননি। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা বা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা। অভিযোগের ফিরিস্তি দেখে ধারণা হয়, তাঁদের 'অপরাধ' সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েই 'জবানবন্দি' তৈরি করে তাঁদের সই নেওয়া বা জবানবন্দির অডিও কিংবা ভিডিও ধারণ করা হয়েছিল এবং তা গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। মওদুদ আহমদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির জন্য বন্দীদের অনেক চাপ দেওয়া, নির্যাতনের ভয় দেখানো এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতন করা হয়েছিল। অনেকেই চাপের মুখে ভেঙে পড়েছিলেন। এটাও সত্য যে অনেক রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ী দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল থেকে সব সময়ই দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং তাঁরা সব সময়ই এই অভিযোগ অস্বীকার

করেছেন। তারপরও দুর্নীতি থেমে থাকেনি।

দুর্নীতির অভিযোগে যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁরা বেশির ভাগই নিম্ন আদালতে জামিন পাননি। এঁদের অনেকেই আপিল বা রিট করে হাইকোর্টে জামিন পেয়ে যান। গ্রেপ্তার এবং নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন খারিজ হচ্ছিল গণহারে। উচ্চ আদালতে দেখা গেল উল্টো ছবি। একপর্যায়ে হাইকোর্ট অনেক অভিযুক্তকেই জামিন দিয়ে দেন। এতে ধারণা হয়, সরকার একসময় যেমন 'চরমপন্থা' নিয়েছিল, তা থেকে সরে আসতে চাইছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত দাবির মুখে নির্বাচন কমিশনও পিছু হটা শুরু করে। নির্বাচনী আইন ও রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নীতিমালার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন শুরুর দিকে যে রকম কঠোর ছিল, পরে তাদের বেশ নরম হতে দেখা গেল।

রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির অন্যতম সমর্থক ড. কামাল হোসেন ইউএনবিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের এই পরিবর্তিত আচরণের সমালোচনা করেন। 'পাইকারি হারে' জামিন দেওয়া ও নিবন্ধন নীতি শিথিল করা নিয়ে তিনি ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের হেরে যাওয়া উচিত হবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০ মাস ধরে জনগণের সমর্থন পেয়ে আসছে। তবে এখন মনে হচ্ছে তারা যেন যেতে পারলেই বাঁচে। এখন তারা নির্বাচনের নামে প্রহসনের দিকে এগোচ্ছে। এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।' হাইকোর্টের একটি অবকাশকালীন বেঞ্চে দুই শতাধিক সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজকে জামিন দেওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন তুলে ড. কামাল বলেন, 'আইন পেশায় আমার ৫০ বছরের কর্মজীবনে আমি এ রকম আর দেখিনি।' গণজামিনের ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, জামিনের আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করা উচিত হবে না। তিনি দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের 'রাজনৈতিক বন্দী' হিসেবে মুক্তির দাবি জানানোর সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত নেতার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তাঁরা মিথ্যা বলছেন, জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছেন। মিথ্যার জন্য তাঁদের অস্কার পুরস্কার দেওয়া উচিত। দাবি না মানলে বড় দুটি দল নির্বাচনে যাবে না বলে যে হুমকি দিয়ে আসছে, তার সমালোচনা করে ড. কামাল অলিম্পিকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার নিয়মকানুনের কথা তুলে ধরে প্রশ্ন করেন, 'ডোপ টেস্টে ধরা পড়ার পর কি কোনো প্রতিযোগীকে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়? বরং আয়োজকরা এ ধরনের প্রতিযোগীর পুরস্কার জব্দ করেন, এমনকি তাদের আজীবনের জন্য ওই প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ করেন।'[88]

ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুরু থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালায়। দুর্নীতিসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধ দমনে জাতীয় সমন্বয় কমিটি এবং দেশজুড়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। ১২ এপ্রিল ২০০৭ জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সরকার দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধীকে 'জিরো-টলারেন্স' দেখাবে।

সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে ডিজিএফআইসহ নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সরাসরি ভূমিকা ছিল। পরে দেখা গেছে, এ ব্যাপারে সমন্বয়ের যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির ঘটনাও উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। ২০০৭ সালের অক্টোবরে লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডিজিএফআইয়ের অন্যতম পরিচালক ব্রি. জে. চৌধুরী ফজলুল বারী এ বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন:

> চৌধুরী ফজলুল বারী: ইমার্জেন্সি হওয়ার পরে জেনারেল মাসুদ আর আমি সেনাপ্রধানের সঙ্গে বসলাম। বললাম, স্যার, ইমার্জেন্সি তো হইল। এখন তো আরও কিছু কাজ করা উচিত।
>
> কী কাজ?
>
> দুর্নীতির অ্যাগেইনস্টে ক্যাম্পেইন চালানো উচিত।
>
> ঠিক আছে, ভালো। কীভাবে করা হবে?
>
> ডিজিএফআই একটা লিস্ট করুক।
>
> তো ডিজিএফআইকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। কীভাবে লিস্ট করবে।
>
> সব সংস্থাকে ডাকো। ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশ, আর্মি ইন্টেলিজেন্স, নেভি-এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স—সব এজেন্সি লিস্ট নিয়া আসো। লিস্ট তো সবার কাছে থাকার কথা। সবাই লিস্ট নিয়া আসল। তত দিনে ডিজিএফআইয়ের ডিজি চলে আসছেন। তাঁকে দায়িত্ব দিলেন। বললেন, তুমি এটা কো-অর্ডিনেট করবা। তো আমি চেয়ার করি এটা। সবাই আসে লিস্ট নিয়া। দেইখা দেইখা শর্ট লিস্ট কইরা দুই হাজারে আনলাম।
>
> দুই হাজার—এত পারা যাবে না। আরও কমাও। আরও কমায়া এটা ৪২০-এ আনো। ৪২০—এটা সেনাপ্রধান বললেন। তো ৪২০-এ আনলাম। বললেন, না, এটাও করতে পারব না এত কম সময়ের মধ্যে। আমরা তো বেশি দিন থাকব না। তো কমায়া ২০০ করা হইল। পরে বোধ হয় ২২০ জন করা হয়েছিল ফাইনালি। তার মধ্যে টপ পলিটিশিয়ান, মানে বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, এই দুইজনের নাম ঢোকানো

হইল। যখন কেস খুঁজতে যাওয়া হয়, তখন দেখা গেল, বেগম জিয়ার নামে কোনো কেস নাই। হয়ই না। সত্যি কথা, ওনার বিরুদ্ধে আসলে কোনো কেস নাই। মানে কোনো অভিযোগই নাই। অভিযোগ সব হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে। আর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে, সবাই আইসা বলতেছে ওনার বিরুদ্ধে।

প্রথম অভিযোগটা হইল ফারুকের (তাজুল ইসলাম ফারুক) কাছ থেকে টাকা নেওয়া। উনি নিজের হাতে...। তারপরে হইল, ইলেকশনের সময়, ওনার ঘনিষ্ঠরাও বলছেন, যেগুলো বলছেন সেগুলোই। কথাবার্তা নিচে হয়। তারপর তিনি উপরে চইলা যান। উপরে গিয়া আদান-প্রদান হয়। এগুলো তো আমরা জানি না। আমরা শুনতেছি মানুষ এভাবে বলতেছে। কেস এইভাবে রেডি করছে।

নাম যাচাই-বাছাই করে ওই যে গুরুতর অপরাধ দমন কমিটি—তাদের কাছে দেয়, তারা ঠিক করে। তারপর ডিজিএফআই থেকে দুদকে পাঠানো হয়। ৫০-৫০ জনের লিস্ট দেওয়া হয়েছিল আমি থাকা অবধি। এরপরে আমি জানি না।

গুরুতর অপরাধ দমন কমিটির সভাপতি হলেন জেনারেল মতিন আর জেনারেল মাসুদ হলেন চিফ কো-অর্ডিনেটর। এরপর ডিজিএফআইয়ের পক্ষ থেকে গেলেন ব্রিগেডিয়ার আমিন। আমি কিন্তু দুর্নীতিবাজদের লিস্ট রেডি কইরা দিয়া... আমার দৌড় ছিল এই পর্যন্ত। ফাইনাল করল কিন্তু আরও সিনিয়র লেভেলে। সবাই বলে, বারী দেশ চালায়। আমার জানামতে, আমি কোনো সেক্রেটারির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি নাই, রাগ করে কথা বলি নাই, ধমক দিয়া কথা বলি নাই, যেটা ব্রিগেডিয়ার আমিন করত। আমিন ধমকাধমকি কইরা সিচুয়েশনটা অ্যাবনরমাল করছে।

ওই দুইজনকে অ্যারেস্ট করার কথা। তার আগে দুজনকেই বিদেশে যেতে বলা হয়েছিল। শেখ হাসিনা তো আগে বুঝেই চলে গেছেন। এখন বেগম জিয়ার যাওয়ার কথা। যাওয়ার জন্য উনি রেডি।

আমাকেও ফোন করছেন কয়েকবার। উনি একবারই কথা বলছেন। অন্যান্যবার সাঈদ এস্কান্দারের মিসেস ফোন করে বলছেন, ভাই, আমরা কীভাবে যাব না যাব, কী করব না করব—মানে চিন্তায় পড়ে গেছেন আরকি। হাউএভার, ওনারা রেডি হয়ে গেছেন, ফ্যান-ট্যান খুলে রেডি। কিন্তু সম্ভবত পলিটিক্যালি ইয়া কইরা ওনাদের ভিসা বন্ধ কইরা দিছে। সৌদি আরবের ভিসা। আদারওয়াইজ, দে অয়ার প্রিপেয়ার্ড টু গো।

মহিউদ্দিন আহমদ : কারা বন্ধ করল?

বারী : ওনার অফিসের কেউ এটা করছে। হারিছ চৌধুরীও করতে পারে বা অন্য কেউ। আমি ঠিক জানি না। বা অন্য কোথাও থেকে বুদ্ধি পাইয়া কেউ এটা করাইতে পারে। উনি একেবারে প্রস্তুত ছিলেন যাওয়ার জন্য। পরে উনি বলেছেন, আমি যাব না। এরপর মেজর আখতার বলেছে, ম্যাডাম, আপনি মাটি কামড়াইয়া পইড়া থাকেন। যাবেন না। যাহোক, যাওয়া অ্যারেঞ্জ করা যায় নাই।

তো উনি মাঠে একলা গোল দিয়া দিবে? তখন উনিও (হাসিনা) চইলা আসার পাঁয়তারা শুরু করল। এটা ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় চিঠিপত্র লেখানো হইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব তখন মো. আবদুল করিম সাহেব।

তারপর কী হইল? লিস্ট হইল। ধরাধরিও শুরু হইল ক্ষেত্রবিশেষে। ইমপর্টেন্ট বিষয় হলো, ডিজিএফআইকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে ইনক্লুড করা। ইমার্জেন্সি দেওয়ার সময় আমি যে গেজেটটা রেডি করছি, আমি ডিজিএফআইকে ইনক্লুড করি নাই। ব্রিগেডিয়ার আমিন আর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ—এরা ডিজিএফআইকে ইনক্লুড করছে। সমস্ত দোষ কিন্তু আমার ঘাড়ে।

মহিউদ্দিন : গোলাম মোহাম্মদ তখন কী?

বারী : তখন ডিএমও। ডাইরেক্টর, মিলিটারি অপারেশনস। ওনারা ডিজিএফআইকে ইনকরপোরেট করল। তারপর পলিটিশিয়ানদের ধরপাকড় শুরু হলো, ধরে ডিজিএফআইতে আনা। করাপ্ট লোকদের ধরে পয়সাকড়ি নেওয়া—এগুলো করতেছে ব্রিগেডিয়ার আমিন। আমি গেলাম আমার ডিজির কাছে। এর আগে আমি কিন্তু সেনাপ্রধানকে বলে এসেছি। ডিজিকে বললাম, স্যার, বাংলাদেশটা এমন জিনিস, এখান থেকে কেউ যদি একটা পয়সাও নেয়, মানুষ বলবে যে ১০ কোটি টাকা নিয়ে গেছে। আপনি যে পলিটিশিয়ানদের আনতেছেন, এদের মধ্যে বুড়া মানুষ-টানুষ আছে, মরে গেলে কেউ আমার নাম বলবে না। গোলাম মোহাম্মদ তখন ডিজি—বললাম, আপনার নাম বলবে।

উনি আবার অল্প কথাতেই উত্তেজিত হয়ে যান। বলো কী? আমিন নিজেকেও খাবে, চিফকেও খাবে। আমিন সাহেবকে আমি সুপরামর্শ দিলাম—এগুলি আনবেন না। আমি বিডিআরে চাকরি করেছি। যারা এক কোটি টাকা খেয়েছে, মানুষ বলেছে, ১০ কোটি টাকা খেয়েছে। বুড়া পলিটিশিয়ানদের আনতেছেন, ধমক-টমক খেয়ে হঠাৎ যদি কলাপস করে—এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল জেনারেল এরশাদের সময়।

কাস্টমসের এক অফিসার মারা গেছিল, তখন ডিজিকে যেতে হতো কোর্টে। বললাম, স্যার আপনি যাবেন, আমাকে সবাই ভুলে যাবে। চিফকেও আমি এ কথা বলেছি।

চিফ এখন বলছেন, ডিজিএফআই ইজ প্লেয়িং দিস রোল, এগুলো ঠিক না। কথা না ডিপ্লোমেটিক, না মিলিটারি। এই টাইপের কথাবার্তা বলে—কথাটা ইফেক্টিভ হয় না। উনি তো সোজা বলে দিতে পারতেন, নো মোর পলিটিশিয়ান শুড বি ব্রট টু ডিজিএফআই। নো মোর কালেকশন অব (মানি)। এসএ ট্রেডার্স আছে না? চিটাগাংয়ের? মান্নান ভূঁইয়া সাহেব আমাকে একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন। বারী সাহেব, মানুষের খাওয়াটা ঠিক রাইখেন। এটা কিন্তু আন্দোলনের সূত্রপাত কইরা দেয়।

আমি কিছু কিছু ব্যবসায়ীকে বললাম, আপনারা ইমপোর্ট করেন। আমার বাচ্চারা টার্কিশ হোপ স্কুলে পড়ত। প্রিন্সিপাল আমাকে খুব সম্মান করত। আমি তাদের বললাম, আপনাদের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে আসতে বলেন—এরা চাল-ডাল ইমপোর্ট করবে। তো ওইভাবে এস এ ট্রেডার্স যাবে। এয়ারপোর্টে গেছে, ওখান থেকে আমিন তাকে অ্যারেস্ট করায়া নিয়া আসছে। নিজে গিয়া তো হাতকড়া লাগায় না?

মহিউদ্দিন : এস এ ট্রেডার্সের মালিকের নাম কী?

বারী : সালাহউদ্দিন বা সালেহউদ্দিন। এভাবে ঘটনাগুলো ঘটেছে। কোনো কো-অর্ডিনেশন নাই। আমি যা করি, তা গণমানুষের দিকে যায়। এরা করে মিলিটারি কায়দায়। পাকিস্তানি মার্শাল লয়ের কায়দায়। এগুলো হলো করাপশন—লোকজনকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমি এসবের মধ্যে নাই। আপনি বলবেন যে আমি গা বাঁচানো টাইপের কথা বলছি।

কাউন্টার টেররিজমটা কে নিল? ওটা ছিল সিটিআইবিতে। জেনারেল মাসুদ যখন এখানে ছিলেন, এ জায়গায় তো আমি বসলাম। এখন কাউন্টার টেররিজমটা হলো ব্রিগেডিয়ার আমিনের আন্ডারে। এটা হেভি রিচ একটা ডাইরেক্টরেট হইছে। কারণ এটার মধ্যে পয়সাকড়ি। বুঝতেই পারেন, মানুষ টাকা দিচ্ছে। এরে ধর, ওরে ধর, মারেকাটে, তারা কাউন্টার টেররিজম করে। এটা অনেক বড় করা হলো। অফিসার বাড়াইয়া—তার অফিসারের শেষ নাই। আমার হলো সিআইবি, হাম্বল ওয়েতে চালানো। আমার লিমিটেড বাজেট। আমার বাজেট আমার কাছে থাকে না। সব বন্টন করে দিই। ম্যানপাওয়ারের দিক থেকে আমার শক্তি বেশি। প্রত্যেক জায়গায় আমার ডিটাচম্যান্ট, সব ক্যান্টনমেন্টে আমর ডিটাচম্যান্ট। ব্রিগেডিয়ার আমিনের এসব নাই। ওদের কাজ হলো

ফরেনারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। নতুন করে এরা করল কী? এরা টাকাপয়সা পাইতে শুরু করল। অফিসার নিয়া আসল কাউন্টার টেররিজমের জন্য। অফিসার বাড়াইতে শুরু করল। অর্গানোগ্রাম বড় করতে শুরু করল।

এই যে পলিটিশিয়ানদের নিয়া আসে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য, এদের জনবল কে দিবে? আমিন সাহেবের লোকরা তো বেকার বসা। এরা খবর নেয়, কোথায় কী হয়, কোথায় মাদ্রাসার পোলাপান বইসা মিটিং করে, এগুলা নিয়া তারা ব্যস্ত। এদেরকে নিয়ে কমিটি করে করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। একেকজন প্রিজনারকে একেক কমিটি জিজ্ঞাসাবাদ করে। আবার টাকা কালেকশনও করে। আমি বলি না যে সে টাকা মাইরা দিছে। সে টাকা জমা করছে।

আরেকটা কথা বলি। তারেক রহমান একবার বঙ্গবন্ধুর কবরস্থানে গেছিলেন, টুঙ্গিপাড়া। আমি পাঠাইছিলাম। উনি আসতেছিল খুলনা থেকে। আমি রিকোয়েস্ট করে বললাম যে এখন যান। আমি বসেই (ডিজিএফআইয়ে) দুইটা কাজ করছি, একটা হলো ওনাকে (টুঙ্গিপাড়া) পাঠানো, আরেকটা হলো তারেক সিদ্দিকী আছে না? জেনারেল তারেক সিদ্দিকী। ওনাকে ডিজিএফআইয়ের লোক নজরদারি করত। উনি ভালো মানুষ। কী দরকার? সার্ভিলিয়েন্সটা উইড্র কইরা দিছিলাম। কে কোন দলের, কোন ব্যক্তির—এগুলো আমার মধ্যে ছিল না।

মহিউদ্দিন : তারেককে যে টর্চার করা হলো...

বারী : আপনি তো একেবারে কনক্লুশন টাইনা বলতেছেন?

মহিউদ্দিন : এটা আমরা শুনেছি।

বারী : আমি এই ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে চাই, তারেককে যে করা হইল, মানে করা হইয়া গেছে।

মহিউদ্দিন : দ্যাট ওয়াজ দ্য স্টোরি।

বারী : ওইভাবে স্টোরিটা করছে, এখন মিস্ট্রিটা হইল কারা করছে। আমি আপনাকে কী বললাম? কারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে? এটা হলো আমিনের হাতে। এটা যদি কারও ফাইন্ড আউট করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তারা বলত, ঠিক আছে আমরা রেজিস্টারটা দেখি। কয়টা গ্রুপ, কয়টা কমিটি করা হইছিল জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য? ধরুন, চারটা কমিটি করা হইছিল। কারা কারা ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? এখান থেকেই ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট। ইজি পদ্ধতি। দুই নম্বর হইল, আদৌ তারেক রহমানকে (টর্চার) করা হইছে কি না। ওনার সঙ্গে আমার দুই-তিনবার

দেখা হইছে। একেবারে যে হৃদ্যতার সম্পর্ক—এইটা না। ভদ্রজনোচিত, লৌকিক, ভালো সম্পর্ক যেটা সেভাবেই ওনার সঙ্গে দেখা হইছে। আমি ওনাকে রেসপেক্ট করি। উনি আমাকে রেসপেক্ট করে কথা বলছে। এটা ওয়ান-ইলেভেনের কথা না, অনেক আগের কথা। ওনাকে আমি দুই-তিনটা বিষয়ে রেসপেক্ট করি। উনি জিয়াউর রহমানের সন্তান, বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান।

তারেক রহমানকে মারার ঘটনায় আসি। আমি বিশ্বাস করি না যে তারেক রহমানকে কেউ মারতে পারে। আমি হঠাৎ করে উইকিলিকসে দেখলাম, তারেক রহমান বলছেন, আমি ওনারে টর্চার করছি। আমি টর্চার করছি বদমাশদের, স্মাগলারদেরকে আমি পিটাইছি, গুলি করছি। কিন্তু আমি জিয়াউর রহমানের ছেলেকে মারব, টর্চার করব? আমি তারেক রহমানের কাছে মেসেজ পাঠাইছিলাম। জানি না উনি পাইছেন কি না। আমি জিয়াউর রহমানের ছেলের কথা বিশ্বাস করি। জিয়াউর রহমানের ছেলে যদি বলেন যে ব্রিগেডিয়ার বারী ওনাকে মারছে, তাহলে ব্রিগেডিয়ার বারী মারছে। আমি তো জানি, আমি কী মানুষ। আমি কি এমন মানুষের গায়ে হাত তোলার মানুষ? আমি তো আমাকে জানি। আমার তো দরকার নাই অন্য কাউকে জানানোর। এ কোন বারী মারছে, সেই বারীর মধ্যে এই বারী নাই, হয়তো। আমি এই কাজ করি নাই।

মহিউদ্দিন: কয়েকজন পরে বলেছেন যে তাঁরা টর্চার্ড হয়েছেন। আওয়ামী লীগের জলিল সাহেব, শেখ সেলিম আর মহীউদ্দীন খান আলমগীর।

বারী: আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। বিকজ দে ওয়ার নট মাই সাবজেক্ট। পুলিশ ধরছে। অনেককে ডিজিএফআইতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ডিজিএফআইতে কারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে, আমি আপনাকে আগে বলেছি। ডিজিএফআইয়ের মেকানিজমটা জানতে হবে। দোষারোপ করার আগে মেকানিজমটা জানতে হবে। শেখ সেলিম নাকি বলছে, আমি নাকি খুব ইয়ে করছি। আল্লার কসম। শেখ সেলিমের বাসায় আমি গেছি। গিয়া ঠিক এইভাবে বলছি, স্যার, আপনার রাজনীতি এখন এদেরকে দেন, আপনার ভাইয়ের ছেলে—তার সুন্দর কথা আমি শুনছি। মাশআল্লাহ, দেশকে এরা কোথায় নিয়া যাবে? আমি এই কথা বলছি—আপনারা রাজনীতি ছাইড়া এদেরকে দেন। আমি যতটুকু আঁচ করি, এদের নড়বড়ে অবস্থান তো? নিজেদের শুদ্ধ করার জন্য বলে, বারী সাহেব এই করছে। আমি যদি তোমাদের এত লোককে ইয়ে করতে

পারতাম, হোয়াই ডোন্ট ইউ পিপল মেক মি প্রাইম মিনিস্টার?

ফেব্রুয়ারি (২০০৮) থেকে আমার আইসোলেশন প্রক্রিয়া শুরু হইছে। কিন্তু দোষারোপ পুরাটাই আমার ওপরে। আমি যদি একা এত শক্তিধর হইয়া থাকি, একটা দেশ চালায়া দিতে পারি, হোয়াই ডোন্ট ইউ মেক মি প্রাইম মিনিস্টার?

মহিউদ্দিন : আপনারা বলেছেন যে আপনারা ক্লিন পলিটিকসের চিন্তা করেছেন।

বারী : প্রথম হলো ইমার্জেন্সি দিয়া স্বাভাবিক অবস্থা নিয়া আসা। এরপর যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হইল, তখন দেখা গেল এটা সব স্ফিয়ারেই আছে। আর্মির বিরুদ্ধেও আছে। এয়ারফোর্সের (সাবেক) চিফকেও ধরা হইল। কোনো পার্শিয়ালিটি করা হয় নাই। অতিরিক্ত যা করা হইছে, ব্যালান্স করার জন্য, দ্যাট ওয়াজ এথিক্যালি রং।

মহিউদ্দিন : এয়ারফোর্সের কোন চিফকে অ্যারেস্ট করা হলো? জামালউদ্দিন? মিগ কেনা নিয়ে একটা মামলা ছিল?

বারী : না, জামালউদ্দিন না। তার বিরুদ্ধে তদন্ত হইছিল। এয়ার চিফ ছিল, ওই যে আল্লার মাল আল্লায় নিয়া গেছে? ওনাকে অ্যারেস্ট করা হইল। আমরা সব করছি আইনানুগভাবে। যতগুলো অ্যারেস্ট হইছে, সব আইনানুগভাবে। পুলিশ করছে, যেভাবে দুদক বলছে।

মহিউদ্দিন : কিছু কিছু কেস ছিল দুর্বল, যেমন বিয়ারের ক্যান পাওয়া গেছে...

বারী : ইউ আর রাইট। এইগুলা কোনো কেসের জাতও না। তারপর টিনের কেস। আমার নিজেরই লজ্জা লাগছে। এগুলির পেছনে তো আমরা ছিলাম না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইয়া করাটা প্রথম কার ছিল—জেনারেল মাসুদের। আমার মূল কাজ ছিল ইমার্জেন্সি পর্যন্ত। এরপর ইলেকশন কমিশন সাজায়া একটা সুন্দর নির্বাচন মানুষের সামনে উপস্থাপন করে যাব, সো দ্যাট পলিটিশিয়ানরা এর থেকে আর বাইর হইতে না পারে। ওনাদের স্ট্যান্ডার্ড ক্যান বি হায়ার দ্যান দ্য টেন পিপল-অ্যামিনিস্টার্ড কান্ট্রি। আমার এ ধরনের চিন্তা ছিল। ধর-মার-কাট এসব চিন্তা আমার ছিল না।

মহিউদ্দিন : আপনি বলেছিলেন যে আপনারা দুর্নীতিবাজদের তালিকা তৈরি করেছিলেন পিপলস পারসেপশন, মিডিয়া রিপোর্ট এগুলোর ওপর ভিত্তি করে।

বারী : হ্যাঁ, এবং পলিটিশিয়ানদের কথা শুনে—ওরাই বলে দিচ্ছে

এক্স, ওয়াই, জেড চোর। তাদের চেয়ে বড় জ্ঞানী তো আর কেউ নাই। ওনাদের কথা আমরা খুব গুরুত্বসহকারে নিছিলাম।

মহিউদ্দিন : ওই সময় কিন্তু কিছু লোক বাইরে চলে গিয়েছিল।

বারী : হ্যাঁ, বিদেশে গেছিল। তখনো ধরপাকড়টা ওইভাবে শুরু হয় নাই।

মহিউদ্দিন : তাদের কি পালাতে দেওয়া হয়েছিল?

বারী : না। ওরা তো বুদ্ধিমান লোক। হয়তো আগেই আঁচ করতে পারছেন যে একটা মিলিটারি ইনভল্‌ভমেন্ট থাকলে এগুলো শুরু হয়। আর এটা তো বাংলাদেশ! একজন এক্স ওয়াই জেড অ্যারেস্ট হওয়ার কথা। দেখা গেল ওনার একজন শালা হয়তো আছে আর্মিতে। কথার কথা বলতেছি। বা পুলিশে আছে হয়তো একজন, একসেস আছে।

মহিউদ্দিন : অ্যারেস্ট যাঁরা হয়েছিলেন, পরে তাঁরা কেউ কেউ বই লিখেছেন। যেমন মওদুদ আহমদ, প্রফেসর হারুন। আমি পড়েছি। তাঁরা তো লিখেছেন, ইন্টারোগেশনের নামে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে।

বারী : আমি অ্যাবসলিউটলি এসব জানি না। প্রফেসর হারুন-অর-রশিদকে অ্যারেস্ট করছিল ইউনিভার্সিটির ঘটনায়। করাপশনের চার্জে না, হি ওয়াজ নট ইভেন ইন মাই লিস্ট।

মহিউদ্দিন : করাপশনের চার্জে যাঁরা অ্যারেস্ট হয়েছিলেন, ওই লিস্টটা আপনার করা?

বারী : আপনার মানে? আই ওয়াজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অব ডিজিএফআই। যেমন এনএসআই থেকে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার লোদি। আর্মির ছিলেন ডিএমও। সিনিয়র অফিসারদের এর মধ্যে রাখা হইছিল। আমি ডিপেন্ড করছি আমার স্টাফদের ওপর। তারা ছিল কর্নেল। তারা কার ওপর ডিপেন্ড করছে? তারা ফিল্ড থেকে খবর আনছে, বিভিন্ন ডিটাচমেন্ট থেকে। আমার তো এখানে কোনো ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না। কারোরই ব্যক্তিগত শত্রু থাকার কথা না। রেকর্ডপত্র দেইখা, যাচাই-বাছাই কইরা লিস্ট করা হইছে। লিস্টটা প্রেজেন্ট করা হইছে টু দ্য হায়ার বডি। তারা এরপরও বলছে—এই করো, ওই করো। তারেক রহমানের নাম, দুই প্রধান নেত্রীর নাম, এগুলি সেনাপ্রধান বইলা দিছে। এটা হইল লিস্ট। অ্যারেস্ট করার ব্যাপারটা অ্যাবসলিউটলি সেনাপ্রধান বলছেন। আমি যার কাছে শুনছি, তিনি বলছেন, এটা সেনাপ্রধানের নির্দেশ। এক্সিকিউটিভ অর্ডার কে দিচ্ছে, দ্যাট আই ডু নট নো। মোস্ট প্রব্যাবলি

ব্রিগেডিয়ার আমিন এগুলো তদারক করছে।

আমার কোনো ইন্টারেস্টও ছিল না। বিকজ বাইরের ইন্টারেস্ট তো আমার না? ব্রিগেডিয়ার আমিন ছিল গুরুতর অপরাধ দমন কমিটির মেম্বার। আমি তো লিস্ট দিয়া খালাস। এখন তো তদন্ত দরকার। এগুলি ফরমালি অন্যরা করবে। দুদক দুদকের কাজ করবে। আমি কখনো ম্যানিপুলেট করি নাই। আমি আগেই বলেছি, আমি কারও সঙ্গে মিসবিহেভ করি নাই।[৪৫]

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বাড়াবাড়ি আচরণের কথা স্বীকার করেছেন সেনাপ্রধান মইন। তবে গ্রেপ্তার এবং জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে তাঁর অনুমোদন ছিল না, এমনটি বলা যাবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ডিজিএফআইয়ের কর্মকর্তারা 'স্বাধীনভাবেই' তাঁদের কাজ চালিয়ে গেছেন বলে মনে হয়। তবে একপর্যায়ে জেনারেল মইনকে হস্তক্ষেপ করতেই হয়েছিল। ২০১৭ সালের অক্টোবরে লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন :

মহিউদ্দিন আহমদ : তারেক রহমানের ব্যাপারে কথা উঠেছিল যে হি ওয়াজ টর্চার্ড। এটা কি...

মইন ইউ আহমেদ : আমি এটা বলতে পারি, আই হ্যাড নেভার ইনস্ট্রাক্টেড অ্যানি ওয়ান টু ইভেন টাচ হিম। হি কামস ফ্রম আ গুড ফ্যামিলি। তার বাবা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমি তাকে সম্মান করি। আমি তাকে কেন ও রকম করব। এতে আমার কী লাভ? কেউ যদি করে থাকে, অ্যাট দেয়ার ওউন ইনিশিয়েটিভ। আমার কাছে অনেক প্রপোজাল এসেছে, একে মেরে ফেলেন, ওকে মেরে ফেলেন। আই উইল বি দ্য লাস্ট ম্যান টু অর্ডার টু কিল সামবডি। আজ আমি একটা চেয়ারে আছি। কাল আমি সেখানে থাকব না। সুতরাং আমার আদেশ দিয়ে কাউকে মারা হবে না। ইট ওয়াজ মাই ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন। ডিজিএফআইয়ের লোকদের আমি বলেছি। জিজ্ঞেস করে দেখেন, বলেছি কি না? আমি কাউকে মারিনি। দেখান তো একটা লোক, যাকে খুন করা হয়েছে? কেউ কেউ বলেছিল, মামুনকে শেষ করে দেওয়া হোক। দেয়ার ইজ আ কোর্ট। লেট দ্য কোর্ট ডিসাইড। একটা লোককে বিচার ছাড়া মেরে ফেলা হবে, আই ডোন্ট বিলিভ ইন ইট। এটা ঠিক না। আল্লাহর কাছে তো জবাব দিতে হবে, টুডে অর টুমরো।

মহিউদ্দিন : দুই নেত্রীকে গ্রেপ্তার করার প্রেক্ষাপটটি বলুন।

মইন : একজন লইয়ার ছিল, একজন অ্যাডভাইজার ছিল, একটা টিম ছিল এ জন্য, একজন জেনারেল ছিল। বিভিন্ন রকম কেস যে আসছে, অনেকগুলো কেস বেরিয়ে এসেছে। এগুলোর ভিত্তিতে কেস স্টার্ট হয়েছে। একপর্যায়ে, যখন অন্যদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, উনাদের এতগুলি কেস, ওনাদের কেন অ্যারেস্ট করা হবে না? ওই সময় এ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল যে এদের কেন ছাড় দেওয়া হবে। ওনাদের কিন্তু আলাদাভাবে, ইউ নো...

মহিউদ্দিন : স্পিকার এবং হুইপের বাসায়...

মইন : হ্যাঁ, ওই বাসাগুলো জেল ডিক্লেয়ার করে যতটুকু কমফোর্ট দেওয়া সম্ভব...

মহিউদ্দিন : দে অয়ার ইনটার্নড।

মইন : একজাক্টলি। ইট ওয়াজ লাইক দ্যাট।

মহিউদ্দিন : আপনাদের মুভটাতে ইমিডিয়েটলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিএনপি। বিকজ তাদের সাজানো বাগানটা আপনারা তছনছ করে দিয়েছেন। তাই না?

মইন : সাজানো বাগান মানে?

মহিউদ্দিন : মানে তাদের সেট-আপ। এই যে ইয়াজউদ্দিন সাহেব, তাঁদের মতন করে কাজ করছিলেন, আওয়ামী লীগ বলছে ২২ জানুয়ারির ইলেকশনে তারা যাবে না...। সুতরাং বিএনপির অ্যাগ্রিভড হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। শেখ হাসিনা কিন্তু প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে 'এক-এগারো আমাদের আন্দোলনের ফসল'। দ্বিতীয়ত, তিনি যখন যুক্তরাষ্ট্রে যান, তিনি বলেছিলেন, আপনাদের সব কাজকে বৈধতা দেবেন। তো শি ওয়াজ গিভিং আ সিগন্যাল যে আপনাদের পেছনে তাঁর সাপোর্ট আছে। তারপর হঠাৎ করে দেশে ফেরার পথে লন্ডনে তাঁকে আটকে দেওয়া হলো। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। খালেদা জিয়া বাইরে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন, সৌদি আরব যাওয়ার কথা ছিল। সৌদি আরব ভিসা দিল না। এটাও একটা পাতানো খেলা হতে পারে। উনি গেলেন না। শেখ হাসিনা ফিরে এলেন। তাঁকে অ্যারেস্ট করলেন প্রথম, পরে খালেদা জিয়াকে। এত সাপোর্ট দেওয়ার পরও হাসিনাকে অ্যারেস্ট করলেন?

মইন : কমিটি ছিল। চার্জেস ওয়ার দেয়ার। ওই সব চার্জের ভিত্তিতেই। ইউ নো ভেরি ওয়েল, কান্ট্রি নোওজ ভেরি ওয়েল, হোয়াট ইজ হোয়াট। ডেভেলপড ওয়ার্ল্ড আর ডেপেলপিং ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটাই পার্থক্য। চার্জ তো সব সময়ই ছিল। যিনি পাওয়ারে ছিলেন, তিনি

দিয়েছেন। ওরা যখন পাওয়ারে গেছে তারা দিয়েছে। ইট কন্টিনিউড। ইতিহাস দেখেন।

মহিউদ্দিন : আপনাদের মধ্যে সমন্বয়ের সমস্যাগুলো...

মইন : কী বিষয়ে?

মহিউদ্দিন : এই যে বললেন না, এজেন্সির সঙ্গে সমস্যা হচ্ছে, কেউ একটু বেশি বেশি..., এটা আপনি কীভাবে হ্যান্ডেল করতেন?

মইন : ডিজিএফআই ওয়াজ ভেরি অ্যাকটিভ অ্যাট দ্যাট টাইম। যদিও ডিজিএফআই ওয়াজ নট ডাইরেক্টলি আন্ডার দ্য কমান্ড অব দ্য আর্মি। তারা সরাসরি ডিফেন্স মিনিস্ট্রির কাছে রেসপনসিবল। তারা ডিফেন্স মিনিস্টারের কাছ থেকে নির্দেশ পায়। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি প্রেসিডেন্টের হাতে।

মহিউদ্দিন : এটা আমি জানতাম না যে ডিজিএফআই আর্মির চিফের অধীনে না।

মইন : এটা হলো ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স। এর মধ্যে আর্মি, এয়ারফোর্স, নেভি—সবার সদস্য আছে। আর্মির নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স আছে, প্রত্যেক লেভেলে আছে। ফরমেশন কমান্ডারের অধীনে আছে ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, আর্মি লেভেলে, ওইটা চিফের অধীনে। কিন্তু একটা কো-অর্ডিনেশন থাকে। ডিজিএফআইয়ের বেশির ভাগ অফিসার তো আর্মির। কোনো কিছু হলে ডিজি ডিজিএফআই এসে চিফকে ইনফর্ম করে।

মহিউদ্দিন : ওই সময় কিছু কিছু বাড়াবাড়ি তো হয়েছে?

মইন : বাড়াবাড়ি হয়েছে, কিছু লোকও বদলানো হয়েছে এবং কোনো কোনো কর্মকর্তাকে বদলিও করা হয়েছে। কিছু হলে তার সুরাহা করতে একটু সময় লাগে। ইফ সামবডি ইজ ডুয়িং সামথিং রং, সেই সংবাদটা আসতে আসতে সময় নেয়, ভায়া মিডিয়া আসে। অনেক সময় দেখা গেছে, খবরটা পেতে পেতে হয়তো বিরাট একটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। তারপরও খুব দ্রুত অ্যাকশন নেওয়া হয়।

মহিউদ্দিন : অ্যাকশন নেওয়ার আগেই অনেক ড্যামেজ হয়ে যায়।

মইন : বাই দ্য টাইম ইউ টেক অ্যাকশন, ইট মে বি লেট, ইট মে নট বি টাইমলি। সমস্যা একটা আছে। আমি চেষ্টা করেছি। যখনই আমার নলেজে এসেছে, রেকটিফাই করেছি। আইদার বাই রিমুভিং পিপল অর অ্যাডমনিশিং অর বাই পানিশিং সামথিং, সাম অ্যাকশনস ওয়ার টেকেন।

মহিউদ্দিন : উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বোধ হয়

বাদ দেওয়া হয়েছিল। গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী, মইনুল হোসেন ও তপন চৌধুরী।

মইন: যেভাবে চিফ অ্যাডভাইজার চেয়েছিলেন, দ্রুত কাজ করার জন্য... কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। সো ফ্রেশ ব্লাড ওয়াজ নিডেড। আমার মনে হয় এটা কেয়ারটেকার গভমেন্টের একটা ভালো ডিসিশন ছিল। মানুষ, দেশ, সরকার সবাই চাচ্ছিল, মাচ মোর দ্যান হোয়াট দে ওয়ার প্রডিউসিং। কেয়ারটেকার গভমেন্টের একটা উপলব্ধি হলো এবং পরিবর্তন আনা হলো।[৪৬]

১৫ ২০০৭ জুন সন্তানসম্ভবা মেয়েকে দেখতে শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার কথা ছিল। আগের দিন বিকেলে দেশের সব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও একটি স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে তাঁর বিদেশযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া দুটি চাঁদাবাজির মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে।[৪৭]

এর আগে সকালে সুধা সদনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শেখ হাসিনা বলেন, 'সামর্থ্যবানদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুদানের টাকায় দল চলে। আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা-কর্মীর সহায়তায় দল চলে। চাঁদা নেওয়া আর চাঁদাবাজি এক হলো? চাঁদা তুলে *প্রথম আলোর* বন্ধুসভা নানা সহায়তামূলক কাজ করে, এলাকায় এলাকায় মসজিদ তৈরি হয়, সরকারও দুর্গতদের সহায়তার জন্য ত্রাণ বিতরণ করতে চাঁদা নেয়। এগুলো তো চাঁদাবাজি নয়। তাহলে রাজনৈতিক দলের জন্য চাঁদা নেওয়া হলে সেগুলো চাঁদাবাজি হবে কেন?' তিনি অভিযোগ করেন, তাঁকে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখার জন্য চক্রান্ত চলছে। এই প্রক্রিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বানোয়াট মামলা দায়ের করা হয়েছে। আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাগজে সই নিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মোট ৩০টি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।[৪৮]

১৬ জুলাই সকালে শেখ হাসিনাকে ধানমন্ডির সুধা সদন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৩ জুন ঢাকার গুলশান থানার ইস্ট কোস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরীর দায়ের করা একটি চাঁদাবাজির মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বিগত জোট সরকারের আমলে দায়ের করা ৪টি মামলাসহ তাঁর বিরুদ্ধে মোট ১১টি মামলা ছিল।

গ্রেপ্তারের পর শেখ হাসিনাকে নিয়ে ৭টা ৩৫ মিনিটে কড়া পুলিশি

পাহারায় ১৪টি গাড়ির বহর আদালতের দিকে যায়। ওই সময় কয়েকজন নেতা-কর্মীকে সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখা গেছে। সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে তাঁকে মহানগর হাকিম কামরুন্নাহারের আদালতে হাজির করা হয়। সহকারী কমিশনার মকবুল হোসেন আদালতে পেশ করা প্রতিবেদনের কিছু অংশ পড়ে শোনান। প্রতিবেদনে বলা হয়, গুলশান থানায় দায়ের করা চাঁদাবাজির এ মামলার অপর আসামি শেখ ফজলুল করিম সেলিম ২১ জুন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে শেখ হাসিনার নাম বলেছেন। আদালতে শেখ হাসিনার পক্ষে আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন খসরু, সাহারা খাতুন, কামরুল ইসলাম, আবু সাঈদ, আবদুর রহমান হাওলাদার, ফজলে নূর তাপস প্রমুখ। তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে যায়। আদালত থেকে বিশেষ কারাগারে নেওয়ার সময় আশপাশের কয়েকটি স্থানে শত শত মানুষ সমবেত হয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে পুলিশের শটগানের গুলিতে আহত হন কয়েকজন।[৪৯]

শেখ হাসিনাকে সংসদ ভবনের পাশে হুইপদের বরাদ্দ দেওয়া হয়, এমন একটি বাড়িতে রাখা হয়। ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এ বাড়িটিকেই উপকারাগার ঘোষণা করে সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদকে রাখা হয়েছিল। প্রায় ছয় মাস পর এখান থেকে এরশাদ ছাড়া পেয়েছিলেন।

শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের পর আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মামলার বাদী আজম জে চৌধুরী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২ কোটি ৯৯ লাখ ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা চাঁদা নেওয়ার অভিযোগ আনেন। শেখ সেলিম তাঁর স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছেন, আটটি চেকের মাধ্যমে নেওয়া এ টাকা তিনি তাঁর মামাতো বোন শেখ হাসিনাকে গণভবনে গিয়ে দিয়ে আসেন। সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে এ চাঁদা নেওয়া হয় বলে বাদী এজাহারে উল্লেখ করেছেন। এ টাকা নগদ চেকে নাকি অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে এবং হয়ে থাকলে কার কার ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে জানতে চাইলে আইন উপদেষ্টা বলেন, 'এ বিষয়ে বিস্তারিত আমার জানা নেই। সরকার কোনো মামলা করছে না। দুদক, আয়কর বিভাগ ও কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মামলা-মোকদ্দমা করছেন। সরকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে।'[৫০]

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হবে কি না, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে মইনুল হোসেন বলেন, 'নির্দিষ্ট কারও বিরুদ্ধে



গ্রেপ্তার হলেন শেখ হাসিনা

দুর্নীতির মামলা হবে কি না, সেটা সরকার নির্ধারণ করে না। কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে সেই মামলা নিজস্ব নিয়মে চলবে।'[৫১]

২৪ জুলাই আদালতে দেওয়া পুলিশের অভিযোগপত্রে আজম জে চৌধুরীর দায়ের করা মামলায় শেখ হাসিনা এবং শেখ সেলিমের সঙ্গে হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানাকেও অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়। অভিযোগপত্রে শেখ রেহানাকে পলাতক দেখিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাসহ তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আবেদন করা হয়।[৫২]

মামলার অভিযোগপত্রে তাঁর নাম থাকা প্রসঙ্গে ২৪ জুলাই শেখ রেহানা বিবিসিকে বলেন, 'এটা একদম সাজানো মামলা। আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি জাতির জনকের দুই কন্যার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হবে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলা। কোনো চাঁদা কিংবা কোনো কিছু আমাদের দরকার নেই। বাংলাদেশের মানুষের বেঁচে থাকাটাকেই আমরা প্রাধান্য দিই। যদি মানুষের জন্য কিছু করতে পারি। কারও কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' তিনি বলেন, একটা পরিবারকে অপদস্থ করার জন্য এই মামলা করা হয়েছে, 'এটা ভাইকে (সেলিম) দিয়ে বোনের (হাসিনা) বিরুদ্ধে

জোরজবরদস্তি করে বলানো। কিন্তু কী পরিস্থিতিতে এটা বলানো হয়েছে? শুনেছি ওনাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছে। উনি হয়তো জানেনও না, তাঁকে দিয়ে কি সই করানো হয়েছে।'[৫৩]

১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ *ইত্তেফাক*-এ ছাপা হওয়া একটি রিপোর্টে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দুই ছেলে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোর বিরুদ্ধে কর ফাঁকির মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার বিভিন্ন নামসহ পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য জানতে চেয়েছে এনবিআর। ব্যাংকগুলোকে বলা হয়েছে এসব হিসাবের অর্থ জব্দ করতে। কিছুদিন আগে খালেদা জিয়া সম্পদের হিসাব দিলে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এনবিআরের চেয়ারম্যান বদিউর রহমান সাংবাদিকদের বলেছেন, অসুস্থতাজনিত কারণসহ জরুরি প্রয়োজনে এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলে আবেদন করে নিয়ম অনুযায়ী দৈনন্দিন খরচ মেটাতে জব্দকৃত অ্যাকাউন্ট থেকে মাসে ৫০ হাজার টাকা তোলা যাবে।[৫৪]

২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ঢাকার তেজগাঁও থানায় দুটি পৃথক মামলা দায়ের করে। খালেদা জিয়া, তাঁর ছোট ছেলে কোকোসহ ১৩ জনকে আসামি করে চট্টগ্রাম বন্দর ও কমলাপুর আইসিডিতে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি করার অভিযোগে একটি মামলা হয়।[৫৫]

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার এজাহারে তিনটি বার্জ-মাউন্টেড বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের জমি ক্রয়ে অনিয়মের অভিযোগ করা হয়। এই মামলার অন্য আসামিরা হলেন সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসচিব তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল, সামিট ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড মার্কেন্টাইল করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আজিজ খান, পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদ খান, ইউনাইটেড গ্রুপের চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ রাজা ও পরিচালক আবুল কালাম আজাদ।[৫৬]

অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এর ছয় মাস আগে ৭ মার্চ তাঁর বড় ছেলে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন। ১৫ এপ্রিল ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে আটকের ২৪ ঘণ্টা পর ছেড়ে দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। খালেদা জিয়া সপরিবার দেশ ছেড়ে যাবেন, এমন সমঝোতার ভিত্তিতে কোকোকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে তখন শোনা গিয়েছিল। খালেদা পরে আর



গ্রেপ্তার হলেন খালেদা জিয়া

বিদেশে যাননি। ১৬ জুলাই চাঁদাবাজির মামলায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর খালেদা জিয়াও গ্রেপ্তার হবেন বলে গুঞ্জন ছিল। অবশেষে হাসিনাকে গ্রেপ্তারের ৪৯ দিন পর ৩ সেপ্টেম্বর সকালে খালেদা জিয়া গ্রেপ্তার হলেন।

খালেদা ও কোকোকে আলাদা গাড়িতে উঠিয়ে ঢাকা সেনানিবাসের শহীদ মইনুল রোডের বাড়ি থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২০-২৫টি গাড়ির বহর মহানগর হাকিম এ বি এম আবদুল ফাত্তাহর আদালতে নেওয়া হয় সকাল সোয়া আটটায়। মামলাটি দায়ের করেছিল দুদক। অভিযোগপত্রে বলা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকার কমলাপুর অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপোতে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর কাজে নিয়ম ভেঙে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল অ্যাগ্রো ট্রেড (প্রা.) লিমিটেডকে (গ্যাটকো) কাজ পাইয়ে দিয়েছেন। এর ফলে সাধারণ ব্যবসায়ীদের ক্ষতি ছাড়াও সরকারের প্রায় এক হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। এ মামলার অন্য আসামিরা হলেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক দুই চেয়ারম্যান কমোডর জুলফিকার আলী এবং এ এস এম শাহাদাত হোসেন, সাবেক পরিচালক এ এম সানওয়ার হোসেন, সাবেক প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আহমেদ আবুল কাসেম, সাবেক পরিচালক লুৎফুল কবির, গ্যাটকোর তিন পরিচালক সৈয়দ গালিব আহমদ, সৈয়দ তানভির আহমদ এবং এ কে এম

মুসা কাজল, প্রয়াত মন্ত্রী কর্নেল আকবর হোসেনের ছেলে ইসমাইল হোসেন সায়মন, কর্নেল আকবরের স্ত্রী জাহানারা আনসার ও এহসান ইউসুফ।[৫৭]

আদালত কোকোকে সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর এবং খালেদা জিয়ার পক্ষে জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এজলাসে বসা অবস্থায় *প্রথম আলোর* প্রতিবেদককে খালেদা বলেন, তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার আগের দিন দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে বহিষ্কার ও তাঁর প্রাথমিক সদস্যপদ বাতিল করেছেন। এখন থেকে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। দলের গঠনতন্ত্রে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন রাখার বিধান না থাকায় কাউকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহ দলের কাজে বা সিদ্ধান্তে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবকে সাহায্য করবেন।[৫৮]

সকাল ১০টা ৮ মিনিটে মহানগর হাকিমের আদালত থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িবহর খালেদা জিয়াকে সংসদ ভবনের লাগোয়া স্পিকারের জন্য তৈরি হওয়া নতুন একটি দোতলা ভবনে নিয়ে যায়। তাঁর জন্য এই ভবনটি বিশেষ কারাগার হিসেবে ঠিক করা হয়। স্পিকারের বাসভবন হিসেবে তৈরি হলেও স্পিকার কখনো এ বাসায় থাকেননি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ৯ সেপ্টেম্বর বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি আরও বলেন, দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স সেপ্টেম্বরের পর দুর্নীতিবাজদের নতুন কোনো তালিকা প্রকাশ করবে না; তবে সরকারের অন্যান্য সংস্থা আইন ও বিধি অনুযায়ী দুর্নীতিবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখবে।[৫৯]

বিবিসি আয়োজিত বাংলাদেশ সংলাপে বিএনপির উপদেষ্টা হান্নান শাহ 'দুই শীর্ষ নেত্রীর' মুক্তির দাবিতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের নীতিগত ঐক্য নেই; অন্তত খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি আওয়ামী লীগের অ্যাজেন্ডা নয়। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থার জন্য বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারই দায়ী এবং তাদের কারণেই সবার ওপর দায় বর্তেছে।[৬০]

দুই নেত্রীর মুক্তির দাবি ইস্যুতে ড. কামাল হোসেন বলেন, আমরা যা-ই বলি না কেন, দুর্বৃত্তায়িত নেতা-নেত্রীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা না হলে গণতন্ত্র কোনো দিনই শক্তিশালী হবে না। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না, এ প্রশ্নের জবাবে ড. কামাল বলেন, তাদের

ছাড়া গণতন্ত্র হবে না, এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কালোটাকা এবং অস্ত্রধারী ক্যাডার বাদ দিয়ে নির্বাচন করলে রাজনীতিতে হাজার হাজার ভালো মানুষ আসবে। দেশের মানুষ অসুন্দর মানুষ থেকে মুক্তি চায়। অন্যদিকে মান্না বলেন, 'দুই নেত্রীকে বাদ দেওয়ার কথা আসবে কেন? এ ধরনের চিন্তাই অযৌক্তিক।'[৬১]

২ অক্টোবর *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত কলামে সৈয়দ আবুল মকসুদ রাজনীতিবিদদের 'প্রতিহিংসাপরায়ণতার' কথা বলতে গিয়ে দুদকের দেওয়া 'দুর্নীতিবাজদের' তালিকা প্রসঙ্গে বলেন, এই তালিকা দেখে কেউ কেউ হতাশ হয়েছেন, কেননা অনেকের নাম নেই এতে। 'অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় না দেখা পর্যন্ত মনে শান্তি নেই।' সৈয়দ মকসুদের মন্তব্য হলো, 'অনেক রাজনীতিকের জীবন আজ বিপর্যস্ত, এ পরিস্থিতি কারও জন্য সুখকর নয়। কিন্তু এ প্রতিহিংসাপরায়ণতা, তা যদি রাজনীতিকেরা এ সময়ও উপলব্ধি করতে অপারগ হন, তাহলে আর কোনোকালেই তাঁদের বোধোদয় হবে না।'[৬২]

'বাংলাদেশে নীরব বিপ্লব' শিরোনামে ৩ অক্টোবর *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর অনলাইন সংস্করণে এমিলে ওয়াক্সের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় :

> একসময় বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে অনেকে বিপ্লব হিসেবে দেখছে। এ দেশে চাঁদাবাজি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। এমনকি তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো পর্যন্ত ঘুষ-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল। ১৬ বছর দেশ শাসন করা সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগে বর্তমানে কারাগারে। তাঁদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। তাঁরা দুজন ছাড়াও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন, কর ফাঁকি ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রভাবশালী ১৭০ জন সাবেক মন্ত্রী-সাংসদসহ ১৫ হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
>
> যেভাবেই হোক, দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষের অর্থ-সম্পদ চুরির অভিযোগ উঠেছে এঁদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের তালিকায় সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাই নন; আছেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বড় ছেলে তারেক রহমানও। তবে তারেক রহমান, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় চলতি বছর এ ধরনের গ্রেপ্তারকে নজিরবিহীন

বলা যায়। কারণ, এ অঞ্চলে সরকারে থেকে দুর্নীতি করেও অপরাধীরা রেহাই পেয়ে যান—এমন ধারণা চালু আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পানি প্রকল্প ও নতুন রাস্তার প্রকল্প এগিয়ে নিতে, গাড়ি, ব্যবসা ও পাসপোর্টের আবেদনের ক্ষেত্রে নিয়মিত ঘুষ দেওয়া-নেওয়া চলে। এমনকি ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাদুর্গতদের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ তহবিল পর্যন্ত রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রায় চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক সাহায্য চুরি হয়েছে।...

কয়েক মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর—ক্ষমতা নেওয়া সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের কৃতিত্ব দিতে হবে।... সরকার ঘোষণা দেয়, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে সরকার যেকোনো উপায়ে দুর্নীতি নির্মূল করবে।...

আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, 'বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা অহিংস নীরব বিপ্লবের চেয়ে কম কিছু নয়। আমরা অন্তত একটি সৎ সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি।'[৬৩]

২৩ অক্টোবর ২০০৭ যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় উপস্থিত ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশ ইনস্টিটিউট সেনাপ্রধানের সম্মানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মইন ও জয় পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। জয় তাঁর মা শেখ হাসিনার গ্রেপ্তার ও বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জেনারেল মইন বলেন, বিষয়টি তাঁর হাতে নয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক এবং বিচার চলছে দেশের প্রচলিত আইনে, প্রকাশ্যে। মইন বলেন, 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। আদালতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলে আমি নিজেও খুশি হব।' অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকসহ ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হার্ভার্ডের প্রভাবশালী অধ্যাপক ডেভিড কিং ও গওহর রিজভী।[৬৪]

লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেনারেল মইন বলেছিলেন, হার্ভার্ডে তিনি একটি সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন।[৬৫]

নিউজ ওয়ার্ল্ডের সূত্র ধরে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, সেনাপ্রধানের ২৩ অক্টোবরের সেমিনার বাতিল হয়ে গেছে। সেমিনারের বিষয় ছিল 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ'। জানা গেছে, হার্ভার্ডের নতুন

প্রেসিডেন্ট গিলপিন ফাউস্ট দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার কারণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আয়োজিত এ সেমিনারে সেনাপ্রধান থাকবেন, এটা জানাজানি হওয়ার পর একটি মহল জেনারেল মইনকে আমন্ত্রণ না জানানোর জন্য তদবির করতে থাকে। তাদের যুক্তি ছিল, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখার ব্যাপারে সব সময় সোচ্চার হার্ভার্ডে একজন সামরিক ব্যক্তিকে আনা ঠিক হবে না; এতে হার্ভার্ডের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। বিষয়টি হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্টের নজরে আনা হয়। পরে কর্তৃপক্ষ জেনারেল মইনকে নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৬৬]

'আত্মস্বীকৃত দুর্নীতিবাজদের' জরিমানা দিয়ে মামলা থেকে অব্যাহতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকার একটি ট্রুথ কমিশন গঠনের কথা বলেছিল। এ লক্ষ্যে অক্টোবর ২০০৭ বিশেষজ্ঞ আইনজীবী ও সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে সরকার চার সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করেছিল। কমিটির সদস্য ছিলেন ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, অ্যাডভোকেট এম আর হাসান, অ্যাডভোকেট আনিসুল হক এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নূর মোহাম্মদ। আনিসুল হক ৮ ডিসেম্বর জানান, আইনের একটি খসড়া তৈরি করে ইতিমধ্যে তা গুরুতর অপরাধ দমন অভিযানসংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক জেনারেল মাসুদের কাছে দেওয়া হয়েছে এবং সরকার তা পরীক্ষা করে দেখছে। খসড়া প্রস্তাবে এক বছরের জন্য গঠিত স্বাধীন এই কমিশনের নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রুথ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশন'। খসড়া অনুযায়ী একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশনে তিন থেকে পাঁচজন সদস্য থাকবেন। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক অথবা আইন ও বিচারকাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কমিশনে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। খসড়ায় বলা হয়েছে, শুধু ব্যবসায়ী নন, যেকোনো ব্যক্তি এই কমিশনে গিয়ে এর সুযোগ নিতে পারবেন। তবে দুর্নীতির অপরাধে ইতিমধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত বা একই অপরাধে বিচারাধীন মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তি এর সুযোগ নিতে পারবেন না। কমিশন চাইলে যেকোনো ব্যক্তিকে নিজ উদ্যোগে (সুয়োমোটো) কমিশনে ডেকে আনতে পারবে। কমিশনের ডাকে কেউ না এলে তাকে সর্বোচ্চ তিন বছরের জেল দিতে পারবে। কমিশনের কাছে অপরাধ স্বীকার করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আর্থিক জরিমানা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে, যা কোনো অবস্থাতেই ওই ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোট পরিমাণের বেশি হবে না।[৬৭]

দুদকের চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধূরী সাধারণ মানুষের স্বপ্নভঙ্গের

দিকে ইঙ্গিত করে একই সঙ্গে আত্মতুষ্টি আর অতীতমুখী চিন্তাভাবনার সমালোচনা করে বলেন, আদর্শের সঙ্গে, স্বপ্নের সঙ্গে সংগতি রেখে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাঁর মতে, মূল সমস্যা হলো নেতৃত্বে। 'নেতৃত্বের গুণাবলির সমন্বয় ঘটিয়ে সেই স্বপ্নকে ধরাছোঁয়ার নাগালে নিয়ে আসাও নেতৃত্বের বড় পরীক্ষা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের নেতৃত্ব সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ বারবার আসে না।'[৬৮]

দুদক চেয়ারম্যানের কথায় এটা মোটামুটি পরিষ্কার যে গ্রেপ্তারকৃতদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে এবং এ ব্যাপারে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। শীর্ষ রাজনীতিবিদদের বিচারের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগ্রহে কমতি ছিল না।

দুদকের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন ও উৎসাহ জুগিয়েছিল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর আগে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল—টানা পাঁচ বছর বাংলাদেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে জায়গা দেওয়ায় দেশের ভেতরে হইচই পড়ে গিয়েছিল। সরকার টিআইয়ের প্রতিবেদনের কড়া সমালোচনা করলেও বিরোধী দল এটাকে তাদের সরকারবিরোধী প্রচারে ব্যবহার করত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুদককে ঢেলে সাজানো হয়। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে দুদক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে জনমনে একধরনের স্বস্তি ও আশাবাদ তৈরি হয়।

টিআইবি দুই বছর পরপর জরিপ চালিয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার দুর্নীতির ছবি জনসমক্ষে তুলে ধরছিল। টিআইবির জরিপ একদিকে সমাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করছিল, অন্যদিকে সরকারি খাতে যে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে, তার একটা ভয়াবহ ছবিও ফুটে উঠছিল। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান কতটুকু সফল হবে, এ নিয়ে গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান খোলামেলাভাবে অনেক কথা বলেন। তাঁদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ: সরকারের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে আপনাদের সংশ্লিষ্টতা বা সাপোর্ট কেমন ছিল?

ইফতেখারুজ্জামান: ওরা আসল এবং প্রথম থেকেই ওদের পাবলিকলি ডিক্লেয়ার্ড অবজেকটিভ বা ভিশন যেটা ওরা বলতে চায়,

সেখানে অ্যান্টি-করাপশন ছিল অন দ্য টপ অব দ্য লিস্ট। তা সত্ত্বেও আমরা এটাকে মনে করেছি যে ইট মে বি ভিউড অ্যাজ আ গুড ওপেনিং ফর এনগেজিং উইথ দ্য গভমেন্ট। আমরা তো সব সময় গভমেন্টের সঙ্গেই কাজ করি। কে ক্ষমতায় থাকল বা না থাকল...। কিন্তু বিফোর উই রিচড আউট, দুটো জিনিস হয়েছে। একটা হলো যে ওরা ধরপাকড় শুরু করল। আমরা আমাদের রেগুলার অ্যাকটিভিটিজ করছি। যখনই দেখা গেল যে হাইপ্রোফাইল অ্যান্ড হাইস্পিড ইনিশিয়েটিভ বাই দ্য গভমেন্ট, তখন থেকেই আমরা একটু কনসার্ন এক্সপ্রেস করেছি—হোয়েদার দিস ক্যান বি সাসটেইনড। এবং সেটার কিছু সিনড্রম দেখা যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছে যে ইট ক্যান বি কাউন্টার-প্রডাকটিভ। অনেক সময় সাবজেকটিভিটি, অনেক সময় নিরাপত্তা হেফাজতে মারা যেত। তখন থেকেই ওয়েবসাইটে আমাদের পাবলিকলি প্রোনাউন্সড ইয়ে ছিল, আমরা কিন্তু বলেছি। ট্রুথ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের কথা হলো না? এটা নিয়ে আমি *প্রথম আলোয়* লিখেছি, ইট ইজ নাইদার ট্রুথ নর অ্যাকাউন্টেবিলিটি। আমাদের কথা ছিল, ডিউ প্রসেসটা যেন এনশিউর করা হয়। মিসক্যারেজ অব জাস্টিস যেন না হয়। ইন দ্য মিন টাইম আমাদের যে রেগুলার অ্যাকটিভিটি, সেগুলো চলছে। আমাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই বলে আমরা কনস্পিরেটর! কিন্তু গভমেন্ট একাধিকবার আমাদেরকে সমালোচনা করেছে। মতিন (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা) তো বরিশালে ছিল, আঙুল উঠায়ে এভাবে বলছে, উই আর ক্রিটিক্যাল অব দ্য গভমেন্ট। এইটা একটা দিক।

মহিউদ্দিন : আপনারা তো দুদককে নানাভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন? কীভাবে যোগাযোগ হলো?

ইফতেখার : আমি কিন্তু টিআইবিকে কোনোভাবেই বিব্রত করতে চাচ্ছি না। হাসান মশহুদ ডিড দ্য ফার্স্ট থিং, হি কনট্যাক্টেড মি। আমাকে ফোন করল। বলল যে কথা বলতে চাই। আমি স্বাগত জানালাম তাঁকে। অ্যান্টি-করাপশন কমিশনের সেটআপের পেছনে টিআইবির ভূমিকা আছে। এটা কার্যকর হোক এটা আমরা চাই। চার বছর কিছুই হয় নাই। মশহুদ সাহেব বলেছে, 'আমরা যেহেতু অ্যান্টি-করাপশনের কথা বলছি, অনেকেই আসছে। বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট—এটা-সেটা। কিন্তু আমার প্রবলেম হলো, আমার যে প্রসিকিউশন স্টাফ আছে, আমি তাদের প্রোফাইল নেওয়ার চেষ্টা করেছি। দেখলাম আমার মাত্র ২০-২৫ জন আছে, যাদের আমি রিলাই করতে পারি, কাজ করার মতো একটা

জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমার কোনো উপায় নাই। ট্রেনিং দরকার। আপনারা তো এই ফিল্ডে কাজ করেন। সুযোগ আছে কি না ট্রেনিং প্রোগ্রাম করার। অ্যান্টি-করাপশন কমিশনের যারা স্টাফ, তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া।' আমার ওয়ার্ক প্ল্যানের মধ্যে এটা ছিল না। বাট পার্টনারশিপ উইথ রেলেভেন্ট এজেন্সিস—এটা ছিল। আমাদের সেই রকম টেকনিক্যাল ক্যাপাসিটিও নাই। সো উই স্যাট টুগেদার অ্যান্ড মবিলাইজড এবং কথা-টথা বলে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলাম। আমার মনে হয় এটা হয়তো কাজে এসেছে। সেকেন্ড যেটা হলো, উনি বললেন, 'আমি এখানে আসার পর দেখলাম বিভিন্ন দেশের অ্যান্টি-করাপশনের কাজ। অ্যান্টি-করাপশন কমিশন তো শুধু ধরার জন্য না। এর তো একটা প্রিভেনশনের দিকে আছে। আমার জানামতে, আপনারা তো সেটা করছেন।' আমি বলি যে, অবশ্যই, এটাই তো আমাদের কাজ। এই ইস্যু নিয়েই আপনাদের সঙ্গে আমরা কাজ করতে চাই। সে বলল, 'আপনি আমাকে একটু বলবেন যে আমরা কী করতে পারি।' তখন আমাদের সুযোগ আসল।

আমরা কিন্তু কে দুর্নীতি করেছে, সেদিকে যাই না। আমরা সেক্টরের কাজ করি। ইনস্টিটিউশনের কাজ করি। উইকনেস ধরি। তারপর সেগুলোর ব্যাপারে ইনফরমেশন দিই। কিন্তু ব্যক্তি-দুর্নীতি নিয়ে কাজ করি না। আমি কিন্তু তাকে পরিষ্কার বলেছি, আমরা এটা থেকে দূরে থাকব। উই ওয়ান্ট পার্টনারশিপ, প্রিভেনশন ক্যাম্পেইন করতে পারব। আমাদের সেই সুযোগও ছিল। এবং ওটাই ট্রান্সলেট করল দুটো বিষয়ে। আমাদের সারা দেশে পঁয়তাল্লিশটা সচেতন নাগরিক কমিটি আছে। যে প্ল্যাটফর্ম আমরা করেছি, সেটা আছে। এগুলোর সহায়তায় স্থানীয়ভাবে মানুষের কাছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার করি। ওই যে বলছে, আমাদের একটা প্রোফাইল আছে, ওটা ব্যবহার করে ঢাকার বাইরে ক্যাম্পেইন করা যায়। সেই কাজ আমরা করেছি। কোথাও কোথাও আমাদের নিজস্ব প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে অ্যান্টি-করাপশন বিষয়ে কনসাল্ট করেছি। এটার বিভিন্ন দিক ছিল। একটা ছিল যে মিডিয়াতে ক্যাম্পেইন করা। আমাদের অ্যান্টি-করাপশন বিষয়ে যে শর্ট ভিডিওগুলো আছে, ওগুলো দেখে সে পছন্দ করেছে। উনি বললেন, 'চলেন একটা কাজ করি, আপনি এর সঙ্গে দুদকের লোগোটা লাগিয়ে দেন। টিআইবি লোগোর পাশাপাশি। আমি বিটিভিকে বলে দেব।' আমরা তো বিটিভিতে কোনো দিন ঢুকতে পারিনি। কমার্শিয়াল চ্যানেলকে একটু পয়সা দিয়ে করাতে হতো। সো




ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের উদ্যোগে ছাত্রদের র‍্যালিতে দুদকের চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরী

উই টুক আ গুড অপরচুনিটি। এটা কাজে লেগেছিল। তারা এখনো বলে, 'টিআইবি এটা আগে করত, এখন করে না।' আপনি তো জানেনই, বিটিভি তো ঢুকতে দেয় না।

আর একটা হলো যে আমাদের ফিল্ডের কাজটা দেখেত খুব ইনপ্রেস্‌ড হয়েছে। সে বলেছে, 'প্রিভেনশনটাকে যদি সাসটেইনেবল রূপ দিতে হয়, তাহলে আপনারা যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছেন, এগুলার আদলে আমি কিছু করতে চাই।' তখন আমি তাকে একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম যে আমরা কীভাবে করি, প্রশ্নটা বুঝিয়ে দেওয়া। হি ওয়াজ ডিটারমিন্‌ড। বলল, 'আমি এটা করব।'

কিছুদিন পরে দেখলাম, একটা অফিশিয়াল অর্ডার ইস্যু হয়ে গেছে। প্রতিটা জেলায় ডিসিদের চিঠি দিয়ে দিছে। ডিসিরা কমিটি গঠন করে দেবে। আমাদেরটা হলো সচেতন নাগরিক কমিটি, ওনাদেরটা হলো দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি। এই নামে কমিটি করে ফেলল। ইট ওয়াজ আ গুড থিং। যেটা মিসপ্লেসিং, সেটা হলো, যেহেতু ডিসি সাহেবদের চিঠি দিয়ে, ডিসিরা হয়তো উইথ গুড ইনটেনশন করেছেন। দুদক থেকে চিঠি গেছে, গভমেন্টের ব্লেসিং আছে, সব একাকার। ওরা উইলফুলি হোক বা বাই মিসটেক হোক, কোথাও কোথাও তাদের পছন্দের লোকজন, খয়ের খাঁ টাইপের কিছুটা...। আমাদের তো সম্পূর্ণ দলীয় রাজনীতির বাইরে,

ওইখানে কিছু রাজনীতির লোক ঢুকে গেছে এবং কোথাও কোথাও ভিতরে-ভিতরে জামায়াতপন্থীরা ঢুকেছে। যার ফলে খুব বেশি টেক অফ করতে পারেনি ওই প্ল্যাটফর্মটা। এই করতে করতে কিন্তু সময়টা চলে গেছে।

মহিউদ্দিন : দুদকের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কী? তাদের কি যথেষ্ট আন্তরিক মনে হয়েছে?

ইফতেখার : ওই সময় আমার যে কাজের অভিজ্ঞতা, সেটা থেকে মনে হয়, যদিও বাইরে থেকে একটা ইমপ্রেশন ছিল যে দুদক খুব অ্যাগ্রেসিভ, খুব ইনডিপেনডেন্টলি কাজ করছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ইট ওয়াজ নট। যাদেরকে ধরতে চায়, যাদের বিরুদ্ধে জেনুইন কেইস আছে, তাদের সবার পেছনে যে যেতে পারছে, সেটা না। তার অন্যতম কারণ ছিল, দেয়ার ওয়ার মোর দ্যান ওয়ান পাওয়ার সেন্টারস ইন দ্য গভমেন্ট। স্পেশালি আমি অ্যান্টি-করাপশনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি। দুদক ছিল, জয়েন্ট টাস্কফোর্স কমিটি ছিল, আর্মি হেডকোয়ার্টার্স ছিল, চিফ অ্যাডভাইজারের অফিস ছিল। জয়েন্ট টাস্কফোর্সের চিফ ছিল জেনারেল মতিন। অন ওয়ান অকেশন সে আমাকে বলেছে যে একাধিকবার অন্যভাবে বলেছে, অনেকের তথ্য দেখেছে, মাসে মাসে টাকা যাচ্ছে বিদেশের অ্যাকাউন্টে, অথচ হ্যান্ডস আর টাইট। বোঝা গেল যে ফুললি ইনডিপেনডেন্ট অপারেশন করতে পারছে না। একটা অকেশনে আমাকে বলল, তখন ময়মনসিংহে ছিলাম, ফোন একটা আসল। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, কিছু বলল না সে। বেশ ক্ষুব্ধ মনে হলো আরকি। পরে বলল যে আমার সব কাগজপত্র তো রেডি...অথচ। মানে মেনি মেনি ফ্যাক্টরস ওয়ার ইনভল্‌ভড। অ্যান্টি-করাপশনটা সত্যিকার অর্থে যে গভমেন্টের অ্যাজেন্ডা ছিল, মে মি ওভারঅল—ইয়েস, বাট এটার ক্রস-কারেন্টস ছিল ডিফারেন্ট টাইপের।

মহিউদ্দিন : আপনারা তো দীর্ঘদিন দুর্নীতি নিয়ে কাজ করছেন, ক্যাম্পেইন করছেন। সরকারের নীতিনির্ধারণে আপনারা কি কোনো ভূমিকা রাখতে পেরেছেন?

ইফতেখার : আরেকটা দিক এটা। কেয়ারটেকার সাইডটা, সিভিলিয়ান সাইডটায় আমাদের একটা ভালো পরিস্থিতি ছিল। আমরা অন্তত দুইটা কাজ করতে পেরেছিলাম। একটা হলো যে আমরা ২০০৪ থেকে ক্যাম্পেইন শুরু করেছিলাম, বাংলাদেশের জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে স্বাক্ষর করা উচিত। তখন




টিআইবির দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন

আমরা ছিলাম এককভাবে। এমনকি জাতিসংঘের ঢাকা অফিসও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়নি। আমরা টাকার জন্য যাইনি। আমাদের ফান্ড ছিল। কয়েকটা সেমিনার করব, যেখানে মওদুদ আহমদ সাহেব আর মোরশেদ খান সাহেবকে ইনভাইট করেছিলাম। ওরা কনসেন্টও দিয়েছিল, আসবে। আমরা বলেছিলাম, টিআইবি একা করতে পারবে না। এটা যেহেতু জাতিসংঘের কনভেনশন, জাতিসংঘ যদি কো-স্পন্সর করে এই ইভেন্টটা, তাহলে ইট গিভস আ বিগার ইমপ্যাক্ট। কিন্তু ওরা দেখলাম ইল্যুসিভ, রিলাকট্যান্ট। একপর্যায়ে ইনডাইরেক্টলি আমাদের বলল, এটা তো সেনসিটিভ ইস্যু। এটা তোমরা নিজেরাই করো। উই আর উইথ ইউ মোরালি। এ পর্যায়ে আমরা আসতে চাই না। এটা ২০০৪-এর ডিসেম্বর মাসে। জাতিসংঘের ঢাকা অফিস, ইউএনডিপি। এটা ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড। আমরা গভমেন্টের কাছে লেখালেখি করলাম। মওদুদ সাহেব বলল, 'আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, বাংলাদেশ এই রকম একটা কনভেনশনে স্বাক্ষর করে নাই? কালকে থেকেই চেষ্টা করব, যত শীঘ্র করা যায়।' বলল, 'আসেন আমাদের অফিসে।' যখন ফলোআপ করতে থাকলাম, ফরেন মিনিস্টারের কাছে কাগজপত্র পাঠালাম। কিছু হলো না। ২০০৭ আসল। ওয়ান অব দ্য থিংস আমি যেটা করলাম, উই ওয়ান্টেড টু ফলো ইট আপ। তো গভমেন্টকে লিখলাম একই কাগজপত্র পাঠিয়ে...। একটা অকেশনে ড. ফখরুদ্দীন সাহেবের

সঙ্গে, এটা সেকেন্ডটা, তথ্য অধিকার আইনের খসড়া, অনেক দিন ধরে এনজিও সেক্টরের একটা কনসার্ন ছিল। সেটা নিয়ে আমরা কয়েকজন ওনার কাছে গিয়েছিলাম বলার জন্য। হি গেইভ অ্যান অডিয়েন্স। খুব পজিটিভ। বললেন, 'এটা করা উচিত।' এটা কিন্তু পরে অর্ডিন্যান্স হিসেবে পাস হয়েছিল। যেটা আবার সংসদে পরে অ্যাক্ট হিসেবে পাস হয়। ওই মিটিংয়ে আমি বলেছিলাম, একটা দাবি আছে, আপনার গভমেন্ট একটা সুযোগ নিতে পারে। অ্যান্টি-করাপশন কনভেনশনে আমরা কেন স্বাক্ষর করব না। বললেন যে 'হ্যাঁ, আমার কাছে কাগজপত্র একটু পাঠান।' সো আই সেন্ট হিম অ্যাগেইন। পরে ক্লিক করল আরকি। ইফতেখার চৌধুরী আমাকে ফোন করে বলল যে 'দিস ইজ আ গ্রেট থিং'। গভর্নমেন্টের যা হয়, তিনবার পাঠালেও বলে আবার পাঠাও। এরপরে বলল যে 'আমি শিগগিরই নিউইয়র্কে যাব।' ঠিকই তারপরে উইদিন আ ফিউ উইকস, কনভেনশনে বাংলাদেশ সদস্যরাষ্ট্র হয়ে গেল। দিস ওয়াজ সেকেন্ড। একটা হচ্ছে তথ্য অধিকার অর্ডিন্যান্স, আরেকটা এইটা। ২০০৭ সালে এই হলো।

আরেকটা কাজ, অ্যান্টি-করাপশন সম্পর্কে, দিল্লিতে তখন সার্ক সামিট হবে। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে সার্কের ওপর আমার একটা ইন্টারেস্ট ছিল। সার্কে তো কোনো দিন দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা হয়নি। আসিয়ান, অন্যান্য সব রিজিওনাল ফোরামে কমবেশি গভর্ন্যান্সের কথা থাকে। সেটা আমরা গভমেন্টের কাছে প্রস্তাব করলাম, টু দ্য চিফ অ্যাডভাইজার, আপনি যাচ্ছেন, বাংলাদেশ সার্কের প্রতিষ্ঠাতা দেশ হিসেবে আমাদের একটা অপরচুনিটি আছে টু টেক লিড অন দিস ইমপর্ট্যান্ট ইস্যু। আপনি এটা সার্ক সামিটে তোলেন। এটা পারস্যু করার পর দেখা গেল যে ইট ব্রট গুড রেজাল্ট। প্রথমবারের মতো একটা প্যারাগ্রাফ যুক্ত হয়েছিল করাপশনের ওপর। কথাটা ছিল এ রকম : সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ টেকস করাপশন অ্যাজ আ কি চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাগ্রিড টু এক্সচেঞ্জ ইনফরমেশন অ্যান্ড নলেজ টু বি অ্যাবল টু কন্ট্রোল করাপশন। এগুলি ছিল আমাদের এনগেজমেন্টের ফলে কিছু বিটস অ্যান্ড পিসেস। তার মানে এই না যে আমাদের করাপশন রীতিমতো কন্ট্রোল হয়ে গেছে।

ইলেকশন কমিশন নিয়ে আমাদের একটা কাজ ছিল। আমরা একটা রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলাম। কমিশনটা কীভাবে কার্যকর করা যায়, কিছু রিকমেন্ডেশন ছিল। ওই সময় কমিশন ওয়াজ প্রোঅ্যাকটিভ ইন এনগেজিং উইথ দ্য সিভিল সোসাইটি। ওই প্রসেসে আমাদের কাজগুলো

মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছিল। আরপিওটার ব্যাপারে, বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সপারেন্সির যে রুলগুলো ছিল। ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে আমাদের এনগেজমেন্ট ছিল টু প্রমোট গ্রেটার লেভেল অব পার্টিসিপেশন, পার্টিকুলারলি ট্রান্সপারেন্সি ইন ইলেকটোরাল প্রসেস।

মহিউদ্দিন : শুনেছিলাম, আপনাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব এসেছিল।

ইফতেখার : আমাকে মইন ডেকেছিল। আফটার এক্সচেঞ্জ অব প্লেজেনট্রিজ, বলল যে আপনি আমাদের সঙ্গে জয়েন করেন। এর আগে আগস্টে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা ঘটনা ঘটেছিল।

মহিউদ্দিন : এই যে কয়েকটা হাই প্রোফাইল অ্যান্টি-করাপশন, পার্টিকুলারলি খালেদা-হাসিনা-তারেক এঁদেরকে নিয়ে, এটাও তো ওই সময়, জুলাই-আগস্ট, তখন আপনার কী মনে হয়েছিল? আমার তো মনে হয়েছিল, তারা করাপশন করে নাই—এটা সম্ভবত পাবলিক বিশ্বাস করে না। কিন্তু অনেক সময় প্রমাণ করা যায় না অনেক কিছু। ওই সময়টা হাউ ডিড ইউ ভিউ ইট?

ইফতেখার : ওরা আসার কিছুদিন পরে কিছু অফিসার আসল আমার অফিসে, কিছু কাগজপত্র নেওয়ার জন্য। কাগজপত্র মানে গভমেন্ট অনেক সময় এটা করে, আমাদের কাগজপত্র—ল্যাক অব ট্রান্সপারেন্সি আছে কি না, সব ঠিক আছে কি না, এসব দেখতে চায়। না, যেটা ওরা দেখতে চাইল, কার কার নামে দুর্নীতির তথ্য আছে। আমরা বললাম যে দেখেন, আমরা কিন্তু ব্যক্তি-দুর্নীতি নিয়ে কাজ করি না। আমাদের কাজ ইনস্টিটিউশন নিয়ে। ওরা খুঁজে খুঁজে, চিটাগাং পোর্ট—ওটা নিয়ে আমাদের একটা গবেষণা ছিল, সেটা ওরা নিল। পরে আরও দুই-তিন দফা আসল, আমাদের রিপোর্টটা অ্যানালাইসিস করল। পরে চিটাগাং পোর্টের কিন্তু একটা পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল আমাদের কিছু কিছু সুপারিশ নিয়ে। একটা পর্যায়ে, তখন তো বেগম জিয়া ওয়াজ আন্ডার অ্যারেস্ট, বলল যে তার ড্রয়ারের মধ্যে কত কোটি টাকার যেন অর্নামেন্টস পাওয়া গেছে। এগুলো কোত্থেকে এল, কী মনে করেন। বললাম এটা যদি থাকে, হোয়াই ডোন্ট ইউ ব্রিং হার টু জাস্টিস? যেকোনো একজন ব্যক্তি সম্পর্কেই আমরা এটা বলব। এটা করেন না কেন? বলে, একটা আনসিন ইনফরমেশন আছে। সময়মতো এটা করা হবে। হ্যাঁ, করলে তো ইউ উইল সেট আ গুড এক্সাম্পল, দেশের টপ লেভেলের পলিটিশিয়ানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে, এই ধরনের। এর

বাইরে ঠিক এই প্রসেসের মধ্যে কোনো ইনফরমেশনের সুযোগ ডাইরেক্টলি আমাদের ছিল না। আমাদের ওরা ট্রাস্টেও নেয়নি। কারণ, আমরা ওদের সমালোচনা করেছি। ইনডাইরেক্টলি শুনতাম, মাইনাস টু মাইনাস টু। এটা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যে সেটা আমি তখনো বলেছি, সব সময় দৃঢ়বিশ্বাস করি যে রিফর্মটা যদি করতে হয়, এটা আপনি টপ সরিয়ে দিবেন, পুরো চেইনের মধ্যে পরিবর্তন আনবেন, সেটা পলিটিকাল প্রসেসে আসতে হবে। সেনাবাহিনী থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই রিফর্মটা—আমার কাছে মনে হয় নাই এটা ডুয়েবল। মাইনাস টু তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে নন-স্টার্ট। এটা করতে পারবে, বা করলেও সেটা সাসটেইন করবে, সেটা মনে হয়নি। যার ফলে যে জায়গায় ছিল, সে জায়গায়ই আছে।[৬৯]

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০টি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ওপর গবেষণা চালিয়ে ৪ অক্টোবর ২০০৭ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এনজিওগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মারাত্মক ঘাটতি আছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। 'এনজিও খাতে সুশাসনের সমস্যা: উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় এই গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ৮৫ শতাংশ এনজিওতে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁরা অনেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠানের মালিক মনে করেন; অডিট ও আর্থিক প্রতিবেদনে প্রায়ই অতিরঞ্জিত তথ্য দেওয়া হয় এবং পরিচিতদের মধ্য থেকে অডিটর নিয়োগ করা হয়। বিশ্লেষণে বলা হয়, একক ক্ষমতাকেন্দ্রিক এনজিওতে দুর্নীতির কেন্দ্রে থাকেন নির্বাহী প্রধান, কর্মীরা তাঁদের বেতন সম্পর্কে জানেন না। এনজিওগুলো সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণের কথা বলে বিদেশ থেকে টাকা আনলেও সেবাগ্রহীতা বা জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহি নেই। তারা দাতা সংস্থাকে অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন দেয়। ৯৫ শতাংশ এনজিও গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করে।[৭০]

সরকারের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম জনমনে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে অনুকূল মন্তব্য ও প্রতিবেদন প্রায় প্রতিদিনই ছাপা হতো। সরকার জনমনে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছিল যে ব্যক্তি যতই ক্ষমতাধর হোক না কেন, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন।

১৩ ডিসেম্বর ২০০৭ *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পাতায় 'সত্যভাষী'র লেখা এক মন্তব্য প্রতিবেদনে সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, 'বেশি ভালো কাজ করতে গেলে মূল উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হওয়ার' আশঙ্কা থাকে। সরকারের অনেক

অর্জনের প্রশংসা করে প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্নীতির মামলার সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে অযথা অভিযুক্তের সংখ্যা না বাড়ানো। এতে মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণে জটিলতা তৈরি হয়। 'দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে একধরনের নিষ্ঠুরতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনমনে অভিযুক্তদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করেছে, যা মোটেও কাম্য নয়।'[৭১]

১৭ ডিসেম্বর ২০০৭ *ইত্তেফাক*-এ ছাপা হওয়া একটি প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বুলেট ট্রেন, আন্ডারগ্রাউন্ড রেল ও ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস হাইওয়ে—এসবই ছিল বিগত জোট সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদার বাগাড়ম্বর। বহুল আলোচিত এসব পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক অগ্রগতির তেমন কোনো তথ্য-প্রমাণ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নথিপত্রে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু রাজধানীতেই ৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রক্রিয়ার কিছুটা অগ্রগতির রেকর্ড রয়েছে মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমিশন ভাগাভাগি ও লাভ-ক্ষতির হিসাব না মেলায় এই পরিকল্পনাটিও অঙ্কুরেই মুখ থুবড়ে পড়ে।[৭২]

*ইত্তেফাক*-এর এই প্রতিবেদনে বলা হয়, থাইল্যান্ডভিত্তিক ইতালি-থাই কোম্পানি ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির ব্যাপারে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরুর পর্যায়ে হঠাৎ করেই কমিশন ভাগাভাগি ও ব্যক্তিবিশেষের লাভালাভকে ঘিরে বিষয়টি জটিলতার মধ্যে পড়ে যায়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আবারও এটি নির্মাণের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।[৭৩]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকার শীর্ষে ছিল একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। কিন্তু প্রথম থেকেই তারা দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে নজর দিয়েছিল এবং এর কোপটা অনেকাংশে গিয়ে পড়েছিল রাজনীতিবিদদের ওপর, যাঁরা বিভিন্ন সময় সরকারের দায়িত্বে ছিলেন। দুর্নীতির নানান ঘটনা ও গল্প লোকের মুখে মুখে ছড়ায়। এর মধ্যে সত্যতা যেমন আছে, আবার অতিরঞ্জনও থাকে কখনো কখনো। ২০১৭ সালের অক্টোবরে লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেনারেল মইন এ বিষয়ে খোলামেলা অনেক কথা বলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি যুগপৎ চমকপ্রদ এবং ভয়াবহ। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

মইন ইউ আহমেদ : আমাদের প্ল্যান ছিল, দুবছরের বেশি সময় নেব না। তখন ভাবলাম, এই দুই বছরের মধ্যে কেয়ারটেকার সরকার আর কী কী

ভালো কাজ করতে পারে? বসে থেকে তো লাভ নাই? দেশ তো দুর্নীতিতে ভরা? এ জন্য দুর্নীতি কমানোর লক্ষ্য ঠিক হলো।

মহিউদ্দিন আহমদ : তখন তো দুদকও রিকনস্টিটিউট করলেন?

মইন : করাপশন কমাতে হলে দুদককে ঢেলে সাজাতে হবে। একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা চাচ্ছিলাম গুড রেজাল্টস। গুড রেজাল্টস পেতে হলে ইউ হ্যাভ টু পুট গুড পিপল। জেনারেল মশহুদ—চিফ অ্যাডভাইজার ভালো বললেন, আমিও ভালো বললাম। আমি তাঁকে চিনি, প্রফেশনাল, হার্ডওয়ার্কিং। বললাম, উনি ভালো আউটপুট দিতে পারবে। চিফ অ্যাডভাইজার আমাকে বললেন, আপনি রিকোয়েস্ট করেন। বললাম। উনি বললেন, মইন, না না। আমি যাব না। উনি তো অ্যাডভাইজার ছিলেন। অনেক বললাম, উনি অ্যাগ্রি করলেন না। চিফ অ্যাডভাইজারকে বললাম। উনি বললেন, লেট মি ট্রাই। উনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। জানি না কী কথা হয়েছে। তবে তাঁকে কনভিন্স করতে পেরেছেন। তারপর উনি জয়েন করলেন। এবং কাজ করে দেখিয়ে দিলেন। করাপশনের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করলেন। এ জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছেন। পরে আফগানিস্তানে করাপশন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা দেখার জন্য জাতিসংঘ তাঁকে অ্যাডভাইজার নিয়োগ করেছিল।

এরপর দায়িত্ব ছিল ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক করা। অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়।

এরপর ছিল সব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যার যারটা সে পালন করবে এবং দে উইল বি আনসারেবল টু রেসপেকটিভ অ্যাডভাইজার। এখন দেখেন কী হচ্ছে। একটা পুলিশের পোস্টিং—মিনিস্টার রিং করে। এসব জিনিস টোটালি বন্ধ হলো। সুপারিশে কোনো কাজ হবে না। কোনো কাজ তিন দিনের বেশি পেন্ডিং থাকলে অ্যাডভাইজারকে বলতে হবে যে এটা পেন্ডিং আছে। ফেলে রাখা যাবে না। না করলেও লিখে দিতে হবে যে তিন দিনের মধ্যে করা সম্ভব নয়। আমাদের এখানে মোস্ট অব দ্য অফিসার্স—দেখবেন তিনটা শেলফ আছে। একটা হলো 'ইন', একটা 'আউট', আরেকটা 'পেন্ডিং'। দেখবেন, 'পেন্ডিং'টা সব সময় উঁচু হয়ে আছে।

আরেকটা কাজ ছিল, জুডিশিয়ারিকে ইনডিপেনডেন্ট করা। এটা ওই সময় করা হয়েছে।

কাস্টমস, এনবিআর, এসবের খুব বদনাম ছিল। আমি ওই দিকে

নজর দিলাম। চিটাগাং পোর্টকে কম্পিউটারাইজ করা হয়। পোর্টে যখন একটা কনটেইনার আসে, তখন এটা ক্লিয়ার করতে ২৮ জন অফিসারের কাছে যেতে হয়। কম্পিউটারাইজ করতেই দেয় না। এখানে-ওখানে তার কেটে দেয়। ২৮ জায়গায় যাওয়া মানে ২৮ জায়গায় আপনাকে টাকা দিতে হবে। সেটাকে আমরা পাঁচটা জায়গায় কমিয়ে এনেছি। আরও দুইটা কমানো যেত, এনবিআর যদি কম্পিউটারাইজড হতো।

একটা কনটেইনার যখন শিপে আছে, তখন আপনি এটা মোবাইল ফোনে দেখতে পাবেন। কোথায় আটকে আছে, জানবেন। এ রকম সিস্টেম করে দিয়েছিলাম। আমরা যখন চলে গেলাম, লোকজন এটার পেছনে লেগে গেল, এটাকে ক্যানসেল করবে।

ব্যুরোক্র্যাটদের একটা টেনডেন্সি হলো, সবকিছু স্লো-ডাউন করে দেওয়া। এটা একটা বড় সমস্যা। আমরা চাচ্ছি সবকিছু তাড়াতাড়ি করতে, তারা আইনকানুন দেখিয়ে দেরি করায়। মানুষের জন্যই তো আইন বানানো হয়। যদি এক আইনে কাজ না হয়, নতুন আইন বানান। অটিচ্যুড মাস্ট চেঞ্জ।

বাংলাদেশ বিমান কোনো দিন বোয়িং কেনেনি ডু ইউ নো, হোয়াই? ওয়ার্ল্ডের বেস্ট এয়ারক্র্যাফট হলো বোয়িং। কারণ, বোয়িং কিকব্যাক দেয় না। মানে, দে ডোন্ট অ্যাপয়েন্ট এজেন্টস। এখানে সাধারণত ১০ পারসেন্ট এজেন্টরা পায়। এই যে আমরা ডিসি-১০ কিনেছি, এটিপি কিনেছি, ফকার কিনেছি, কিন্তু বোয়িং কিনিনি।

সো উই কনট্যাক্টেড দেম। বলে, ভাই, তোমাদের কাছে আগেও এসেছি, তোমাদের কিকব্যাক দিতে পারব না। বললাম, আমরা তো তোমাদের কাছে টাকা চাইনি? আটটা কনট্রাক্ট করলাম। আটটা বোয়িং। তার মধ্যে ট্রিপল সেভেন আছে, সেভেন সিক্স সেভেন আছে। এগুলো এখন আসছে, এসে গেছে।

কথা ছিল, তারা দুইটা এয়ারক্র্যাফট আমাদের লিজ দিবে। ওগুলোর কনট্র্যাক্ট হয়ে গেয়েছিল। এক বা দুই বছরের জন্য। বোয়িং লিজ হবে, কিন্তু কন্ট্র্যাক্ট বোয়িংয়ের সঙ্গে না, অন্যদের সঙ্গে। আমরা চলে যাওয়ার পরে লিজটাকে ক্যানসেল করে দেওয়া হয়েছে। সেম কোম্পানি থেকে বোয়িং লিজ নিয়ে ওগুলো চালিয়েছে।

মহিউদ্দিন : মানে আবার টাকা খেয়েছে?

মইন : আমি সেটা বলতে চাই না। নতুন করে কনট্র্যাক্ট করেছে, সেম কোম্পানির সঙ্গে, আরও বেশি টাকা দিয়ে।

মহিউদ্দিন: এই প্রথম আমাদের দেশে নতুন বোয়িং এয়ারক্র্যাফট কেনা হলো।

মইন: এর আগে এটিপি ছিল। কিন্তু ওটা ভালো চলেনি। ওটা প্রেসিডেন্ট এরশাদ কিনেছিলেন। ওটার মধ্যে অনেক গলদ ছিল। পরে তো বন্ধই হয়ে গেল। একটা অ্যাকসিডেন্ট করল। তারপর পার্টস-টার্টস নিয়ে অনেক সমস্যা। এটিপি দূরপাল্লার জন্য না। বিমানে যে কী ধরনের করাপশন হয়েছে? দুইটা ফকার পড়ে ছিল ইন্দোনেশিয়ায়। এ দুই বছর ধরে পড়ে ছিল। ঘাস উঠে গেছে। আগের গভমেন্ট ওগুলো কিনেছে। কিনে এখানে নিয়ে এসেছে। পুরা ওভারহলিং করতে হয়েছে। ওটা ফ্লাইই করতে পারেনি। একবার ফ্লাই করে আবার গ্রাউন্ডেড হয়ে গেছে। টোটাল ওয়েস্টেজ।

ডিসি-১০ এ চারজন পাইলট লাগে। পাইলট, কো-পাইলট, আরও দুজন ক্রু। ট্রিপল সেভেনে লাগে দুজন, পাইলট আর কো-পাইলট। দেখেন, হাউ মাচ ইউ আর সেভিং? আগে বিমান যখন নিউইয়র্কে আসত, ১৫ দিন এদেরকে নিউইয়র্কে বসায়া রাখত। আর ১৫ দিনের ডেইলি অ্যালাউন্স। আমাদের যে অ্যাডভাইজার ছিলেন, মি. আজিম, ওনাকে আনা হয়েছিল। উনি সিঙ্গাপুরে যোগাযোগ করেছিলেন। বলে, তোমরা কীভাবে চলো? দেখো, আমাদের লন্ডনে ডেইলি ফ্লাইট নেই। লন্ডনে আমাদের যে ক্রু আছে, তাকে এক রাত ঘুমাতে দিই। দুই দিনের হয়তো গ্যাপ আছে। আমরা তাকে বসায়া রাখি না। পরের দিন ফ্রান্স থেকে সিঙ্গাপুরে ফ্লাইট আছে। লোকাল ফ্লাইটে ওরা প্যারিসে চলে আসে। তারপর প্যারিস থেকে ফ্লাই করে সিঙ্গাপুরে চলে আসে। তো হি ট্রাইড অল দিস থিংস। আর পাইলটদের তখন কী চিল্লাচিল্লি! হাইমাউ, পয়সা বন্ধ হয়ে গেছে?

যেখানেই হাত দেবেন, সমস্যা। আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। আমাদের সময় ছিল সীমিত। দুর্নীতি কমিয়ে নিয়ে আসা। ফলাফল কী হলো? এর আগে আমরা পাঁচ বছর পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ছিলাম। এক বছরের মধ্যেই এটা কমে এল। তার পরের বছর আরও কমেছে। দেখুন, আন্তর্জাতিক মহল বলছে, দুর্নীতি কমেছে। এটা আমাদের দেশের জন্য খুবই কঠিন কাজ। কিছু লোক এমন যে কীভাবে কার কাছ থেকে পয়সা নেবে? মনে করেন, আমারই হয়তো জানাশোনা, খুব খাতিরের লোক, এসব বলেকয়ে পয়সা খেয়ে নেবে। হয়তো আমি জানিও না। আমার সামনেও আসবে না। পয়সা কিন্তু খেয়ে ফেলেছে।

একবার আমার কাছে একজন আসল। মেঘনা পাওয়ার প্ল্যান্টে যে জেনারেটর আছে, দুটো আছে, থার্ডটা বসাবে। উনিই এর আগে দুটো এনেছিলেন। বললেন, থার্ডটা ওনাকে দেন, আমি ৫০ কোটি টাকা দেব। যে লোক আমার কাছে অফার নিয়ে এসেছে, তাকে বললাম, শোনেন ভাই, আমাকে যদি ৫০ কোটি টাকা দেয়, তার মানে সে অন্যদের আরও ১০০ কোটি টাকা দিবে। তার মানে দেড় শ কোটি। তাহলে যে থার্ড জেনারেটরটার জন্য উনি কমপিট করবেন, ওখান থেকে দেড় শ কোটি টাকা মাইনাস করে দিতে বলেন। আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব, যাতে সে কন্ট্রাক্টটা পায়। তারপর দেখি আর কোনো খোঁজখবর নেই। শুনিওনি যে উনি টেন্ডার সাবমিট করেছে। যে লোক আমার কাছে অফারটা নিয়ে এসেছিল, ১৫ দিন পর এক পার্টিতে তার সঙ্গে দেখা। বললাম, কী ভাই, উনি তো আর এলেন না? বলে যে না, ও করবে না। কেন করবে না? করবে না এ জন্য যে তখন তো ধরপাকড় শুরু হয়েছে। ও বলল, সাত বছর আগে যখন দিয়েছিল, ওই দরে দিবে। আমি বলেছি ওই প্রাইজ থেকে দেড় শ কোটি টাকা মাইনাস করতে। বলে যে ওই সময় আমি কত মানুষকে কত টাকা খাওয়াইছি, আমি দেব না ভাই। এই হলো আমাদের লেভেল অব করাপশন।

আরেকটা গল্প বলি। সেক্রেটারি, ডক্টরেট, একটা অর্গানাইজেশনকে বলছে, তার ছেলেকে একটা কম্পিউটার কিনে দিতে। ওই অর্গানাইজেশনের কোনো কাজে তার সম্মতি দরকার। কম্পিউটারের কতই-বা দাম? এটার লোভ যদি একজন সেক্রেটারি না সামলাতে পারে, সে আবার দেশের কী কাজ করবে? এই হলো আমাদের অবস্থা। সবখানেই এ রকম।

আমি চেয়েছিলাম, এই দুই বছরে আমাদের একটা কন্ট্রিবিউশন থাকুক। ঢাকায় এক্সপ্রেসওয়ে করে দিতে চেয়েছিলাম। কমিউনিকেশন মিনিস্টারকে বললাম, আমার একটা রিকোয়েস্ট, আমরা চাচ্ছি এটা। এই প্রপোজালটা আমেরিকান গভমেন্ট আগের ইলেক্টেড গভমেন্টকে দিয়েছিল। একজন আমেরিকান এ নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশনও দিয়েছিল। বলেছিল, তারা সরকার থেকে পয়সা নেবে না। ওখান থেকেই খরচ তুলবে।

মহিউদ্দিন : বিওটি।

মইন : হ্যাঁ, বিল্ড, অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার। প্রেজেন্টেশন শুনে মিনিস্টার বলল, আমার কী লাভ? আপনার লাভ মানে আপনার দেশের

লাভ, কোনো টাকা খরচ না করে। না না না, আমার কী লাভ? তারপর বলেই বসল, আমাকে যদি নয় পারসেন্ট দেন, তাহলে এটা হবে। তো এটা আর হয়নি। আমি ভাবলাম, দিস ইজ দ্য টাইম। ওনাকে বললাম। এনার্জাইস করলাম।

মহিউদ্দিন : কমিউনিকেশন অ্যাডভাইজার যিনি ছিলেন?

মইন : হ্যাঁ, এক মাস গেল, দুমাস গেল, কোনো নড়াচড়া দেখছি না। বললে জবাব দেয়, হ্যাঁ, দেখব। দেখি যে বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। ওনাকে দিয়ে তো এই কাজ হবে না? তখন চিফ অ্যাডভাইজারকে বললাম, জেনারেল মতিনকে বললাম। তারপর আরেকজন এলেন। উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। উনি বললেন, উনি চেষ্টা করবেন। এক মাস গেল, দুমাস গেল। উনিও দেখি...। বললেন, ফাইল তো পাঠিয়েছি, কিন্তু মুভ করছে না। ছয় মাস চলে গেছে। বললাম, স্যার, একটা কাজ করেন। একটা টেন্ডার করে লোক ঠিক করে দেন। কাজটা শুরু হোক। বললেন, লেট মি ট্রাই। তারপর এসে বললেন, মইন, হবে না।

কেন হবে না?

উড ইউ বিলিভ ইট? নোবডি ইজ মুভিং দ্য থিংস। ফাইল পাঠালে তিনটা অবজেকশন দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বলে স্যার, এটার এই রুল...। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু ইট। কারণ, তারা টাকা পাবে না।

এটা করতে দিল না। না হলে আমরা সারা ঢাকা শহরে এক্সপ্রেসওয়ে করে দিতাম।

মহিউদ্দিন : তবু ভালো যে আপনারা হাতিরঝিলটা শুরু করেছিলেন।

মইন : হাতিরঝিলের গল্প শুনবেন? আই রেসপেক্ট ড. ফখরুদ্দীন। আ থরো জেন্টলম্যান। ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড হ্যাজ লাভ ফর দ্য কান্ট্রি। উনি এটা পারস্যু করেছেন। আমরা সাপোর্ট দিয়েছি।

হাতিরঝিলের চারপাশে কী হতো জানেন তো? গাঁজা, সমাজের যত কুকাজ। আমি নাম করতে চাই না। এসব হতো, সোনারগাঁও হোটেলের অপজিটে। প্রথমে আমরা এটাকে ভাঙলাম। একদম ক্লিন করে ফেললাম। কোনো পলিটিক্যাল গভমেন্টের জন্য এটা করা ডিফিকাল্ট ছিল। কারণ, তাদের ওপর এত চাপ ছিল চারদিক থেকে। কোনো দিন চিন্তাও করেনি।

আমরা কিন্তু সব করে ফেলেছিলাম। শুধু তিন মাসের কাজ বাকি ছিল। ওটা করতে পরে আরও তিন বছর লাগল। যাহোক, যখন এটার উদ্বোধন হয়, আমার খুব ভালো লেগেছে।

মহিউদ্দিন : ঢাকার মধ্যে একটা ওপেন স্পেস।

মইন : সুন্দর। আর এখানে তো নর্দমার পানি আসত। এসব বন্ধ করা হয়েছে।

মহিউদ্দিন : ওপর থেকেও খুব সুন্দর লাগে।

মইন : হ্যাঁ, বিউটিফুল। এখানে ড. ফখরুদ্দীনের বিরাট কনট্রিবিউশন আছে। যখন এটার উদ্বোধন হয়, আমি *প্রথম আলোয়* অনেক কমেন্টস দেখেছি। ৯৯ পারসেন্ট কমেন্টস ছিল খুব ভালো। একটা-দুইটা তো খারাপ থাকবেই। মোস্ট অব দ্য পিপল সেইড, দিস শুড বি নেইমড অ্যাজ ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দীন ঝিল।

আমরা কিন্তু টুকটাক এ রকম অনেক কাজ করেছি, মানুষ হয়তো জানেও না। ঢাকায় কোনো নতুন রাস্তা হয়নি অনেক বছর।

মহিউদ্দিন : তেজগাঁও লিংক রোডটা?

মইন : এটা আমরা করেছি।

মহিউদ্দিন : ফ্লাইওভারের মতো।

মইন : এটা একটা। বনানীতে একটা করা হয়েছে, ব্রিজসহ। তারপর কবরস্থান।

মহিউদ্দিন : রায়েরবাজারের ওইটা?

মইন : না, বনানী কবরস্থান। ওখানে আট বিঘা না কত জানি যোগ করা হয়েছে। এটা ছিল...

মহিউদ্দিন : দখল?

মইন : দখল করে ফেলেছিল, এবং সবাইকে পয়সা খাওয়ানো হয়েছে। বললাম, ঠিক আছে, আমি এটার জন্য কাজ করব। একটা শর্ত। এই জায়গা আমি উদ্ধার করে দেব। কিন্তু এটা হবে ফি সাবিলিল্লাহ। এখানে আপনি জমি কিনে—ভিআইপি কবরস্থান? ওটা হবে না। এখানে এক বছর পরে রোটেশন হবে, জান্নাতুল বাকি যেমন। ইফ দিস ইজ অ্যাগ্রিড, ওনলি দ্যান আই উইল ওয়ার্ক। সবাই অ্যাগ্রি করল। ভেঙে-টেঙে দখলদারদের উঠিয়ে দিলাম। আমি দুবছরের মধ্যে কবর স্টার্ট করিয়ে দিয়েছি।

মহিউদ্দিন : পুরাতন এয়ারপোর্টের ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা করেছেন? মিরপুরের ট্রাফিকটা ডাইভার্ট হয়ে গেল।

মইন : একজাক্টলি। এটা ড. ফখরুদ্দীনের চেষ্টা। এয়ারফোর্স দিতে চাচ্ছিল না। এয়ার চিফের সঙ্গে কথা-টথা বলে করলাম।

তারপর ওই টাওয়ারটা, র‍্যাংগ্‌স ভবন। আরে বাবা, এ তো আরেক

স্ক্যান্ডাল? সবাই পয়সা খেয়েছে ওনার কাছ থেকে। এটা ছিল নো ফ্লাই জোন। এখানে ছয়তলার বেশি দালান বানাতে পারবেন না। সে যখন পারমিশন চেয়েছে, তাকে এটা বলা হয়েছে। সে ২৪ তলার ফাউন্ডেশন দিয়ে এটা শুরু করেছে। করেও ফেলেছে। এর মধ্যে গায়ের জোরে হোক, যেমনেই হোক, সঙ্গে একটা ওয়াক্‌ফ ল্যান্ড ছিল, ওটাও খেয়েছে। এটা নিয়ে মামলা চলছিল অনেক আগে থেকেই। কোর্টের রায় ছিল। আমাদের সময় ফাইনাল রায় হয়েছে। তখন ওরা আবার লোকজনকে ধরেছে। দিস কেম ইন দ্য কেবিনেট। চিফ অ্যাডভাইজার আমাকে বললেন, আপনি একটু আসেন। সবাই বলছে, এটা ভাঙবে কেন? কী দরকার? তখন আমি বলেছিলাম, দিস ইজ দ্য আইকন অব দিস গভমেন্টস অনেস্টি। এটা যদি থাকে, মানুষ যখনই দেখবে, বলবে, কোর্টের রায় পেয়েও সরকার কিছু করেনি। তখন না ভাঙলে পরে এটা ভাঙাও হতো না।

মহিউদ্দিন : এই যেমন বিজিএমইএরটা।

মইন : এখনো আছে। আমাদের সময় ফাইনাল রায় আসেনি। এ জন্য ওটা রয়ে গিয়েছিল। আমি চীনে অফিসার পাঠিয়েছিলাম, কীভাবে এ রকম বিল্ডিং ভাঙতে হয় তা শিখতে। আমাদের তখন কোনো টেকনোলজি ছিল না। তারপর তো হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে গেছে, কয়েকটা ওয়ার্কার মারা গেল। বাট ইট ওয়াজ ব্রোকেন। এবং ওখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। পিপল আর গেটিং দ্য বেনিফিট।

মহিউদ্দিন : আপনারা বোধ হয় দুই দফায় বা তিন দফায় দুর্নীতিবাজদের লিস্ট করেছিলেন।

মইন : জি।

মহিউদ্দিন : প্রথমে বোধ হয় ৫০ জন, তারপর ২০০ জন, আমার যদ্দুর মনে পড়ে। ক্রাইটেরিয়া কী? কীভাবে এই লিস্ট করলেন?

মইন : এটা হোম মিনিস্ট্রি করেছে। জেনারেল মতিন ছিলেন দায়িত্বে। ওনাকে একটা কমিটি করে দেওয়া হয়েছিল। এর কো-অর্ডিনেটর ছিলেন মে. জেনারেল মাসুদ। কমিটি তথ্য সংগ্রহ করেছে। সাথে ল মিনিস্ট্রি ছিল। সবাই মিলে লিস্ট করেছে। উইথ অ্যাভিডেন্সেস। এখানে কিছু ভুল হয়েছে। স্পেশালি বিজনেস কমিউনিটিকে ডিসটার্ব না করলেই ভালো ছিল। যারা খুব বেশি রকম, এ ধরনের দু-চারজনকে করলেই...

মহিউদ্দিন : একসঙ্গে বোধ হয় অনেকগুলো ফ্রন্ট খুলে ফেলেছিলেন।

মইন : আমাকে একটা কথা বলেন। এই যে লিস্টটা হয়েছে, তার

মধ্যে একটা ভালো লোককে কি ঢোকানো হয়েছে? শো মি ওয়ান পারসন, যাকে ভিকটিমাইজ করা হয়েছে? আমি তো বললাম, ভুল হতে পারে। ইজ ইট ইনটেনশনাল অর আনইনটেনশনাল?

মহিউদ্দিন : কতগুলো মামলা তো হাস্যকর মনে হয়েছিল—যেমন বিয়ারের ক্যান পাওয়া গেছে ইত্যাদি।

মইন : আপনি বললেন না, অনেকে মসলা লাগায়? এগুলো হচ্ছে মসলা। ইটস নট দ্যাট বিয়ারের ক্যান পাওয়া গেছে বলেই মামলা হয়েছে। ব্যারিস্টার মওদুদ—কী না করেছে? বাড়ি খেয়ে ফেলেছে। এখন বলছে, বিয়ারের ক্যান নিয়ে করেছে। লুক অ্যাট দিস। সময় তো বলে দিচ্ছে। দেড় বিঘা জমি গুলশানে, কত দাম? এবং এটা করেছে ভাইয়ের নামে।

মহিউদ্দিন : কিন্তু একপর্যায়ে এসে দেখলাম, হাইকোর্টে গিয়ে সব মামলা খারিজ হয়ে গেল। চার্জশিটে কি কোনো সমস্যা ছিল পুলিশের?

মইন : যারা দুর্নীতি দমনের কাজে ছিল দুদকে, তারা অ্যাবসলিউটলি ইললিটারেট ইন দিস জব। একজন তো কেঁদেই দিয়েছে—আমি জীবনে এগুলো করিনি। আমি এ সমস্ত পারব না। তারপর আর্মি অফিসার দিয়ে তাদের শেখানো হলো। ক্লাস নেওয়া হলো। রিপোর্ট বানাও, এই বানাও, সেই বানাও। তারাও এ ধরনের কাজে নতুন। কোর্টে মামলা ওঠার পর প্রথমে তারা দেখাল, এটা আন-ল-ফুল। তারপর অনেকেই জামিন নিয়ে নিয়েছে। লোয়ার কোর্টে, অন্যান্য স্থানে বিচার হয়েছে। প্রবলেম হলো, আমাদের অফিসাররা তো বোঝেনি গ্যাপটা কোথায়। ওই গ্যাপটা ক্লোজ করতে পারেনি ঠিকমতো। ওই গ্যাপ দিয়ে অনেকেই বেরিয়ে গেছে। টেক দ্য এক্সামপল অব ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর। হি ওয়াজ দ্য ওনলি পারসন, হু ওয়াজ কনভিক্টেড। ইউ নো দ্যাট। অনেক কিছু ডিলে হয় গেছে। কাউকে ছাড় দেওয়া হয়নি। যখন ইলেক্টেড গভমেন্ট এসেছে, ছাড়া পেয়ে গেছে।

মহিউদ্দিন : তিনি তো এখন অনেক কথা বলেন?

মইন : কে, মহীউদ্দীন খান আলমগীর ? বলব আমি তার গল্প?

মহিউদ্দিন : বলেন না।

মইন : আওয়ামী লীগ যখন ইলেকশনে জিতল, দুই-তিন দিনের মধ্যে হি ওয়ান্টেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ মি। আফটার অল, ইলেক্টেড মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলাম। আসছে। আই গেভ হিম ফুল রেসপেক্ট। দ্যান হি স্টার্টেড। হি ওয়াজ ড্যাম অ্যানয়েড উইথ

আ মেজর। ওই মেজর নাকি দুর্ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে।

বললাম, আমি এই প্রথম এটা শুনছি। আপনি যা বলছেন, সে যদি সত্যিই এ রকম করে থাকে, নিশ্চিত থাকুন, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু সে যদি এটা না করে থাকে, অথবা সে যদি নির্দেশিত হয়ে থাকে, আমি কিছু করতে পারব না।

উনি চলে যাওয়ার পর আমি ইন্টেলিজেন্সকে বললাম, আসলে কী হয়েছিল? ওই মেজর তার অফিসে গিয়েছিল। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উনি যেগুলো ডিক্লেয়ার করেছে, তার মধ্যে তেমন টাকা ছিল না। তো কথা শেষ। হঠাৎ মেজরের চোখ পড়ল, পেপার ওয়েটের নিচে কী যেন একটা স্লিপ। জাস্ট আউট অব কিউরিয়াসিটি অর ফান, হি পিকড আপ দ্যাট স্লিপ, পকেটে রাখল। দ্যাট ওয়াজ আ ব্যাংক স্টেটমেন্ট, যেখানে ৯০ লাখ টাকা আছে, হুইচ হি ডিড নট ডিক্লেয়ার। পরে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এ টাকা কোথায় পেয়েছেন? উনি উত্তর দিতে পারেননি। বলেছেন, ছেলে পাঠিয়েছে। ছেলে বোধ হয় আমেরিকায় থাকে। তো ছেলে পাঠিয়েছে। রেমিট্যান্সের কাগজ দেখান? হি কুড নট প্রডিউস অ্যানি পেপার। মামলা হলো এবং প্রমাণ হলো যে এটা ইললিগ্যাল মানি। তাঁর ১২ বছরের জেল হলো। এ জন্য ওই মেজরের ওপর ভীষণ খেপা। আমি তার ব্রিগেড কমান্ডারকে বললাম, সেই মেজর একটা ভালো কাজ করেছে। চিন্তার কারণ নেই, তার কিছু হবে না। আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেসও করিনি। এ জন্য তিনি (আলমগীর) আমার ওপর অ্যানয়েড।

সরকার থেকে আমি পাঁচ কাঠা জমি পেয়েছিলাম। ওটাতে আমি বাড়ি বানিয়েছি। আমার সঞ্চয়, আমার ইউএন মিশনের টাকা, ব্যাংক লোন নিয়েছি, বড় ভাই আমাকে পয়সা দিয়েছে, বোন দিয়েছে—আমার তো নিজস্ব টাকাও ছিল। আমি পাকিস্তানে ডিফেন্স অ্যাডভাইজার ছিলাম। সব টাকা পেতাম ফরেন কারেন্সিতে। অত টাকা খরচ হতো না। টাকা জমিয়েছিলাম। আমার এত বছরের চাকরি। প্রভিডেন্ট ফান্ডে আমার টাকা ছিল। ওগুলো নিয়ে আমি বাড়িটা বানিয়েছি। কেউ চাইলে এখনো হিসাব দিতে পারব। উনি হোম মিনিস্টার হয়েই, প্রথমে বলেছে, আমি বাড়ি বিক্রি করে টাকাটা নিয়ে চলে যাচ্ছি, আমেরিকায়, হুইচ ইজ টোটালি ফলস। বাড়িটা এখনো আছে। এই লোক এসব বলে বেড়াচ্ছে। তারপর তো তিনি আমার বিরুদ্ধে লাগলেন—অল আউট। পরে শুনেছি, কারও হস্তক্ষেপে তিনি চুপ হয়েছেন।

একজনই শুধু শাস্তি পেয়েছে। এটা সিভিল কোর্ট ডিল করেছে। এটা

মার্শাল ল কোর্ট ছিল না, স্পেশাল কোর্ট ছিল না। এ জন্য ডিলে হয়েছে।[৭৪]

এক-এগারোর সরকার আইএমইডির সচিব বদিউর রহমানকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সাত মাসের মাথায় তিনি পদত্যাগ করে স্বেচ্ছা-অবসরে যান। এ নিয়ে তখন গুঞ্জন ছিল। গণমাধ্যমে তিনি বলেছিলেন, 'মনিবের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়েছি বলে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।' তাঁর কথায় আক্ষেপের সুর ছিল স্পষ্ট। বোঝা যাচ্ছিল, এনবিআরের নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বনিবনা হচ্ছে না। লেখকের সঙ্গে কথোপকথনে বিষয়টি উঠে এসেছে :

বদিউর রহমান : ওরা তো তখন ক্ষমতায় এসে গেছে। কিন্তু মার্শাল ল দেওয়ার সময় এরশাদ যেখাবে হোমওয়ার্ক করেছিল, এরা তা করেনি। এরা পরিস্থিতির বেনিফিট নিয়ে এসে গেছে।

মহিউদ্দিন আহমদ : আপনার সঙ্গে বিরোধ হলো কী নিয়ে?

বদিউর : জরুরি বিধিমালার মধ্যে ওরা এনবিআরকে ইনক্লুড করতে চেয়েছিল। তার মানে, ইনকামট্যাক্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ সাবসাইডেড হয়ে যাবে। আমি এটাতে রাজি হইনি। এই প্রথম একটা টক্কর লেগে গেল তাদের সঙ্গে।

মহিউদ্দিন : জেনারেল মইনের সঙ্গে কি কখনো কথা হয়েছে?

বদিউর রহমান : জেনারেল মইনের সঙ্গে দুবার এক্সক্লুসিভ বৈঠক হয়েছে। আমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছি,

আপনারা থাকবেন কয় দিন?

দুই বছর।

দুই বছর থাকলে, আমার চাকরিও ওই সময় পর্যন্ত আছে। আমি রেভিনিউ কালেকশনের টার্গেট ফুলফিল করতে পারব।

প্রথম দিকে তারা ভালো ভালো কথা বলেছে। অন্য আইনে যা-ই থাকুক না কেন, জরুরি বিধিমালার ব্যাপারে আপত্তি জানানোয় তারা আমার ওপর অসন্তুষ্ট। কারণ জিজ্ঞেস করায় বললাম, আপনারা যদি দুবছর থাকেন, দুবছর পর পার্লামেন্ট আসলে তখন জরুরি বিধিমালা বা এর কোনো ধারা যদি পার্লামেন্টে র‍্যাটিফাইড না হয়, তখন তো এটা বাদ হয়ে যাবে। টেমপোরারি রেভিনিউ কালেকশনের জন্য আমি তো অকারণে এসব কাজ করব না, যা পরে খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় একটা ঝামেলা ঘটে গেল। তারা কিছু লিস্ট দিয়েছিল আমাকে। করাপ্ট পলিটিশিয়ান, বিজনেসম্যান। তারা যেসব কাগজপত্র দিত, সই করে চিঠি দিত না।

মহিউদ্দিন : কে লিস্ট দিয়েছিল?

বদিউর : ব্রিগেডিয়ার আমিন। তখন তো সে বেশ পাওয়ারফুল। বলেছি, আমি এ ধরনের কোনো কাজ করব না। নিয়মের মধ্যে যা আছে, সেগুলো করব। ট্যাক্সের বিষয়ে আপনি কাউকে যদি দোষী সাব্যস্ত করতে চান, সেখানে তার পক্ষে কোনো মেরিট থাকলে আমি বরং তার পক্ষে যাব। রেভিনিউ বোর্ড কারও কাছে খেলনা হতে পারবে না। আমরা প্রতিশোধমূলক কাজে যাব না।

আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এনবিআরকে ৭০ মিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছিল। এনবিআরের মডার্নাইজেশন, নতুন বিল্ডিং বানানো—এই সব কাজের জন্য। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে তখন পরিচালক জাকির খান, আমাকে বললেন, সই করে দেন। আমি একদিন সময় নিলাম। টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস দেখে ঠিক করলাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে এনবিআরের মাথাটা ঢুকিয়ে দেব না।

মহিউদ্দিন : ওরা তো আপনাদের আলাদা ভবন তৈরির জন্য টাকা দিতে চেয়েছিল? নিলে কী হতো?

বদিউর : দুই-চার-পাঁচ মিলিয়ন ডলার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দিলে সেটা খরচ করতাম। কিন্তু গোটা এনবিআর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পকেটে চলে যাবে, সেটা হতে দেব না। ইআরডির অতিরিক্ত সচিব থাকাকালে দেখেছি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে যাওয়া মানে মাথা বিক্রি হয়ে যাওয়া। আমার সময় রেভিনিউ কালেকশনে ১৭ পার্সেন্ট গ্রোথ হয়েছিল। কাজ ভালোই চলছিল। আমি তাদের মাতব্বরির মধ্যে ঢুকতে চাইনি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ আমার ওপর খেপা ছিল। আমাকে এনবিআর থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের ইন্ধন ছিল।

মহিউদ্দিন : অর্থ উপদেষ্টা মির্জ্জা আজিজের সঙ্গে আপনার কি কোনো বাহাস হয়েছিল?

বদিউর : না। ওদের (সেনা কর্তৃপক্ষের) কোনো ইনস্ট্রাকশন নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললে তিনি বলতেন, এটা আপনি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। মির্জ্জা আজিজ সব সময় ওদের থেকে আলাদা থাকত।

মহিউদ্দিন : তাহলে আপনার ট্রান্সফারটা হলো কেন?

বদিউর : ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চাপ ছিল। এ ছাড়া আমি কিছু ট্যাক্স মেজার

নেওয়ায় তারা ভাবল এতে তাদের জনপ্রিয়তা কমে যাবে। একদিন রাত ১১টায় ফখরুদ্দীন সাহেব ফোন করে আমাকে বললেন,

বদিউর, আমরা কী বলি আর আপনি কী বলছেন?

কেন স্যার, টাকা লাগবে না?

কত পাবেন? ১০০ কোটি? ৫০০ কোটি?

স্যার, ১০০ কোটি, ৫০০ কোটি কি টাকা না?

মেইন পয়েন্টটা হলো, আমি একটা হাউস টু হাউস সার্ভে করতে চেয়েছিলাম। ঢাকা শহরের চার-পাঁচটা এলাকায়—ধানমন্ডি, বনানী, গুলশান, উত্তরা, লালমাটিয়া—এসব জায়গায়। চারজনের টিম হবে। এনবিআরের দুজন, লোকাল ওয়ার্ডের একজন আর পুলিশের একজন। ওরা দেখবে, ঢাকা শহরে যদি ফ্ল্যাটের ভাড়া ২০ হাজার টাকা হয়, এটা হিসাব করলেই তো ট্যাক্সের আওতায় এসে যায়। কোন দিন কোন এলাকায় যাবে, সেটা আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে। একটা ইংরেজি পত্রিকায় এটা লিক হয়ে গেল। ফখরুদ্দীন-মির্জ্জা আজিজ এটা অ্যালাউ করেননি। বললেন, এসব করছেন কেন? আমরা এসবে যেতে চাই না।

তারপর তো আমাকে এনবিআর থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

মহিউদ্দিন : কোথায় বদলি করল?

বদিউর : খাদ্যসচিব হিসেবে নিয়োগ পেলাম। অথচ এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। এটি স্বাভাবিক সৌজন্যবোধের বাইরে। আমি স্বেচ্ছা-অবসরের দরখাস্ত দিয়ে দিলাম।[৭৫]

বদিউর রহমানের কথায় এটা বোঝা যায়, রাজস্ব বাড়ানোর স্বাভাবিক পদ্ধতিতে করদাতাদের নেটওয়ার্ক বাড়ানোর চেয়ে রাজনীতিবিদ-ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে সামরিক কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ছিল বেশি। এ দেশে আমলারা সাধারণত আপস করে চাকরি ধরে রাখেন। বদিউর রহমানের পদক্ষেপ ছিল একধরনের বিদ্রোহ।

দুর্নীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে দুদক মামলা করলেও অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যের উৎস হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে এনবিআরও জড়িয়ে পড়ে নানাভাবে। এনবিআরের কাজের ধরন, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী কী—তা উঠে এসেছে একটি সাক্ষাৎকারে। লেখকের সঙ্গে এনবিআরের সদস্য আহমেদ আলীর কথাবার্তা ছিল এ রকম :

আহমেদ আলী : দুর্নীতিবাজদের সহজে শাস্তি দেওয়ার উপায় হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স লতে তাদেরকে বিচার করা, যেটার ইতিহাস নাই। আইন

আছে, ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। আইনের একটা ছোট্ট ধারা ছিল যে এটা রহিত ছিল আরকি, সেটাও একটা কারণ। একটা পলিটিকাল উইল লাগে। সেটা ছিল না।

এটা কীভাবে আসল আমি জানি না। অথরিটি হিসেবে যারা আসছে, সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যারা মেইন ফিল্টার বা যারা এক্সেকিউশনে আছে, যেমন ব্রিগেডিয়ার আমিন সাহেব, উনি তো আসছে, আমাদের সঙ্গে মিটিং করছে। উনি এবং চিফ যিনি। এইখানে একটা পাইওনিয়ার রোল প্লে করছে আমাদের জামিল ওসমান সাহেব। আমাদের পরের ব্যাচের, পরে সেক্রেটারি হয়েছিল। সে আমার সঙ্গে ট্যাক্স ল নিয়ে আলাপ করছে। একটা ল হচ্ছে যে আইনে যেসব তথ্য আছে, এগুলোর মধ্যে কী কী ত্রুটি আছে। দুই নম্বর হচ্ছে ব্যক্তিগত ইনফরমেশন কালেক্ট করা, যেমন ব্যাংক থেকে কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে এটা যোগ করে টোটাল এসেট বের করে এসেটের ওপর, যেটা দেখানো আছে। যেটা শোউন, সেটা হোয়াইট, বাকিটা তো ব্ল্যাক। আমাদের ফাইলে যেসব আছে, ফাইলে কমবেশি কিছু ত্রুটি থাকে। এটা আপনার ফাইলেও আমি পাব, আমার ফাইলেও আপনি পাবেন। এটা হলো মাইনর। মেজর হলো উনিশের বি ধারা, এই ধারাতে হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো সম্পদ কিনছেন এই দেশে, জমি হোক, বাড়ি হোক, তাহলে একটা ফিক্সড পারসেন্টেজ অনুযায়ী আপনি যদি ট্যাক্স পেমেন্ট করতেন, তাহলে সোর্স অব ইনভেস্টমেন্ট ধরেন ১০০ কোটি টাকার যদি আপনি থ্রি পারসেন্ট ট্যাক্স দিয়া দেন, তাহলে তিন কোটি টাকা ট্যাক্স দিলে আপনার ৯৭ কোটি টাকা হোয়াইট হয়ে গেল। এই ধারায়, যারা পলিটিকাল লিডারস, তাদেরকে ধরবে, বিজনেসম্যানকে ধরবে, তাদের টার্গেট ছিল তখন। ওই ধারা, যেটা রহিত হইছে, সেটা রি-ওপেন করে বিচার করতে চেয়েছিল। এই ব্যাপারে জামিল ওসমান আমার কাছে আসছিল। আমি বললাম, দেখো, ইটস অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট বিটুইন দ্য গভমেন্ট অ্যান্ড ট্যাক্সপেয়ার পিপল। এটা তো করা যায় না। আর এখন আইনটা যদি তোমরা রিপিলও করো, তাহলে ব্যাকে তো যাওয়া যাবে না। যখনই আমরা পিছনে ইফেক্ট দিব, টিকবে না। তখনই এটা যাবে কোর্টে। তা ছাড়া নতুন ইনফরমেশন কালেক্ট করা তো সময়সাপেক্ষ। ডিফিকাল্ট তো বটেই। এটা একটা সাইড। আর একটা সাইড, ব্রিগেডিয়ার আমিন আমাদের সঙ্গে মিটিং করে বলল। বললাম, এই সব মেজার যে নিবেন, এইগুলা তো আপিল হবে। তখন ওনারা বলল, 'ল,

এটা আমরা দেখব।' পরে একজন মেজর আসত আমাদের কাছে, এই সাইডটা ডিল করত আরকি।

আমরা কিছু সাজেশন দিছিলাম, যেটা তারা বাস্তবায়ন করতে পারে নাই। ফার্স্ট কেইস ট্রাই হইছিল টুকুরে নিয়া। আনফরচুনেটলি তার কেইসটা প্রথম হইছিল।

মহিউদ্দিন আহমদ : ওই যে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী?

আলী : হ্যাঁ, ওনার তো অনেক হ্যারাসমেন্টও হইছিল। যার ফলে তার ছেলেমেয়েদের নিয়া গেছে। এটার সমালোচনাও হইছিল। জেলে একসঙ্গে ছিল। টুকু সাহেবের ছেলের সঙ্গে শেখ সেলিমের মেয়ের বিয়া তো এভাবেই হলো। জেলেই পরিচয়। এরও ভালো-মন্দ দিক আছে!

তখন দুর্নীতি দমন—এটা আমাদের কাছে ছিল না। কিছু আইনে তাদের সঙ্গে আমাদের কিছু সিমিলারিটি আছে, আবার কন্ট্রাডিকশনও আছে। কিছু ধারা ওভারল্যাপিং আছে আরকি। কিছু তারাও করতে পারে। আমরাও করতে পারি, ওই দুর্নীতিবিষয়ক। সে জন্য নতুন আইন করল পরে। এতে হইল কী, তাদের কাছে কিছু পাওয়ার চইলা গেল, যেটা পুলিশের ছিল। আমাদের মধ্যে যারা এসব করে, অনেক ভেবেচিন্তে করে, ম্যাক্রোভিউতে করে। কিন্তু এর যে আরও রেমিফিকেশনস আছে, ল্যাক অব নলেজও হইতে পারে, আবার ইচ্ছাকৃত অ্যাভয়েডেন্সও হইতে পারে, তখনই, যখন আইন ত্রুটিপূর্ণ হয়। এইটা তিন রকম করে তারপর মামলা শুরু হইল।

আমি তো বললাম, আমাদের সব ফাইলে ত্রুটি আছে। প্রথম হইল, তারা কতগুলি বড় ব্যবসায়ীর নাম জানাল আমাদের। বলল যে ওমুক ওমুক গ্রুপ, এদের সমস্ত কাগজপত্র আপনাদের দিয়ে দেব। আপনারা বের করে কেইস করেন। এটা বিরাট একটা কাজ। অনেক কভার দিতে হবে। এ ছাড়া ওদের সঙ্গে, কী বলব, অনেক রকম লাগালাগি হবে। আমরা এটা অ্যাভয়েড করলাম। আমরা বললাম যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট জোগাড় করে দেন। ব্যাংকে যেগুলো অনেক সময় ডিসক্লোজড থাকে, ওগুলো তো আমাদের কাছে হোয়াইট। আর যেগুলো ডিসক্লোজড থাকে না, ওগুলো হোয়াইট হইলেও ব্ল্যাক হয়ে যায়। ট্যাক্স-পেইড ইনকামকেই হোয়াইট ধরা হয়। বাকিটা আপনার ব্ল্যাক ইনকাম, আমাদের আইন অনুযায়ী। তখন তারা ব্যাংকে গিয়া—আমাদের আইনে কিন্তু ব্যাংকের স্টেটমেন্ট নেওয়ার অনেক সুযোগ আছে। চিঠি পাঠাইলেই দিয়া দেয়। তো সেভাবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করল। তারা পাওয়ারও ইউজ করল

কিছু। মানে ব্যাংকে বন্দুক নিয়া গেল। এইভাবে সাইফুর রহমান সাহেবেরও ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিল। যাহোক, ইট ওয়াজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি।

এইভাবে মামলাগুলি শুরু হইল। প্রথম যে মামলা গেল শুনানিতে, তখন একটা আইনগত প্রশ্ন দেখা দিল। ওরা আমাদের কাছে আসছিল। মওদুদ সাহেবের আইনজীবী, প্রথম এই আইনটার ব্যাপারে অবজেকশন দিল। বলল যে আমার ক্ষমতাই নাই। মানে চেয়ারম্যান হচ্ছে ইললিগ্যাল। আমাদের আইনে আছে, বাহাত্তর সনের যে আদেশে এনবিআর প্রতিষ্ঠিত হইছে, এই আদেশে বলা আছে যে ওয়ান অব দ্য মেম্বারস হবে চেয়ারম্যান। কিন্তু '৭৯ সনে না কোন সনে আমার মনে নাই, ওই সময় রুলস অব বিজনেস চেঞ্জ করে আইআরডি যখন করল, মানে মিনিস্ট্রি ভাগ করল, তখন ঠিক হইল, আইআরডি সেক্রেটারি উইল বি দ্য চেয়ারম্যান অব এনবিআর। এভাবে করে দিল, উইদাউট অ্যামেন্ডিং দ্য এনবিআর অর্ডার। মামলা করতে হলে এনবিআরের যে বোর্ড অব মেম্বারস অ্যান্ড চেয়ারম্যান, আমাদের মামলার অ্যাপ্রুভাল দিতে হবে বোর্ড থেকে। যে-ই অ্যাপ্রুভাল দিলাম, বলল যে বোর্ড থেকে ইললিগ্যাল অথরিটি অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে।

মহিউদ্দিন : এইটা কি মওদুদ সাহেবের কেইস?

আলী : না, তখনো মওদুদ সাহেবের কেইস আসে নাই। টুকু সাহেবের কেইস ও করছিল। টুকু সাহেবের কেইস হলো ওয়ান অব দ্য ফার্স্ট কেইসেস। ওনার ইনফরমেশন দ্রুত পাওয়া গিয়েছিল বলে ওনার মামলা তাড়াতাড়ি হইছে।

এরপর এনবিআরের আইনও চেঞ্জ হইছে। রুলস অব বিজনেস সংশোধন করল। ওইটার রেট্রোস্পেকটিভ ইফেক্ট দিল। তখন রুহুল আমীন সাহেব ছিলেন চিফ জাস্টিস। ওনাকে থ্রেট দিয়া ওইটা করাইছে। উনি বলছিল ইললিগ্যাল। যেসব মামলা আমরা অ্যাপ্রুভাল দিছি, ওনাকে দিয়াই শেষ পর্যন্ত সই করাইছে। তখনকার যে পরিস্থিতি। মেজর হামিদ নামে একজন ছিল। আমাদের কাছে এসে এই সব গল্প করত। বলত, আপনারা করে দেন স্যার। বাকিটা আমরা দেখব। ব্রিগেডিয়ার সাব তো একবার বলছে, 'দরকার হইলে আমরা অন্য ব্যবস্থা নিব। কেউ যেন ছাড় না পায়।' আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাদের যেসব লইয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিল, আমরা বললাম, এই সব কেইস তো টিকবে না। সরকারের লইয়াররা তো লো-পেইড। তারা তো ভালোভাবে প্লিড করবে

না। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে হয় এইগুলা। তারা তো বইসা থাকবে। আমাদের ট্যাক্স মামলা সম্বন্ধে তারা অবহিতও না, জানেও না। আমরা হেরে যাই সুপ্রিম কোর্টে গেলে। একটা হলো, জাস্টিস জানে না। এইটা তো বলা যাবে না।

মহিউদ্দিন : তারা ফ্যামিলিয়ার না?

আলী : স্বাভাবিক। ট্যাক্স ল তো জটিল। আপনাকে ল প্লাস অ্যাকাউন্টস, দুটাই জানলে তবে আপনি ট্যাক্স ম্যাটারে জাজমেন্ট দিতে পারবেন। আইনে আপনি যত বিদ্বানই হন না কেন, এটা সম্ভব না। কারণ, এই দুইটার মধ্যে রিলেশনশিপ আছে। তখন ওনারা কিছু লইয়ার ঠিক করে দিল। দেখলাম, এখনকার যে আইনমন্ত্রীও একজন। লিস্ট কিন্তু তারাই করে দিছে। রেমুনারেশনও ফিক্স করে দিচ্ছে তারা। তাদের হ্যান্ডসাম দিতে হবে। এভাবে আলাদাভাবে ইন রিলেশন টু অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস তাদের নিয়োগ দেওয়া হইছে। ওই সময় আনিসুল হকের নামধাম প্রচার পাইল বেশি। উনি একজন ভালো লইয়ার নিঃসন্দেহে। আরও কয়েকজন লইয়ার ছিল। যারা স্বল্প পরিচিত, লেখাপড়া জানা, মানে নিরপেক্ষ। আগে যাদেরকে ভালো লইয়ার জানতাম, তাদেরকে বাদ দেওয়া হলো। ধরে নেওয়া হলো তারা এই কেইসগুলো প্লিড করবে না। এইটা হইল একটা সাইড। আর একটা সাইড, তখন টাস্কফোর্স ছিল।

মহিউদ্দিন : এটার চিফ ছিলেন জেনারেল মতিন?

আলী : না, মাসুদ সাহেব ছিল চিফ। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল মতিন সাব। মূল কাজ ওখানেই হইত। আমাদের এনবিআরের ট্যাক্স উইং যেটা, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, সিআইসি, এটা চেয়ারম্যানের আন্ডারে ছিল। আমি যেহেতু অ্যাডমিনে ছিলাম, আমি এটার সঙ্গে কানেক্টেড। মামলা যেহেতু আমার উইং হইয়া আসত, আমার কাছে আনত অ্যাপ্রুভালের জন্য। আমাদের নিম্নতম উইংটা ছিল সার্কেল। সেখান থেকে জয়েন্ট কমিশনার, কমিশনার হইয়া তারা ফিক্স কইরা দিত। তারপর আমরা অ্যাক্ট করতাম। এই প্রসেসে মামলা হইত। সরকারের দুর্নীতিবিরোধী যে অভিযান, এগুলো কিন্তু ডাইরেক্টলি। যেগুলো রেইড করা, এগুলো আমাদের এইখান থেকেও হইছে কিছু, কিন্তু বেশির ভাগই তারা করছে। মানে একটা কমিটি ছিল। আমাদের ইন্সপেক্টর লেভেলের একজন সদস্য ছিল, আর হেডেড বাই আর্মি। অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থারও দু-একজন ছিল। অনেকগুলো গ্রুপ ছিল। তারা রেইড-টেইড করত।

মহিউদ্দিন : ওই সময় হাই প্রোফাইল যে কেইসগুলো ছিল, বিশেষ করে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, তারেক—এদেরকে নিয়ে যেগুলো, এর সঙ্গে কি আপনারা ইনভল্‌ভ্‌ড ছিলেন?

আলী : সব কেইস তো আমাদের মাধ্যমে আসছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তো মেজর কোনো কেইস পাওয়া যায়নি? যেমন তারেকের তো কোনো কিছু প্রমাণিত হয় নাই? তার তো কিছু পায় নাই বলতে গেলে। তার সোর্স অব ইনকাম নাই। তার নামে কোনো অ্যাসেট নাই। তারেকের নামে এ দেশে ব্যাংকে কোনো কিছুই তো পাওয়া যায় নাই।

মহিউদ্দিন : তার নামে মানি লন্ডারিং কেইস হলো না?

আলী : এটা তার পরে হইছে। এটা কিন্তু ট্যাক্স লতে না। মানি লন্ডারিং হইল অন্য আইনে।

মহিউদ্দিন : অ্যারেস্ট তো হলো ওই পিরিয়ডেই?

আলী : হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ওনাদের আইনে হইছে। দুদকের আইনেও তো মানি লন্ডারিংকে নিয়া আসছে। ওইখান থেকে করছে।

মহিউদ্দিন : ওই সময়ই আমরা দেখলাম মিডিয়া রিপোর্টে যে বেগম জিয়া আর সাইফুর রহমান কিছু টাকা দেয়...

আলী : একসেস ক্যাশ? হ্যাঁ, তখন আইন করল যে পরের দিকে একটা সুযোগ দিল, ডিসক্লোজার অব ইনকাম, টেন পারসেন্ট ট্যাক্স দিলে আপনার পিছনের যত ব্ল্যাক আছে, সব হোয়াইট হয়ে যাবে। এইভাবে খালেদা জিয়াও দিলেন। এই যে রেমুনারেশন-টেমুনারেশন যেগুলি পাইছিল, এগুলি ডিসক্লোজড ছিল না। এমনিতে বৈধ ছিল, তবে দেখানো ছিল না। স্টেটমেন্টে নাই।

মহিউদ্দিন : সাইফুর রহমানও এইটা করেছিল।

আলী : সাইফুর রহমান নিজে দেয় নাই। ওনারটা বলা ঠিক হবে না। ওনারটা কিছুটা ইয়ে করা হইছিল, ওপর থেকে আসছিল।

মহিউদ্দিন : হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেশার ছিল।

আলী : ওনার একটা মাইনর ইয়ে ছিল। সেইটা... । পরে অন্যদের ব্যাপারে যেসব সাক্ষ্য আসছে, অন্য আইনে করছে। আমাদের আইনে না। বেশির ভাগই ব্যবসায়ী। লইয়ারও আছে। মওদুদ সাহেবকে ধরছিল। চাকরিজীবীও ছিল। চাকরিজীবী তো ধরছে সব আমাদের আইনে। ওই যে একজন শ্রমিক লিডার ছিল, ইউনিয়ন লিডার। তারপরে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল। কী যেন নাম?

মহিউদ্দিন : আ ন হ আখতার হোসেন?

আলী : হ্যাঁ হ্যাঁ। এগুলি সব আমাদের আইনে। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন। একজন ব্যবসায়ীর জেল হইছে। এবং তিনি কোনো দিন জেল খাটেন নাই। না খাইটা এইভাবেই চলতেছে। উনি দিব্যি বহাল তবিয়তে আছেন। আট বছর জেল হওয়ার পরেও। যেহেতু উনি বাইরে ছিলেন, উনি কোনো আপিলও করেন নাই। আপিল করারও কোনো সুযোগ নাই।

মহিউদ্দিন : আপনার সঙ্গে কি জেনারেল মাসুদের কথাবার্তা হয়েছে?

আলী : হইছে। তবে ওই সময় না, পরে। আমাদের ডিজি ছিল, মোস্টলি সে যেত। আমরা যাই নাই।

মহিউদ্দিন : আমিনের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে। কী ধরনের কথা?

আলী : উনি এই সব নিয়ে থাকছে।

মহিউদ্দিন : আপনাদের প্রেশারাইজ করেছে?

আলী : উনি বলত যে এই করতে হবে। তখন তো খুব হট ছিল। প্রেশার তো। সবাই খুব আতঙ্কিত। এমনকি আমাদের এক অফিসারের জেল হইছে। কোনো এক আর্মি অফিসারের রিলেশনকে সে কোনো কারণে হার্ট করছে বা তার কাজ করে নাই। ওই অফিসারটার একটু বদনাম ছিল। আমি দায়িত্ব নিয়া বদলি কইরা দিছি। ধরেন অমুক বুধবার। আমি বলছি তাড়াতাড়ি জয়েন করো। সে কী করছে, দুই দিন সময় নিছে। এই রকম সময় পায় এক সপ্তাহ...। এই যে বৃহস্পতিবার আগামীকাল, এই বৃহস্পতিবারেই সে ধরা পড়ে গেছে। সকালে আমাকে আর্মি থেকে ফোন দিছে। বলছে, আপনার অফিসার তো বাড়াবাড়ি করতেছে। কী বাড়াবাড়ি করতেছে? এই যে হ্যারাস করতেছে। বললাম, আমি তো ওরে বদলি করে দিছি। ওমা, পরের দিন দুপুর বেলা শুনি যে সে অ্যারেস্টেড, অ্যালং উইথ আ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মানে ওইটা একটা ফাঁদ পেতেছে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরে দিয়া টাকা দেওয়াচ্ছে। ওই সময় ওরা সাডেনলি রুমে ঢুকে তারপর ওকেসহ ধরে ওকেও জেলে নিছে। এবং সেই ছেলেটা জেল খাইটা আবার চাকরি ফেরত পাইছে।[৭৬]

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ৩ ডিসেম্বর ২০০৭ জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রী হোস্টেলের ১ নম্বর ব্লকে স্থানান্তরিত ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে ব্যবসায়ী আজম জে চৌধুরীর দায়ের করা মামলার বিচার শুরু হয়। মামলার অপর অভিযুক্ত শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই ও সাবেক মন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ান। এর আগে ২১ জুন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে

১৬৪ ধারায় দেওয়া জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন জানান শেখ সেলিম। আবেদনপত্রে তিনি বলেন, তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে এই জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল। তিনি দাবি করেন, 'আমি তাদের শেখানো বক্তব্য অনুযায়ী ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিতে বাধ্য হই। আমাকে যে পরিস্থিতিতে রাখা হয়েছিল, তাতে যে কেউ এ ধরনের জবানবন্দি দিতে বাধ্য হবে।' তিনি আরও বলেন, তাঁকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এই মামলায় রাজসাক্ষী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং রাজসাক্ষী হতে রাজি হলে তাঁকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।[৭৭]

অনেক রাজনীতিবিদ দেশের বিভিন্ন জেলে আটক। অনেকের বিরুদ্ধেই মামলা হয়েছে। তাঁরা নিয়মিত আদালতে হাজিরা দেন। তখন তাঁদের সঙ্গে দলের অন্য নেতা-কর্মী ও সাংবাদিকদের কথাবার্তা হয়। অনুমতি নিয়ে জেলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন কেউ কেউ। জেলখানায় তাঁরা কেমন আছেন, এ নিয়ে জনমনে আছে অস্বস্তি, কৌতূহল এবং ক্ষোভ। অনেকেই বেশ খুশি।

২৮ অক্টোবর ২০০৭ *প্রথম আলো* কারা প্রশাসনের উপমহাপরিদর্শক মেজর শামসুল হায়দার ছিদ্দিকীর বরাত দিয়ে রাজনীতিবিদদের কারাজীবনের ওপর একটি রিপোর্ট ছাপে। রিপোর্টে জানা যায়, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থিত বিশেষ কারাগারে দোতলায় তিনটি কামরা নিয়ে থাকেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। বই পড়ে আর মহিলা কারারক্ষীদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটান। কারাগারে আসার পরই নিজ হাতে রান্না করে খাওয়ার জন্য চুলা আর হাঁড়ি-পাতিলের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। তবে কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করেনি। মেজর হায়দার বলেন, নিরাপত্তার কারণে তাঁকে চুলা জ্বালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। কারা কর্তৃপক্ষের দেওয়া খাবারই তিনি খাচ্ছেন। খাবার বলতে সকালে দেওয়া হচ্ছে রুটি, সবজি, মাছ বা মাংস, ডাল ও আলু ভর্তা। রাতেও একই ধরনের খাবার দেওয়া হয়। আত্মীয়স্বজন কোনো খাবার দিলে পরীক্ষার পর তা খেতে দেওয়া হয়।

কারাসূত্রগুলো জানায়, খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন শেখ হাসিনা। ফজরের নামাজের পর কোরআন পাঠ করেন। নাশতার পর চা আর সংবাদপত্র নিয়ে বসেন। দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম নেন, কিন্তু দিনের বেলা ঘুমান না। বিকেলে দোতলার বারান্দায় হাঁটাহাটি করেন, রেডিওতে খবর ও গান শোনেন। মাঝেমধ্যে পারিবারিক চিঠিপত্র পড়েন, সঙ্গে করে আনা ছবির অ্যালবামও দেখেন। রাতের খাবার খান সাড়ে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে। কিছু সময় টিভি দেখে সাড়ে ১১টার মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। জেলে আসার পর তিনি পছন্দমতো কিছু বই আনিয়েছেন। এসবের মধ্যে আছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে

লেখা কিছু বই আর কয়েকটি উপন্যাস। কিছু ধর্মীয় বইও আছে। জেলে আসার পর তিনি কোরআন খতম দিয়েছেন।[৭৮]

শেখ হাসিনার ডান কানে এখনো সমস্যা আছে। ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে গ্রেনেড হামলার পর তাঁর কানের সমস্যা দেখা দেয়। কারাগারে আসার পর তাঁর চিকিৎসক অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত দুবার এসে কান পরীক্ষা করেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে দেখা করার যে আবেদন জানিয়েছেন, তা মঞ্জুর হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ড. ওয়াজেদ মিয়াকে বিশেষ কারাগারে আসার অনুমতি দেওয়া হবে বলে মেজর হায়দার জানান।[৭৯]

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কথা বলেন খুব কম। খুব দরকার না হলে তিনি কাউকে ডাকেন না। একই ঘরের ভেতরে থাকেন। দোতলায় তাঁর জন্য তিনটি কামরা বরাদ্দ থাকলেও তিনি বাকি দুটি কামরায় তেমন একটা যান না। শেখ হাসিনার মতো একই ধরনের খাবার দেওয়া হয় তাঁকে। তবে তিনি প্রতিদিন পাকা পেঁপে খান। কারা প্রশাসন তা নিয়মিত সরবরাহ করে।[৮০]

কারাসূত্র জানায়, বেগম জিয়া ঘুমাতে যান একটু দেরিতে। রাত একটার আগে তিনি ঘুমান না। ফজরের নামাজের পর আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ওঠেন সাড়ে আটটা থেকে নটার দিকে। তিনি বেশির ভাগ সময় হাতে তসবি রাখেন। তাঁর কামরায় একটা টিভি আছে। কোনো রেডিও নেই। কারা প্রশাসন থেকে তাঁকে তিনটি বাংলা ও একটি ইংরেজি পত্রিকা দেওয়া হয়। প্রশাসনের লোকজন পেলেই তিনি সন্তানদের কথা জানতে চান। কারাগারে আসার পর তাঁর চোখে একবার সমস্যা হয়েছিল। তখন পরিবারের লোকজন এসে চোখের ওষুধ দিয়ে যান। কোনো দর্শনার্থী এলে তিনি পাশের কামরায় এসে কথা বলেন। নিচের একটি কামরা দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত থাকলেও তিনি নিচে নামেন না।[৮১]

গুরুত্বপূর্ণ বন্দীদের মধ্যে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বাগান পরিচর্যা করেন। কারাগারের লাইব্রেরি দেখাশোনা করতেন সাবেক বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাছির। তাঁকে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মোহাম্মদ নাসিম কাশিমপুর কারাগারে বাগান পরিচর্যা করেন। এ ছাড়া অনেক বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন।[৮২]

দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ছিল ২০০৭ সালে দেশে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। এ অভিযানে দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়ার দুই ছেলে তারেক রহমান,

আরাফাত রহমানসহ ৭৯ জন প্রভাবশালীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির মামলা হয়েছে। সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী এবং তারেক-আরাফাতের বিরুদ্ধে দায়ের করা কোনো কোনো মামলার বিচার শেষ হয়নি। তাঁদের বাইরে গ্রেপ্তার হওয়া ২৮ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাজা হয়েছে গত আট মাসে, মার্চ থেকে ডিসেম্বরে (২০০৭)। জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত বিশেষ জজ আদালত ও দেশের অন্য আদালতে এঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ঘুষ, চাঁদাবাজি, অবৈধ অস্ত্র রাখাসহ মোট ৭৭টি মামলায় তাঁদের কারাদণ্ড হয়েছে। সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরুর পর দুদক চার দফায় সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজ হিসেবে ১৭৭ জনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) কর্নেল হানিফ ইকবাল জানান, তালিকা ও তালিকার বাইরে এ পর্যন্ত ২৫৬ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সাবেক মন্ত্রী-সাংসদসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৪১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। ১৮টি মামলার রায় হয়েছে, ৫৩টি বিচারাধীন এবং ৬৯টির অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। দুদকের দায়ের করা ৮৯টি মামলার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন হয়েছে। এর মধ্যে হাইকোর্ট ৪৪টি মামলা স্থগিত করেছেন, ২১টি স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে দুদক আপিল করেছে। মামলাগুলোর মধ্যে আছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৫টি, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ২টি এবং তারেকের বিরুদ্ধে ১৩টি। গ্রেপ্তার এড়াতে অনেকেই আত্মগোপন করেছেন বা পালিয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বিএনপির হারিছ চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিনুল হক, শাজাহান সিরাজ, বরকত উল্লা বুলু, মনোয়ার হোসেন ডিপজল, জিয়াউল হক জিয়া, মির্জা খোকন, এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, শাহরিয়ার ইসলাম তুহিন ও ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।[৮৩]

আওয়ামী লীগের পলাতকদের মধ্যে আছেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, তাঁর ছেলে দিপু চৌধুরী, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, জয়নাল হাজারী, হাজি সেলিম, মকবুল হোসেন ও তাঁর ছেলে মাসুদ, শেখ হেলাল, নুর-ই-আলম চৌধুরী লিটন, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, ডা. এইচ বি এম ইকবাল, হাবিবুর রহমান মোল্লা, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম, শামীম ওসমান, সৈয়দ আবুল হোসেন, শেখ মো. আবদুল্লাহ, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত শিকদার এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর ছেলে শাহাদাত আকবর চৌধুরী লাবু।[৮৪]

পলাতকদের মধ্যে আরও আছেন বসুন্ধরা গ্রুপের আহমেদ আকবর সোবহান শাহ আলম, স্বদেশ প্রপার্টির তানভিরুল ইসলাম, হেদায়েত উল্লাহ,

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান, সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী ফয়জুর রহমান, ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম, ডেসার সিবিএ নেতা কাজী মোশাররফ হোসেন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সিবিএ নেতা জাফরুল হাসান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিবিএ নেতা আবুল কালাম আজাদ, শাজাহান সিরাজের ছেলে অমিতাভ সিরাজ প্রমুখ।[৮৫]

দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির মামলায় আরও যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁরা হলেন আওয়ামী লীগের আব্দুল জলিল, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ওবায়দুল কাদের, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, মোহাম্মদ নাসিম, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সালমান এফ রহমান, আ হ ম মুস্তফা কামাল, কামাল আহমেদ মজুমদার, পঙ্কজ দেবনাথ, ইসলামী ঐক্যজোটের মুফতি শহিদুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর ডা. আবদুল্লাহ মো. তাহের, শাহজাহান চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও গাজী নজরুল ইসলাম; বিএনপির খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মওদুদ আহমদ, নাজমুল হুদা, সিগমা হুদা, লুৎফুজ্জামান বাবর, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, মির্জা আব্বাস, সালাহ্উদ্দিন আহমেদ, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, মোসাদ্দেক আলী ফালু, মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন ও তাঁর ছেলে ব্যারিস্টার হেলাল, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, আলী আসগর, আমানউল্লাহ আমান, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী, ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর, আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া, এম এ এইচ সেলিম ওরফে সিলভার সেলিম, নাসের রহমান, মারুফ নিজাম, আরিফুল হক চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলম ও আবদুল কাইয়ুম, সিবিএ নেতা ফিরোজ মিয়া ও বি এম বাকির হোসেন, সাবেক সচিব আ ন হ আখতার, বন কর্মকর্তা ওসমান গণি ও মুন্সী আনোয়ারুল ইসলাম, গিয়াসউদ্দিন আল মামুন, নারায়ণগঞ্জের সাবেক সাংসদ মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, কুমিল্লার রেদোয়ান আহমেদ, আখতার হামিদ পবন প্রমুখ।[৮৬]

# মাইনাস টু

১৩ মার্চ ২০০৭ ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে ভিসা নেন শেখ হাসিনা। ওই সময় তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত গীতা পাসির সঙ্গে কথা বলেন। আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা যায়, তিনি এক মাসের জন্য ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন এবং ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ নাতনিদের সঙ্গে সময় কাটাবেন। এ ছাড়া তিনি কানের চিকিৎসাও করাবেন।[১]

যুক্তরাষ্ট্রে রওনা দেওয়ার আগে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী ধানমন্ডির সুধা সদনে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। ১৫ মার্চ বিকেলে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পথে লন্ডন রওনা হন।[২]

শেখ হাসিনা ঢাকা ছাড়ার সময় জানিয়েছিলেন যে এক মাসের মধ্যেই তিনি ফিরবেন। ২৩ এপ্রিল তাঁর ঢাকা ফেরার কথা। দেশে ফিরে তাঁর বিরুদ্ধে আনা মামলার মোকাবিলা করবেন বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। ফেরার পথে লন্ডনে তাঁর যাত্রাবিরতির কথা ছিল।

১৮ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে ২৩ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। প্রেসনোটে বলা হয়, তাঁর ফিরে আসা দেশের আইনশৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, জননিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন বিবিসিকে বলেন, প্রেসনোটের বক্তব্য হচ্ছে হাসিনার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে একধরনের নিষেধাজ্ঞা। মইনুল বলেন, 'তাঁকে বারবার অনুরোধ জানানো হয়েছে, এখন আপনার দেশে ফেরার প্রয়োজন নেই। আপনি সময় নিয়ে আসুন। এখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। তারপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যেসব বক্তব্য দিয়ে আসছেন, এটি এখানে একধরনের উসকানির সৃষ্টি করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তিনি একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসছেন।'

দেশে চলে এলে কী হতে পারে, বিবিসির এমন প্রশ্নের জবাবে মইনুল বলেন, 'আমরা এয়ারলাইনসগুলোকে অনুরোধ করেছি তাঁকে না নিয়ে আসার জন্য।'[৩]

সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হাসিনা ২৩ এপ্রিল ঢাকা ফেরার ঘোষণা দিয়ে ১৯ এপ্রিল বিকেলে লন্ডনে পৌঁছান। ২০ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের 'অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের' (এপিপিজি) সঙ্গে তিনি দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেন। বৈঠকে হাউস অব লর্ডসের নেতা ব্যারোনেস ইমোস, ব্যারোনেস জেনিটাং, ব্যারোনেস রয়াল লর্ড এভবারি, ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। ব্যারোনেস মঞ্জিলা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এপিপিজি বাংলাদেশের বন্ধু। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারমূলক কাজগুলো সমর্থন করে, আবার একই সঙ্গে শেখ হাসিনার বক্তব্যের ব্যাপারেও তারা সচেতন।[৪]

এর আগে ১১ এপ্রিল ২৮ অক্টোবর (২০০৬) পল্টনে সহিংসতার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ১৪ দলের ৪৬ জন নেতা-কর্মী এবং জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে অভিযোগপত্র দিয়েছিল মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। ২২ এপ্রিল ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

শেখ হাসিনা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে ঢাকা ফিরতে চাইলে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে তাঁকে বোর্ডিং পাস দেওয়া হয়নি। ২৪ এপ্রিল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ব্যবস্থাপক জেমস ফরস্টার এক লিখিত ব্যাখ্যায় বলেন, বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি লিখিতভাবে জানানোয় তাঁকে বোর্ডিং পাস দেওয়া হয়নি।[৫]

এপ্রিলের (২০০৭) প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল যে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দেশত্যাগ করবেন। ৮ মার্চ বড় ছেলে তারেক রহমান গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর তিনি মুষড়ে পড়েন। তাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—বিভিন্ন মহল থেকে এমন কথা উঠলে তিনি বিষয়টি মোটামুটি মেনে নেন। ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো গ্রেপ্তার হতে পারেন—এমন আশঙ্কাও ছিল। বিএনপির কয়েকজন নেতাকে তিনি বলেছেন, ছেলেরা অভিযুক্ত হবে, দলের নেতা-কর্মীরা জেলে থাকবে, আর তিনি বিদেশে বসে থাকবেন—এর কোনো মানে হয় না।[৬]

১৮ এপ্রিল গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, খালেদা জিয়া ছোট ছেলে আরাফাত ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সৌদি আরব যাচ্ছেন। এর

আগেই আরাফাতকে গভীর রাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আটক করেছিল। খালেদা বিদেশে যেতে রাজি হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দলের অনেকেই মনে করেন, খালেদাকে বিদেশে পাঠাতে চাপ সৃষ্টি করতেই আরাফাতকে আটক করা হয়েছিল। খালেদা স্বেচ্ছায় গেলে সৌদি সরকার তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি আছে বলে আগে থেকে আলোচনা ছিল।[৭]

২১ এপ্রিল তারেক রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়। যাওয়ার পথে তাঁকে মা ও স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়। ২২ এপ্রিল রাতে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহ জানিয়ে দেন, 'খালেদা জিয়া সৌদি আরবে যাবেন না। তিনি যেকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে তৈরি, তবু দেশ ছাড়বেন না।' এদিকে তাঁর সৌদি আরবে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তিনি ভিসা পাননি। পরে ঠিক হয়, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কয়েক সপ্তাহের জন্য তিনি সিঙ্গাপুর যাবেন। সব প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও ছেলে আরাফাতকে তাঁর সঙ্গে সিঙ্গাপুর যাওয়ার অনুমতি দেয়নি সরকার। বরং তাঁর বিরুদ্ধে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার চাঁদাবাজির একটি মামলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়া তাঁর সিঙ্গাপুর যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দেন।[৮]

শোনা যায় যে পরিবারের সবাই সৌদি আরবের ভিসা পেলেও খালেদা জিয়াকে ভিসা দেওয়া হয়নি। পরে তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনো দেশে পাঠানোর চেষ্টা হলেও সেটি সফল হয়নি।

২৩ এপ্রিল দেশের ১৪ জন বিশিষ্ট নাগরিকের সই করা এক বিবৃতিতে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের একজন নেত্রীকে দেশে ফিরতে বাধা দেওয়ার এবং আরেকজন নেত্রীকে জোর করে দেশত্যাগে বাধ্য করার সমালোচনা করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট ও চরম দুর্নীতির জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকেন, তাঁদের আইনি প্রক্রিয়ায় বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোটা দেশবাসী কামনা করে, আইনবহির্ভূত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নয়। বিবৃতিতে সই দেন কবীর চৌধুরী, কে জি মুস্তাফা, কলিম শরাফী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, ফয়েজ আহ্‌মদ, আতাউস সামাদ, হামিদা হোসেন, সৈয়দ শামসুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, আনোয়ারা সৈয়দ হক, মমতাজউদদীন আহমদ ও ফেরদৌসী মজুমদার।

দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও শীর্ষ রাজনীতিবিদকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার বা দেশের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলার একটি চেষ্টা

হচ্ছিল। এটা পরে গণমাধ্যমে এবং জন-আলোচনায় 'মাইনাস টু' নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়।[৯]

'মাইনাস টু' চিন্তাটি হঠাৎ করে আসেনি। শুরু থেকেই এক-এগারোর কারিগরদের মাথায় এটা ছিল। এ নিয়ে তাঁরা রাজনীতিবিদসহ সমাজের অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছেন, তাঁদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু তথ্য পাওয়া যায় জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কাছ থেকে। লেখকের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেন :

মহিউদ্দিন আহমদ : এক-এগারোর সময় আপনার অবস্থান কী ছিল? ওদের সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ বা কথাবার্তা হয়েছিল?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী : যোগাযোগ হয়েছিল ১০-১৫ দিনের মধ্যেই। চা খেতে ডাকল।

মহিউদ্দিন : কে ডাকল?

জাফর : ব্রিগেডিয়ার বারী।

মহিউদ্দিন : আগে পরিচয় ছিল?

জাফর : না। আমাকে হয়তো নামে চিনত। সে নাকি ছাত্র ইউনিয়ন করত। আমি যেদিন গেলাম, সেদিন আবুল মাল আবদুল মুহিত তাকে ফোন করেছিল। কাউকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তদবির। এই আমার প্রথম পরিচয়। তারপর আমিন ঢুকল।

মহিউদ্দিন : এটা কি ডিজিএফআই অফিসে?

জাফর : হ্যাঁ। ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে হাতের বাঁ দিক দিয়ে গেলে। আমি জানতাম না এখানে এত বড় একটা অফিস আছে। জীবনে আমি সিকিউরিটির দুইটা অফিস দেখেছি, খুব ইনোসেন্ট-লুকিং। একটা হলো এটা। আরেকটা হলো কার্জন হলের কোনায়, যেটাতে সাবেক মন্ত্রী ভবানীশংকর বিশ্বাস থাকতেন। সেখানে আমাকে কয়েকবার হাজিরা দিতে হয়েছে।

বারীকে প্রথম দেখলাম। খুব ইমপ্রেস করার চেষ্টা করল। দেশে দুর্নীতির কথা ওঠাল। পলিটিশিয়ানদের কথা ওঠাল। দু-তিনবার দেখা হয়েছে। খুবই ভদ্র।

মহিউদ্দিন : দু-তিনবার ওখানেই গেছেন?

জাফর : ওখানেই। চা-টা খাওয়াত। ফোন করত। তখন তাদের প্ল্যান বলল। দেশে গণতন্ত্র... । আমি বললাম, আপনারা কেমনে গণতন্ত্র করবেন? আপনারা তো সরকারি চাকরি করেন? তাদের আইডিয়া হলো,

বলল, মাথা ঠিক থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হাসিনা আর খালেদাকে বাদ দিতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, এটা একদম ভুল কাজ। আমার বাড়ির বাপকে আপনি বাদ দিবেন কীভাবে? এ দায়িত্ব তো আপনাদের হতে পারে না! আপনারা ভুল পথে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, সংশোধন হওয়া দরকার। আপনারা চেষ্টা করেন। তাঁদের দলের ভেতরে কথা বলা, ভোট হয় কি না, দেখেন। কিন্তু বাদ দেওয়া হবে একদম ভুল সিদ্ধান্ত। প্রতিবারই তারা এ কথা ওঠাত। বোধ হয় তারা টেস্ট করছে, এটা করলে পাবলিকের রিঅ্যাকশন কী হবে।[১০]

২৪ এপ্রিল শেখ হাসিনার পক্ষের আইনজীবীরা তাঁর দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে জারি করা প্রেসনোটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ ও তাঁর দেশে ফেরার বাধা দূর করার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদনের অনুমতি চান। হাইকোর্ট ২৬ এপ্রিল রিট দায়েরের অনুমতি দেওয়ার কথা জানিয়ে ২৯ এপ্রিল এর ওপর শুনানি হবে বলে জানান।[১১]

কিন্তু তার আগেই সরকারি সিদ্ধান্ত পাল্টে যায়। ২৬ এপ্রিল বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে চারজন উপদেষ্টা ও উচ্চপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার দেশত্যাগের ব্যাপারে কোনো সরকারি চাপ নেই এবং তাঁর চলাচলে কোনো বিধিনিষেধ নেই বলে জানানো হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা দুটি আলাদা প্রেসনোটে এ কথা বলা হয়। আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন বলেন, 'বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত যদি কেউ ভুল মনে করেন, তবে ইতস্তত না করে সে ভুল সংশোধন করে সরকার সাহস দেখিয়েছে'।[১২]

২৭ এপ্রিল একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে তিনি বলেন, দুই নেত্রী দেশের ভেতরে না বাইরে থাকবেন, সরকার সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে না। বরং এ দুই দলের নেতারাই চেয়েছিলেন যেন দুই নেত্রী দেশের বাইরে থাকেন। এতে তাঁদের জন্য দল সংস্কার করা সহজ হবে।[১৩]

শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ও আসার পথে দুবারই লন্ডনে থেমেছেন। যাওয়ার পথে তিন ঘণ্টার জন্য এবং ফেরার পথে বেশ কয়েক দিন। লন্ডনে তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানার সঙ্গে দেখা এবং কথা বলাই ছিল তাঁর যাত্রাবিরতির উদ্দেশ্য। কিন্তু যাওয়ার সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে উষ্ণ আচরণ ছিল, ফেরার সময় তা হয়ে পড়ে শীতল। ওই সময় লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলেন শফি ইউ আহমেদ। এর আগে তিনি

কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলেন। সেখানেই জেনারেল মইনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁকে লন্ডনে পোস্টিং দেওয়া হয়। লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি লন্ডনে শেখ হাসিনার যাত্রাবিরতি সম্পর্কে বলেন :

মহিউদ্দিন আহমদ : একবার শেখ হাসিনাকে তো লন্ডন থেকে ফেরার সময় প্লেনে উঠতে দেয় নাই। শি ওয়াজ নট অ্যালাউড টু রিটার্ন। কয়েক দিন ছিলেন লন্ডনে।

শফি ইউ আহমেদ : হ্যাঁ, যাওয়ার সময়টায় আই ওয়াজ ইনস্ট্রাকটেড বাই ফরেন অ্যাডভাইজার, শি উড পাস থ্রু, সিম্পলি ট্রানজিট থ্রু লন্ডন। ইউ আর অ্যাডভাইজড টু গো। রিসিভ করে মেক সিয়োর দ্যাট শি গোওজ টু আমেরিকা। অ্যাকর্ডিংলি আমি গেলাম। ঘণ্টা দুই-তিন ছিলেন। তারপর উনি চলে গেলেন।

মহিউদ্দিন : আপনি প্রটোকল দিলেন?

শফি : হ্যাঁ, আমি গেলাম। আই রিসিভ্ড। ওখানে তো ওঁর বোন থাকে। আমাকে বলা হলো, দিস ইজ হার নাম্বার, কনট্যাক্ট হার। ওনলি শি উইল গো। নোবডি এলস। মানে পার্টির কোনো লোকজন না। আমার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল তাঁর (রেহানার)। বললাম আমি তো আসছি। ইচ্ছা করেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনি। বিকজ আই অ্যাম আন্ডার সার্ভিল্যান্স। আই হোপ ইউ ডু রিয়েলাইজ। এখন আপনাকে ফোন করলাম। আই হ্যাভ দ্য ক্লিয়ারেন্স। উনি (হাসিনা) আসতেছেন। চলে যাবেন। আপনাকে নিয়ে যাব আমি। তো আপনি চলে আসেন। এয়ারপোর্টে উনি দু-তিন ঘণ্টা ছিলেন। তারপর চলে গেলেন। পরেরবার আমাকে আর যাইতে বলে নাই। আমি অ্যাকচুয়েলি এই গভমেন্টের ব্রিফের বাইরে যাই নাই। কারণ হইল, ইউ নেভার নো। আপনি তো একটা গভমেন্টের সেটআপের মধ্যে, তাদের ব্রিফের মধ্যে কাজ করেন। সেকেন্ড টাইম আই ওয়াজ গিভেন দ্য ইমপ্রেশন নট টু গো। প্রথমবারের যাওয়াটাই বিভিন্ন মহল থেকে—কে দিল, কে বলল, এই সব প্রশ্ন আসতেছে। অথরিটি তো হলো বিভিন্ন চ্যানেলের। আমাকে হয়তো বলছে চিফ বা ফরেন অ্যাডভাইজার। ডিজিএফআই চ্যানেল ওয়াজ পসিবলি নট ইনফরমড। দে অয়ার রেইজিং কোয়েশ্চেনস। মিশনে ডিজিএফআইয়ের লোক আছে তো? সেকেন্ড টাইম উনি যখন পাস করেন, অনেক নাটক-টাটক হইছে। ওদের একটা অ্যাপ্রাইজাল ছিল। ব্রিটিশদের অ্যাপ্রাইজাল

ছিল, ভারবালি তারা বলছেও, প্লাস দে অয়ার সাপোর্টিং দ্য গভমেন্ট ইন অল ডিফারেন্ট ফর্মস।[১৪]

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞার সময় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া লন্ডনে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার কমলেশ শর্মাও তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। হাসিনা এ সময় ব্রিটিশ এমপি রবার্ট উইলসন, অ্যান মেইন ও কিথ ভাজ এবং কমনওয়েলথ মহাসচিবের সঙ্গে দেখা করেন। এ ছাড়া তিনি সিএনএন, বিবিসি, আল-জাজিরাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেন।[১৫]

ভারতীয় টিভি চ্যানেল সিএনএন-আইবিএন-এর সুমন চক্রবর্তীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনা করে হাসিনা বলেন, সেনাশাসন বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ঢাকার একটি পত্রিকায় পিটিআই-এর সূত্র ধরে ২১ মে ছাপা হওয়া এই সাক্ষাৎকারে হাসিনা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন বিলম্বিত করার জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, 'সংস্কারের নামে কালক্ষেপণ করা উচিত হবে না। সরকারের উচিত জনগণকে তাদের মনমতো সরকার গঠনের অনুমতি দেওয়া।'[১৬]

রাজনীতি এত দিন দুই প্রধান দল ও তাদের দুই নেত্রীকে নিয়ে ঘুরপাক খেত। এখন তাঁরা দুজনই বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। একদিকে চলছে রাজনীতিতে তাঁদের প্রভাব ছেঁটে ফেলার আয়োজন, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে এই দুই দলের বাইরে নতুন একটি 'শক্তিকেন্দ্র' তৈরির প্রক্রিয়া। ঢাকা থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটেনিসের ১৯ জুন ২০০৭ ওয়াশিংটনে পাঠানো এক তারবার্তায় বলা হয়, ডিজিএফআইয়ের পরিচালক ব্রি. জে. চৌধুরী ফজলুল বারী নতুন রাজনৈতিক দলের জন্য লোক জোগাড়ের কাজকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন এবং বিএনপির একজন সাবেক মন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী দলটির প্রায় ১০০ জন নেতা, যাঁদের বেশির ভাগই জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন, নতুন দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে বিএনপি থেকে পদত্যাগ করার তারিখবিহীন আগাম চিঠি জেনারেল বারীর কাছে জমা রেখেছেন। জানা গেছে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের ছোটখাটো নেতাদের নিয়ে ঢাকার কয়েকটি রেস্তোরাঁয় দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। এসব বৈঠকে অপেক্ষাকৃত পরিচিতদের মধ্যে আছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ এবং আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা ঢাকার সাবেক মেয়রের ছেলে সাঈদ খোকন।[১৭]

বিউটেনিসের বার্তায় বলা হয়, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২৭টি মামলা নিয়ে কাজ করছে দুদক। এর মধ্যে একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা আছে: ২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ওই সময়ের বিএনপি সরকার পদত্যাগ না করলে 'জনগণের চাপের' মধ্য দিয়ে সরকার উৎখাতের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ওই মামলা দায়ের করা হয়। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আছে দুটি মামলা; তার উদ্দেশ্য সম্ভবত শেখ হাসিনার সম্ভাব্য গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করা। বার্তায় খালেদা জিয়া সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সেনানিবাসের বাসায় বিচ্ছিন্ন দিন কাটাচ্ছেন এবং দলকে চাঙা রাখার চেয়ে পরিবারের সদস্যদের বাঁচাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। অন্যদিকে, দুটি চাঁদাবাজির মামলা আছে এই যুক্তি দেখিয়ে সরকার শেখ হাসিনার বিদেশ যাওয়া আটকে দিয়েছে। দুদক ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা গেছে, জামিনে থাকা সাঈদ খোকন এই মর্মে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে পারেন যে ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালের আগের দিন শেখ হাসিনার নির্দেশে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে রাস্তাঘাট থেকে দূরে রাখার জন্য বাসে আগুন দেওয়া হয়েছিল। তারবার্তার শেষে বিউটেনিস তাঁর মন্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতির প্রভাবশালী দুই নেত্রীকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার ত্রিমুখী আক্রমণ চালাচ্ছে : আদালতে মামলা, নতুন দল বানানো এবং দলীয় সংস্কারের উদ্যোগ। শেষ পর্যন্ত যদি তাঁদের সরে যেতেই হয়, তাহলে দলের মধ্যে যে শূন্যতা তৈরি হবে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়, অখ্যাত ও অজ্ঞাত কুশীলবদের নিয়ে তৈরি নতুন কোনো দল এই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না।[১৮]

শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে 'মাইনাস' করার পরিকল্পনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় ওয়াশিংটনে পাঠানো ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান গীতা পাসির একটি তারবার্তায়। ১৯ জুলাই ২০০৭ সকালে পাঠানো এই বার্তায় জানা যায় যে ডিজিএফআইয়ের সন্ত্রাসবাদ দমন বিভাগের প্রধান ব্রি. জে. এ টি এম আমিন ১৭ জুলাই সকালে মার্কিন দূতাবাসে এসে গীতা পাসিসহ কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে বলেন, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে সসম্মানে রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দুজনই সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ জন্য শেখ হাসিনাকে আগের দিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং খালেদা জিয়াকে শিগগিরই গ্রেপ্তার করা হবে।[১৯]

আমিনের বরাত দিয়ে বার্তায় বলা হয়, হাসিনার বিরুদ্ধে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র চুক্তি-সংক্রান্ত চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয়েছে। চুক্তিটি

পাওয়ার জন্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান ঘুষ দিয়েছিল। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের আমিন আরও বলেন, হাসিনার বিরুদ্ধে ১০-১১ জন মানুষকে হত্যার অভিযোগ আনা হবে; ২০০৪ সালে হাসিনা একটি বাস পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে ওই লোকগুলো মারা যায়। হাসিনার বিরুদ্ধে ২০টির মতো অভিযোগ আনা হতে পারে। আমিন বলেন, 'আমরা আশা করছি, প্রথম মামলাটি শিগগিরই আদালতে যাবে ১০ দিনের মধ্যে এবং শুরু হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে মামলাটির নিষ্পত্তি হবে।' আমিন আরও বলেন, ২০০৬ সালের অক্টোবরে রাজনৈতিক সহিংসতায় কয়েকজনের মৃত্যুর ব্যাপারে হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আমিন আশঙ্কা করেন, হাসিনার গ্রেপ্তারের ফলে সহিংসতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। তিনি স্বীকার করেন যে হাসিনার ছেলে জয় (যুক্তরাষ্ট্রে আছেন) মিছিল-সমাবেশ উসকে দিতে পারেন, তবে হাসিনার সমর্থনে কোনো ধরনের মিছিল-সমাবেশ না করতে কর্তৃপক্ষ সাবধান করে দিয়েছে। আর খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হবে 'সমতা সৃষ্টির' খাতিরে। খালেদা এটা জানেন এবং গ্রেপ্তারের জন্য তিনি তৈরি আছেন।[২০]

আমিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের 'রাজনৈতিকভাবে অপরিচিত' ফেরদৌস কোরেশীর 'কিংস পার্টি' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া সম্বন্ধে বলেন, কোরেশীর দল তৈরি হচ্ছে অন্যান্য দল থেকে বেরিয়ে আসা লোকদের নিয়ে এবং এটা নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি উৎস হবে; তবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বেশির ভাগ সমর্থক নিজ নিজ দলের সঙ্গেই থাকবেন। আমিন জানান, সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে সরকার শিগগিরই ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করবে, কেননা এটি হচ্ছে সহিংসতার একটি উৎস। তবে তিনি স্বীকার করেন যে এতে সমস্যা তৈরি হতে পারে, কেননা রাজনীতিবিদেরা ছাত্রজীবনেই রাজনীতি শেখেন এবং 'ছাত্ররাজনীতি ছাড়া হবু রাজনীতিকেরা পথ খুঁজে পাবেন না'। বার্তার শেষে গীতা পাসির মন্তব্যে বলা হয় :

> গত সপ্তাহে বাংলাদেশ 'নির্বাচনের রোডম্যাপ' ঘোষণা করে তাদের ওয়াদা পূরণ করেছে। এই ঘোষণা এবং শেখ হাসিনার গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করল। সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে উজ্জীবিত আমিনের কথা থেকে বোঝা যায়, সামরিক বাহিনী পরিকল্পনা তৈরি ও তার বাস্তবায়ন করছে এবং এর ফলাফলে তারা সন্তুষ্ট।[২১]

দলের মধ্যে শেখ হাসিনার অবস্থান কী হবে বা হওয়া উচিত, এ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে দুই ধরনের মত লক্ষ করা গেছে। সভাপতিমণ্ডলীর

সদস্য আমির হোসেন আমু ১ সেপ্টেম্বর ইস্কাটনে নিজের বাসায় সাংবাদিকদের বলেন, 'তাঁকে (হাসিনাকে) মনে রাখতে হবে যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে তিনি আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।' দলের সভাপতিমণ্ডলীর অন্য তিন সদস্য আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের দেওয়া সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গেও তিনি একমত বলে জানান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে এই সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেবে বলে শেখ হাসিনা যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা দলীয় সিদ্ধান্ত ছিল কি না জানতে চাইলে আমু বলেন, 'তিনি যা বলেছিলেন তা আলোচনা করে বলেননি। আবার আমেরিকায় গিয়ে দুই দিন পরে যা বলেছিলেন, তা-ও দলের সঙ্গে আলোচনা করে বলেননি। আমি এটাকে দলীয় সিদ্ধান্ত বলব না। তবে এই বছরের ৩ মার্চ সর্বশেষ কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আমরা এই সরকারকে সহায়তা দেব।'[২২]

একই দিন গুলশানে নিজের বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনমুখী দল ঠিকই, কিন্তু শেখ হাসিনাকে কারাগারে রেখে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবে না এবং দলে কোনো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে না। 'যোগ্যতা বিবেচনায় নয়, শেখ হাসিনা দলের সভানেত্রী হয়েছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে' আমির হোসেন আমুর এই বক্তব্যকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক বললেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, আমুর স্ত্রী অনেক দিন ধরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন। আমু দেশে না থাকার কারণে তিনি সবকিছু জানেন না বলেই এ ধরনের কথা বলেছেন।[২৩]

১২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক শেষে সংস্কারপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত মুকুল বোস, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, খ ম জাহাঙ্গীর, আবদুল মান্নান ও সাবের হোসেন চৌধুরী একদল কর্মীর হাতে লাঞ্ছিত হন। এ নিয়ে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে এক সদস্যের তদন্ত কমিশন তৈরি করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করার সময় সাজেদা চৌধুরী বলেন, 'হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো ঘটনাটি ঘটেছিল। ঘরোয়া রাজনীতি বন্ধ, এ কারণে মনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ না থাকলে আমিও হয়তো এমন ক্ষোভের শিকার হতে পারি।'[২৪]

মুকুল বোস প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'কারা গাড়িতে লাথি মেরেছে, নেতাদের লাঞ্ছিত করার চেষ্টা চালিয়েছে, তাদের চিনি না। তবে কারা এ কাজে ইন্ধন দিয়েছে তাদের চিনি।'[২৫]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ১৩ সেপ্টেম্বর বিবিসির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করার সময় আসবে। তবে তিনি মনে করেন, 'এখনো সে সময় আসেনি এবং তার হয়তো প্রয়োজনও নেই। কারণ এখন সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে, যেমন দলের সংস্কার, নির্বাচনী আইনের সংস্কার, নির্বাচনী বিধির সংস্কার। এ জন্য যতটুকু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রয়োজন, তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ঘরোয়া রাজনীতি উন্মুক্ত করার পর তারা এগুলো নিশ্চয় করতে পারবে।' সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যেসব কারণে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, তার সবগুলো এখনো দূর হয়নি।[২৬]

বিএনপির মধ্যে খালেদাবিরোধী মেরুকরণ ছিল বেশ জোরালো। এঁদের প্রধান নেতা ছিলেন দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। খালেদা জিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার দিন তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দলে মান্নান ভূঁইয়ার প্রভাবের বিষয়টি তাঁর অজানা ছিল না। খালেদা চেয়েছিলেন দলাদলি যতই থাকুক, মান্নান ভূঁইয়া যেন দল ভাগ না করে বা দলের নতুন কোনো কমিটি তৈরি না করে। তিনি সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে দূতিয়ালি করার ভার দিয়েছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে। ১৯৬০-এর দশকে জাফরুল্লাহ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা ছিলেন। লেখকের সঙ্গে আলাপচারিতায় জাফরুল্লাহ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন :

জাফরুল্লাহ চৌধুরী : বেগম খালেদা জিয়া একজনকে দিয়ে আমাকে ফোন করালেন। সরাসরি কথা বললেন।

মহিউদ্দিন আহমদ : উনি অ্যারেস্ট হওয়ার পর?

জাফর : হ্যাঁ। বললেন, আমার একটু উপকার করেন।

—আপনার উপকার আমি কীভাবে করব? আপনি কি আমাকে কিছু বানাইছিলেন?

আমার সঙ্গে খালেদা জিয়া সব সময় ভদ্র ব্যবহার করতেন। বললেন,

—আমাকে সবাই বলেছে, মান্নান ভূঁইয়া আপনার কথা শোনে।

—একদম ভুল কথা বলেছে আপনাকে। মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে আমার একটা কানেকশন আছে, সে ছাত্র ইউনিয়ন করেছে। আমি ভালো করেই চিনি। তবে আমাদের ইতিহাসের একটা ফানি ব্যাপার, সে ছাত্র

ইউনিয়নের সবচেয়ে স্মার্ট লোকটা না। সে-ই হাইয়েস্ট পদে গেল। আমরা সবাই খুশি।

—না, সে আপনার কথা শোনে।

—সে আমার জুনিয়র। আমার কথা শুনবে কেন?

—না আমার পক্ষ হয়ে বলেন, সে যেন পার্টি না করে।

—দেখি।

—না, আপনি আজই যান।

আমি আমার ধানমন্ডি অফিসে ছিলাম। মান্নান ভূঁইয়ার বাড়িতে গেলাম। এই প্রথম। দেখলাম, টেলিভিশন ক্যামেরার ছড়াছড়ি। আমি একটু বেকায়দায় পড়ে গেলাম। ও বলল,

—আপনি আসছেন? আপনি যোগ দেন।

—কিসের যোগ দেওয়া?

বুঝলাম, খালেদা জিয়ার ইনফরমেশন কারেক্ট ছিল। আর্মিওয়ালারাই তাঁকে ইনফরমেশন দিয়েছে। মান্নান ভূঁইয়া আমাকে দোতলায় নিয়ে গেল। বলল,

—আমি আপনাকে কয়েকবার খোঁজ করেছি জাফর ভাই। একটু পরামর্শ দরকার।

—তুমি আমাকে পাও নাই কেন? খবর পেলে তো আমি আসতাম?

লোকে লোকারণ্য। সেখানে অনেককে দেখলাম। নামী-দামি অনেককেই। আজ অনেকেই মৃত। তাঁদের নাম নাই-বা বললাম। শুধু মান্নান ভূঁইয়া পড়ে গেছে ফাঁদে। অন্য অনেকেই ছিলেন। আমাকে বলল,

—দেশের জন্য তো কিছু করতে হবে।

—অবশ্যই করতে হবে।

—এভাবে দেশ চলে না।

—অবশ্যই চলে না। তোমার সাথে কে আছে?

—সবাই আছে।

—তারা কই?

—দেশের বাইরে।

—আর্মিকে কত দিন ধরে চেনো?

—চিনি না তো।

—খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলো।

আমি আর বললাম না যে আমি তাঁর মিশনে এসেছি।

—ওনার সঙ্গে কোনো কথা বলা যায় না। উনি কথা শোনেন না।

—কথা বলা যায় না মানে? তোমরাও তো কথা বলো না? তোমার জন্য এটা খুব ভালো সময়।

—কী রকম?

—তুমি বলো ওনাকে।

—কী বলব?

—বলো যে দেখেন, আমি আপনাকে এত দিন সার্ভ করেছি। আপনি পার্টির একটা ভাইস চেয়ারম্যান বানাবেন, সাঈদ এস্কান্দারকে। আপনি আমাদের একবারও জিজ্ঞেস করলেন না? আজকে খালেদা জিয়াকে কবজার মধ্যে আনতে হবে, গণতান্ত্রিক উপায়ে।

—কীভাবে?

—তুমি বলো যে এটা ক্যানসেল করে দেন। করবেন কি করবেন না, জানি না। তবে তিনি এখন বেকায়দায় আছেন। আর তোমাদের জন্য একটা অপরচুনিটি হলো, পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র আনা। বলো যে আমরাই ওনাকে ভাইস চেয়ারম্যান বানাব। আমরা পার্টির মধ্যে আলোচনা করব। ভোট দিয়ে বানাব। তফাতটা হবে কী? আপনার প্রিয় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে আমরা বানাব, আপনি বানাবেন না।

—উনি কি শুনবেন?

—শুনবেন।

আমি বলিনি যে আমি খালেদা জিয়ার তদবির করতে এসেছি। আমার একটা বিশ্বাস হলো, পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রায়ণ দরকার। এই যে পার্টিগুলোর দুরবস্থা! কেউ কথা বলে না। একবার আওয়ামী লীগের এক নেতাকে বলেছিলাম, আপনাদের অবস্থা গ্রামের বাড়ির চাকরের চেয়েও খারাপ। চাকর একসময় বলে, এভাবে কাজ করব না, গেলাম গিয়ে। বলে, এ রকম একটা উদাহরণ দিলেন আপনি? আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রোথ হচ্ছে না বলে এত সব। মান্নান ভূঁইয়া বলল,

—সব তো ঠিক হয়ে গেছে।

—ঘোষণা দিয়ো না। এক সপ্তাহ সময় নাও।

সে এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিল। কিন্তু যেটা পারলাম না...। এদের মধ্যে সাহস জোগানো দরকার। এদের দুরবস্থা হলো... এই যে তারেক জিয়ার এই অবস্থা। অন্যরা যেভাবেই দেখুক, আমি তো দেখেছি, এত বেয়াদব ছিল না। এত দুর্নীতি ছিল না। আমাকে বলেছে, এরশাদ দেখা করতে গেছে, সে বসে ছিল। সে উঠে দাঁড়াল না। অথচ দেখেছি, আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেছে। কিন্তু একটা তরুণ যুবককে আমরা বারোটা

বাজিয়ে দিয়েছি।

যা হোক, ঘোষণা দেওয়া এক সপ্তাহ পেছাল মান্নান ভূঁইয়া। আমি খালেদা জিয়াকে বললাম, আপনার কাজ তো পুরাপুরি করতে পারলাম না। একটা কাজ করেছি। আজ ঘোষণা দেওয়ার কথা ছিল। ঘোষণা হয়নি।

মহিউদ্দিন : ফোনে বললেন?

জাফর : ফোনে। এ জন্যই উনি আমার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ। আর্মিই তো মান্নান ভূঁইয়াকে দিয়ে পার্টি বানিয়েছে। মান্নান ভূঁইয়া যদি রাজি হতো...তার সাহস ছিল না। আমি তো এদের দেখেছি। তারা কেউ কথা বলত না। এমনকি জিয়াউর রহমানের আমলেও, দু-একজন সিএসপি কথা বলত। এত সব পণ্ডিত ব্যক্তিরা কথা বলত না। যে কারণে জিয়ার মনে হতো, আমি অনেক জানি।

মান্নান ভূঁইয়া যে ভুলটা করল, যে জন্য তার পার্টির গ্রোথ হলো না। আর্মির কাজ ছিল তাকে একটা স্টুজ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।[২৭]

২৯ অক্টোবর রাতে গুলশানে সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের বাসভবনে দলের স্থায়ী কমিটির এক সভায় সাইফুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমদকে অস্থায়ী মহাসচিব করা হয়। একই সঙ্গে মান্নান ভূঁইয়া, সাবেক হুইপ আশরাফ হোসেন ও মফিকুল হাসান তৃপ্তির বহিষ্কারাদেশ অনুমোদন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাইফুর রহমান, মান্নান ভূঁইয়া, ড. আর এ গণি, চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ, এম শামসুল ইসলাম ও লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমান। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সভায় যাননি। জানা গেছে, মান্নান ভূঁইয়া মহাসচিবের দায়িত্ব পালনে রাজি না হওয়ায় তাঁর ঘনিষ্ঠজন হিসেবে মেজর হাফিজকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। সভা শেষে দলের সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের পড়ে শোনান সাইফুর রহমান। সিদ্ধান্তে বলা হয়, তাঁরা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল এবং তাঁর মুক্তির লক্ষ্যে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবেন।[২৮]

পরদিন বারডেম হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে খালেদা মনোনীত ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের কাছে স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, দলের চেয়ারপারসনের সিদ্ধান্ত ছাড়া স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডাকা যায় না এবং দলের গঠনতন্ত্রে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলে কিছু নেই। স্থায়ী কমিটির সভায় যোগদানকারী নেতাদের সম্পর্কে তিনি

বলেন, 'যাঁরা ওই বৈঠকে গিয়েছেন, তাঁরা নিজের ইচ্ছায় নাকি অন্য কারও ইচ্ছায় গেছেন, সেটিও দেখতে হবে। আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। বাধ্যতামূলক উপস্থিতি থেকে রেহাই পেয়েছি। কারণ, ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকলে আমাকেও বিশেষ কোনো চিঠিতে সই করতে হতো।'[২৯]

বিএনপিতে সংকট ছিল গোড়া থেকেই। কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরিবারতন্ত্র। জ্যেষ্ঠ নেতারা বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়ার ভয়ে অনেকেই মুখ খুলতেন না। এক-এগারোর দমকা হাওয়া সংকোচ আর ভয়ের দেয়ালটা ধসে দিল। দলের মধ্যে গণতন্ত্রায়ন লক্ষ্যে সোচ্চার হলেন অনেকেই।

এক-এগারোর পরপরই বিএনপির চারজন সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী একটি বৈঠকে বসেন। লক্ষ্য হলো সেনাসমর্থিত সরকারের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে কিছু একটা করা। লুৎফুজ্জামান বাবরের বাসায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত অন্য তিনজন হলেন কামরুল ইসলাম, আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং শাহজাহান উমর। মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিসের সঙ্গে বাবরের সম্পর্ক ভালো। বাবর অন্য তিনজনকে আশ্বস্ত করে বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাইয়ে দেবেন। দুদিন পর বাবরের বাসায় ডিনারের নিমন্ত্রণ পেলেন বিউটেনিস। পরে দুর্নীতির অভিযোগে বাবর এবং আলতাফ চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় এই প্রক্রিয়াটি আর এগোয়নি।

এক বিকেলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদের বাসায় টেলিফোন বেজে উঠল। অপর প্রান্তে নরসিংদীর আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম। মুক্তিযোদ্ধা নজরুল একসময় সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। নজরুল ফোনে হাফিজকে বললেন, 'আমরা আসছি।' একটু পরেই তিনি এলেন, সঙ্গে ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক মে. জে. গোলাম মোহাম্মদ, পরিচালক ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী ফজলুল বারী এবং আরও একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা। হাফিজ ও নজরুলের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক ছিল। আলাপ শুরু করলেন নজরুল। তাঁদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

নজরুল : পলিটিশিয়ানরা দেশের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা চলছে, তা আমাদের পছন্দ না। বিএনপির পারফরম্যান্সও ভালো না। দেশে এমন কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নাই যার পেছনে মানুষের সাপোর্ট আছে। আমরা, সেনাবাহিনী কিছুদিন দেশ চালাব বলে ঠিক করেছি।

হাফিজ : তোমরা কী করতে চাও?

নজরুল : আমরা দেশকে একটা সৎশাসন উপহার দেব, জিয়াউর রহমান যেমনটি করেছিলেন। জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা ভালোভাবে দেশ চালাব। ফেরদৌস কোরেশীকে দিয়ে একটা দল বানাব, জিয়া যেমন করে বিএনপি তৈরি করেছিলেন।

হাফিজ : ফেরদৌস কোরেশী তো এমপি ছিলেন না। মন্ত্রীও ছিলেন না। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। একসময় ছাত্রনেতা ছিলেন। একজন ভালো মানুষ। কিন্তু এ রকম অচেনা লোককে কোনো সিরিয়াস কাজে ব্যবহার করলে উল্টো ফল দিতে পারে। তার চেয়ে ভালো তোমরা বিএনপিকে ইনভলভ করো। বিএনপিও ক্যান্টনমেন্টের পার্টি। এখানে আরও লাইকমাইন্ডেড লোক আছে। তোমরা বিএনপিকে নিয়ে আগাও।

বারী : ১০৫ জন এমপি বিএনপি থেকে রিজাইন করে ফেরদৌস কোরেশীর দলে যোগ দেবে। তারা ইতিমধ্যে কাগজে সই করে দিয়েছে।

হাফিজ : ওই কাগজগুলো ফেরত দাও। ওর মধ্যে এদের নিয়ো না। এটা প্রচারও করো না। বরং তোমরা বিএনপির এই গ্রুপটাকে নিয়ে আগাও। এই মুহূর্তে বিএনপিকে ভাঙা ঠিক হবে না।

হাফিজের সঙ্গে আলাপের পর ওরা বিএনপির ওই ১০৫ জনকে নিয়ে আর এগোয়নি। তবে বিএনপিকে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার একটা চিন্তা ছিল তাদের। তারা জানাল, এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। হাফিজের বাসায় বসে তারা মান্নান ভূঁইয়াকে ফোন করে ডেকে আনল।

মান্নান ভূঁইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাফিজের সতীর্থ ছিলেন। ভূঁইয়া পড়তেন ইতিহাস এবং হাফিজের বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। তখন পরিচয় ছিল না। হাফিজ খেলাধুলা নিয়েই থাকতেন। ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলতেন। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় ছিলেন। কখনো রাজনীতিতে জড়াননি। অন্যদিকে, ভূঁইয়া ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা, দলের সাধারণ সম্পাদক।

মান্নান ভূঁইয়া দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর নারাজ ছিলেন। বিশেষ করে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের ওপর ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। তারেক পদে পদে ভূঁইয়াকে মহাসচিবের দায়িত্ব পালনে বাধা দিতেন। অনেক সময় নিজেই কমিটি বানিয়ে সই করার জন্য ভূঁইয়ার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। মহাসচিব হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পেরে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। যেহেতু তারেকের মা প্রধানমন্ত্রী এবং অনেক মন্ত্রীও তারেকের পক্ষে এবং তাঁরা

হাওয়া ভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, সলাপরামর্শ করেন, এ কারণে ভূঁইয়া একপর্যায়ে এসে বিদ্রোহ করে বসেন। তাঁর অনুগত কয়েকজন সংসদ সদস্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন।

মান্নান ভূঁইয়া চান, কেউ দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। হাফিজের মত হলো, বেগম জিয়াকে এভাবে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। বরং বলা যেতে পারে, দুবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হবেন না—এটা ঠিক করবে দল।

ভূঁইয়া ইতিমধ্যে তাঁর সংস্কার প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে ফেলেছেন। হাফিজের বাসায় তাঁরা আরও দুদিন বৈঠক করেন। ওইসব বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা কামাল ইবনে ইউসুফ, ওসমান ফারুক, মাহবুবুর রহমান ও এম কে আনোয়ার। দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকা প্রসঙ্গে তাঁরা একমত হন যে এ দুবার কখন থেকে গণনা করা হবে, তা দলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে। তাঁদের চাপে মান্নান ভূঁইয়া প্রস্তাবটি পরিমার্জন করতে রাজি হন এবং সংবাদ সম্মেলনে সংশোধিত প্রস্তাবটিই উত্থাপন করবেন বলে কথা দেন।

পরদিন মান্নান ভূঁইয়ার বাসায় সংবাদ সম্মেলন। পরিমার্জিত প্রস্তাবটি ওসমান ফারুক লিখে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক হলো। মানান ভূঁইয়া জানালেন, দেরি হয়ে গেছে। প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে টাইপ করা হয়ে গেছে। তবে সংবাদ সম্মেলনে তিনি সংশোধনীটি মৌখিকভাবে উল্লেখ করবেন। এম কে আনোয়ার তো ঝানু আমলা। তিনি বুঝে ফেললেন যে এর মধ্যে গোমর আছে। হাফিজকে তিনি বললেন, 'আমি আর সেখানে যাচ্ছি না। যেহেতু এটা অ্যামেন্ড করে নাই, আই অ্যাম গোয়িং ব্যাক। আপনাকেও বলি, আপনিও এর মধ্যে যাবেন না।'

এম কে আনোয়ারকে ছাড়াই অন্যরা গেলেন মান্নান ভূঁইয়ার বাসায়। দোতলার ড্রয়িংরুমে বসেছেন সবাই। নিচতলায় সংবাদ সম্মেলন। সম্মেলনে ভূঁইয়া তাঁর সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তবে সংশোধনীর উল্লেখ করলেন না।

ওখানে বিএনপির প্রবীণ নেতা সাইফুর রহমানও ছিলেন। তিনি আবার কামাল ইবনে ইউসুফের বেয়াই। সাইফুরের মনেও ক্ষোভ ছিল। তবে তাঁর ক্ষোভ মান্নান ভূঁইয়ার ওপর বেশি। গত জোট সরকারের আমলে জাতীয় সংসদে তিনি সংসদ নেতা খালেদা জিয়ার পাশের আসনে বসতেন। পাঁচ বছরেও তাঁকে সংসদের উপনেতা করা হয়নি, যদিও তিনি এটি প্রত্যাশা করতেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরী তখন আর দলে নেই। তিনিই সবার

সিনিয়র। তিনি মনে করতেন, মান্নান ভূঁইয়ার আপত্তির কারণেই তাঁকে উপনেতা করা হয়নি।

২৯ অক্টোবরের সভায় কয়েকজনকে সেনাবাহিনীর লোকেরা রীতিমতো ধরে এনেছিল। রাত বারোটার সময় ওখান থেকে ব্রিগেডিয়ার বারী টেলিফোনে হাফিজকে জানালেন, সাইফুর রহমানকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং হাফিজকে অস্থায়ী মহাসচিব করা হয়েছে। সাইফুর রহমান বলেছেন, মান্নান ভূঁইয়া মহাসচিব থাকলে তিনি দলের দায়িত্ব নেবেন না। তাঁর দাবি, ভূঁইয়াকে সরিয়ে হাফিজকে যেন মহাসচিব করা হয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা হাফিজকে পছন্দ করেন। তাঁরা হাফিজকে বলেছেন, 'এ আর্মি তো আপনারাই বানিয়েছেন। আপনারা আমাদের ফাদার ফিগার। আপনারা দায়িত্ব নিয়ে সব ঠিকঠাক করেন।'

বিএনপির সাইফুর-হাফিজ কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে অনুষ্ঠেয় সংলাপে তাঁদের কমিটিকে দাওয়াত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। মেজর হাফিজের সই করা একটি চিঠি ৩১ অক্টোবর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে পৌঁছে দেন বিএনপি নেতা মাহবুবুর রহমান।[৩০]

২ নভেম্বর বিএনপির ১০৬ জন সাবেক সাংসদ এক যৌথ বিবৃতিতে সাইফুর-হাফিজ নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের আস্থার কথা জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, মাহবুবুর রহমান, সাদেক হোসেন খোকা, এম ওসমান ফারুক, রেজাউল করিম, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, রেজাউল বারী ডিনা, মোশারেফ হোসেন শাজাহান, লুৎফর রহমান খান আজাদ, মে. জে. (অব.) মাহমুদুল হাসান, এহছানুল হক মিলন, মইনুদ্দীন ভূঁইয়া, গৌতম চক্রবর্তী, বিচারপতি মোজাম্মেল হক, জি এম সিরাজ, কবির হোসেন, নাজিমউদ্দিন আলম, ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর, শামসুল আলম প্রামাণিক, আবদুল মান্নান তালুকদার প্রমুখ। এদিকে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহ অভিযোগ করে বলেন, জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন মেজর হাফিজ।[৩১]

পরদিন ৩ নভেম্বর বিএনপির ১৯ জন সাবেক সাংসদের নামে একটি বিবৃতিতে অস্থায়ী মহাসচিব হিসেবে খোন্দকার দেলোয়ারের প্রতি আস্থা জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এম কে আনোয়ার, ব্যারিস্টার আমিনুল হক, মঈন খান, মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, মজিবর রহমান মনজু, নাদিম মোস্তফা, হারুনুর রশিদ খান মুন্নু, মিজানুর রহমান সিনহা, মুশফিকুর রহমান, আবু হেনা, উকিল আবদুস সাত্তার, সাঈদ এস্কান্দার, জিয়াউল হক জিয়া ও

আবুল খায়ের ভূঁইয়া। এ ছাড়া আগের দিন সাইফুর-হাফিজ কমিটিকে সমর্থন জানিয়ে যাঁরা বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে নাজিমউদ্দিন আলম, এহছানুল হক মিলন, শাহজাহান ওমর, শামসুল আলম প্রামাণিক ও আবদুল মান্নান তালুকদার মত পরিবর্তন করে খোন্দকার দেলোয়ারের প্রতি আস্থা জানান।[৩২]

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ধারাবাহিক সংলাপে বসার কথা। কিন্তু বিএনপির কোন গ্রুপকে ডাকা হবে এ নিয়ে কমিশন ধন্দে পড়ে যায়। কমিশন ৫ নভেম্বর মেজর হাফিজকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়, সংলাপ হবে ২২ নভেম্বর। এই চিঠিতে বিএনপির মূলধারা হিসেবে সাইফুর-হাফিজের নেতৃত্বাধীন অংশকেই বোঝানো হলো।[৩৩]

মেজর হাফিজের অনুকূলে দেওয়া সংলাপের চিঠি প্রত্যাহারের আহ্বান জানান চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হান্নান শাহ। ৬ নভেম্বর রাতে হান্নান শাহ গ্রেপ্তার হন।[৩৪]

৭ নভেম্বর বিএনপি-ঘোষিত 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে' চন্দ্রিমা উদ্যানে জিয়ার সমাধিতে ফুল দেওয়া নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়। সংস্কারপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত জেনারেল মাহবুবুর রহমান লাঞ্ছিত হন, সাদেক হোসেন খোকা ও মে. জে. (অব.) জেড এ খানকে ধাওয়া করা হয়।[৩৫]

১৩ নভেম্বর খালেদা জিয়া নির্বাচন কমিশন বরাবর একটি উকিল নোটিশ পাঠান। নোটিশে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন তাড়াহুড়ো করে মেজর হাফিজকে সংলাপে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছে, তা অবৈধ ও আইনি প্রক্রিয়ার লঙ্ঘন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই চিঠি বাতিল বা প্রত্যাহার করা না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নোটিশে আরও বলা হয়, মেজর হাফিজকে চিঠি দেওয়ার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন অজুহাত হিসেবে 'ডকট্রিন অব নেসেসিটির' কথা উল্লেখ করেছে, যা এই ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[৩৬]

পুলিশ প্রশাসন স্পষ্টতই সাইফুর-হাফিজ কমিটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল। এর আগে ১০ সেপ্টেম্বর খোন্দকার দেলোয়ারের নেতৃত্বে একদল নেতা-কর্মী বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে উঠে যেতে বাধ্য হন। ১৪ নভেম্বর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাদাপোশাকধারী সদস্যদের কড়া পাহারায় সাদেক হোসেন খোকা সকাল ১০টায় কয়েক শ নেতা-কর্মীকে নিয়ে দলের অফিসে ঢোকেন। এরপর মেজর হাফিজ যান আরও কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে। বেলা সাড়ে ১১টায় অফিসে ঢোকেন সাইফুর রহমান। আশপাশে দেলোয়ারপন্থীরা কেউ ছিলেন না।[৩৭]

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানিয়ে দেন, মেজর হাফিজকে দেওয়া সংলাপের চিঠি প্রত্যাহার করা হবে না।[৩৮] তবে খালেদা জিয়ার পক্ষে রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ১৮ নভেম্বর হাফিজকে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের চিঠির কার্যক্রম স্থগিত করে দেন।[৩৯]

ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে হাফিজ, মাহবুবুর রহমান, কামাল ইবনে ইউসুফ এবং ফজলুল আজিম আরও কয়েকবার বৈঠক করেছেন। জেনারেল মইনের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক হয়নি। টেলিফোনে কয়েকবার কথা হলেও সিরিয়াস কোনো আলোচনা হয়নি। বেগম জিয়ার সঙ্গে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা দেখা করেছিলেন। বেগম জিয়া সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। ফলে এ আলোচনা আর এগোয়নি। এ ছাড়া সাইফুর রহমান এবং জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমানও দেখা করে কথা বলেছেন। খালেদার সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিনই সাইফুর রহমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দেন। এর কিছুদিন পর মান্নান ভূঁইয়া গ্রেপ্তার হন এবং সাইফুর রহমান গ্রেপ্তার এড়াতে সিঙ্গাপুর চলে যান। তাঁর এক ছেলে আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং আরেক ছেলে গ্রেপ্তার এড়িয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল। বিনা বাধায় সাইফুর রহমানের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনের সহযোগিতা ছিল বলে গুঞ্জন ছিল। সাইফুর রহমান অর্থমন্ত্রী থাকাকালে ফখরুদ্দীনকে ওয়াশিংটন থেকে ডেকে এনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বানিয়েছিলেন।

বিএনপির বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যকার ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্বয়ং খালেদা জিয়া। একদিন সকালে তাঁর একটি বার্তা নিয়ে তাঁর আইনজীবী নওশাদ জমির হাজির হন হাফিজ উদ্দিন আহমদের বাসায়। নওশাদ স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকারের ছেলে। বার্তায় বলা হয়েছিল, হাফিজ এবং খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন যেন যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে সবাইকে বলে দেন যে তাঁরা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আছেন। হাফিজ নওশাদকে বলেন, তিনি রাজি এবং স্পিকার যেন দেলোয়ারকে এটা জানিয়ে দেন। হাফিজ একদিন ফোন করে সটান চলে যান দেলোয়ারের কাছে। দেলোয়ারের বাসার ওপরতলায় একজন সংসদ সদস্যের বাসায় তাঁরা এক ঘণ্টা বৈঠক করেন। দেলোয়ার হাফিজকে বলেন, 'আপনি আর্মির সঙ্গে ভালোভাবে বার্গেইন করেন যাতে তারা বিএনপিকে নিয়েই আগায়।' হাফিজ বললেন, 'আমি চেষ্টা করছি। আপনিও কথাবার্তা সেভাবে বলবেন।'[৪০]

খালেদা জিয়ার বার্তা পাওয়ার পর ওসমান ফারুকের বাসায় বিএনপির দুই গ্রুপের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হয়। এক গ্রুপে ছিলেন হাফিজ, ওসমান ফারুক, কামাল ইবনে ইউসুফ এবং সাদেক হোসেন খোকা। অন্য

গ্রুপের পক্ষে ছিলেন হান্নান শাহ, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এবং নজরুল ইসলাম খান। তাঁরা পরদিন সকালে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন করার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। সেখান থেকে হাফিজ এবং হান্নান শাহ কথা বলেন দেলোয়ারের সঙ্গে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দেলোয়ার সংবাদ সম্মেলনে আসতে রাজি হননি। ঐক্য প্রক্রিয়ার এখানেই ইতি।

একপর্যায়ে এসে বিএনপির সংস্কারপন্থী নেতাদের উপলব্ধি হলো, তাদের কোনো পরামর্শেই সরকার কান দিচ্ছে না। মনে হলো, সরকার যেন আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকছে। হাফিজের ভাষ্যমতে, 'আমরা ভেবেছিলাম, সেনাবাহিনী থাকবে। তারা বিএনপিকে সাপোর্ট করবে। সেটা যখন তারা করল না, তখন দলের সাপোর্টও আমাদের ওপর থেকে সরে গেল। ধীরে ধীরে সবাই খোন্দকার দেলোয়ারের দিকে চলে গেল। মইনরা শেষের দিকে আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকল। তারা মনে করেছিল, এটা তাদের সেফ এক্সিট দেবে। তাদের আশঙ্কা ছিল, খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলে তাদের ছাড়বে না।'[৪১]

আওয়ামী লীগও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। ৪ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, আতাউর রহমান খান কায়সার, মতিয়া চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। তাঁরা প্রস্তাব দেন, নির্বাচন কমিশন বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা' হিসেবে স্বীকৃতি দিলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী পোস্টারে তাঁর ছবি ব্যবহার করবে না। তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে যেমন ভোটার তালিকার কাজে লাগানো হচ্ছে, তেমনি নির্বাচনের কাজেও ব্যবহার করা দরকার। এতে নির্বাচনের পরিবেশ যেমন ভালো হবে, তেমনি প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে এবং নির্বাচনে পেশিশক্তির ব্যবহার অনেক কমবে।'[৪২]

দলের গঠনতন্ত্র যা-ই থাক, দলীয় প্রধানই সর্বেসর্বা। ২৭ নভেম্বর এক আলোচনায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা কমিশনের নিবন্ধন পেতে দলগুলোর গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে গণতন্ত্রায়ণের পরিধি বাড়ানোর কথা বলেন। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেন :

রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক ধারা শুধু



নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপে গেলেন আওয়ামী লীগের নেতারা

সংযোজন করাই নয়, গণতন্ত্রের চর্চা প্রতিষ্ঠাও নিশ্চিত করা দরকার। আর এ জন্য নির্বাচন কমিশনকে আরও কঠোর হতে হবে। আমি মনে করি, এ জন্য রাজনৈতিক দল আইন সংশোধন করতে হবে। শুধু নিবন্ধন বন্ধ করা নয়, আরও কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখতে হবে। আর এ লক্ষ্যে আমরা বহুকাল ধরেই গলা ফাটাচ্ছি।[৪৩]

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সব সময়ই গণতন্ত্রের চর্চার অভাব আছে, কিন্তু আইন করে তা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তা ভেবে দেখতে হবে, বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন কীভাবে করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে।[৪৪]

এ সময় কয়েকটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। বিএনপির সাবেক নেতা ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী তখন একটি আলোচিত নাম। ফেরদৌস কোরেশীকে দিয়ে দল তৈরির আয়োজনটি হয়েছিল সামরিক গোয়েন্দাদের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে। সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা প্রশ্রয়ের বাইরে গিয়ে এটি হয়েছিল বলে মনে হয় না। পরে যে কারণেই হোক, সেনা নেতৃত্ব এর দায় আর বয়ে বেড়াতে চাননি। কোরেশীর দলও রাজনীতির বদ্ধ জলাশয়ে কোনো বুদ্বুদ সৃষ্টি করতে পারেনি। বিষয়টি উঠে এসেছে ওই সময় *প্রোব* ম্যাগাজিনের পারভেজ হালিমের ভাষ্যে :

বিকেলে বনানীর অফিসে যাই। সদ্য চুনকাম করা ঘিয়ে রঙের দোতলা বাড়ির সামনে গেটের বাইরে কয়েকজন সতর্ক দৃষ্টিতে পায়চারি করছেন। আমাদের দিকেও কড়া নজর। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই আরেক দৃশ্য। তালাবদ্ধ কলাপসিবল গেটের ভেতরে তিন-চারজন নিরাপত্তাকর্মী। মিলিটারি স্টাইলে কর্কশ গলায় একনাগাড়ে জানতে চান—কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন, কোথা থেকে এসেছেন ইত্যাদি। বললাম কোরেশী ভাইয়ের কাছে এসেছি। আবার প্রশ্ন—কোন কোরেশী? বললাম, আমরা সাংবাদিক। ওনার ইন্টারভিউ করব। এবার আরও কর্কশ জবাব—এখানে কোরাইশী নামে কেউ নেই। আমরা হতবাক, পরস্পর চোখের ইশারায় বাইরে বেরিয়ে আসি। কোরেশী ভাইকে ফোন করলে তিনি বলেন, আমি তো ভেতরেই আছি, দোতলায়। বললাম, ভাই, আপনাকে তো এঁরা কেউ চেনেন না।

মিনিটখানেকের মধ্যে সিভিল পোশাকে যিনি নিচে নেমে এলেন, তিনি একজন গোয়েন্দা সেনা কর্মকর্তা, আমার পূর্বপরিচিত। নিরাপত্তাকর্মীদের ধমক-টমক দিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন তিনি। কোরেশী ভাই ভদ্র মানুষ। অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, সরি। ইন্টারভিউ শেষে বিদায়ের আগে তাঁকে বলেছিলাম, ভাই, কলাপসিবল গেট আটকিয়ে রাজনৈতিক দল! জনগণ যদি অবাধে দলের কার্যালয়ে আসতে না পারে, তাহলে এ দলের রাজনীতি কাদের জন্য? তিনি কোনো জবাব দেননি। আসল ঘটনা, এ দলের গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল একটি গোয়েন্দা সংস্থা। এরপর ২২ জুন ২০০৭ কোরেশীর নেতৃত্বে প্রগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) আত্মপ্রকাশ ঘটে। তত দিনে অঙ্কের হিসাব পাল্টে যেতে থাকে। মইন ইউ আহমেদ আর পিডিপির সঙ্গে নিজেকে জড়ানিন। পিডিপিও রাজনীতিতে সাড়া জাগাতে পারেনি। কোরেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছাপার মাসখানেক পর আমরা কভারস্টোরি করেছিলাম, 'আনসারটেইন ফিউচার অব পিডিপি'।[৪৫]

ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর পর নতুন আরেকটি রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেন মে. জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। নতুন এই দলের নাম বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি। ৪ ডিসেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে প্রায় ২০০ লোকের উপস্থিতিতে ইবরাহিম ১৩ পৃষ্ঠার একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করে নিজেকে দলের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। এ অনুষ্ঠানেই জানা যায় যে কয়েক মাস আগে তৈরি হওয়া পিডিপির বিভিন্ন স্তরের ২৬ জন নেতা এই



বছরজুড়েই আলোচনায় ছিলেন 'কিংস পার্টি'র নেতা ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

দলে যোগ দিয়েছেন। ইবরাহিম তাঁর ভাষণে বলেন, 'ওয়ান-ইলেভেন আমাদের নতুনভাবে চিন্তা করার বা এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ওয়ান-ইলেভেনের মহানায়ক হচ্ছে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও এই দেশের জনগণ।' ইবরাহিম তাঁর তিনজন পরামর্শককে পরিচয় করিয়ে দেন। এ ছাড়া ১১ জন তাঁর এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। এঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন সামরিক বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা।[৪৬]

জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খান অনেক দিন চুপচাপ ছিলেন। এক-এগারোর পর তিনি একটু নড়েচড়ে বসেন। নির্বাচন সামনে রেখে তিনি তৈরি করেছিলেন 'সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন' নামে নতুন একটি সংগঠন। ওই সংগঠন থেকে 'সিরাজুল আলম খানের ১৪ দফা সংস্কার কর্মসূচি' বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার ঘোষণা দেওয়া হয়। দলের পক্ষ থেকে একটি লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়, 'এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে সিরাজুল আলম খান কর্তৃক উত্থাপিত ১৪ দফা রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশকে কাঙ্ক্ষিত সুশাসন ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।'[৪৭]

এ ধরনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় অনেক রাজনীতিবিদের

মধ্যেই। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা ওই সময় নিজ নিজ দলে শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তন চেয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা দলের সাধারণ নেতা-কর্মীদের একটি বড় অংশের সমর্থন পেয়েছিলেন।

বিএনপির মধ্যে যাঁরা সংস্কার চেয়েছিলেন, তাঁদের একজন হলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমান। রাজনীতিতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং একপর্যায়ে এসে তাঁর পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয়নি। ২০১৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই সময়ে দলের মধ্যকার অবস্থা, সংস্কার প্রক্রিয়া, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি খোলামেলা মন্তব্য করেন। সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> মাহবুবুর রহমান : জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বিএনপিতে যোগ দিই। তাঁকে ক্লোজলি দেখেছি। তাঁর যে সততা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং করাপশনের অ্যাগেইনস্টে সাংঘাতিক রকমের একটা জিহাদ, এগুলি আমাকে মুগ্ধ করে।
>
> আমি তো রিটায়ার করে গেলাম, ইলেকশন করলাম। কাজকাম করতেছি। জিয়াউর রহমানের যে স্পিরিটটা হুইচ প্রপেল্ড মি টু জয়েন দিস পার্টি, সেটা অ্যাবসেন্ট দেখলাম। আমার তখন খুব একটা ফ্রাসট্রেশন পিরিয়ড ছিল। হাইলি করাপশন, এখানে যারা কর্মী, তাদের মধ্যেও সাংঘাতিক রকম দুর্বৃত্তায়ন, গোটা দেশজুড়েই একটা দুর্বৃত্তায়ন। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ মোটেই নাই। এসব বিএনপি সম্পর্কে, রাজনীতি সম্পর্কে আমার আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে। আমার মতো করে আমি কাজ করতে পারিনি।
>
> বিশেষ করে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে আমি কিন্তু অল অ্যালং ফাইট করেছি। আর্মিতেও তাই, সব সময়েই। জিয়াউর রহমানের মধ্যে যে আদর্শিক চেতনাটা দেখেছি, জাতীয়তাবাদী পার্টি সম্পর্কে তাঁর যে ধ্যানধারণা, এগুলোর একটা অ্যাবসেন্স দেখছি।
>
> যে পিরিয়ডে ওয়ান-ইলেভেন হয়, আর্মির লোকজনই করে। এরা আমার পরিচিত, কথা ঠিক। চিফ অব স্টাফ ছিল মইন ইউ আহমেদ। আমি তাকে চিনতাম। মাসুদ উদ্দিন আমার সঙ্গে আর্মিতে চাকরি করেছে। দেখেছি সবাইকেই। আমারই ছাত্র, আমার আন্ডার কমান্ড। ওরা কিন্তু আমাকে কয়েকবার ডেকেছিল। আমি ওইভাবে তাদের কাছে ফরমালি যাইনি। আমার বাসায় এসেছিল। 'স্যার, এত দুর্বৃত্তায়ন, এত দুর্নীতি,

গণতন্ত্রের নামে সব হচ্ছে, গণতন্ত্র কোথাও নাই, এখান থেকে দেশটাকে পরিত্রাণ করতে চাচ্ছি।' আমি বললাম, এ কথা তো অনেকে আগে বলেছে। কেউ তো করতে পারেনি। বলে, 'না না, আমরা পারব স্যার।'

মহিউদ্দিন আহমদ : কে কে এসেছিল? নাম বলা যাবে?

মাহবুব : মোটামুটি যারা হোমরাচোমরা, সকলেই এসেছিল। নামটা আর না-ই বললাম। আমি বললাম, যদি করতে পারো, ভালো কথা দেশের মঙ্গল করবা, কল্যাণ করবা, গণতন্ত্র আনবা, করাপশন বন্ধ করবা, দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করবা, দ্য হোল কান্ট্রি উইল বি উইথ ইউ, উই আর অল উইথ ইউ। তোমরা আর্মি থেকে করবা, ভালো কথা। এই লেভেলেই আমি... । বলব না যে আমি মানা করেছি। কোনো কিছু আমি জানি না, এটা বলব না। যা ঘটছে, আমি বুঝতে পারছি, আমি জানছি। এর মধ্যে বললাম, তোমরা একা করলে তো পারবে না? ইউনিফাইড একটা শক্তি থাকা দরকার। এবং আর্মির বাইরে যে পলিটিক্যাল সাপোর্ট, সেটা কতটুকু উইন করতে পারবা, সেটাও একটা কথা। তখন এরা সাইফুর রহমান-টাইফুর রহমান এদের নাম বলতে গেল, আরও নাম বলল যারা যাচ্ছে। বলল, 'স্যার, আপনিও আছেন।' বললাম, হ্যাঁ, তোমরা যদি আনতে পারো ডেমোক্রেসি, দুর্নীতি থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারো, ভালো। যারা দুর্বৃত্তায়ন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের সবার ব্লেসিং ওদের উপর আছে। বিএনপিরও অনেকে তাদের সঙ্গে আছে। বললাম, এটাই যদি তোমাদের আদর্শ, তাহলে ঠিক আছে, আমরা সবাই আছি।

মহিউদ্দিন : ওদের মুভমেন্ট তো আরও আগে থেকেই শুরু হয়েছিল?

মাহবুব : হ্যাঁ। আর্মি তো বেশ ডিস্টার্বড হয়ে গিয়েছিল। আর্মি কমান্ডও করতে পারছিল না। আর্মির চেইন অব কমান্ড ভেঙে গিয়েছিল কিন্তু। বাইরে এত ক্যাওস, কেউ কাউকে মানে না, আন্দোলন হচ্ছে, আন্দোলন ঠেকাতে পারছে না, এসব তো হয়েছে। আওয়ামী লীগও বেশ শক্তিশালী দল। ওরা বলতে চাচ্ছে যে 'স্যার, যদি গভমেন্ট চেঞ্জ না হয়, তাহলে আমরা কত দিন এটাকে সামনে নিয়ে যাব? এ তো সম্ভব না, টু পারপেচুয়েট ইট ফর ইটারনিটি?' যাদের আপনি সিনে দেখছেন, তারা সবাই অ্যাকটিভলি কাজ করছে। তাদের ইনিশিয়ালি আদর্শিক একটা চেতনা ছিল। তারা চেয়েছিল দেশটাকে একটা ভালো পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে। তাদের অ্যাজেন্ডা ছিল গণতন্ত্রায়ণ, দুর্নীতিমুক্ত আর দুর্বৃত্তায়নমুক্ত একটা ভালো সিস্টেম দেশে নিয়ে আসা। কাজ হচ্ছিল। আমার মনে হয়, পরের দিকে ওদের মধ্য থেকে, দে কুড নট গিভ দেয়ার

ইনটিগ্রিটি অর ইউনিটি। অনেকে সাইড কেটে চলে গেছে, অথবা অন্যের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। ডিজিএফআই ওয়াজ ডিপলি ইনভল্ভড। ব্রিগেডিয়ার বারী, তাকে আমি দেখেছি। হি ইজ আ কমিটেড পারসন। ওর অনেস্টি, ইনটিগ্রিটি—কেউ বলতে পারবে না যে হি ওয়াজ আ ডিজঅনেস্ট ম্যান, যে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ করে। আরেকজন, কী নাম যেন?

মহিউদ্দিন : আমিন।

মাহবুব : আমিনকে আমি অতটা জানতাম না। আমার সঙ্গে কাজ করেছে। ওইভাবে চিনি। পরে দেখলাম, ওদের মধ্যেও এটা তারা রাখতে পারেনি। যেমন মাসুদ, মইন, এদের মধ্যেও একটা—সেপারেট সেপারেট মনে হলো। আইডিয়া ওয়াজ গুড অ্যান্ড দে কুড ক্যারি দ্য মেসেজ, অ্যান্ড দে অ্যাকসেপ্টেড ইট। বাট মে বি, দ্য ফেইলিওর ইজ, যেভাবে তারা শুরু করেছিল, সেটা তারা রাখতে পারে নাই। তারাও হয়তো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল। বোল্ডনেস, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ, এটা তারা রাখতে পারেনি। কমপ্রোমাইজ করে গেছে।

মহিউদ্দিন : যখন এটা তারা ক্যারি করতে পারল না, এবং একটা পর্যায়ে এসে দুই নেত্রীকে ছেড়ে দিল, তারপর আপনার অবস্থা কী হয়েছিল?

মাহবুব : না না, আমার কোনো খারাপ অবস্থা হয়নি। এরা ছেড়ে চলে গেল। বিএনপির ভেতরে সংস্কারবাদী-মারামারি হলো। আমার তো সংস্কারবাদী নাম হয়ে গেল। কিন্তু আমি জিয়াউর রহমানের নাম করে বলছি, আমি এখনো বলি, আই বিলিভ ইন সংস্কার। রিলিজিয়নে সবচেয়ে বড় সংস্কার এনেছিলেন হজরত মুহাম্মদ (দ.)। ইসলাম ওয়াজ আ সংস্কার ইন রিলিজিয়ন। চায়নার উত্থানটা আমি দেখে এসেছি, চেঞ্জ ডান বাই দেং শিয়াও পিং। ওরাও তো সংস্কারবাদী। এ রকম সংস্কারে আমি বিশ্বাস করি। হোয়াটএভার ইজ পজিটিভ ফর দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য পিপল, অফ কোর্স টু বি অ্যাকসেপ্টেড (বাই দেম), এখনো বলি। ইনিশিয়ালি আমার একটু অসুবিধা হয়েছিল। যা-ই হোক, দল আন্ডারস্টুড মাই পজিশন। দল মানে খালেদা জিয়া। তারেক স্টিল নট হ্যাপি উইথ মি।

মহিউদ্দিন : হঠাৎ তারেককে এভাবে প্রমোট করা।

মাহবুব : গ্র্যাজুয়াল মুভ করা হলে এক জিনিস। কিন্তু একেবারে সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি? এটা একটা ব্লান্ডার।

মহিউদ্দিন : এগুলো কি আপনারা মিটিংয়ে আলাপ করেন?

মাহবুব : পরিবেশ নাই। যখন সাইফুর রহমান ছিল, তখন হয়তো আলাপ-টালাপ করত। সাইফুর রহমান তো ওয়ান-ইলেভেনে, হি ওয়াজ ডিপলি ইন। তাই না? দে ওয়ান্টেড মি টু লিড দিস। আমি রাজি হইনি। দে ওয়েন্ট টু মেজর হাফিজ অলসো। মেজর হাফিজ রাজি হয়ে গেল সাইফুর রহমানের সঙ্গে। সাইফুর রহমান তো আমার সঙ্গে অনেক মিটিং করেছে। সে তো সংস্কারবাদী একটা কমিটি করল। পরে তো ব্যাক আউট করে গেল। তখন যদি ব্যাক আউট না করত, বিএনপি ভেঙে যাওয়ার কথা। সংস্কারবাদীদের দল হওয়ার কথা এবং সেটাই স্ট্রং হওয়ার কথা। তাই না?

মহিউদ্দিন : একটা কমিটি বোধ হয় হয়েছিল। সাইফুর রহমান এবং মেজর হাফিজ মিলে।

মাহবুব : হ্যাঁ হ্যাঁ।

মহিউদ্দিন : ইলেকশন কমিশনও তাদের আলাদা করে চিঠি দিয়েছিল।

মাহবুব : কথা ঠিক। সাইফুর রহমান পরে বুঝছে বোধ হয়, ওয়ান-ইলেভেন আলটিমেটলি সাকসেসফুল হবে না। মনে হয় আমার। সে জন্য সে সরে এসেছে। সাইফুর রহমান যদি ধরে থাকত, ওয়ান-ইলেভেন যদি সাকসেসফুল হতো, তাহলে কী হতো আমি জানি না।

মহিউদ্দিন : ওয়ান-ইলেভেনের অ্যাকটররা যখন অ্যাবাউট টার্ন দিল, আপনারা তখন সবাই বিএনপির ফোল্ডে চলে এলেন। বাট মান্নান ভূঁইয়া ওয়াজ নেভার ফরগিভেন। তার প্রতি কেন এত ইয়ে? আপনারা তো অনেকেই ছিলেন একসঙ্গে? মান্নান ভূঁইয়ার প্রতি রাগটা কেন?

মাহবুব : এটা ভাই আমি জানি না, পলিটিক্যাল বিষয়। মান্নান ভূঁইয়া তো আলাদা করে, খালেদা জিয়ার নাম করে তো বিএনপি করেনি। খালেদা জিয়াকে সে অতটা গুরুত্ব দেয়নি, বা ও রকম ব্লাইন্ড ওবিডিয়েন্স দেখায়নি। এখানেই বোধ হয় খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার ডিফারেন্স হয়ে গেছে। তারেক মে বি আ ফ্যাক্টর।

মহিউদ্দিন : ওই সময় ফেরদৌস কোরেশীর মুভটা কেমন দৃষ্টিকটু ছিল। তাকে দিয়ে তো ডিজিএফআই পার্টি বানাতে চেয়েছিল?

মাহবুব : ওটাও তো ফেল করেছে।

মহিউদ্দিন : এই এন্টায়ার পিরিয়ডে হাউ ডু ইউ অ্যাসেস দ্য রোল অব জামায়াতে ইসলামী?

মাহবুব : না, সংস্কারবাদীদের সঙ্গে জামায়াতের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কোনো সুযোগ নাই। কারণ, এখানে জামায়াতবিরোধী লোক অনেক

আছে। আমি মনে করি সংস্কারবাদী তারাই, যারা দেশের প্রগ্রেসিভ এলিমেন্ট, থট আইডিয়াস, আদর্শিক, করাপশন দূর করা, এই রকম স্লোগান নিয়েই তো ওয়ান-ইলেভেন আসে। সাকসেসফুল হয়নি, সেটা ভিন্ন কথা।

মহিউদ্দিন: ওই সময় আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীদের সঙ্গে বিএনপির সংস্কারবাদীদের কি কোনো যোগাযোগ-টোগাযোগ ছিল?

মাহবুব: নট ডাইরেক্টলি। কিন্তু হয়েছে।

মহিউদ্দিন: আপনারা শেয়ার করেছেন?

মাহবুব: হ্যাঁ, আমরা শেয়ার করেছি। যাদেরকে ভালো মানুষ মনে করেছে, ওদেরকে ওয়ান-ইলেভেনে ইনক্লুড করেছে।

মহিউদ্দিন: আপনারা যোগাযোগ রাখতেন?

মাহবুব: নট সো ডাইরেক্টলি বা ফরমালি। আমরা জানি যে ওখানেও চিন্তাভাবনা হচ্ছে। ওদেরও তো সাপোর্ট লাগবে।

মহিউদ্দিন: এটা কি মিউচুয়াল ইনস্পিরেশনের ক্ষেত্র তৈরি করত?

মাহবুব: আমি মনে করি, করত।

মহিউদ্দিন: আপনাদের মাধ্যমে তারা এনকারেজড হতো, তাদের মাধ্যমে আপনারা এনকারেজড হতেন?

মাহবুব: হ্যাঁ। একটা কথা বলি। আমি কিন্তু এটার পার্শ্বচরিত্রও নই। ঘটনাটা জানি। জানি না, এটা বলব না। বাট আই অ্যাম নট আ ওয়ান-ইলেভেনে ম্যাটার, বা ইনিশিয়েটর।[৪৮]

আওয়ামী লীগ একটি পুরোনো ও পোড় খাওয়া রাজনৈতিক দল। অতীতে এই দলের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। দলটি বারবার হোঁচট খেয়েছে, আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এক-এগারোর ধাক্কায় এই দলটির মধ্যকার সংহতি অনেকটা এলোমেলো হয়ে যায়। দলের নেতৃত্বের মধ্যে এত দিন যত ক্ষোভ জমা হয়েছিল, হঠাৎ করেই যেন তার বিস্ফোরণ ঘটে। এই পরিস্থিতির একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় দলের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্নার ভাষ্যে। ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ লেখককে দেওয়া তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে এসব কথা। সেই সঙ্গে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো:

মহিউদ্দিন আহমদ: আমার আগ্রহ ২০০৭-০৮ সময়টা নিয়ে। ওই সময় যেহেতু আপনি আওয়ামী লীগে ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের ভেতরে গণতন্ত্রায়ণের একটা প্রক্রিয়া ছিল। বিএনপির মধ্যেও ছিল, তখন ইউ

অয়ার অলসো আ পার্টি টু দ্যাট ডেমোক্র্যাটাইজেশন প্রসেস। আপনি এর ভিকটিমও হয়েছেন। আপনি যদি ওই সময়টার কথা বলেন।

মাহমুদুর রহমান মান্না : আপনি যেভাবে বিষয়টা প্রেজেন্ট করছেন, বিষয়টা ও রকম না।

মহিউদ্দিন : আপনি যেভাবে দেখেছেন বা বুঝেছেন সেভাবেই বলুন।

মান্না : আওয়ামী লীগকে ভালো করে বুঝতে হলে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বুঝতে হবে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক টানাপোড়েন ছিল। স্ট্রেটলাইনে আওয়ামী লীগকে কখনোই বোঝা যাবে না। ইভেন আওয়ামী লীগ আন্ডার শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড আওয়ামী লীগ আন্ডার শেখ হাসিনা ইজ অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট। শেখ মুজিবের মধ্যে একধরনের বিগ ব্রাদারলি, ফাদারলি অ্যাটিচ্যুড ছিল। অন্যদের ছায়া দেওয়া, সাহায্য করা ইত্যাদি। শেখ হাসিনা এগুলো সব রপ্ত করেছেন। মনেপ্রাণে হয়তো বিলিভ করেননি।

আমি ২৬ বছর আওয়ামী লীগে ছিলাম। টানা অনেক দিন সেন্ট্রাল কমিটিতে ছিলাম। এর মধ্যে উনি ক্ষমতায় ছিলেন। আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। আমার কথা বক্তৃতায় বলতেন। আমি যে জায়গাতে ছিলাম, আমার কাছাকাছি তো কেউ ছিল না, আমার বয়সীদের মধ্যে। ওবায়দুল কাদেরও তো কিছু করতে পারেনি। আমার মধ্যে কী কোয়ালিটি আছে, এটা নিশ্চয়ই উনি বুঝতেন।

আমরা বসে আছি শেখ হাসিনার অফিসে, ধানমন্ডির ৩-এ রোডে। একটা ঘরে সভানেত্রী বসে, আমরা এদিকে একটা ঘরে বসি। ওই সময় আমি, সাবের, সম্ভবত নূর ভাই, রাজ্জাক, আরও কে কে ছিল। নেত্রী আসল। বলল, 'আচ্ছা, সংস্কার কী হচ্ছে? সংস্কারটা কী?' সাবের কী একটা জবাব দিল। উনি বললেন, 'তোমরা এটার ওপর একটু কথাবার্তা বলো তো।'

মহিউদ্দিন : উনি আপনাকে বলেছেন?

মান্না : সাবেরকে বলেছেন, মানে আমাদের সবাইকেই বলেছেন। সংস্কারের ইনিসিয়েশনটা উনি এভাবেই করেছেন। এই আলোচনাটা চলছিল। আমরা মাঝে মাঝে বসছি। আমি, সাবের আর নূর ভাই—আমাদের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক—কথাবার্তা বলতে ভালো লাগে। আবার আলাদাভাবে কয়েকবার বসছি।

আলোচনার একটা পর্যায়ে ঠিক হলো, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে হবে, ওপিনিয়ন ফর্ম করতে হবে, একটা ডেমোক্র্যাটাইজেশন লাগবে। এই

পর্যায়ে একসময় সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং বসল। আলোচনা হচ্ছে। ইলেকশন কমিশন বলছে, ইলেকশন করবে। কী কী করা দরকার, এই সব আলোচনা। এর মধ্যে শেখ হাসিনার উপদেষ্টা পরিষদের কে কে যেন গেছে কমিশনে। প্রস্তাব দিয়েছে, ফটোসহ আইডেন্টিটি কার্ড, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, এইটা ধরে আমরা কাজ করব। তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনও করতে হবে, আবার ফটোসহ ভোটার আইডি কার্ডও করতে হবে। এটা বলতে হবে।

শেখ হাসিনা কিছু বলেছে আর সেটা দলের মধ্যে হয়নি—এটা কখনো হয়নি। ওই কথার সূত্র ধরে আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট কথা বলেছি। মূল কথা বলেছি আমি। সেন্ট্রাল কমিটিতে এই আলোচনা বিস্তৃতি পায়নি। অন্যরা হয়তো কিছু কিছু কথা বলেছে, বাকিরা হিসাব করে বলেছে। মাঝখানে এমনও হয়েছে, আমি নেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তখন মনে হয় সংস্কার প্রস্তাব চার নেতা দিয়ে দিছে। ড. মিজানুল হক নামে একজন, বুয়েটের টিচার ছিলেন। টিচার এবং সিনিয়র, ওনাকে সম্মান করি। হঠাৎ একদিন উনি বললেন, 'সংস্কার কিসের? আমি সংস্কার চাই না। আমি সংস্কারের বিপক্ষে।' বললাম, সংস্কার চাই না, এটা কেমন কথা হলো? সংস্কার নেই মানে তো বন্ধ্যা হয়ে গেল। আপনি তো বিল্ডিংও সংস্কার করেন, হোয়াইটওয়াশ করেন। আপনি যে ঘর রেগুলার পরিষ্কার করেন, সেটাও একটা সংস্কার। সংস্কারের বিরোধিতা কীভাবে করেন? উনি বললেন, 'আমি শেখ হাসিনার পক্ষে আছি। শেখ হাসিনার সঙ্গে আছি, এর সঙ্গে সংস্কারের কী সম্পর্ক? এখন আমি বুঝতে পারি, ওরা তত দিনে বুঝেছে যে সংস্কার মানে অন্য কিছু। সংস্কার চাই না আমরা, নেত্রী সংস্কার চান না—এ রকম একটা পজিশন নিয়ে ফেলেছে।

আমার মনে হয়, শেখ হাসিনা যখন বলেছেন, উনি আসলে বোঝেন নাই সংস্কার আসলে কী?

মহিউদ্দিন : এটা কি উনি অ্যারেস্ট হওয়ার আগে?

মান্না : হ্যাঁ। যখন উনি এটা বুঝলেন, তখন এটার বিপক্ষে চলে গেলেন। এ রকম ঘটনা সম্ভবত হয়েছিল, চারজন নেতা একই রকম স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন।

মহিউদ্দিন : হ্যাঁ, দু-তিন দিন পরপর।

মান্না : একটা মজার ঘটনা বলি। সাইয়িদ ভাইয়ের বাড়ি, বা কারও একজনের বাড়িতে আমাকে যেতে বলেছে, ওই চারজন।

মহিউদ্দিন : কোন সাইয়িদ ভাই?

মান্না : অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। এখানে রাজ্জাক ভাই খুব সিরিয়াসলি

ইনভল্‌ভড ছিলেন। রাজ্জাক ভাইয়ের যারা ফলোয়ার—সাইয়িদ ভাই, খ ম জাহাঙ্গীর, প্রফেসর মান্নান, এরা খুব সিরিয়াসলি ইনভলভড ছিল। মান্নান এসে আমার সঙ্গে কথা বলল, বগুড়ার মান্নান, সবচেয়ে ক্লোজ লোক বলে পরিচিত ছিল। হঠাৎ একদিন আমার বাসায় এসে এই সোফাটার ওপর বসে আমাকে বলল, 'ভাই, আপনি যেসব কথা বলতেছেন, এগুলি তো আমরা ম্যালাদিন ধরে বলতেছি। আপনি তো এখন বলতেছেন।' ওরা মনে করত আমি এটার সঙ্গে আছি।

তো আমাকে ওইখানে ডেকেছে। যাওয়ার পরে, মেইন জায়গাটায় তোফায়েল ভাই বসা। রাজ্জাক ভাই ছিলেন, ওরা চারজনই ছিলেন।

মহিউদ্দিন : মানে রাজ্জাক, তোফায়েল, সুরঞ্জিত, আমু—এই চারজন?

মান্না : হ্যাঁ। কী যে বলতেছে, বোঝা যাচ্ছে না। কেউ যদি তার বক্তব্য পরিষ্কার না করে...। একসময় আমি বললাম, ভাই, আমাকে যে ডাকছেন, কে ডাকছেন? কারা ডাকছেন? আপনাদের বক্তব্য কী? কী বলতে চাচ্ছেন, সেটা বলেন? স্পষ্ট করে বলেন?

—না, এই তো আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছি।

—নির্দিষ্ট কিছু থাকলে সেটা বলেন। আপনারা চারজন যে কথা বলতেছেন, ডেকেছেন, আপনারা চারজন তো চার রকম কথা বলতেছেন। এমনিতেই আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা আমাকে ভয় পাইত, কথা বললে কথার তো জবাব দেওয়া কঠিন, এ রকম একটা ভাব। আমি স্পষ্ট করে বললাম, আপনারা যে স্টেটমেন্টটা দিলেন, চারজন নিজেরা আলাপ-আলোচনা করে, আমি কিছু জানি না। এই সব বক্তব্যের সাথে আমি একমত না। আমি জানি যে এ রকম করে কিছু হবে না। আপনারা প্রস্তাব দিয়ে বললেন যে দুই টার্মের বেশি (প্রধানমন্ত্রী) থাকতে পারবে না। আপনারা বাইরে বলবেন কেন? ভেতরে বলেন? আপনারা চারজন মিলে দলের ভেতরে যদি বলেন, তাহলে তো এটার বড় একটা আলোচনা হয়। ভারচ্যুয়েলি মিটিংটা এন্ডেড ইন আ ফিয়াসকো। বিকজ তারাও ডেফিনিট কোনো কিছু বলতে পারতেছে না, আমরাও বলছি না।

পরের কথা বলি। ঘটনা যখন অন্যদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, আওয়ামী লীগের ভেতরেও রেজিসট্যান্স হচ্ছে। কারণ, শেখ হাসিনাকে অ্যারেস্ট করার পরে সিম্প্যাথি ওই দিকে চলে গেছে। যাবে, এটাই স্বাভাবিক। অ্যারেস্ট করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা অ্যাবসলিউটলি রং।

আমার বাড়িতে এসেছিল, বারী। রাত দশটায়। আধা ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট আগে আমাকে ফোন করছে।

মহিউদ্দিন : ব্রিগেডিয়ার বারী?

—হ্যাঁ। বলল, বাসায় আছেন? আমি আসব?

—আসবেন? কাজ আছে কোনো?

—না, এদিক দিয়ে যাচ্ছি। ভাবলাম দেখা করি।

—আসেন।

—আগে পরিচয় ছিল?

—সুলতানের কোনো এক আত্মীয়ের বিয়েতে ওকে আমি দেখেছি সেনাকুঞ্জে।

—কোন সুলতান।

—আমাদের সুলতান মোহাম্মদ মনসুর। সেই আলাপের সূত্রে আমার সঙ্গে কথা বলছে। কোনো এক সময় হবিগঞ্জের বৃন্দাবন কলেজে একটা পরিচিতি সভায় গেছিলাম। হবিগঞ্জ শহরের অনেক লোক এসেছিল। জায়গা না পেয়ে মাটিতে বসে বক্তৃতা শুনেছিল। বলল, 'আমি আপনার ওই বক্তৃতা শুনেছি'। আলাপ করতে করতে তাদের প্রসঙ্গ তুলল। বললাম, কী করতে চাচ্ছেন?

—এই দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে হবে।

—ঠিক আছে। কীভাবে?

—সে জন্যই আপনার কাছে আসছি। দায়িত্বটা আপনাকে নিতে হবে।

—দায়িত্ব নিতে হবে, কীভাবে? পার্টি লাগবে তো একটা?

—পার্টি আছে।

—কে কে আছে ওই পার্টিতে?

—সেটা সময়মতো আমরা ঠিক করে নেব।

—পার্টির প্রধান কি আমি?

—না, প্রধান থাকবে চিফ।

—চিফ, উনি তো চাকরিতেই আছেন?

ঘটনা হচ্ছে কি, এর আগে আমার কাছে আরেকজন আসছিল। নাম বলছি না, পরিচিত লোক, সিভিলিয়ান। ওই একই প্রপোজাল নিয়ে। আমার ফ্যাক্টরিতে। চিফের কথা বলতেই বললাম, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—না, উনি তো কথা বলবে না।

—আপনি যে তার পক্ষ থেকে আসছেন, সেটা তো আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আপনি তো এমনিই এসব বলতে পারেন? আই নিড অ্যান ইনডিকেশন, আ ডেফিনিট ইনডিকেশন। অন্তত একটা নোট।

—সেটা কীভাবে?

—সেটা আমি জানি না। নোট কীভাবে দেবেন, সেটা আপনি ঠিক করেন। আপনার যে চিফ, ওনাকে বলেন।

—সেটা তো সম্ভব না?

—তাহলে কিসের ভিত্তিতে করব? আপনি বলছেন উনি চিফ। পার্টিরও চিফ। উনি কিছুই বলতেছেন না। চিফই যদি এই পার্টির চিফ হয়, তাহলে তো তার পলিসি সম্পর্কে কিছু বলতে হবে আগে? আমাকে তো বলতে হবে, আমি যদি দায়িত্ব নিই? ধরেন, আমি দলের সেক্রেটারি হলাম।

—আমরা তো বলছি।

—আপনি তো কিছুই বলছেন না? কারা কারা আসবে?

—সময় হলেই বলব।

—আমাকে দায়িত্ব দিলে আমি লোক জোগাড় করব, যে এই এই লক্ষ্যে এই এই মানুষকে আমি সংঘবদ্ধ করছি। আপনি লক্ষ্যও বলতেছেন না, মানুষও বলতেছেন না। তাহলে কী করতে বলছেন?

যা-ই হোক, ও তো জবাব-টবাব দিল না। আমি তখন কথা প্রসঙ্গে বললাম, অনেক টাকা লাগবে পার্টি করতে।

—কত টাকা?

—সভানেত্রীকে একবার বলতে শুনছিলাম যে পার্টিতে মাসে দুই কোটি টাকা খরচ হয়। ইলেকশন হতে এখনো বারো মাস বা আঠারো মাস বাকি আছে। এই আঠারো মাসে ছত্রিশ কোটি টাকা আপনাকে ক্যাশ দিতে হবে।

—টাকা দেওয়া যাবে।

—না ভাই, টাকা দিতে হবে না। আপনি যেভাবে বলছেন, লক্ষ্যও বলতে পারছেন না, দুর্নীতি দূর করবেন—এটা সবাই বলে। পলিসি আরও ডিফাইন করতে হবে। আর যদি আমাকে দায়িত্ব দেন, তাহলে আমার মতো করে পলিসি তৈরি করব। এভাবে কমান্ড করে, ডিজিএফআই দিয়ে, গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে, পার্টি কখনোই এভাবে হয় না। এটা আপনারা করতে পারবেন না।

উনি হতাশ হয়ে গেলেন। বললেন, এটা আমাদের করতেই হবে এবং আপনাকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে।

—দায়িত্ব নিতে হবে এটা কেমন কথা হলো? আমি যেখানে কনভিন্সড না, দায়িত্ব কীভাবে নেব?

তখন কী জানি একটা বলল। বলল, আপনি চিন্তা করেন। চলে গেছে। দুই দিন বা তিন দিন পরে ফোন করছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

—কিসের সিদ্ধান্ত?

—মান্না ভাই, এটা ভাবতে হবে। না হলে তো অসুবিধা।

—আপনি কি থ্রেট করছেন?

—না না, ওইভাবে নিয়েন না।

—অসুবিধা হবে মানে কী? অ্যারেস্ট করবেন, এই তো? জেল তো আমি আগেই খাটছি। এগুলা আমাকে বইলেন না। এগুলা বলে আমাকে দিয়ে কাজ করাতে পারবেন না। আমি তখনই কাজ করব, যখন একটা ব্যাপারে আমি কনভিন্সড হব। তার আগে, আমি আপনাকে বলছি, আপনারা যে পথে যাচ্ছেন, ইট উইল বি আ টোটাল ফেইলিওর, কিচ্ছু হবে না। পরে বুঝবেন।

মজা হলো, বারী যখন চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, ওই সময় সে বলেছিল, আপনার কথা যদি শুনতাম, তাহলে এত সব হতো না। সবকিছু চিফের নির্দেশমতো হয়েছে।

—আপনিই তো চিফ চিফ করতেছিলেন? আমি তারে দেখি নাই, কথাও বলি নাই। কিসের ভিত্তিতে আপনারা এগুলি করছেন?

—যা-ই হোক, মাফ-টাফ কইরা দিয়েন। দোয়া কইরেন আমার জন্য।

যে সময়টার কথা বললাম, পুরা সময়টায় শেখ হাসিনা, শি ওয়াজ অ্যাট আ লস। কী হচ্ছে উনি বোঝেনই নাই। প্রফেসর আতাউর রহমান আছে না? এই লোক কিন্তু এর মধ্যে ছিল। সে একটা সম্মেলন ডেকেছিল, শেরাটনে।

মহিউদ্দিন : মইন গিয়েছিল?

মান্না : মইন গেছে, আমিও গেছি। ওটা ওপেন ছিল। আমি প্রশ্নও করেছি। মইন একটা বোকা লোক। কিচ্ছু জানে না। আমি দাঁড়িয়েছি, প্রশ্ন করার জন্য। বললাম, আপনি যা বলছেন, কথাটা যদি আমি বুঝে থাকি, আপনারা পরিবেশ ঠিকঠাক করে একটা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দিয়ে দেবেন। আবার আপনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি—দুটারই সমালোচনা করলেন। ইলেকশন যখন হবে, ছমাস পরে বা এক বছর পরে, এই দুইটা পার্টিতেই কনটেস্ট হবে। আপনারা কী করবেন?

খুব বিরক্ত হলো সে।

মহিউদ্দিন : আতাউর রহমান?



শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে মিছিল

মান্না : না না, মইন। বলে, আমরা সেটার ব্যবস্থা নেব।

—কী ব্যবস্থা নেবেন?

এরপর সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। আর কথা-টথা হলো না। পরে কেউ কেউ আমাকে বলেছে, আপনার বিপদ হবে ভাই। আতাউর রহমান যেটা করছে, সংস্কারের ওপর আমাকে বলতে বলছে। বললাম দেখেন, সংস্কার নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল, তখন আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে রেজল্যুশন ওয়াজ টার্নড ডাউন। ওই চর্চাটা করতে দিতেন, তাহলে দলের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ আসত। সংস্কার প্রস্তাব আমরা শেখ হাসিনার সভাপতিত্বেই পাস করতে পারতাম। বিকজ, ফেভারেবল কারেন্ট ছিল। ওনাকে অ্যারেস্ট করার পরে সবাই তার মুক্তি চায়। এখানে 'শেখ হাসিনার মুক্তি চাই' এর আলোচনাই নাই।

—আপনি কী চান?

—আমি শেখ হাসিনার মুক্তি চাই।

এটা আবার রেডিওতে শোনাইছে। এইটা শুনে জিল্লুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি) ফোনে আমাকে ধন্যবাদ দিছে। বলছে, খুব সাহসের কাজ করছেন। বিবিসিতেও আমি একই কথা বলেছি।

রিজনটা আপনাকে বলি। আমু ভাই মাঝে আমাকে ডাকেন। আমু ভাই মনে করেন, মান্না বোঝে-শোনে। ওর কথার দাম আছে। তোফায়েল ভাই কখনো বলে নাই। রাজ্জাক ভাই, কী বলব? মাথায় কিচ্ছু নাই।

সুরঞ্জিতদা খুব চালাক। ওনারা কেউ ডাকে নাই। আমু ভাই ডাকত। কে যে একটা বুদ্ধি দিছে তারে? দলের মিটিং ডাকবে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট হলে। আমি বললাম, সেখানে শুধু শেখ হাসিনার ওপর বক্তৃতা হবে। সাথে সাথে বুঝল। ঠিক বলছ তো?

মহিউদ্দিন : একই সময় বিএনপির মধ্যেও তো একটা—সংস্কারবাদের পক্ষে বেশ একটা, মান্নান ভূঁইয়া যদিও একটা প্রপোজাল দিয়েছিল, সাথে তো অনেকেই ছিল। সাইফুর রহমান, মেজর হাফিজ অনেকেই ছিলেন।

মান্না : তাদের মেজরিটিই ছিল।

মহিউদ্দিন : বিএনপির সংস্কারবাদীদের সঙ্গে আপনাদের কি কোনো ডিসকাশন...?

মান্না : দেখিনি। সম্ভবত হয়নি।

মহিউদ্দিন : ওই সময় তো আমরা সিরাজুল আলম খানের কাছে শুনতাম যে ওনার ব্লেসিং-টেসিং আছে জেনারেলদের উদ্যোগের সঙ্গে। আপনি কি এ রকম শুনেছেন?

মান্না : না।

মহিউদ্দিন : ফাঁকা আওয়াজ?

মান্না : এমন একটা প্রশ্ন করলেন?

মহিউদ্দিন : আপনি আগে বললেন না, উনি অনেক মিথ্যা কথা বলেন? এটাও কি এ রকম মিথ্যা?

মান্না : ওনার কোনো জায়গাই ছিল না। ওয়ান-ইলেভেনে অর্গানাইজড কিছুই ছিল না। মইন নিজেই একটা দুর্বল মানুষ। অত সব নাটক করার কী দরকার ছিল ওর? সে ক্ষমতা নিয়ে নিত? নিয়ে তার মতন করে করত, যেমন জিয়াউর রহমান করেছে। এরশাদ করেছে। সে তা করেনি। কেন করেনি? এই বারী বা আমিন—আমিনের সঙ্গে তো আমার দেখা-টেখা হয়নি। এদের নাকি এটাই অভিযোগ ছিল যে এই রকম বেইমানি করল?[৪৯]

মাইনাস টু-এর ব্যাপারে সেনাবাহিনীর কতটুকু ভূমিকা এবং রাজনীতিবিদদের কতটুকু আগ্রহ—তা নিয়ে নানান কথাবার্তা আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেনের দাবি, এ ব্যাপারে সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না। উদ্যোগটি এসেছিল তাঁদের নিজ নিজ দল থেকেই। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। তাঁদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

মইনুল হোসেন : আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে নোবডি ইজ অ্যাবাভ ল। আমরা হাসিনা-খালেদাকে অ্যারেস্ট করলেও তাঁদের যথেষ্ট সম্মান দিয়া রাখছি। এই যে বলা হয় মাইনাস-টাইনাস, এত দিন কিছু বলি নাই। পলিটিক্যাল লিডাররা মইনের কাছাকাছি আসতে পারে নাই। নিচের লেভেলের আর্মি অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, 'আপনেরা আসেন। আমরা এই দুই মহিলাকে চাই না।' এই কথা কিন্তু আমার কাছে বলে নাই। নিচের লেভেলের অফিসারদের কাছে বলছে—বারী, এদের সাথে। বলছে, এই দুই ভদ্রমহিলারে আপনারা যদি কিছুদিন বাইরে রাখতে পারেন। তখন তাদের দুইটা চিন্তা হইল—এটা তো নট আ ব্যাড আইডিয়া। তারা যদি দেশের বাইরে যায়—ফেরত আসা হয়তো ঠেকাইতে পারব না। কথাটা ছিল, ওরা যদি কিছুদিন বাইরে থাকে, তাহলে আমরা পার্টি অর্গানাইজ করতে পারব, মাইনাস করে। ইট ওয়াজ নট আওয়ার প্ল্যান। এইটা আমি শুনছি। সত্য-মিথ্যা আমি বলতে পারব না। এইটা ঠিক যে তারা আইসা আমাদের বলতেছিল, আপনারা যাইয়েন না, আপনারা থাকেন। আমরা আপনাদের সাথে আছি। জেনারেল মইনকে তারা চাইছিল।

আমি তখন জেনারেল মইনকে বলছি, আমরা পার্টি ভাঙার দায়িত্ব নিয়া আসি নাই। আর আপনি পার্টি করবেন, এই চিন্তা নিয়াও আসি নাই। আপনি এর মধ্যে আছেন কি না। বলল, না, আমি এর মধ্যে নাই।

তখন আমি কোরেশী আর আওয়ামী লীগের জলিল সাহেবকে ডাকলাম। ডাইকা জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের সঙ্গে কী আলোচনা হইছে?

না, মইনের সাথে এখনো বসা হয় নাই। কিন্তু ওরা বলতেছে যে হবে, অ্যাট ওয়ান স্টেজ।

মহিউদ্দিন আহমদ : ফেরদৌস কোরেশী আর আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল জলিল?

মইনুল : হ্যাঁ। তারা বলছে, মইনের সাথে কথা হয় নাই, তবে হবে। তার মানে দেয়ার ওয়াজ আ প্ল্যান। তার মানে এই দুইজনকে বাদ দিয়া তারা পলিটিকস করতে চাচ্ছে। এটা তো তাদের ব্যাপার? এখন তারা যেভাবেই বলুক না কেন, হাসিনা-খালেদাকে বাদ দিয়া পলিটিকস করলে আমাদের কী লাভ আছে? আমরা যদি ইলেকশন করতাম, তাহলে হাসিনা-খালেদাকে বাদ দেওয়ার একটা প্রশ্ন থাকত। আমরা তো ইলেকশন করি নাই?

মহিউদ্দিন: ফেরদৌস কোরেশী সাহেব তো অনেক আগেই পলিটিকসে ইররেলেভ্যান্ট হয়ে গেছে। হোয়াই ওয়াজ হি পিকড আপ?

মইনুল: হি ওয়াজ নট পিকড আপ। তারাই আসছে। পাওয়ারে গেলে টের পাইবেন, কত চাটুকার আসে, কত লোক আসে। বিএনপিতে খালেদা জিয়ার সঙ্গে অনেকেই নাই। কিন্তু তাঁকে ছাড়া উপায়ও নাই। কিন্তু দেখেন, নাইনটি পার্সেন্ট লোকই বলে, তারেককে নিয়া আমরা রাজনীতি করতে চাই না। আওয়ামী লীগেও এ রকম আছে। এ রকম একটা চেষ্টা ছিল। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা তা নয়। খালেদাকে বা হাসিনাকে বাদ দিলে আমাদের লাভ কী? আমরা যেটা করছি—ইনস্টিটিউশনগুলি ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। উই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট কনস্টিটিউশন-ডেমোক্রেসি ইজ স্ট্রেনদেনড। এ জন্য—ইলেকশন কমিশনের সেক্রেটারিয়েট ছিল না, আমরা সেক্রেটারিয়েট কইরা দিছি। দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীন করছি। বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দিছি, ইলেকশন ফেয়ার করছি। আর কী চান? সেখানে আমাদের ক্রেডিট না দিয়া আমাদের সমালোচনা করেন?[৫০]

রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে নানান কাণ্ডে জড়িয়ে গিয়েছিলেন ডিজিএফআইয়ের ফোর্সেস কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক ব্রি. জে. চৌধুরী ফজলুল বারী। এটাকে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এটাও অস্বীকার করার জো নেই যে সেনা হস্তক্ষেপের অভ্যন্তরীণ শর্ত তৈরি করে দিয়েছিলেন কোনো কোনো রাজনীতিবিদ। ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল নানান চিত্রকল্প ও নাটক। এই নাটকে ভূমিকা রেখেছেন অনেকেই। ২০১৭ সালের অক্টোবরে লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বারী অনেক কিছু বলেছেন, যার সত্যতা সব ক্ষেত্রে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। পরে পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ায় মুখে কুলুপ এঁটেছেন অনেকেই। সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো :

চৌধুরী ফজলুল বারী : একটা মেজর ইভেন্ট হলো পলিটিক্যাল পার্টি। ওই যে আপনারা কী বলতেন?

মহিউদ্দিন আহমদ : কিংস পার্টি—ফেরদৌস কোরেশী।

বারী : উনি মেধাবী মানুষ।

মহিউদ্দিন : হ্যাঁ, ডাকসুর ভিপি ছিলেন, ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন একসময়।

বারী : কোনো কারণে যেন এসেছিলেন একবার। আমি বললাম,

আপনি একটু বসেন, আমাদের কয়েক দিন সময় দেন। বাংলাদেশের পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যুগ-যুগান্তর ধরে—এখন তো অর্ধশতাব্দী হয়ে যাবে—ওনারাই চলতেছেন। ডাইনামিজন আনতে হলে বদলি করতে হয়। নতুন ব্রেইন আসবে, নতুন চিন্তা আসবে, পুরোনোদের এক্সপেরিয়েন্স নিয়া কীভাবে আগাবে, এ রকম একটা কনস্টিটিউশন বানান তো? পলিটিক্যাল পার্টির কনস্টিটিউশন। ওনাকে এই কাজ দেওয়া হলো।

এটা বেশ আগের ঘটনা। উনি লেখে, আসে। বলি, লেখছেন তো? বলে, লিখছি। আমি চেক করি না, দেখিও না। এই করতে করতে কী হইল? একেকটা জিনিস ক্রপ আপ করে। এদেরকে দিয়া একটা ব্যালেন্স করা দরকার। এই যে ভালো ভালো মানুষ—বি চৌধুরী, ড. কামাল হোসেন, ওনাদের মতো মানুষ, তারপর ইয়াং জেনারেশনেও অনেক ভালো ছেলেপুলে আছে, পলিটিক্যাল লিডার হতে পারত। এরা কোনো পাত্তাই পাচ্ছে না। এদেরকে একসঙ্গে করে—ওই রকম চিন্তাভাবনা যখন শুরু করা হইছে—এর আগে আমি উকিলদের কথা বলছিলাম। পলিটিশিয়ানরাও এর ব্যতিক্রম না। উইথ ডিউ রেসপেক্ট, ভালো মানুষগুলো ঝইরা যায়। আ ফ ম মাহবুবুল হকের মতো মানুষ ঝরে গেছে। তারপর চার খলিফার একজন—নূরে আলম সিদ্দিকী—সিদ্দিকী ভাই, ওনাদের মতো মানুষ পলিটিকস থেকে ঝরে গেছে। এদের প্রিন্সিপল ছিল। এসব মানুষ তো থাকল না।

এর মধ্যে যে ভালো মানুষ নেই, তা না। ভালো আছেন। না থাকলে আল্লাহ দুনিয়া টিকায়া রাখছেন কেন? আল্লাহ তো দুনিয়া ধ্বংস কইরা দিতেন। এর মধ্যে ভালো আছে, মন্দরা বেশি হয়ে গেছে। এরা হলো সব স্পাইনলেস। সাইফুর রহমানের মতো পলিটিশিয়ান নাই। যিনি বেগম জিয়ার সামনে বোল্ডলি কথা বলতে পারতেন। এখন বোল্ড কথা বলার মতো কোনো পলিটিশিয়ান দেখি না।

কথা হলো, ওনাদের সবাইকে একত্র করে একসঙ্গে বসিয়ে দেওয়া। আমাকে বলা হলো, ইয়োর ডিউটি ইজ টু কিপ পলিটিশিয়ানস ইন গুড হিউমার, সো দ্যাট কোনো আন্দোলনের সূত্রপাত না হয়। আমি তো সবাইকে চিনি না। আমাকে অনেকে চেনেন। ওদেরকে বসানো হলো।

ড. কামাল হোসেনের কথা বলি। ওনারা ইউটিলিটি হারায়া ফেলছেন। হি ইজ আ গুড ল-ইয়ার, কিন্তু পলিটিশিয়ান হিসেবে আই ডোন্ট ভ্যাল্যু। কী পলিটিকস করছেন উনি? বঙ্গবন্ধুর এইড ছাড়া কী করছেন?

সবাই মনে করেছে, ফেরদৌস কোরেশীকে বুঝি প্যাট্রনাইজ করা হচ্ছে। আসলে না। ওনাদের একত্র করে বসায়া—লেট দেম থিংক। সিমিলারলি বিএনপি—ভাঙাভাঙি তো আমাদের কাজ না? লেট দেম সিট টুগেদার, ডিসকাস অ্যান্ড গো ফরোয়ার্ড।

আমাকে বলা হলো, তোমার জন্য ২০ দিনের টাইম। আবদুর রাজ্জাককে গিয়া বলো, ২০ দিন টাইম দেওয়া হইল, দল ভাইঙা আসতে হবে।

মহিউদ্দিন : কে বলল আপনাকে?

বারী : এটা সেনাপ্রধান বলল, গোলাম মোহাম্মদ বলল। ডিজি-ডিজিএফআই এবং সেনাপ্রধান, দুজন। কাউকে কাউকে গিয়ে বললাম, আমার চিন্তা ছিল দলগুলো থাকবে। কিন্তু খারাপ লোকগুলো চিরতরে বিদায় করে দেওয়া। এই যে দুর্নীতির মামলা-টামলা হইছে, এগুলো দিয়ে এদেরকে চিরতরে ব্ল্যাকলিস্ট করা, সো দ্যাট দে ক্যান নট কাম ইন পলিটিকস। ওই যে ছোট ছোট পার্টিগুলো আছে, এদেরকে নারিশ কইরা দিয়া—একটা স্ট্রং ইয়া হইলে তখন ব্যালেন্স অব পাওয়ার আসবে। দুই পার্টির মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করবে না।

দলের নাম কী হবে, এটাও একটা লিস্ট করে দেওয়া হলো। উনি আসবে না। মইনুদ্দীন আসবে না। বলে, না, আমি যাব না পলিটিকসে। একদম স্ট্রেইট আমাকে বলছে। উনি গিয়া ফখরুদ্দীনকে বললেন। ইনারা কি পলিটিকসের মানুষ? ইনারা বড়জোর অ্যাডভাইজার হইতে পারে। ওনারা তো পলিটিক্যাল লিডার না? ওনাকে বলল। উনি ফেইল করল।

আমি অনেকগুলো মানুষের লিস্ট নিয়া দিলাম। ওনারা চিনেও না। ওই যে মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নাই তো? এরা আর্মিতে গেছে, কোর্স-মোর্স করছে, পড়াশোনা করছে, টাইম পাস কইরা—সিনিয়র হইছে সব। নামটাম দেওয়া হইছে। নাম দেখছেন উনি। বলছেন, ঠিক আছে। উনি টিকও দিছে পলিটিক্যাল পার্টির নামে। ঠিক আছে, এটা ওনারা করবে। আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। আমাদের কাজ হলো নারিশ কইরা—ব্যালেন্স অব পাওয়ারটা আসুক।

কোরেশী সাহেব করলেন কী, হঠাৎ করে একদিন ডিক্লেয়ার করে দিলেন। বিশ্বাস করেন, আমি নিজেও জানি না। আমার তো বেশি যোগাযোগ ওনাদের সঙ্গে। আমি নিজেও জানি না।

মহিউদ্দিন : প্রগ্রেসিভ পার্টি না কী যেন নাম?

বারী : জি। পিপলস প্রগ্রেসিভ ডেভেলপমেন্ট পার্টি। তো এটা

ডিক্লেয়ার করে দিলেন। এটা দিয়ে লোকজনের কাছে একটা খোরাক উঠায়া দেওয়া হইল। অন্যদের জন্য ঘরোয়া রাজনীতি, আর এটা করছে সরকার। এটা কিন্তু আমাদের কারও নলেজে ছিল না। ও মা, এর কয়েক দিন পরে দেখি, উনি ওনার লোকলস্কর নিয়ে কোথায় যেন গেছে।

মহিউদ্দিন : মানিকগঞ্জে।

বারী : হ্যাঁ। এরশাদ সাহেবের মন্ত্রী মিলন না কী যেন নাম, প্রতিমন্ত্রী ছিল। সেও ছিল। আমি তো লজ্জিত হয়ে গেছি। সেনাপ্রধান আমাকে জিজ্ঞাসা করছে।

স্যার, আমি জানিও না কিছু। হঠাৎ করে ওনারা এটা করছে। এটা আমাদের ওয়ান-ইলেভেনের ইমেজটা ক্ষুণ্ন করছে। বাট ওয়ান-ইলেভেন গভমেন্ট ওয়াজ নট ইনভল্‌ভড ইন ইট, নাইদার আর্মি নর গভমেন্ট। এভাবে চলছে। আমি গেলাম সিঙ্গাপুরে, আমার ছেলের একটু প্রবলেম ছিল। যাওয়ার আগে আমি বলেছি, বিএনপি-আওয়ামী লীগ, তারা নিজেরা বসুক, নিজেরাই ঠিক করুক তাদের পার্টি থেকে কাকে কাকে আউট করবে। তারপরেই ব্রিগেডিয়ার আমিন আমাকে ডাকল, আসো। আমিন তো আমার সিনিয়র? আসলাম।

চলো চিফের ওখানে।

কেন?

এদেরকে বসাইতে হবে। তুমি সবাইকে টেলিফোন করে বলো।

আমাকে ওনারা সবাই ভ্যালু দেন। সাইফুর রহমান সাহেবের কাছে একবার গেছি। ব্রিগেডিয়ার আমিন তাকে ধমকাধমকি শুরু করছে। সাইফুর রহমান সিনিয়র মানুষ। তিন-চারবারের অর্থমন্ত্রী, বয়সে বড়। আমিন বলে, 'আপনারা ট্রেইটর।' উনি আমার হাত ধইরা বললেন, বাবা রে, জিয়াউর রহমানও তো আমারে এই রকম কইছুইন না।'

আমি বললাম, স্যার, মাফ করেন।

দ্বিতীয় ঘটনা। যখন বিএনপির লোকদের বসানো হইল। সাইফুর রহমানকে পার্টির প্রেসিডেন্ট বানানো হইল।

মহিউদ্দিন : মেজর হাফিজকে সেক্রেটারি।

বারী : হ্যাঁ। তানভীর সিদ্দিকী আছে না? এমনভাবে ব্রিগেডিয়ার আমিন ওনাদেরকে গালিগালাজ শুরু কইরা দিল? জেনারেল মাহবুব ওইখানে বসা। তানভীর সিদ্দিকী কাইন্দা দিল। উনি কানে কম শুনে। কাইন্দা বলে, 'বারী সাব, আমি আপনাকে দেইখা আসছিলাম।'

আমার তো মাফ চাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নাই। জেনারেল

মাহবুব বললেন, 'বারী, আই ওয়াজ চিফ অব স্টাফ। হাউ ওয়ান কুড স্পিক ইন ফ্রন্ট অব মি লাইক দিস?'

এইভাবে মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার...।

বিএনপির যে সেক্রেটারি পলায়া গেলেন, মারা গেলেন যে?

মহিউদ্দিন : মান্নান ভূঁইয়া?

বারী : মান্নান ভূঁইয়া না, আরেকজন। মান্নান ভূঁইয়াকে ম্যাডাম বাদই দিয়া দিলেন।

মহিউদ্দিন : খোন্দকার দেলোয়ার?

বারী : হ্যাঁ। খোন্দকার দেলোয়ারের কাছে গেলাম। খোন্দকার দেলোয়ারকে গালিগালাজ করে—আপনারা ট্রেইটর, এইটা-সেইটা। আমি গিয়া খোন্দকার দেলোয়ারের পাশে বসলাম। বুড়া মানুষ তো। আফটার অল। পিঠে হাত দিয়া বললাম, মাফ কইরা দেন স্যার, এ ধরনের কথা তো বলতে আসি নাই। এসব তো বলার কথা না আপনাকে।

আরেকবার জিল্লুর রহমান সাহেবের সঙ্গে মিটিং হলো। তোফায়েল সাহেবও ছিলেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন। এখানেও ধমকাধমকি।

মহিউদ্দিন : জিল্লুর রহমানের বাসায় মিটিং?

বারী : না, এইচ টি ইমামের বাসায়। ওখানেও এ রকম। জিল্লুর রহমান সাহেব আমাকে বলে, আরে, বারী সাহেব, কেমন আছেন? আপনি বারী সাহেব না?

খুবই স্নেহের সুরে বললেন। ওখানেও রাগারাগি। আমরা তো রুলিং কোনো কিছু না। আমরা ফ্যাসিলিটেটর। দেশের মধ্যে যাতে শান্তি আসে, বদনাম হয়ে গেছে, মুখ দেখাইতে পারতেছি না। বাংলাদেশের মানুষ বিদেশিদের কাছে মুখ দেখাইতে পারতেছে না। আমরা এ থেকে পরিত্রাণ কইরা দিয়া একটা সুন্দর নির্বাচন কইরা দিয়া—কারও পক্ষপাতিত্ব করা না।

মহিউদ্দিন : আমি মাহমুদুর রহমান মান্নারও একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছি। উনি আপনার কথা বললেন। আপনি গিয়েছিলেন ওনার কাছে। উনি আমাকে বলেছেন যে বারী বলল, পার্টি করতে হবে। এর একটা ব্যাখ্যা দেন।

বারী : আমি উপযাচক হয়ে কারও কাছে যাই নাই। পার্টি করার ইয়ে আমার মধ্যে ছিল না। উনি এবং আরেকজন আছেন না, গাজীপুরের?

মহিউদ্দিন : আখতার?

বারী : হ্যাঁ, এই দুইজন। আমার এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে ওনারা

যোগাযোগ করছেন। ও আর্মির লোক, রিটায়ার্ড। ওর মাধ্যমে আমারে সবাই আমন্ত্রণ জানায়। একটু দেখা করতে চাই। আমাকে মানুষ এমন জায়গায় উঠাইছে, আমি যেটা না, 'ওনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, উনি বললেই সব হয়া যাবে'—এই টাইপের কথা। আসলে আমি জানি আমার দৌড় কতটুকু।

আমি প্রোগ্রাম করে করে, কার কার সাথে দেখা করতে হবে—ওই যে আদেশ দিছে না? টু কিপ পলিটিশিয়ানস ইন গুড হিউমার? ভালো মানুষগুলো একত্রিত হয়ে রাজনীতি করুক, এটা আমিও চাইছি। মান্না ভাইয়ের একটা কথা, 'রাজনীতিটা কী হবে? মানে হোয়াইট উই আর হেডিং ফর? কাজটা কী হবে আমি যদি ওই দলে যাই?' আমি কোনো সদুত্তর দিতে পারি নাই। আমি রাজনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ দিতে পারি নাই। আমি বলছি, এটা স্বাধীনতার পক্ষের, দেশের পক্ষের একটা শক্তি হবে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি মানে মাইনাস বিএনপি মাইনাস আওয়ামী লীগ—নো। বিএনপির মধ্যে কি স্বাধীনতার পক্ষের মানুষ ছিল না? আছে। আওয়ামী লীগে আছে, বিএনপিতেও আছে। সব দলেরই স্বাধীনতার পক্ষের একটা শক্তি হবে এটা। এই কথা আমি বলছি ওনাকে। ডিটেইলস আমি বলতে পারি নাই—মার্ক্সবাদ হবে, না লেনিনবাদ হবে, না মুজিববাদ হবে, না চৌ-এন লাইয়ের ইয়ে হবে, রেড বুক হবে মাও সে তুংয়ের, এসব আমি বলতে পারি নাই। এ জন্য তো সময়েরও দরকার।

মহিউদ্দিন : উনি আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, পার্টির চিফ কে হবে? আপনি নাকি বলেছেন, আপনাদের চিফ এই পার্টির চিফ হবে।

বারী : এ রকম কথা অনেক সময় আমি বলছি। কথাটা আমি কীভাবে আপনাকে উপস্থাপন করব? এ রকম একটা ইঙ্গিত আমি...। ওনার কথা হলো, 'উনি মুখে এসব বলতেছে, বাকিগুলা কেন করতেছে না?'

মহিউদ্দিন : মান্নাও আমাকে বলেছেন, তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'চিফ কেন কথা বলছেন না'? তখন আপনি বলেছেন, 'চিফ এখন কিছু বলবে না।'

বারী : এইটা মান্না ভাই সঠিক বলছেন।

মহিউদ্দিন : উনি একসময় খুব পপুলার ছাত্রনেতা ছিলেন।

বারী : ওনারাই তো ঝরে যাচ্ছেন, যাঁদের দরকার ছিল।

মহিউদ্দিন : কিন্তু আপনি বললেন যে তাঁরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আপনি যোগাযোগ করেন নাই, তাঁরাই যোগাযোগ করেছেন।

বারী : তারাই যোগাযোগ করছে। আমি তো সময় পাই নাই। যারা পরিচিত—একটু আসেন, দেখা করি, কোন জায়গায় বসবেন—এগুলা

করছেন তো তাঁরা। এটা কোনো নেগেটিভ বা তুচ্ছ অর্থে বলতে চাই না। জিনিসটা হলো পলিটিশিয়ানদের মধ্য থেকেই যোগাযোগ হইছে। আমি লিস্ট করে অমুকের সাথে, অমুকের সাথে দেখা করছি—নো। বেগম রওশন এরশাদ লোক পাঠাইছেন, খবর পাঠাইছেন—কখন আসবেন, কখন আসবেন? একবার দেখা হইছে, আবার দেখা করা—এগুলা হইছে। তোফায়েল আহমেদ তৃতীয় মাত্রায় এসে কী বললেন? বারী সাহেব লোকজন নিয়া আমারে অ্যারেস্ট করতে আইছে।

শেখ হাসিনার অ্যাগেইনস্টে যে মামলা হইছিল, কিসের মামলা, লগি-বইঠার মামলা। তাদের নামগুলি আমি বাদ দিয়াই রাখছি। বলে, আমি নাকি অ্যারেস্ট করতে গেছি। গিফটের তো শেষ নাই। প্লটও। বলে, 'ভাই, একটা প্লট নেন।' আলহামদুলিল্লাহ। সাড়ে তিন হাত জায়গা দরকার, এর বেশি দরকার নাই।

মহিউদ্দিন: জেনারেল মাহবুবের একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম।

বারী: ওনারে ফরেন মিনিস্টার করা উচিত ছিল। উনি যখন চীনে ছিলেন, তখন আমি সেখানে গেছিলাম একটা কোর্স করতে। চীনারা বলে, 'হি স্পিকস বেটার চায়নিজ দ্যান আস।' ওনার কাছেও গেছি। উনি আসতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম, না। ওনার মতো মানুষের আমার অফিসে আসা ঠিক না। তা ছাড়া ভয়ও তো আছে। কে না কে দেখবে। লুকাইয়া-ছাপাইয়া আমি তাদের বাসায় গেছি। কোনো সময় ওনারা অন্য জায়গায় আসতে চাইছেন। এইভাবে দেখা হইছে। কোনো সময় ভায়া মিডিয়া—অমুককে ধরছেন—তাকে বল, দেখা করতে চাই, কথা বলতে চাই।

মহিউদ্দিন: আমি একটা গসিপ শুনেছি। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কি আপনাদের কোনো যোগাযোগ...

বারী: আমি ওনারে দেখি নাই, ওই রকম শুনেছি। চিফের সঙ্গে নাকি যোগাযোগ হইছিল। আই ডু নট নো। আমার এসব জানার কথা না। চিফের বাসায় কে আসল, গেল, এটার রিপোর্ট একটা আসে। আমি এটা কোনো দিন শুনি নাই। আর এগুলি তো টেলিপ্যাথি কইরা হয় না।

মহিউদ্দিন: ওই সময় আবদুর রাজ্জাকের কী রোল ছিল?

বারী: সবাই বলে, আমারে সাপোর্ট দাও, উনি বলে আমারে সাপোর্ট দাও, কর্নেল ওলি বলে আমারে সাপোর্ট দাও, ইবরাহিম বলে আমারে সাপোর্ট দাও।

মহিউদ্দিন: মে. জেনারেল ইবরাহিমকে বেশ তৎপর দেখা গেছে।

কথাবার্তা বলেছেন?

বারী : আদার দ্যান টু পার্টিজ, বা পার্টির মধ্যেও যাঁরা কথাবার্তা বলার সুযোগ পান না...।

ওই যে, নাম মনে করতে পারছি না। এখন মুখ্য সচিব। এরা ওয়ান-ইলেভেনকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাপোর্ট করছে। আনোয়ারুল ইকবাল সাহেবের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল বোধ হয় সে। যেমন সা'দত হোসাইন। ওনাদের রোল তো প্রকাশ্য, গোপনীয় কিছু নাই। দে সাপোর্টেড। দে গট দ্য এনভায়রনমেন্ট টু ওয়ার্ক। যাদেরকে নেওয়া হইছিল, কাজের লোকই নেওয়া হইছিল। এবং তাঁরা কাজ করার এনভায়রনমেন্টটা পাইছেন বলে কাজ করতে পারছেন।

এই যে ডিফেন্সের সংসদীয় কমিটি একটা বানায়া রাখছে। ওনারা আইসা আমার এখানে...।

মহিউদ্দিন : নাম কী তাঁর?

বারী : কী জানি, কুমিল্লার। আইসা বেগিং করছে, ফেরদৌস কোরেশীরে বইলা দেওয়ার জন্য।

মহিউদ্দিন : তাকে যেন নেয়?

বারী : হ্যাঁ। এ রকম লোক তো ছিল প্রচুর। তাজুল ইসলাম চৌধুরী। বাপ রে বাপ! আমি কী করতে পারতাম? করার কিছু ছিল না।

মহিউদ্দিন : ওই সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আতাউর রহমান আপনাদের পক্ষে কথাবার্তা বলতেন।

বারী : আমিনের সাথে খুব দহরম-মহরম ছিল। আমি ওনাকে খুব একটা ইয়ে করি না। ইফেক্টিভ মানুষ না। এগুলি হইল...রাষ্ট্রদূত হওয়ার জন্য। আরেকটা অ্যাম্বাসেডর ছিল। বয়স্ক।

মহিউদ্দিন : কোথায় অ্যাম্বাসেডর ছিল?

বারী : কোথায় ছিল ভুলে গেছি। সকাল-বিকাল ফোনের জ্বালায়, পরে আমি ফোন বন্ধ কইরা রাখতাম। অ্যাম্বাসেডর হওয়ার জন্য।

কিংস পার্টি শব্দটা কিন্তু পেপার থিকা আসছে। মাইনাস টু শব্দটা পলিটিশিয়ানের মুখ থিকা আসছে। অ, ওনারা মাইনাস টু করতে চায়, পাকিস্তানের মতো? দ্যাট ওয়াজ নট আওয়ার ওয়ার্ড। আমরা এটা প্রথম মুখ দিয়া বলি নাই। ওনারা যখন উচ্চারণ করছেন, ওনারাই বেশি বেশি সাপোর্ট করছেন, ওনাদের সত্যি সত্যি মাইনাস কইরা দেওয়ার জন্য, নট ওনলি ফ্রম পলিটিকস...

মহিউদ্দিন : আপনি যত দিন লাইমলাইটে ছিলেন, আপনি বলেছেন

ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত। ফখরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আপনাদের কি কখনো মতানৈক্য হয়েছে?

বারী : না। টু টক অ্যাবাউট মাইসেলফ, আমি কখনো চ্যানেল ভায়োলেট করি নাই। যখন ডিজি আসলেন, আমি আর সেনাপ্রধানের কাছে যাইতে চাইতাম না। তারপরেও ডাক দিয়া মাঝেমধ্যে আমারে নিতেন। এরপর ডিজি চেঞ্জ হইলেন। সাদিক হাসান রুমীর পরে গোলাম মোহাম্মদ যখন ডিজি হইলেন, উনি করতেন কি—বারী আসো। উনি এর আগে ডিজিএফআইতে চাকরি করেন নাই তো? এদিককার ব্যাপারে উনি আমাদের ইনভল্ভ কইরা রাখতে চাইতেন।

আমি শুধু আর্মি-এয়ারফোর্স-নেভি নিয়া থাকতে পছন্দ করতাম। আমাকে যখন বলা হইল কিপ দ্য পলিটিশিয়ানস ইন গুড হিউমার, আমাদের অ্যারেনাটা একটু বড় হইতে শুরু করল।

মহিউদ্দিন : পলিটিশিয়ানদের মধ্যে প্রথমে কাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো?

বারী : ফার্স্ট কনট্যাক্টে বিএনপির অনেকেই।

মহিউদ্দিন : নাম বলেন কয়েকটা।

বারী : বাবর সাহেব, তারপর ফরিদপুরের দুই ভাই ছিলেন, চৌধুরী, ওনারা। তারপর ঢাকায় এমপি ছিলেন, পরে মন্ত্রীও ছিলেন।

মহিউদ্দিন : মেজর কামরুল?

বারী : কামরুল। মেয়র সাহেব, সাদেক হোসেন খোকা। আর এরা তো একেবারে রেগুলার ভিজিটর হয়ে গেছিল। এখন যে মেয়র আছে।

মহিউদ্দিন : আনিসুল হক?

বারী : না, আনিসুল হক তো ছিলেনই, আসা-যাওয়া করতেন। সাঈদ খোকন।

মহিউদ্দিন : রেগুলার ভিজিটর? কী করতেন?

বারী : হি হ্যাড দ্য ইনটেনশন টু বিকাম মেয়র। তারপর আওয়ামী লীগের কয়েকজন। তাদের স্টাইল হইল একসাথে বসা, আবার আলাদা করে বসা, আবার দুইজন একসঙ্গে বসা।

মহিউদ্দিন : ওই দুইজন কে?

বারী : আই অ্যাম ট্রায়িং টু রিক্যাপিটুলেট। কেউ কোনো দিন আমার সঙ্গে রাগ কইরা কথা বলেন নাই, দূরত্ব রাইখা কথা বলেন নাই। সবাই আপন হয়ে কথা বলেছেন। আর্টিফিশিয়াল না আপন, এইটা তো বোঝা যায়। ওনারা আসলে জানতে চাইতেন, কী ঘটনা, কী হবে, আমরা কার

সঙ্গে যোগাযোগ করব?

মহিউদ্দিন : আপনি কি ওনার বাসায় কোনো মিটিং করেছেন?

বারী : ঠিক ওইভাবে না। হয়তো কথা হইছে, কোথায় বসা যায়—ঠিক আছে বাসায় আসেন—এই রকম।

মহিউদ্দিন : শেখ হাসিনাকে অ্যারেস্ট করানোর ব্যাপারে আওয়ামী লীগে কারা বেশি সিরিয়াস ছিলেন?

বারী : আমি তো বলব, অনেকেই। কোনো কোনো লিডার এমনও বলছে, 'ভাই, জিয়াউর রহমান আর এরশাদ সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাদের অ্যারেস্ট কইরা নিয়া গেছে। আর আমরা ওনার সঙ্গে, মইনুদ্দীনের সঙ্গে, কথা বলতে চাই, উনি দেখা দেয় না। কারণটা কী?' এখন এইটা আপনার রিসার্চের বিষয়। একটা লোকের যদি ব্যাড ইনটেনশন থাকত, তাহলে সে-ই তো যোগাযোগ করত? কিন্তু এইটা উনি করেন নাই।

মহিউদ্দিন : আপনার কথায় মনে হচ্ছে যোগাযোগ করার ব্যাপারে তারাই উদ্‌গ্রীব ছিল। জাসদের কেউ কি যোগাযোগ করেছিল?

বারী : হ্যাঁ। প্রথম দিকে ইনুর সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল। তারা ইমার্জেন্সির আগে থেকেই—ভাই, কবে হইব? কবে হইব? আর্মি নামায়া দেন?

আমি তাকে একটা আভাস দিয়েছিলাম, পলিটিক্যাল সিচুয়েশন যদি এ রকম চলতে থাকে, তাহলে ইমার্জেন্সি হইতে পারে। মইন উদ্দীন খান বাদল যোগাযোগ করছে। মইন উদ্দীন বাদল আর ইনু মিটিং করতে চাইছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে।

মহিউদ্দিন : কে?

বারী : কর্নেল একজন আছে নাকি।

মহিউদ্দিন : এর আগে ছিল ক্যাপ্টেন তাজ।

বারী : ক্যাপ্টেন তাজও যোগাযোগ করছে। অনেকবার যোগাযোগ করছে। 'ভাই, যাওয়ার আগে আমার বাসায় একটু আসবেন?'

মহিউদ্দিন : ইনু আর বাদল কি আপনার কাছে এসেছিলেন?

বারী : আমার কাছেই। দেখা করছেন নরসিংদীর কর্নেল, এখন প্রতিমন্ত্রী, ওনার অফিসে, ডিওএইচএসে।

মহিউদ্দিন : তারা আপনাকে কী প্রপোজ করল?

বারী : কিছু করতে হইলে শক্ত হইয়া করতে হবে। তখন তো উপদেশ-পরামর্শদাতার শেষ নাই! এগুলি ছিল গণপরামর্শ। এগুলো এক

কান দিয়া শুইনা আরেক কান দিয়া বাইর করার জিনিস। এরা এমন কোনো পরামর্শ দেয় নাই, যেখানে জাতির কোনো উপকার হবে। ইলেকশন কবে হবে, টাইম ফ্রেম কী হবে, আমি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ রাখতেছি—এই সব।

ডিজিএফআইয়ের সাতটা ডাইরেক্টরেট আছে। এগুলোকে বলে ব্যুরো। এর মধ্যে বড়টা হলো এফসিআইবি—ফোর্সেস কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো। এটার হেড আমি। এরপর হলো ফোর্সেস কাউন্টার টেররিজম ব্যুরো। এটার হেড হলো ব্রি. আমিন। এর ফাংশনের মধ্যে আছে—বিয়ন্ড দ্য বর্ডার, ইন্টারন্যাশনাল।

মহিউদ্দিন : এটা কি র, সিআইএ—এ জাতীয় কিছু?

বারী : না, ইন্টারন্যাশনাল মানে বিদেশিদের সঙ্গে কাজ। যত লেনাদেনা। ইমার্জেন্সি উপলক্ষে আমাদের মধ্যে কিছু দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়। মিডিয়া দেখত এফএসআইবি—ফোর্সেস সিগন্যাল ইনফরমেশন ব্যুরো। মামুন খালেদের নাম শুনছেন? তাকে আইনা এফএসআইবির প্রধান বানানো হইল। এরা মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করত। আরেকটা ছিল ফরেন লিয়াজোঁ ব্যুরো—এফএলবি। এদের কাজ ছিল এমবেসিগুলোর সাথে, বিদেশে বাংলাদেশের যত এমবেসি আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। এরপর হলো এফআরএবি—ফোর্সেস রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ব্যুরো। টোটাল সাতটা ব্যুরো।

আমার কাজ ইন্টারনাল। ইন্টারনাল ইন্টেলিজেন্স কালেক্ট করা, যেখানে যেটা প্রযোজ্য—জানানো এবং ডিজিকে পলিসি ম্যাটারে হেল্প করা। আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, পুলিশ, বিডিআর—এগুলোর মধ্যে ইন্টেলিজেন্স করা, মানে তাদের খোঁজখবর রাখা। এদের মধ্যে সাবভার্সিভ কিছু হয় কি না, সেটার খোঁজ রাখা। অন্যান্য দেশের ইন্টেলিজেন্সি, যা আমাদের দেশকে এফেক্ট করে, তার খোঁজ রাখা, নিজের দেশের আর্মড ফোর্সেসের নিরাপত্তা বিধান করা—ইন্টেলিজেন্স পয়েন্ট অব ভিউ থেকে। এগুলা হইল মেইন কাজ।

এখন বলবেন, আপনারা তাহলে পলিটিকসে কেন? আমাদের দেশের পলিটিকস কোনোভাবেই আর্মড ফোর্সকে এড়াইয়া হয় না। প্রত্যেকটা সৈনিক তার নিজস্ব বাড়িঘরে যায়। তাদের আত্মীয়স্বজন আছে, বন্ধুবান্ধব আছে। পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিটিজ কী হচ্ছে না হচ্ছে, এসব তো এফেক্ট করে। আপনি জানেন, জাসদের রাজনীতি কীভাবে আর্মির ভিতরে ঢুকছে, আর্মির ভিতরে এতগুলো ক্যু হইছে, অনেক জিনিসই জানেন। এসব

নজরদারির মধ্যে রাখা। কেউ বিদেশ যাবে, এটা ক্লিয়ারেন্স করার দায়িত্ব হইল এফসিআইবির। তারপর মনে করেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যা দেখি—হস্তক্ষেপ করা না। একজনকে হয়তো প্রধান বিচারপতি বানাবে। ডিজিএফআই যেহেতু একটা ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন, তার তো নেটওয়ার্ক আছে। আইনজীবীদের মধ্যে আছে, সাংবাদিকদের মধ্যে আছে। আসল খোঁজটা পাওয়া যায়। ওই সব দায়দায়িত্ব ছিল এফসিআইবির।

মিডিয়া কন্ট্রোল করত এফএসআইবি। পলিটিশিয়ানদের গুড হিউমারে রাখার দায়িত্ব ছিল আমার। কিন্তু আমি যেখানে যেখানে কথা বলছি, সামহাউ ব্রি. আমিন—হাসিব নামে জাসদের আরেকজন, হাসিবরে সে নারিশ করত। হাসিবরে দিয়া ওইখানে একটা কাউন্টারঅ্যাক্ট করা হইত। ওইখানে একটা জেলাসি। পলিটিশিয়ানরা আমারে ভালো চিনত।

মহিউদ্দিন : হাসিবের কানেকশনটা ছিল তাহলে আমিনের সঙ্গে?

বারী : হ্যাঁ, আমিনের সঙ্গে। এ ছাড়া আরেকটা জিনিস—জাগো বাংলাদেশ নামে একটা ইয়ে হইছিল বিদেশে। এই ব্যাপারে আমার জিরো নলেজ। এগুলো আমিন আর সেনাপ্রধান করাইত। আমি জানতাম না।[৫১]

সাবেক ছাত্রনেতা আবুল হাসিব খান ওই সময় 'সংস্কার আন্দোলন'-এর ব্যানারে ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে অনেকগুলো সভার আয়োজন করেছিলেন। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমর্থনে এবং প্রশ্রয়ে সভাগুলো হয়েছিল। লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ডিজিএফআইয়ের একজন উপপরিচালকের মাধ্যমে ফোর্সেস কাউন্টার টেররিজম ব্যুরোর পরিচালক ব্রি. জে. আমিনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও কথা হয়। আমিন তাঁকে খরচপাতির টাকা দিতে চেয়েছিলেন, তবে তিনি সরাসরি টাকা নেননি। তাঁদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ডিজিএফআইয়ের লোক সভাগুলোতে হাজির হয়ে প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা দিত। মূলত জাসদ ঘরানার সাবেক ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের একটি অংশ এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছিল। তাঁরা রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষে কথাবার্তা বলতেন। অনেক জায়গায় তাঁরা স্থানীয় নেতাদের সাহায্য পেয়েছেন, যেমন পিরোজপুরে তাদের সভার আয়োজনে সাহায্য করেছেন সাবেক জাসদ নেতা মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন। খুলনায় এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন সাবেক জাসদ নেতা কামরুজ্জামান টুকু। উল্লেখযোগ্য যে জিয়াউদ্দিন এবং টুকু দুজনই ওই সময় আওয়ামী লীগে ছিলেন।[৫২]

বহুল আলোচিত 'মাইনাস টু' আর 'রাজনৈতিক সংস্কার' প্রক্রিয়া একাকার হয়ে গিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার বারীর ভাষ্যে বোঝা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে তিনি অনেক কিছুই করেছেন তাঁর নিয়মিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে। এসব কাজে সেনাপ্রধানের আদেশ কিংবা প্রশ্রয় ছিল বলে তিনি দাবি করেছেন। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকেও যোগাযোগের মাধ্যমে ডিজিএফআইয়ের হস্তক্ষেপের পথটি আরও মসৃণ হয়েছিল বলে তাঁর কথায় বোঝা যায়।

জেনারেল মইন এক সপ্তাহের সফরে ১৭ অক্টোবর ২০০৭ নিউইয়র্ক পৌঁছান। ১৮ অক্টোবর নিউইয়র্কের একটি রেস্তোরাঁয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক সমাবেশে তিনি বলেন, 'দেশ ১১ জানুয়ারির আগের অবস্থায় আর ফিরবে না।' বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'অনেকেই প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশে নেতা কোথায়? দেশ চলবে কার নেতৃত্বে? আমি বলি সৎ ও জাতির কাছে দায়বদ্ধ অনেক নেতাই আছেন। তাঁদের বের করে নিয়ে আসতে হবে। দেশে নেতৃত্বের অভাব আছে বলে আমি মনে করি না।' ১১ জানুয়ারির আগের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মইন বলেন, 'রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রধান দুই দল দুর্নীতিতে সহযোগিতা করেছে একে অপরকে। এ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে, যা রীতিমতো অবিশ্বাস্য। সময়ে এ সবই প্রকাশ করা হবে জাতির সামনে।' দুই বছর পর সংস্কার ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বর্তমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভালো লোকজন নেতৃত্বে আসবেন। দেশে নেতৃত্বের কোনো সংকট নেই, অপনেতৃত্বের কারণে ভালোরা সুযোগ পাচ্ছিলেন না।[৫৩]

মইনের কথাবার্তায় এটা পরিষ্কার যে দেশে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরির সুযোগ আছে এবং এ সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে।

১৯ অক্টোবর নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন জেনারেল মইন। বাংলাদেশে 'মাইনাস টু ফর্মুলা' অনুসরণ করা হচ্ছে উল্লেখ করে এবং এটি 'পাকিস্তানি স্টাইল' কি না—এ প্রশ্নের জবাবে মইন বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে যদি কেউ আমাদের সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করে।' তিনি আরও বলেন, '১৫ কোটি মানুষের দেশে যোগ্য নেতৃত্ব নেই, এটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। সৎ ও যোগ্য নেতা অবশ্যই আছে, তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে।' নির্বাচনের এখনো ১৪ মাস বাকি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সময়ে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটি ইতিবাচক অবস্থানে দাঁড়াবে। 'সাধারণ

মানুষের জন্য সঠিক নেতৃত্ব বাছাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমাদেরই।'[৩৪]

জেনারেল মইন কিন্তু বিকল্প নেতৃত্ব তৈরির ব্যাপারে তাঁর সংশ্লিষ্টতা বা দায় স্বীকার করেননি। তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা না করে গোয়েন্দা সংস্থার 'অতি উৎসাহীরা' কিছু কিছু কাজ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বয়ান উঠে এসেছে লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। 'মাইনাস টু' শব্দটিও মিডিয়ার তৈরি বলে তিনি উল্লেখ করেন :

মইন ইউ আহমেদ : এই যে কথাটা এসেছে, 'মাইনাস টু', এটা মানুষের মুখ থেকে এসেছে। এটা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আসেনি। পেপারে আসছে, মিডিয়াতে, এই দুই নেত্রী ছাড়া দেশে পলিটিকস করা ডিফিকাল্ট। আনলেস সামবডি ইজ রিয়েলি গুড, রিয়েলি আর্ন দ্য হার্ট অব দ্য পিপল। আমাদের দেশটা তো আসলে খুব ভালো। মানুষ খুব সরল। বুঝাইলে বুঝে। এভরিথিং ইজ ওকে। এই মানুষগুলোকে চালাবার জন্য ভালো নেতৃত্ব দরকার, অ্যাট অল লেভেলস। শুধুমাত্র প্রাইম মিনিস্টার না। আমার ব্যক্তিগত মতামত, উই নিড গুড লিডারশিপ অ্যাট অল লেভেলস। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে এসে জনগণের জন্য কাজ করা। এলাকার জন্য কাজ করা।

মহিউদ্দিন আহমদ : ক্রিমিনাল কেসগুলো থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হলো কেন?

মইন : এটা করা হয়েছে যখন সিদ্ধান্ত হলো ইলেকশনে যাবে। ফ্রি, ফেয়ার, ক্রেডিবল ইলেকশন। কেয়ারকেটার গভমেন্ট বা সেনাবাহিনী থেকে কেউ ইলেকশন করবে না। আমরা ইলেকশনে পার্টিসিপেট করব না। ইন্টেলিজেন্স থেকে কিছু লোক কিছু কেচ্ছা তৈরি করেছিল যে আর্মি পার্টি আসবে, ইলেকশন করবে। পুরোপুরি মিথ্যা প্রচার এটা। আমি যখনই এটা জানতে পারলাম, এটা বন্ধ করলাম। নো ফান্ডিং, নাথিং। তারপর আস্তে আস্তে দেখা গেল, তারা ইলেকশনে পর্যন্ত টেকেনি। তারা চেয়েছিল যে কেয়ারটেকার গভমেন্ট তাদের সাপোর্ট করবে, সেনাবাহিনী সাপোর্ট করবে। ইট উড নেভার ওয়ার্ক এবং আমরা তা কখনোই করব না।

মহিউদ্দিন : মেজর জেনারেল ইবরাহিমকেও খুব ভোকাল দেখেছিলাম।

মইন : ওই যে বললাম না? যে যেখানে পেরেছে...।

মহিউদ্দিন : আপনি তো আগাগোড়া একজন প্রফেশনাল সোলজার?

মইন : আমি চেষ্টা করেছি।

মহিউদ্দিন : আপনি বলেছেন, মিলিটারি লাইফের বাইরে আপনি চিন্তা করেন নাই। কিন্তু একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়লেন আপনি। বা একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হলো, যেখানে আপনাকে হস্তক্ষেপ করতে হলো। এ ধরনের টারময়েলিং সিচুয়েশনে অনেক সিজনড পলিটিশিয়ানও ভালনারেবল বোধ করে। একটা নন-পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে এ ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে হ্যান্ডেল করলেন বা সামাল দিলেন?

মইন : অ্যাগেইন, ইফ ইউ রিমেইন ইন ইয়োর মিশন, দেন ইউ উইল বি ইন দ্য রাইট ট্র্যাক। আপনার মিশনটা যদি ঠিক রাখেন, তাহলে আপনার ডানে-বাঁয়ে যাওয়ার চান্স কম। যদি আপনি পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করেন—এর আগের দুটো সামরিক সরকারের কথা চিন্তা করুন—হাউ দে বিকেম দ্য সিভিল গভমেন্ট। ওনারা পার্টি তৈরি করেছেন, লোকজনের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। আমার লক্ষ্য ছিল পরিষ্কার। আমি একটা ফেয়ার, ফ্রি, ক্রেডিবল ইলেকশন করব। আমি ওটা থেকে সরে আসিনি।

মহিউদ্দিন : কিন্তু গুঞ্জন ছিল ওই শব্দটা নিয়ে—কিংস পার্টি। মানে দ্য পার্টি ইজ বিইং ফর্মড উইথ দ্য প্যাট্রনেজ অব দ্য...

মইন : কিং। এগুলো মানুষের বানানো। কিংস পার্টি—আমি তো পরে শুনেছি।

মহিউদ্দিন : যাদের নিয়ে এগুলো হয়েছে, তারা তো অনেকেই জনগণ দ্বারা বাতিল, পলিটিক্যালি তারা তো বিক্রয়যোগ্য ছিল না।

মইন : ট্রু। তাদের ক্রেডিবিলিটি এস্টাবলিশ করার জন্য তারা আমাদের নাম বিক্রি করেছে। তাদের তো নিজেদের কোনো ক্রেডিবিলিটি ছিল না। তাদের পার্টির গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য তাদের একটা প্ল্যাটফর্মের দরকার ছিল। তাই তারা আমাদের ব্যবহার করেছে। যখন জানতে পারলাম, আমি তখনই ওই প্ল্যাটফর্ম বাতিল করে দিয়েছি। আমাদের যদি ইচ্ছা থাকত, তাহলে তাদের আরও টেম্পারিং করতাম।

মহিউদ্দিন : তারা তো কোনো না কোনো এজেন্সির কাছ থেকে সাপোর্ট পেয়েছে। এরা কি এতই বোকা? এরা কি দেখে না যে মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নেই? তর্কের খাতিরে বলি, ধরুন, মান্নান ভূঁইয়ার মতো একজন সিজনড পলিটিশিয়ান তার পার্টির মধ্যে একটা উদ্যোগ নিয়েছে। তাকে লোকজন চেনে একজন সফল রাজনীতিবিদ

হিসেবে। আলটিমেটলি হয়তো চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। বাট দে হ্যাভ সাম ক্রেডিবিলিটি। ফেরদৌস কোরেশীর তো কিছুই নেই। তারা কোথা থেকে এ সমস্ত লোক বের করে? তারা আর লোক পেল না?

মইন : আপনাকে একটা উদাহরণ দিই। পার্লামেন্টারি ইলেকশনে একজন প্রার্থী বলছে যে আমি শিয়োর জিতব।

ডিওএইচএস ছিল কনস্টিটুয়েন্সি। ইলেকশন হয়ে গেল, ভোট কাউন্ট হলো, সে পেয়েছে ১৩টা ভোট। তার বাসায় সব মিলে ১৫ জন মেম্বার। দুইজন তাকে ভোট দেয়নি। আমাদের অবস্থা হয়েছে এ রকম। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমি বিরাট পলিটিশিয়ান হয়ে গেছি। মুখে বলতে তো কোনো অসুবিধা নেই। আর ইনিশিয়ালি তো খুব সেল করেছে যে আমাদের সঙ্গে আছে।

মহিউদ্দিন : ওই সময় সবচেয়ে আলোচিত সাবজেক্ট ছিল 'মাইনাস টু'। এর ব্যাখ্যা কী?

মইন : এটা মানুষে বের করেছে। আমরা বলিনি 'মাইনাস টু'। বুদ্ধি দেওয়ার লোকের তো অভাব নেই? কত রকম বুদ্ধি? বুদ্ধি-টুদ্ধি দিয়ে লাস্টে বলে, আই নিড দিস, আই নিড আ প্রেস, আই নিড আ টিভি স্টেশন। প্রথমে আমি বুঝিনি। পরে দেখলাম আরে, এটা তো একটা নতুন জিনিস? গল্প-টল্প করে বলে। তারপর বলে, সব ঠিক হয়ে যাবে, মাইনাস টু করে দেন।

মাইনাস টু ইজ নট দ্যাট ইজি। কীভাবে করবেন? পার্টি থেকে বের করে দেবেন? পারবেন না তো? দুইজনের কাছে দুইটা ছাতি আছে। বিরাট ছাতি। বিগ আমব্রেলা। এই ছাতিটা তো ওনাদের কাছে? নোবডি ক্যান টেক ইট ফ্রম দেম।

আরেকটা জিনিস আমি বুঝে গেছি। বিএনপি ওয়ান্টেড টু ব্রেক ইনটু টু। তারা লিস্ট নিয়ে এসেছে। তাদের যত পার্লামেন্ট মেম্বার—১১২ জনের লিস্ট নিয়ে এসেছে, দে আর কামিং টু জয়েন। তাদের লিডাররা বলছিল, দে আর গুড পিপল, খুব ভালো হবে। বললাম, যান আপনারা। ফিল্ডে কাজ করেন। তারপর আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যে 'ওরা তো ওই জায়গায় যেতে পারবে না। আপনাদের প্রটেকশন লাগবে'। হোয়াট? আমাদের প্রটেকশন লাগবে? তাহলে তো ইউ পিপল আর নট—বুঝে গেছি, এদের দ্বারা কিছু হবে-টবে না। যে লোক নিজের কনস্টিটুয়েন্সিতে যেতে পারে না, ল এনফোর্সিং এজেন্সির সাপোর্ট চায় নিজেদের সিকিউরিটির জন্য, তারা কী করবে?

মহিউদ্দিন : এ সময় আরেকটা বিষয় এল, কিংস পার্টি, ফেরদৌস কোরেশী।

মইন : এটা হচ্ছে একটা ইনিশিয়েটিভ, টেকেন বাই ওয়ান অব দ্য অর্গানাইজেশনস। ওরা করেছে। আমি কাউকে বলিনি। কারণ, আমার পরিষ্কার লক্ষ্য ছিল, আমি কী করতে যাচ্ছি। আমি যদি চাইতাম, প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার হয়ে পাঁচ বছর—আই কুড ইজিলি ডু ইট। এটা কোনো ব্যাপার ছিল না। বাট আই নেভার ওয়ান্টেড দ্যাট। ওই সময় জানতে পেরেছি, ভেতরে ভেতরে একটা ইন্ট (ইন্টেলিজেন্স) অর্গানাইজেশন এদের ক্রপ আপ করেছে। এদের সঙ্গে কথা বলেছে। আমি এটা জানতাম না। আপনার খেয়াল আছে কি না, এরা মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়েছে।

মহিউদ্দিন : হ্যাঁ, মানিকগঞ্জের দিকে বোধ হয়।

মইন : বিরাট মোটরবাইক মিছিল। মাই গড! হোয়াট দ্য হেল ইট ইজ? হু আর দে? ডেকেছি ইন্ট অর্গানাইজেশনের লোকদের। হোয়াট ইজ ইট? কে এসব করতে বলেছে?

হ্যাঁ, আপনি পলিটিক্যাল পার্টি করলে, পার্টি তো লাগবে, বেইজ তো লাগবে।

আমি কি কখনো বলেছি যে পলিটিক্যাল পার্টি বানাব? দিস ইজ দ্য এন্ড অব ইট। বাদ দাও এসব। তারপর আমি কোনো পাত্তাই দেইনি। তারা যদি পলিটিক্যাল পার্টি করতে চায়, করুক। হোয়াই আর দে পুলিং আর্মি উইথ দ্যাট? আর্মি এর মধ্যে নেই। আর্মি যাবে না ওদের সঙ্গে। কয়েক বছর পরে ওদের সেক্রেটারির সঙ্গে একটা বিয়েতে দেখা হয়েছে। বলে, আপনি তো আমাদের ধ্বংস করে দিলেন।

কীভাবে ধ্বংস করলাম?

এই যে আমাদের পার্টি...

আমি আপনাকে চিনি না, কোনো দিন দেখি নাই। আপনি ধ্বংস হলেন কীভাবে?

ওই যে বললাম, হি থট, সাম পিপল থট, আমরা সবকিছু চালাব, অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ অল দ্য গুড থিংস। যা হোক, পাত্তা পায়নি, টেকেওনি। দে ওয়ান্টেড টু ফ্লোট এভরিথিং ইন আওয়ার নেম। আমরা যদি চাইতাম, করতে পারতাম।

মহিউদ্দিন : এটাতে আপনার এজেন্সির লোকজন তো ইনভল্‌ভড ছিল? লেট মি শেয়ার। আমি মাহমুদুর রহমান মান্নার ইন্টারভিউ

করেছিলাম। ওনার নাম তো ওই সময় শুনেছি, আওয়ামী লীগের ভেতরে সংস্কারবাদী কে কে। তো উনি বললেন যে তাঁকে অফার দেওয়া হয়েছিল। উনি চৌধুরী ফজলুল বারীর কথা বললেন। পার্টি করতে হবে। চিফ হবেন আপনি। মান্না আমাকে বলেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'চিফ কি আমি'? বারী বলেছিল, 'না, আমাদের চিফ'। মান্না বলেছিলেন, 'তাহলে তো চিফের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে'। না, 'উনি এখন কথা বলবেন না'। এ রকম কথাবার্তা, মান্না আমাকে যা বলেছেন।

মইন : আমি এটা জানিও না। আর আমি বলিওনি কোনো দিন। এরা আগের হিস্ট্রিটা ধরে নিয়েছে। ডিজিএফআই আগে এ রকম পার্টি বানিয়েছে।

মহিউদ্দিন : বিএনপি, জাতীয় পার্টি...

মইন : একই স্টাইল। তারা ভেবেছে, লেট আস ওয়ার্ক ফর হিম (মইন)। হি উইল বি ভেরি হ্যাপি। আমি তো কাউকে বলিনি? বারীকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখেন? তখন ডিজি ছিল মে. জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ। মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। বলেছি নাকি যে পার্টি ফর্ম করো? সে ও অনেক কিছু জানত না।

মহিউদ্দিন : এরা যে এটা করল, এর সাহস বা সাপোর্ট পেল কোথায়?

মইন : আই ডোন্ট নো। ওই যে বললাম, ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। প্রেসিডেন্ট জিয়া করেছে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ করেছে। তারা ধরে নিয়েছে আমিও করব। আর মানুষ তো ইনস্টিগেট করে, বাইরে থেকে লোকজন।

মহিউদ্দিন : ওই সময় বেশি শুনেছি বারীর কথা, আমিনের কথা।

মইন : হতে পারে।

মহিউদ্দিন : সিরাজুল আলম খানের ব্যাপারটা...। উনি নিজে আমাকে বলেছেন।

মইন : কী বলেছেন?

মহিউদ্দিন : এটা বলেছেন বছরখানেক আগে। আগে শুনতাম এ রকম। গসিপ ছিল, হি হ্যাজ সাপোর্ট ফর ড. ইউনূস। তাঁর লেখায়ও আমি দেখেছি। উনি আমাকে বলেছেন, 'ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দীন তো আমার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়।' আমি ভাবলাম, এটা কি কোনো ফ্যামিলি কানেকশন, নোয়াখালী কানেকশন? আমি চিন্তা করেছি, কোনো রকম আত্মীয়তা আছে কি না। নাকি হাই-হ্যালো করেছেন, ওটা নিয়েই উনি...। কিন্তু তাদের পার্টির র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল মোটামুটি সবাই জানে যে আপনি তাঁর লোক বা সে আপনার লোক।

মইন : আমি লাইফে তাঁকে কোনো দিন দেখিনি। কোনো দিন কথা বলিনি। কোনো দিনও না। টেলিফোনেও না। প্রশ্নই ওঠে না। আমার একজন ক্লোজ জুনিয়র ফ্রেন্ড, তার সঙ্গে ওনার খাতির ছিল। উনি আমেরিকায় থাকেন। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খাতির ছিল। ২০০৭ সালে সে দেশে এল। সে আমাকে খুব রিকোয়েস্ট করল—দাদা, দাদা। কে দাদা? বলল যে সিরাজুল আলম খান, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চায়। কী ব্যাপার? না, জাস্ট এমনিই।

আচ্ছা, অলরাইট। ইফ ইউ কাম, আই উইল অ্যালাউ হিম। আদারওয়াইজ নট।

ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসব।

তো উনি নিয়ে এসেছেন। সাদা দাড়ি। তখন দুপুর। বাসায় কোনো গেস্ট আসলে আমার ওয়াইফ আপ্যায়ন করে...

মহিউদ্দিন : বাসায়?

মইন : বাসায়, শি ডাজ ইট অলওয়েজ। পরে বললেন, মুড়ি আছে? কিছু খেলেন না। শুধু মুড়ি আর পানি। অ্যান্ড জাস্ট নরমাল টক। হি নেভার গেভ মি অ্যানি অ্যাডভাইস। আর ওনার স্টাইলের কথা শুনে তো আমার কাজ হবে না। উনি তো প্রথম দিকে আসেননি, শেষের দিকে। তারপর কিছু কথা-টথা বলে চলে গেলেন। দ্যাটস ইট। নেভার এভার আই টকড টু হিম অ্যাগেইন।

মহিউদ্দিন : এমনি জাস্ট হাই-হ্যালো?

মইন : হাই-হ্যালো, ওই একবারই, ওই ভদ্রলোকের মাধ্যমে।

মহিউদ্দিন : কোনো রকম পলিটিক্যাল ডিসকাশন হয়নি?

মইন : কিচ্ছু না এখন যদি কেউ এ রকম বলে, আমার তো বলার কিচ্ছু নেই। কেউ কেউ তো বলে, আমি তিন শ-চার শ-দুই হাজার কোটি টাকা নিয়ে এসেছি। আমি মানুষকে বলি, এত টাকা, ইউ ক্যান নট কিপ ইন দ্য হাউস।

মহিউদ্দিন : ওনার সঙ্গে ডিজিএফআইয়ের কারও সঙ্গে কি একটা যোগসূত্র ছিল?

মইন : আই ডোন্ট বদার। ওনার যে চিন্তাধারা, ওইগুলো নিয়ে চিন্তা করার তো সময় নেই আমাদের। উই হ্যাভ মাচ ইম্পর্ট্যান্ট জব টু ডু। আমাদের এইম ইজ টু হ্যাভ অ্যান ইলেকশন।[৫৫]

ছয় মাসের বেশি জেলজীবন কাটিয়ে অক্টোবরে (২০০৭) ছাড়া পান

ব্যবসায়ী নেতা আবদুল আউয়াল মিন্টু। গোড়ার দিকে তিনি এক-এগারোর সমর্থক ছিলেন। পরে হয়রানির শিকার হন। শেষমেশ মুচলেকা দিয়ে তিনি নিস্তার পান। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৃশ্যত একটি গোলকধাঁধার মধ্যে পড়েছিল। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না, কীভাবে এ ঝামেলা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসা যাবে। ক্ষমতা নেওয়ার সময় সেনাবাহিনী তার 'এক্সিট প্ল্যান' ঠিক করে রাখেনি। বড় দুই রাজনৈতিক পক্ষ আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে কাবু করা যত সহজ মনে করেছিল, বাস্তবে হয়েছিল তার বিপরীত। অন্তরীণ দুই নেত্রীর ক্যারিশমা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে ছিল তাঁদের নিজ নিজ দল ও বলয়ের সংহতি, যেখানে বড়সড় ফাটল ধরানো সম্ভব হয়নি। এক-এগারোর কারিগরদের এখন দরকার 'ওয়ে আউট'। এই প্রশ্নটি ১২ জানুয়ারি (২০০৭) সকালেই করেছিলেন বিচারপতি কুদ্দুস চৌধুরী। জেনারেল মইন তখন কোনো জবাব দিতে পারেননি। এখন একটি পথ বের করার ফর্মুলা উদ্ভাবনের দায়িত্ব নিলেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। ৬ ডিসেম্বর ২০০৭ তিনি পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে একটি ধারণাপত্র 'কর্তৃপক্ষের' কাছে জমা দেন।[৫৬]

এখানে তিনি তিনটি বিকল্পের উল্লখ করলেও নিজ কোনো চূড়ান্ত মত দেননি। বিষয়টি বিবেচনার ভার তিনি সেনা নেতৃত্বের হাতে ছেড়ে দেন। ধারণা করা হয়, বিরাজমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা ছিল। মিন্টুর বক্তব্যে সমসাময়িক সেনামনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। ওই মনস্তত্ত্বে নানান বিকল্পের মধ্যে নির্বাচনী রোডম্যাপ, ঐকমত্যের সরকার, এমনকি পুরোদস্তুর সামরিক আইন জারি করার বিষয়টিও ছিল। প্রস্তাবিত বিকল্পগুলো ছিল এ রকম :

বিকল্প-১ : নির্বাচন

১. (ক) শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া জেলে থাকবেন। (খ) দুজনেরই সাজা হবে। (গ) দুজনের কেউই পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। (ঘ) তাঁদের দেশ ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না।

২. এর সম্ভাব্য পরিণতি হলো : (ক) দুদলেই মতামতের ভিত্তিতে বিভক্তি আসবে; এক অংশ চাইবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বা জিতে নেতাকে মুক্ত করতে। (খ) অন্য অংশটি বলবে নির্বাচন বর্জন করে রাজপথে আন্দোলন করে নেত্রীকে মুক্ত করতে হবে। নেত্রীকে বাদ দিয়ে নির্বাচনে জেতা যাবে না, সুতরাং নির্বাচনে না যাওয়াই ভালো। (গ) নির্বাচন বর্জনকারী অংশটি যদি বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে

নির্বাচনটি অগ্রহণযোগ্য ও হাস্যকর হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। বর্জনকারীরা বলবে যে সরকার অবৈধ এবং নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট।

৩. ঝুঁকি : (ক) সরকার যেকোনো একটি অংশের দিকে ঝুঁকে পড়বে। (খ) রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থকেরাই শুধু বিভক্ত হবে না, সরকারের মধ্যেও বিভাজন চলে আসতে পারে।

বিকল্প-২ : দুই নেত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া

১. সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে : (ক) দুই নেত্রীর সঙ্গে সমঝোতা, অথবা (খ) দুজনকেই দণ্ড দেওয়া। তবে সমঝোতা করাটাই হবে উত্তম। বোঝাপড়ার বিষয়গুলো হলো :

২. নির্বাচন কমিশনের যেকোনো নির্দেশ মানতে রাজনৈতিক দলগুলোকে বাধ্য করা।

৩. রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে সরকারের যেকোনো বিধান মেনে নেওয়া।

৪. সরকারের দেওয়া সব বিধান বা সংস্কার মেনে সংসদকে কার্যকর করা, দুর্নীতি কমানো।

৫. দুই নেত্রীর কেউই পরবর্তী পাঁচ বছরের মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী বা দলের প্রধান হবেন না। তাঁরা যদি নির্বাচনে প্রার্থী না হন, তাহলে তাঁরা সংসদ সদস্য বা প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।

৬. সংবিধান সংশোধনসহ সব বিধিবিধান গণভোটের মাধ্যমে পাস করিয়ে নেওয়া।

৭. নির্বাচনের আগে বা পরে একটি জাতীয় সরকার গঠনের বিষয়টি আলোচনা করা।

৮. দুই নেত্রী যদি এটা মেনে নেন, তাহলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তাঁদের জামিন হতে পারে। সমঝোতা করে তাঁরা ছাড়া পেয়েছেন, এমন ধারণা জনগণকে দেওয়া যাবে না।

৯. অন্য যে বিষয়গুলো নিয়ে দুই নেত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার : (ক) তাঁরা নতুন একজন রাষ্ট্রপতিকে মেনে নেবেন (প্রয়োজনে সংসদে আস্থা ভোটের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করতে হবে)। (খ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ মেনে নেবেন তাঁরা। (গ) জরুরি অবস্থা জারি থাকাকালীন সব বিধিবিধান তাঁরা প্রত্যয়ন করবেন।

১০. যদি উভয় নেত্রী উল্লিখিত বিষয়গুলো মেনে নেন, তাহলে সরকার

নির্বাচনের সময় কোনো বিশেষ একটি দলের পক্ষ নেবে না।

১১. দুই নেত্রী যদি সবকিছু মেনে নেন, তাহলে নির্বাচনের আগেই একটি সর্বদলীয় সরকার অথবা জাতীয় সরকার গঠন করা যেতে পারে এবং নির্বাচনের পরেও এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকতে পারে।

১২. নেত্রীরা যদি এসব মেনে না নেন অথবা যদি যেকোনো একজনের সঙ্গে বোঝাপড়া না হয়, তাহলে অন্যজনের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩. দুই নেত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে খুবই কুশলী হতে হবে এবং সততা থাকতে হবে। এঁদের সঙ্গে যাঁরা বোঝাপড়া করবেন তাঁরা যেন কাউকে বিভ্রান্ত না করেন। অনেক সময় আলোচনাকারীর কারণে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

১৪. যদি বোঝাপড়া একান্তই না হয়, তাহলে নেত্রীরা যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন এবং নির্বাচন পর্যন্ত তাঁদের সেখানেই রেখে দেওয়া হবে। তবে এটা একটা ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে পারে।

১৫. বোঝাপড়া হতে হবে উভয়ের সঙ্গে অথবা কারও সঙ্গে না। যেকোনো একজনের সঙ্গে বোঝাপড়া হলে স্বল্প মেয়াদে লাভ হতে পারে, যেমনটি হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। তবে মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদে এর ফল খারাপ হতে পারে। তদুপরি, এর ফলে ভবিষ্যতে রাজপথে আন্দোলনের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

১৬. নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসবে, নেতাকে জেলে রেখে নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্নে দুটো দলের নেতারাই দুভাগ হয়ে যেতে পারেন : (ক) এক অংশ ভাববে, নির্বাচনে গিয়ে নেতাকে মুক্ত করাই হবে উত্তম। (খ) অন্য অংশটি ভাববে নেতাকে মুক্ত করার জন্য নির্বাচন বর্জন করাই হবে শ্রেয়।

১৭. কোন অংশটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, তা এখন বলা খুবই কঠিন।

১৮. সরকার বিপজ্জনকভাবে কোনো এক অংশের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে।

১৯. যদি দলের মধ্যে এ ধরনের বিভাজন থাকে এবং সরকার যদি কোনো একটি অংশের প্রতি পক্ষপাত দেখায়, তাহলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা রাজনৈতিক দলগুলোর যেকোনো একটি অংশের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন, বিশেষ করে ওই দেশগুলো, বাংলাদেশে যাদের কৌশলগত স্বার্থ আছে। যারা বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী, তারা

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায়।

২০. নির্বাচন যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়ে প্রহসনমূলক হয়, তাহলে দেশের ভবিষ্যতের জন্য তা খুবই ক্ষতিকর হবে।

২১. দুই নেত্রীকে বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে জোরাজুরি করা ঠিক হবে না। দেশে মুক্ত থাকার চেয়ে বিদেশে থেকে তাঁরা বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারেন।

২২. সরকার যদি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নির্বাচনের পরে সবাইকে নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে উত্তেজনা হ্রাস পাবে।

বিকল্প-৩ : বিস্তারিত কৌশল

১. সামরিক আইন জারি করা।
২. সংবিধান স্থগিত করা।
৩. জরুরি অবস্থায় জারি করা সব প্রজ্ঞাপন সামরিক আইনের আওতায় নিয়ে আসা।
৪. সংবিধান সংশোধনের জন্য নতুন অধ্যাদেশ জারি করা।
৫. রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেবেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।
৬. সবকিছুই ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে করা যেতে পারে।
৭. দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে গ্রাম ও ছোট শহরগুলো থেকে সামরিক আইন তুলে দিয়ে প্রধান শহরগুলোতে (সিটি) তা বহাল রাখা।
৮. প্রতি সপ্তাহে একটি বড় শহর থেকে সামরিক আইন তুলে নেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত ঢাকা শহরে, ধরা যাক ১৫ সপ্তাহ পর্যন্ত, তা বহাল রাখা।
৯. প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পরবর্তী মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হিসেবে থেকে যাওয়া এবং সামরিক আইন অধ্যাদেশগুলোকে গণভোটের মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া।
১০. প্রস্তাবিত নির্বাচনী রোডম্যাপ অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া।

সামরিক আইন জারির সুযোগ আর নেই

২০০৬ সালের ৩১ অক্টোবর সামরিক আইন জারি হলে তা যুক্তিযুক্ত হতো। সামরিক আইন জারির পক্ষে অনুকূল অবস্থা ছিল মার্চ/এপ্রিল ২০০৭ পর্যন্ত। যেমন :

১. এপ্রিলে প্রধান নেতাসহ রাজনীতিবিদেরা অনেক চাপের মধ্যে

ছিলেন, বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিলেন।

২. দুই প্রধান নেতাসহ রাজনীতিবিদেরা অনেক চাপের মধ্যে ছিলেন, বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিলেন।
৩. রাজনৈতিক দলগুলো ছিল পুরোপুরি অকার্যকর।
৪. মার্চ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।
৫. জনগণ পরিবর্তন এবং সংস্কার চাচ্ছিল। তারা সমর্থন দিত।
৬. ওই সময় বিদেশিরা হয়তো স্বল্প মেয়াদের জন্য সামরিক শাসনকে মেনে নিত।

এখন আর এটা সম্ভব না

১. জনসমর্থন কমে গেছে।
২. সেনাবাহিনীর সবাই এটা সমর্থন করবে বলে মনে হয় না। সেনাবাহিনীর অনেক ইউনিট দীর্ঘদিন ফিল্ড অপারেশনে থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।
৩. নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে এবং তারা নির্বাচনের তারিখও বলে দিয়েছে।
৪. বিদেশিরা এটা সম্ভবত সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে।
৫. চাল-ডাল-পেঁয়াজ—এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম অনেক বেড়ে গেছে।
৬. গত দশ মাসে অনেক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে।
৭. রাজনৈতিক দলগুলো নিষ্ক্রিয় থাকলেও কর্মী মহলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।
৮. বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে।
৯. অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগ হচ্ছে না এবং বেকারত্ব বেড়ে গেছে।
১০. অর্থনীতির সূচকগুলোর বেশির ভাগই নিম্নগামী।
১১. খাদ্য ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী।
১২. সামরিক শাসন জনগণ ও সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে।

ঝুঁকি

১. যদি এখন সামরিক আইন জারি করা হয়, তাহলে জনগণ তাদের গত এক বছরের সব সমস্যা ও দুর্গতির জন্য সেনাবাহিনীকে দায়ী করবে।

২. একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীর মধ্যে শতভাগ একতা থাকতে হবে। তাদের মধ্যে বিভাজনের ফল হবে খুবই খারাপ—শুধু সেনাবাহিনীর জন্য নয়, দেশের জন্যও।
৩. এ ধরনের অনৈক্য সার্বভৌমত্বকে ঝুঁকিতে ফেলবে।[৫৭]

উল্লিখিত প্রস্তাব ও মতামতের সূত্র ধরে বোঝা যায়, সেনা নেতৃত্বের মনোভাব কী এবং কী ধরনের বিকল্পের সন্ধান করছেন তাঁরা। মনে হয়, দুই প্রধান নেত্রীকে বাদ দিয়ে দুই দলের অন্য নেতাদের নিয়ে আপস-আলোচনার মাধ্যমে একটি অসামরিক সরকার বা জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজনীতিবিদেরা যদি সমঝোতায় না আসেন, তাহলে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে চরমপন্থার দিকেও ঝুঁকতে পারে সেনা নেতৃত্ব।

বাংলাদেশের রাজনীতির দুই শীর্ষ নেত্রী গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁদের নিজ নিজ দলে অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠা যেমন বেড়েছে, এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে বাইরেও। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী ১ মে ২০০৮ মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টির সঙ্গে দেখা করে দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অব্যাহত জনপ্রিয়তা এবং তাঁদের আটক থাকা অবস্থায় গণতন্ত্রের ধারায় দেশটির ফিরে আসার ব্যাপারে উদ্বেগ জানান। হাইকমিশনার চক্রবর্তী বলেন, দুই নেত্রীকে রাজনীতি থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে কোনো লাভ হবে না। আটক থাকা অবস্থায় তাঁদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং 'পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত দুই ভদ্রমহিলার মুক্তির দিকেই গড়াবে।' ৫ মে ২০০৮ ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এক তারবার্তায় চক্রবর্তী-মরিয়ার্টি সংলাপের তথ্য উঠে এসেছে। তারবার্তায় পিনাক চক্রবর্তীকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পেছনের সামরিক বাহিনী হাসিনা ও খালেদাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, বিশেষ করে তাঁদের বিচার শেষ হওয়ার আগে। মরিয়ার্টি আশঙ্কা জানিয়ে বলেন, বিচার শেষ না করে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হলে অতীতে তাঁদের 'চরম দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের সময় দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, এসব অপরাধ করার যে বিচারহীনতার রাজনৈতিক সংস্কৃতি' চালু ছিল তা আবার ফিরে আসতে পারে। জবাবে পিনাক চক্রবর্তী বলেন, তিনি দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাহারের সুপারিশ করছেন না; তবে তিনি চান এই দুজনকে জামিন দেওয়া হোক যাতে তাঁরা একটু দম নেওয়ার সুযোগ পান। চক্রবর্তী আশঙ্কা জানিয়ে বলেন, আসন্ন সংলাপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতা না হলে সেনাবাহিনী জনগণের ইচ্ছার

বাইরে চলে যেতে পারে। পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের জন্য ডিজিএফআই প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ করছে বলে খবর আছে এবং রাজনীতিতে সামরিক গোয়েন্দাদের কলকাঠি নাড়ানোর ঝুঁকি সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার।[৫৮]

মরিয়ার্টির সঙ্গে আলোচনার সময় চক্রবর্তী জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে বলেন, 'জামায়াত সংশোধনাতীতরূপে ভারতবিরোধী' এবং সংগঠিত ক্যাডার বাহিনী নিয়ে এই দলটি আদেশ পেলেই রাস্তায় নেমে পড়ে; এদের কোনো রকম সুযোগ দেওয়া উচিত না। তিনি আরও বলেন, ভারতের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীরা' বাংলাদেশের ভেতর থেকে ভারতে আক্রমণ চালায়, অথচ বাংলাদেশ সরকার এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কথা অস্বীকার করে। চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ দমনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মিলে কাজ করতে ভারত স্বচ্ছন্দবোধ করে, কিন্তু এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার অগ্রগতি খুবই শ্লথ। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল মইনের ভারত সফর ছিল সন্ত্রাসবাদবিরোধী সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভালো পদক্ষেপ, যদিও কয়েকজন দাগি অপরাধীকে ভারতের কাছে হস্তান্তরের ব্যাপারে বাংলাদেশ সাড়া না দেওয়ায় তিনি হতাশ। চক্রবর্তীর মত হলো, জেনারেল মইনের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। তবে তিনি উর্দি ছেড়ে রাজনৈতিক পদ নেওয়ার চেষ্টা করলে ভারতের জন্য তা সমস্যা হবে না।[৫৯]

মরিয়ার্টির বার্তায় বলা হয়, ভারতবিরোধী দল বিএনপির নেতা খালেদা জিয়ার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল হালকা ধাঁচের, কিন্তু ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগের নেতা শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা অটুট আছে বলে তিনি মনে করেন। চক্রবর্তীর আশঙ্কা হলো, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলে ইসলামি জঙ্গিদের পক্ষে বাংলাদেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ভারতে হামলা চালানো সহজ হবে। 'দুই নেত্রীকে সরিয়ে দিলে পরিবারতন্ত্রের ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো দুই দলের ব্যাপক জনপ্রিয়তায় ধস নামবে এবং এমন পরিবেশ তৈরি হবে, যেখানে রাজনৈতিকভাবে জামায়াত লাভবান হবে।' অতীতের 'অকার্যকর' রাজনীতিতে দুই নেত্রীর দায় থাকলেও চক্রবর্তী তাঁদের ততটা সমস্যা হিসেবে দেখেন না। বরং দেশটি যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করছে, সেখানে দুই নেত্রীকে সমাধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেন তিনি।[৬০]

# ক্যাম্পাসকাণ্ড

রাজনীতির ডামাডোলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। অবরোধ-হরতালের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছিল সেশনজট। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে রোজা ও পূজার ছুটি মিলিয়ে ক্যাম্পাস বন্ধ ছিল এক মাস। জাতীয় রাজনীতিতে অস্থিরতা ও সহিংসতা বাড়তে থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় আর খোলেনি। শেষমেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালা খুলল ১৪ জানুয়ারি ২০০৭, সাড়ে তিন মাস বন্ধ থাকার পর। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকেই এক এক করে ফাঁস হতে থাকে নানান অনিয়ম, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির খবর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে দুটি বিজ্ঞাপিত পদে ৩০ জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তিনজনই জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য। নির্বাচন কমিটির সভা হয়েছিল রাত ১২টায়।[১]

২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পরীক্ষায় ২০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জনকে প্রথম শ্রেণি দেওয়া নিয়ে হইচই হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ধরনের মেধা বিস্ফোরণের নজির আর নেই। এ নিয়ে তদন্ত কমিটি হয়। তদন্তের ফলে অনেক ঘটনা বেরিয়ে আসে।[২]

১৫ মার্চ ২০০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় ভুয়া ভর্তি বিষয়ে একটি তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে ৩০ জন ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২২ জন লোকপ্রশাসন বিভাগে, ছয়জন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে এবং দুজন অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়েছিল।[৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে ভুয়া ভর্তির বেশির ভাগ ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠেছে। এই কোটায় সর্বাধিক আড়াই শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।[৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের মাঠে হলের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারেন না। কারণ হলো, হলের প্রভোস্ট মাঠটি রহমতগঞ্জ ক্লাবকে ভাড়া দিয়েছেন। বিকেল পাঁচটায় ছাত্ররা খেলার সুযোগ পান। মাঠ ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে প্রভোস্ট অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, 'এ থেকে মাসে আয় হয় ১৬ হাজার টাকা। হলের আয় হলের উন্নয়নেই ব্যয় করা হয়েছে।' তবে হলের হাউস টিউটর কে এম সাইফুল ইসলাম খান বলেন, 'হলের সম্পদ ব্যবহার ও বিক্রি করে প্রতিবছর কয়েক লাখ টাকা আয় হয়। এই টাকা কোথায় যায় এবং কী কাজে ব্যয় হয় তার সুস্পষ্ট তদন্ত হওয়া জরুরি।' কয়েকজন আবাসিক শিক্ষক ও কর্মচারী জানান, ২০০৪ সালের নভেম্বরে যোগ দেওয়ার পর প্রভোস্ট এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে ১২ জনকে নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁদের সবার বাড়ি একটি বিশেষ জেলায়। এসব নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের একজন আবদুল কাদের বলেন, 'আমার চাকরি এমনিতেই হতো। স্যার চাকরি স্থায়ী করে দেওয়ার কথা বলে আমাকে তাঁর আত্মীয়াকে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। বিয়ের এক বছর না যেতেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মামুলি ঝগড়ার জের ধরে তিনি আমাকে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করেন।'[৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ও ক্যানটিনে প্রায় ৮০০ নিরক্ষর শিশুশ্রমিক কাজ করে বলে জানা গেছে। মধুর ক্যানটিনের শ্রমিক নুরে আলমের বয়স ১০ বছর। সে শিক্ষার্থীদের পানি এগিয়ে দেয় এবং ধোয়ামোছার কাজ করে। তাকে দিনে শতাধিকবার টেবিল মুছতে হয়, আর পুরো ক্যানটিন মুছতে হয় দিনে দুবার। মুহসীন হলের ক্যানটিনে কাজ করে ছয় বছরের সৌরভ এবং সূর্য সেন হলের ক্যাফেটেরিয়ায় কাজ করে আট বছরের হৃদয়। তাদের কাজ পানি এগিয়ে দেওয়া ও টেবিল মোছা। মাস শেষে মাইনে জোটে ৩০০ টাকা। অনেক শিশু ক্যাম্পাসে সিগারেট, চকলেট কিংবা মালা বিক্রি করে। একটি শিশুকে বলতে শোনা গেল, 'ফুল আর চকলেট বেইচ্যা ভাত খামু।' তারা প্রতিদিন গড়ে ৮০ থেকে ১০০ টাকার কাজ করে। উপাচার্য এস এম এ ফায়েজ বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, শিশুদের নিয়ে আসে ক্যানটিন ও দোকানমালিকেরা, শিশুদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব তাদেরই।[৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল। ২০ আগস্ট ২০০৭ মাঠে ফুটবল খেলা চলার সময় সৈনিকদের সঙ্গে ছাত্রদের একটি বচসাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম ঘটে। হাতাহাতি-মারামারি তো হয়ই, এর প্রতিবাদে ছাত্ররা সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সেনাবাহিনী ও পুলিশের লোকেরা অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্যান্য শহরেও ছাত্রবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এর জের ধরে ঢাকা ও কয়েকটি বিভাগীয় শহরে কারফিউ জারি করা হয়।

২২ আগস্ট জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ অভিযোগ করে বলেন, 'দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলি ব্যবহার করে আজ কিছু অপশক্তি ও সুযোগসন্ধানী উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তারা নির্বিচারে সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে জনজীবনে নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।...উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সাধারণ জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং বেআইনি তৎপরতা বন্ধ করতে সান্ধ্য আইন জারিসহ কতিপয় ব্যবস্থা নিয়েছে।'[৭]

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে ছাত্রদের সরাসরি অভিযুক্ত করা হয়। বিষয়টি ছিল খুবই গোলমেলে। মনে হলো, সরকার নতুন একটি ফ্রন্ট খুলেছে এবং ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি বিবাদে জড়িয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য ছিল গতানুগতিক ধারার প্রেসনোটের মতো, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পুলিশ বিভাগ সচরাচর দিয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভ ও সহিংস ঘটনার সময় শিক্ষকদের বক্তব্য-বিবৃতিতে ছাত্ররা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল বলে পুলিশের মহাপরিদর্শক নূর মোহাম্মদ সাংবাদিকদের বলেন। ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 'ছাত্রবিক্ষোভের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছাত্রদের শান্ত না করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিষয়টিকে জটিল করেছেন।'[৮]

যৌথ বাহিনীর সদস্যরা তল্লাশি চালিয়ে অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক গ্রেপ্তার হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক বিবৃতিতে শিক্ষককে গ্রেপ্তার এবং শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে, নিরাপত্তা বাহিনীকে তরুণ সমাজের মুখোমুখি দাঁড় করানো ও ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।[৯]



পুলিশের নির্যাতনে আহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত 'বিক্ষোভ ও সহিংসতার' ঘটনায় ১৩টি মামলায় চারজন শিক্ষক, ১৫ জন ছাত্রসহ মোট ৩৬ জনকে আসামি করে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন আদালতে চার্জশিট দেওয়ার পাশাপাশি একটি মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়। মামলা হয়েছিল ৫৩টি। অভিযুক্ত ছাত্ররা হলেন ছাত্রদল ঢাবি শাখার সভাপতি হাসান মামুন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, কামরুল হাসান কচি, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক তানজিন চৌধুরী লিলি, রোকেয়া হল শাখার সভানেত্রী শাহিনুর নার্গিস, মনিরুজ্জামান তালুকদার, কামরুজ্জামান, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি অপর্ণা পাল, রিফাত হোসেন জিকু, নজরুল ইসলাম রাসেল, শামসুল কবির রাহাত, মিতুল ও ছাত্র ইউনিয়নের আজিজ হাসান।[১০]

'জরুরি বিধিমালা ভঙ্গ ও সহিংস ঘটনায় মদদ' দেওয়ার অভিযোগে রাজশাহীর অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম এক রায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষককে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটক শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে প্রধান উপদেষ্টা উপাচার্যকে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে *ইত্তেফাক*-এ ৬ ডিসেম্বরে ছাপা একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় :

> ...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ আগস্টের সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ২১ ও ২২ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ঘটনা ঘটানো হইয়াছে

তাহা মোটেও অভিপ্রেত ছিল না। জরুরী বিধিমালা লঙ্ঘন করিয়া সেইখানে উত্তেজক ব্যানার সম্বলিত মিছিল বাহির করা হইয়াছে। ডাকা হইয়াছে ছাত্র ধর্মঘট। পুলিশের সহিত ছাত্রদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটিয়াছে। ভস্মীভূত করা হইয়াছে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের একটি গাড়ি। আর ইহার বলি হইয়াছে একজন নিরপরাধ রিকশাচালক। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হইল, জরুরী বিধিমালার পরিপন্থী এই সব ঘটনায় জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন আমাদের সম্মানিত কয়েকজন শিক্ষকও। ক্যাম্পাসের অভিভাবকস্থানীয় হিসাবে যাহাদের দায়িত্ব ছিল পরিস্থিতিকে শান্ত ও স্বাভাবিক রাখা। প্রশ্ন উঠিতেই পারে এ ধরনের বেআইনী ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যুক্ত হইবেন বা কেন? শিক্ষকগণ অবশ্যই রাজনীতিসচেতন থাকিবেন। দেশ ও জনগণের কল্যাণে ভূমিকাও রাখিবেন। কিন্তু রাজনীতির যে দলাদলি দেশের পরিবেশকে বিষম করিয়া তুলিয়াছে সেইখানে তাঁহারা জড়াইয়া পড়িবেন কেন?[১১]

ছাত্রদের উসকানি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। অভিযুক্তরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সদরুল আমিন, সহসভাপতি অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন এবং অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক। এঁদের মধ্যে সদরুল আমিন বিএনপিপন্থী 'সাদা' দলের নেতা এবং বাকিরা আওয়ামী লীগপন্থী 'নীল' দলের নেতা হিসেবে পরিচিত। হারুন-অর-রশিদ ও আনোয়ার হোসেন গ্রেপ্তার হন ২৩ আগস্ট। সদরুল আমিন ও নিমচন্দ্র ভৌমিক পরে আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাঁদের আটক করা হয়। আটক অবস্থায় তাঁদের হয়রানি ও নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে তুলকালাম হলো, তার পেছনে শিক্ষক সমিতির কোনো কোনো নেতার উসকানি ছিল বলে একাধিক সূত্রে জানা যায়। অভিযোগের তির ছিল প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে। ৩০ আগস্ট আদালতে নেওয়ার সময় সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি যেন নিজের ঘাড়েই দোষ টেনে নিয়েছিলেন। টিভি চ্যানেলগুলোতেও তাঁর এই বক্তব্য প্রচার করা হয়। তিনি বলেন :

সেনাবাহিনী বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব ও সম্প্রীতির প্রতীক, সেই সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মের ওপর যদি কেউ আঘাত করে, সে সেনাবাহিনী মনে কেমন আঘাত পায় সেটা আমরা বুঝতে পারি। এই সেনাবাহিনীর

আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত করা হয়েছে। তারা যে অপমানিতবোধ করেছে সে জন্য আন্তরিকভাবে আমরা দুঃখিত। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক হিসাবে আমি ছাত্রদের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য ও সাধারণ সম্মানিত জওয়ান থেকে সেনাপ্রধান পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি অন্তস্তল থেকে ওই দিনের ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গ্লানিবোধ করি না, অপমানবোধ করি না এবং হীনমন্যতাবোধ করি না। সেনাসদস্যদের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য আমাদের কথার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের অন্তরের সে কথাটি গ্রহণ করবেন, তাদের মনে যে ভয়াবহ বেদনার সৃষ্টি হয়েছে সেটি তাঁরা ভুলে যাবেন।[১২]

শিক্ষকদের একটা বড় অংশ ছিল সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে। আর ছাত্ররা তো প্রায় সব সময়ই এস্টাবলিশমেন্টবিরোধী। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকে যে একটা দাবানল তৈরি হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। লেখকের সঙ্গে অধ্যাপক সদরুল আমিনের কথোপকথনে ওই পরিস্থিতির একটি ছবি ফুটে উঠেছে।

মহিউদ্দিন আহমদ: ওয়ান-ইলেভেনের পরে শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? ওয়ান-ইলেভেনকে তাঁরা কীভাবে দেখেছেন? আপনি কীভাবে দেখেছেন?

সদরুল আমিন: দেখেছি, এটা একটা ষড়যন্ত্র, গণতন্ত্রকে ব্যাহত করার জন্য এটা করা হয়েছিল। বিএনপির দোষ ছিল। কিন্তু এভাবে আসা ঠিক হয়নি। যেমন ক্লিনিং ড্রাইভ শুরু করেছিল, এটা মানুষ পছন্দ করে, খারাপ লোকদের ধরা। কিন্তু সবাইকে যদি ধরা শুরু করে দেয়, ভালো-খারাপ সবাইকে, তাহলে...। প্রথম দিকে যে এটা খুব আনপপুলার ছিল, তা কিন্তু না। কিন্তু যখন ওরা শেখ হাসিনাকে অ্যারেস্ট করল—আমি নিজেই কিন্তু মিটিং ডেকেছি, কনডেম করেছি, প্রটেস্ট করেছি এটা।

মহিউদ্দিন: শিক্ষক সমিতি থেকে?

সদরুল: হ্যাঁ, আমরা যে অ্যারেস্ট হলাম, তার আগেই কিন্তু এটা করেছি। সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল, আমি ফিলও করেছি এটা যে একজন পলিটিশিয়ানকে এভাবে হ্যারাস করতে পারে না। এটা তো কোনো পার্টির ব্যাপার না। শেখ হাসিনা ওয়াজ আ ফিগার।




ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ মিছিল

আমার মনে হয়েছিল, তারা তো পলিটিকস করবেই। তারা যদি আসে ভালোর জন্যই, দেশের জন্য যদি কাজ করে, সে রকম প্রস্তাব কিছু আসেনি। মনে হচ্ছে তারা থাকতেই এসেছে। তারপর অবজারভ করল, বিভিন্ন পয়েন্টে অনেকে সোলজার রাখা হয়েছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছে, জিমনেসিয়ামে। অনেক জায়গায় ওরা ছিল। আমার মনে হলো, সামথিং ইজ দেয়ার।

মহিউদ্দিন : ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যে ক্যাম্পটা ছিল, এটা কি ইউনিভার্সিটি অথরিটির অ্যাপ্রুভাল নিয়ে করেছে?

সদরুল : অ্যাপ্রুভাল ছাড়া তো কোনো কিছু হতে পারে না। ভিসি যে ছিল, নিশ্চয়ই তিনি এটা অনুমোদন করেছেন।

মহিউদ্দিন : আপনারা কি কখনো ভিসির কাছে জানতে চেয়েছেন, এই অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হলো কেন?

সদরুল : না। আমরা জানতে চাই নাই। এখানে তো অনেকেই আসে। এখানে ক্লিয়ারলি কিন্তু দুইটা গ্রুপ আছে। একটা টোটালি অ্যান্টি-আর্মি। আর্মিকে, ডিফেন্স সার্ভিসকে পছন্দ করে না। আরেকটা আছে, আপনি রিঅ্যাকশনারি বলতে পারেন বা কনজারভেটিভ বলতে পারেন, তারা কিন্তু বলে, তারা থাকবে। আমার কথা হলো, অল অর্গানস এখানে থাকবে, সবাই সরকারকে শ্রদ্ধা করবে। কেউ কাউকে ইনসাল্ট করবে না। আমি কিন্তু অ্যান্টি-আর্মি না। বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসল, এরশাদকে

হটানো হলো, সে সময় কিন্তু আমার কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল—জানি না আমি নামটা বলব কি না।

মহিউদ্দিন : বলেন।

সদরুল : আনোয়ার হোসেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যারের রুমে বসা ছিল। আমি ছিলাম। উনি বলল, আমাদের ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাওয়া উচিত। আমি বললাম, ক্যান্টনমেন্টে যাব কেন? আমি কি প্রেসিডেন্ট হব, প্রাইম মিনিস্টার হব? এটা তো হতে পারে না? হোয়াই শুড উই ডু ইট? ওয়ান-ইলেভেনের পরে, দেখেন আমি মনে করি, আর্মি যদি না থাকত, অন্য রকম টার্ন নিতে পারত। সেটা আমি চাইনি। এখানে যে-ই আসুক, বিএনপি হোক, আওয়ামী লীগ হোক, গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আসবে। এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছা ছিল। আমাকে যখন অ্যারেস্ট করল—আমার সাপোর্ট কিন্তু খুবই কম। আমার মেয়ে, ওয়াইফ, এ ছাড়া নোবডি ইজ দেয়ার। কোনো সাপোর্ট নেই।

মহিউদ্দিন : আপনাদের অ্যারেস্ট করে রেখেছিল কোথায়?

সদরুল : আমাকে তো পরে অ্যারেস্ট করল। আমাকে দু-তিন সপ্তাহ পর অ্যারেস্ট করল। আমি সারেন্ডার করলাম। তারপর স্ট্রেইটওয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল।

মহিউদ্দিন : আপনাদেরকে কি প্রথমে সারেন্ডার করতে বলেছিল?

সদরুল : না। যে সময় ইউনিভার্সিটিতে মুভমেন্টটা হলো, এখানে যখন খুব বেশি উত্তেজনা ছিল, থানা আক্রমণ করল, বিভিন্ন জায়গায় জ্বালাও-পোড়াও, তারপর দুদিন চলল এ কাজ। সেকেন্ড ডে-তে সন্ধ্যার সময় কারফিউ ছিল। আমার একটা ভাগনের অপারেশন ছিল। আমি ওখানে গেলাম। সারা রাত এখানে গন্ডগোল হলো। আমি ঢুকতে পারিনি ক্যাম্পাসে। মগবাজারে ছিলাম। পরের দিন ভিসির বাসা আক্রমণ করল। আমরা মিটিং করলাম। ছাত্ররা থানা আক্রমণ করল।

মহিউদ্দিন : থানা মানে, নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি?

সদরুল : হ্যাঁ, ওই পুলিশ ফাঁড়ি। এগুলো অ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট, অ্যান্টি-পুলিশ, অ্যান্টি-রেজিম—এটা তো আছেই। স্পেশালি এগুলো থাকেই। রাতে যে ঘটনা ঘটল, ভিসি ছিলেন না। উনি আমেরিকায়। সকালে এসে দেখি ওরা বাসার গেটে বোমা ফাটিয়েছে। বাসায় ছোট ছোট মেয়েরা ছিল, ওনার ওয়াইফ ছিল। এটাকে পলিটিক্যালি ডাইভার্ট করেছে। এখানে একটা মিলিটারিকে মারতে গিয়েছিল ভিসির বাসার সামনে। পলিটিক্যালি অনেকে এভাবে প্রিপারেশন নিয়েছে।

মহিউদ্দিন : উসকানি দেওয়া?

সদরুল : অবশ্যই। উসকানি বলেন, নিজের লাভের জন্য বলেন, এটা করেছে। অনেকে এটার মধ্যে সরাসরি ছিল। ছাত্রদের ডেকেছে, অনেককে ডেকেছে। তা না হলে এটা হতো না। পরের দিনের পরের দিন আমরা গেলাম, মিছিল করলাম এখানে। ওই দিন সকালে কিন্তু আর্মি সরে গিয়েছিল, ফার্স্ট আওয়ারে। আমাকে আগে এখানে রিং করেছে, কর্নেল হুদা, 'স্যার, আমরা তো চলে যাব, পানিশমেন্ট দেব ওদেরকে (সংশ্লিষ্ট সেনাসদস্যদের)। উই উইল জাস্ট ভ্যাকেট দিস প্লেস। এটা ট্যাকল করা সম্ভব না।' এরপর চলে গেছে। বুঝতে পেরেছে যে এটা অসম্ভব। দে শুড লিভ অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড দে ডিড ইট। পরদিন বিকেলে যাওয়ার কথা ছিল, ভোর পাঁচটার দিকেই চলে গেছে। যাওয়ার পর দেখলাম অনেক ছাত্র, এমনকি শিক্ষকও, জিমনেসিয়ামের গেটে গিয়ে লাথি দিচ্ছে। এটাকে কী বলব। অতি উচ্ছ্বাস, আবেগ বলব; কিংবা একটু পলিটিক্যাল আন্ডারকারেন্ট থাকতে পারে। আমি কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে বলেছি, তোমরা কেন এ রকম করলে? এটার তো দরকার ছিল না। দুই দিন আগে ভিসির বাসায় কেন অ্যাটাক করলে? তোমরা ক্যাম্পাসে কেন আগুন জ্বালাবে? এটা ঠিক না। ওরা কিন্তু রেডি ছিল যে তাদের ধরতে পারে। ওরা জানত। ওদের ধরার পর আমার বাসায় গেল। আমি ছিলাম না। আমার বাসায় আমার ওয়াইফ আর মেয়ে শুধু ছিল। অনেকেই এসেছিল, প্রায় ত্রিশজন। দরজা খুলতে চেষ্টা করল। আমার ওয়াইফ শেষে দরজা খুলল। খুবই ভয় পেয়েছিল।

মহিউদ্দিন : ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে?

সদরুল : ফুলার রোডের বাসায়। আমাকে খুঁজেছে, ছাদের ওপর খুঁজেছে, এমনকি বিল্ডিংয়ে যেখানে লেপ-তোশক রাখি সেখানে খুঁজেছে, আমি লুকিয়ে আছি কি না। পাশের বাসায় খুঁজেছে আমাকে ধরার জন্য। তো পায়নি। না পেয়ে চলে গেল। সকালে খবর পেলাম ওদের (আনোয়ার হোসেন ও হারুন-অর-রশিদ) অ্যারেস্ট করেছে।

সকালে নাশতা করে ক্যাম্পাসে গেলাম। আমাকে অনেকেই বলল, কেন আসছেন? অ্যারেস্ট করবে তো? বললাম, কেন অ্যারেস্ট করবে, অন্যায় তো করিনি? প্রফেসর আনোয়ার, হারুন তো কোনো অন্যায় করেনি। অ্যাসোসিয়েশনের পার্ট হিসেবে মুভমেন্ট করেছি।

শুক্রবার ছিল। বিকেলে প্রো-ভিসিকে বললাম, ওরা কোথায় আছে। বলতে পারল না। ফয়েজ সাহেবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। উনি তো

খোঁজখবর নিবেন। সেটা করেন নাই। আমি একটু শকড হলাম। আসিফ নজরুলের সাথে আলাপ হলো। বলল, স্যার, আপনি আসছেন কেন? এভাবেই কথাটা বলল। ল-ইয়ার মানুষ তো? বললাম অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে? বলল যে, না। বলল, আপনি চলে যান। সন্ধ্যার সময় পাশের গেট দিয়ে আমি চলে গেলাম। না হলে ওই দিনই আমাকে অ্যারেস্ট করত।

পনেরো-বিশ দিনের মতো বাসায় ছিলাম। ক্যাম্পাসে আসতাম। সিন্ডিকেট মিটিং করেছি, সব সময় থাকতাম ক্যাম্পাসে। কোনো না কোনোভাবে চলে যেতাম। ভয় পাইনি। খারাপ লাগত যে সবাই ডিন ছিলাম। আমি ডিন, প্রফেসর হারুন ডিন, আনোয়ার ডিন। আমাদের জায়গায় অন্য লোক আসবে কেন? কেন দায়িত্ব নিবে? সরকার যদি আমাদের অপদস্থ করে, অ্যারেস্ট করে, দুজন তো অলরেডি জেলে আছে, আমরা কিছু করতে পারছি না। অন্য লোক কেন আমাদের দায়িত্ব নেবে? একদিন মিটিং ছিল, ডিনস কমিটির। দেখলাম কেউ আসছে না। সোশ্যাল সায়েন্সের কেউ আসছে না। আরেফিন সিদ্দিক দায়িত্বে ছিল সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির। দেখলাম উনি আসছে। আমি খুব একটা পছন্দ করিনি। উনি তো না নিলেও পারত দায়িত্বটা। আমি জেলে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে দর্শনের আমিনুল ইসলাম আমার দায়িত্ব নেয়। আমি সমালোচনা করেছি। তিনজন ডিন আমরা নেই। চলবে কীভাবে কেউ দায়িত্ব যদি না নেয়? এটা আমাদের মধ্যে ছিল। আমি কিন্তু এটুকু বুঝি, আমার সহকর্মী কিংবা একই আদর্শে বিশ্বাসী, একটা লোক বিপদে পড়েছে, যত লাভই হোক, তার জায়গাটা কেন নেবে?

মহিউদ্দিন : আরেফিন সিদ্দিক সাহেব সোশ্যাল সায়েন্সের ডিনের দায়িত্ব নিলেন?

সদরুল : হ্যাঁ। আর্টসের দায়িত্ব বেশ কিছুদিন পরে আমিনুল ইসলাম সাহেব নিলেন।

মহিউদ্দিন : বায়োকেমিস্ট্রির?

সদরুল : নামটা ভুলে গেলাম আমি। বের করতে পারব। কাউকে বলিনি কথাটা। আমি কিন্তু এটা পছন্দ করিনি। আমি যদি হতাম, আমাকে যদি জড়াতও, আমি কিন্তু দায়িত্ব নিতাম না।

মহিউদ্দিন : এটাও কি একধরনের অপরচুনিজম?

সদরুল : অবশ্যই। আমি কিন্তু লোকটা এ রকমই। বিশ্বাস করেন, আপনি যে পজিশনে আছেন, কেউ যদি বলে আপনি হোন আরেকজনকে



এক-এগারো—২৩

সরিয়ে, আমি কি আপনাকে এটা বলতে পারি? কোনো টেম্পটেশনই পারত না, আমি নিতাম না এই দায়িত্বটা। আমি কিছুটা হার্ট হয়েছি। দায়িত্ব নেওয়াটা উচিত হয় নাই। দায়িত্ব না নিলে দেখা যেত কী হয়। তারপর দেখলাম ইউনিভার্সিটির কিছু টপমোস্ট ব্যক্তি, ওরা কোনো খোঁজখবরও নেয় নাই। নিজেরা তালে ছিল, কীভাবে কী করা যায়। সেটাতেও ব্যক্তিগতভাবে আমি হার্ট হয়েছি। সামান্য ফিলিং তো থাকা উচিত। আমার বেলায় কিন্তু অনেকেই গেছে। আমি কোনো পার্টির আদর্শে চলিনি। কারও ডিকটেশনে চলিনি। অন্য পার্টিতে ঠিকই কিন্তু ওরা পরামর্শে চলত। আমার একটা ইনডিপেনডেন্ট সত্তা ছিল। এটা ১৯৭৩ থেকে আছে। এখনো আছে। আমি চাই না যে কেউ আমাদের ডিকটেট করুক।

মহিউদ্দিন : আপনি সারেন্ডার করলেন কেন?

সদরুল : টিভিতে দিল যে আমাদের বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। পরের দিন ছিল শুক্রবার, তারপর শনিবার। বন্ধ ছিল কোর্ট। যেদিন কোর্ট খুলল, সেদিন আমি সারেন্ডার করলাম।

মহিউদ্দিন : আপনি কোর্টে সারেন্ডার করলেন?

সদরুল : হ্যাঁ, কোর্টে। ওখান থেকে আমাকে সোজা নিয়ে গেল জেলে। জেলে নেওয়ার পর সবাই বলল, আপনাকে কেন? অ্যাজ ইফ আমি ভিজিটর। বলে, আপনাকে কেন আনছে? আমি তো জানি কেন আনছে। অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখল। গেটের পাশে একটা রুম আছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার, সামথিং লাইক দ্যাট। আমি বুঝতে পারি নাই ব্যাপারটা কী। আমার ধারণা ছিল কি জানেন? আমাকে অ্যারেস্ট করবে। করার পর তিনজনকে একসঙ্গে ছেড়ে দেবে। নিমচন্দ্র ভৌমিক ওই সময় সারেন্ডার করে নাই। আমি মনে করেছি, ওদের তো জেলে অনেক হিউমিলিয়েট করেছে, আমি গেলেই সবাইকে ছেড়ে দিবে। এটা বিশ্বাস করেই কিন্তু আমি গেছি। আমি তো পালাতাম না? পালাব কেন? আমি তো কোনো দোষ করি নাই? তারপর বুঝলাম, ইন দ্য মিন টাইম, ফয়েজ সাহেব দরবার করেছিল ডিভিশন দেওয়ার। ওই দিন দেওয়া হলো। আগে থেকে কিন্তু ডিভিশন দেওয়া হয় নাই। আনোয়ার আর হারুনকে খুব খারাপভাবে ট্রিট করেছে। ওরা রিমান্ডেও ছিল কিছুদিন।

মহিউদ্দিন : টর্চার করেছে কি?

সদরুল : কিছু বলে না। অবশ্যই করেছে। যদি কয়েক ঘণ্টা বসিয়ে রাখে, রাত দুইটার সময় যদি হঠাৎ বলে, আসো, এটা টর্চার না? অবশ্যই

টর্চার। টন্টিংভাবে কথা বলা হয়, ইনসালটিংভাবে কথা বলা হয়। অবশ্যই এটা হিউমিলিয়েট করে। জেলেও ওদের খারাপভাবে রাখল। অর্ডিনারি সেলে, দুজন একসঙ্গে ছিল। ফ্লোরে ঘুমাত এবং অর্ডিনারি খাবার। আমি যেদিন গেলাম, সেদিন ডিভিশন। ডিভিশন মানে ঢাকা কলেজের পাশে যে ছোট ছোট সস্তা খাটো চৌকি পাওয়া যায়, এই টাইপের আরকি। এটাও খুবই পুরান একটা সেল, বাজে। ওইটাই ডিভিশন আরকি। রাতে খাবার ছিল না, রোজার সময় ছিল। জাহাঙ্গীর সাত্তার, পংকজ দেবনাথ—ওরা সবাই ছিল। ওরা খুবই আদর-যত্ন নিয়েছে। ওরা নিজেরা এসে আমার বিছানা ঠিক করে দিত। আবদুল আউয়াল মিন্টু লেপ নিয়ে, তোশক নিয়ে আমাকে বলল, স্যার, এগুলো নেন। আমরা রোজা রাখি আরকি। সবাই খোঁজ নেয়। খেয়েছি কি না কিছু। জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু আছে না, আওয়ামী লীগের, খোঁজখবর নিত। স্যার, আপনি খেয়েছেন? দেখো, আমি তো রাতে কখনো খাই না, শেষ রাতে ভাত খাই না। হয়তো পরাটা বা ফিরনি খাই। বলল, স্যার, আর কিছু নাই, আপনি এইটাই খান। এত বিশ্রী গন্ধ? মোটা চাল খেতে পারি, কিন্তু দুর্গন্ধ হলে খেতে পারি না। বললাম, না, খেতে পারব না। স্যার, একটু খান। বললাম, সরি। অ্যানিওয়ে, পরদিন থেকে ভালো খাবার আসছে। আমাদের এখানে অনেক পলিটিক্যাল প্রিজনারস ছিল। তারা নিজেরা রান্না করে খেত সবাই। ওখান থেকে আমাদের খাবার পাঠাত। এত দিন রাখবে ভাবি নাই।

মহিউদ্দিন : কত দিন ছিলেন?

সদরুল : আমরা তো ছিলাম প্রায় চার মাস।

মহিউদ্দিন : আপনাকে কি কখনো রিমান্ডে নিয়েছিল?

সদরুল : আমাকে রিমান্ডে নেয় নাই।

মহিউদ্দিন : নিমচন্দ্র ভৌমিক সারেন্ডার করল কত দিন পর?

সদরুল : আরও পরে।

মহিউদ্দিন : উনি কি অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ মেম্বার ছিলেন?

সদরুল : না, জাস্ট অর্ডিনারি মেম্বার।

মহিউদ্দিন : তাহলে তাঁকে কেন?

সদরুল : ওকে ধরার কারণই নেই। ওকে ওরা মনে করছে ইন্ডিয়ান সর্ট অব সাপোর্ট আছে। পরে দেখল...

মহিউদ্দিন : নাম দেখেই?

সদরুল : নাম দেখেই। তারপরে, কারণ আছে হয়তো অন্যদিকে। কিন্তু এই মুভমেন্টে ওর কোনো ইনভল্‌ভমেন্ট ছিল না। আমাকে তো

ধরেছে শিক্ষকনেতা হিসেবে। অনেক দিন পরে কিন্তু আমাকে কোর্টে আনল। প্রায়ই বলত, কোর্টে আনবে, আনে নাই। সব সময় মনে হতো আমাদের ছেড়ে দেবে।

মহিউদ্দিন : ইউনিভার্সিটি অথরিটি, মানে ভিসি, এরা আপনাদের সঙ্গে জেলে দেখা করেছেন?

সদরুল : হ্যাঁ। ফয়েজ সাহেব দেখা করেছে। বাকি কেউ যায়নি। প্রো-ভিসি ছিল, প্রক্টর ছিল। ওরা কেউ যায় নাই। ফয়েজ সাহেব কয়েকবারই গিয়েছে। ওনাকে দেখলাম সবাই সম্মান করে। আমাকেও সম্মান করেছে।

মহিউদ্দিন : কিন্তু প্রেসিডেন্ট (ইয়াজউদ্দিন) তো আপনাদের কলিগ?

সদরুল : জি, জি। আমাদের দুঃখ তো সেটাই। উনি ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি। আমিও সভাপতি। উনি প্রেসিডেন্ট আর আমি জেলে। অদ্ভুত না? ব্যাপারটা আনইউজুয়াল ছিল। খারাপ লাগত। দেখতাম, *ইত্তেফাকের* মতো পেপারে লেখত। কী নাম না? মইনুল ইসলাম?

মহিউদ্দিন : মইনুল হোসেন।

সদরুল : মইনুল হোসেন ওপেনলি বলত, আমরা চাকরি ছেড়ে দিই না কেন।

মহিউদ্দিন : তিনি তো অ্যাডভাইজার ছিলেন।

সদরুল : হ্যাঁ। আর বলত আমরা নাকি উচ্চাভিলাষী শিক্ষক। বিডিআরের যে গাড়িটায় আগুন দিল, ড্রাইভারটা, সে পর্যন্ত বলছে, আমাদের নাকি কনস্পিরেসি ছিল।

মহিউদ্দিন : গাড়িতে আগুন দেওয়ার ব্যাপারটা?

সদরুল : হ্যাঁ, গাড়িতে কারা আগুন দিয়েছে, আমি তো আগেই বলেছি, ব্যাপারটা পলিটিক্যাল ছিল। আমরা তো জানতামই না ব্যাপারটা। আমি তো কোনো দিন কাউকে উসকাই না। বলতে পারেন কনজারভেটিভ। দেশের যা আছে, সম্পদ রক্ষা করে চলা। একটা ছবি দেখাল আমাকে। একজন সোলজারকে লাথি মারছে।

মহিউদ্দিন : ছবিটা ওয়েবসাইটে আছে।

সদরুল : আমাকে বলে, স্যার স্যার, দেখেন স্যার। আমি দেখে খুব শক পেলাম। এভাবে মারবে কেন? সাথে সাথে গেলাম ভিসির ওখানে, প্রো-ভিসি ছিল।

মহিউদ্দিন : অ্যারেস্ট হওয়ার আগে?

সদরুল : অ্যারেস্ট হওয়ার আগে। সব প্রভোস্টরা ছিল, প্রক্টররা ছিল। আমি বললাম, দেখেন, এ রকম লাথি মারছে। আপনাকে যদি লাথি মারে,

আপনার কেমন লাগবে? তাই না? এটা হিউমিলিয়েটিং। এসব তো আমাদের ডিসকারেজ করা উচিত। ইট ইজ নট দ্যাট আমি আর্মির দালাল। আমি কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সবার প্রতি শ্রদ্ধা রাখি সব সময়। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রফেসর আহমেদ কামাল, প্রফেসর আহমদ কবির দেখা করতে গেলেন। তারপর দেখলাম আস্তে আস্তে ওরা গুটাতে শুরু করল। শিক্ষক সমিতি প্রটেস্ট করল। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বাড়তে থাকে। ওই সময় ওরা আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। বের হওয়ার পর আমাদের লক্ষ্য ছিল, এটা আর না বাড়ানো। আমরা যদি আরও গন্ডগোল করি, তাহলে এটা আরও লিঙ্গার করবে।

মহিউদ্দিন : যাতে এসকালেট না করে।

সদরুল : সবাইকে ধরে, বলে—ঠিক আছে ইলেকশন দাও। যে-ই ক্ষমতায় আসুক, সবাই যেন স্বস্তি পায়। এটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

মহিউদ্দিন : আপনাদের কি কোনো ট্রায়াল হয়েছিল?

সদরুল : জি, জি, অবশ্যই।

মহিউদ্দিন : কনভিকশন হয়েছে?

সদরুল : হ্যাঁ, কনভিকশন হয়েছে।

মহিউদ্দিন : কনভিকশনটা কী ছিল?

সদরুল : জেল দিল আমাদের।

মহিউদ্দিন : কত দিনের? ব্যাকডেট দিয়ে? নাকি ওই সময়ই রিলিজ দিয়ে দিয়েছে?

সদরুল : ওই দিনই রিলিজ দিল।

মহিউদ্দিন : কনভিকশনটা থেকে গেল?

সদরুল : এটা পরে উইড্র করা হলো।

মহিউদ্দিন : আপিল করে?

সদরুল : জি, আপিল করে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়।

মহিউদ্দিন : ওই সময় শুনেছিলাম, মার্সি পিটিশন করে নাকি...

সদরুল : না, আমরা মার্সি পিটিশন করি নাই। আমাদের তো জামিন দিয়ে দেয়।

মহিউদ্দিন : তাহলে কনভিকশনটা উইড্র হয়েছে ২০০৮-এর ইলেকশনের পর।

সদরুল : জি, নতুন গভমেন্ট আসার পরে। আমার যত দূর মনে পড়ে। ছাত্রদেরটা উইথড্র করে নাই। ওদের কেসটা লিঙ্গার করেছিল।

মহিউদ্দিন : অনেক ছাত্রকে তো ধরে নিয়ে পিটিয়েছে?

সদরুল : অনেক অত্যাচার করেছে। খারাপ লেগেছে আমার। ছাত্রদের ওখানে খুব টর্চার করেছে, আমাদের নাম বলার জন্য। অনেকে হয়তো ভয়ে বলেছে। একজনের দেখলাম, পায়ের হাড় ভাঙা। আমার কাছে আসত, খারাপ লাগত। জেলে আমরা একটা ডরম-এ থাকতাম। বিরাট একটা ঘর। হসপিটাল ডরমের মতো, অনেকগুলো বিছানা। ভালো ছিল জায়গাটা, খারাপ না। অনেক সিভিল সার্ভেন্ট ছিল, ইঞ্জিনিয়ার ছিল।

মহিউদ্দিন : ওই সময় অনেক হাই প্রোফাইল লোকজন তো সব জেলে?

সদরুল : ওরা ছিল। জেলের বাইরেও অমানবিক অত্যাচার করত ছাত্র আইডেনটিটি কার্ড দেখলে এখানে মার্কেট আছে না? আজিজ মার্কেট। ওখানে অনেককে মারধর করেছে।

মহিউদ্দিন : ছাত্র বুঝতে পারলেই মারত?

সদরুল : হ্যাঁ। ওদের অনেক অপমান করেছে। বিডিআর চিফের গাড়ি পুড়িয়েছে, ওদের মেরেছে। এসব ছবি পত্রিকায় এসেছে। পত্রিকায় না দিলেও পারত। ক্যান্টনমেন্টে খুব রিঅ্যাকশন হয়েছিল। হুইচ ইজ ভেরি ন্যাচারাল। তারপরও ওটা কন্ট্রোল করা উচিত ছিল।

মহিউদ্দিন : ওই সময় তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনেক টিচারের আর্মি-ব্যাকড গভমেন্টের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম ছিল?

সদরুল : ছিল। কিছু তো ছিল। এ দেশে তা-ই হয়। আমরাই তো যাই, অ্যাডভাইজ দিই। এটাই সব সময় করা হয়। অনেকেরই সে রকম ইচ্ছা ছিল, ওদের সঙ্গে থেকে আমরা লাভবান হই। ডেফিনিটলি ছিল, বাট হয়তো সংখ্যায় খুব নগণ্য ছিল। আবার অনেকে ভয়ে ছিল, হয়তো জেলে দেবে, রিমান্ডে নেবে। আমাদের এক সহকর্মী আমাদের অ্যাগেইনস্টে সাক্ষ্য দিল কোর্টে।

মহিউদ্দিন : কে?

সদরুল : এটা বিজনেস স্টাডির টিচার।

মহিউদ্দিন : নামটা বলেন।

সদরুল : এটা হলো মিজানুর রহমান। ওকে হুমকি দিল, ফোর্স করল। ওকে হ্যারাসও করল কোর্টে আমাদের উকিল ছিল যারা। পরে খুব একটা বলে নাই।

আমাদের যে হিউমিলিয়েট করেছে, সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি নাই। একপর্যায়ে আমি বললাম, চলেন, আমরা কোর্টে যাই। আমরা তো ক্রিমিনাল না। বুক উঁচু করে যাব। ওয়েল-ড্রেসডভাবে যাব। তারপর

বাসা থেকে ভালো কাপড় নিয়ে সেগুলো পরে আমরা যেতাম। আমরা হাসতে হাসতে গেছি। আমরা মোরালি উইক বা ভেঙে পড়েছি, এটা বুঝতে দেই নাই। আমরা প্রিপেয়ার্ড ছিলাম। জেলে দিলে জেলে থাকব। উপায় তো নেই। হারুন বলছিল, চলেন, আমরা কাশিমপুর জেলে যাই। আনোয়ার একটু এক্সপেরিয়েন্সড ছিল তো? আগে জেলে ছিল। যেদিন কনভিকশন দিল, সেদিনই কিন্তু ছেড়ে দিল।

আমি কিন্তু বলি, আমার জেলে যাওয়াটা খুব কষ্টকর। কিন্তু অর্জন তো কিছু হয়েছেই। বড় অর্জন হয়েছে আমাদের। এখন যদি চিন্তা করি কী অর্জন,...কত রকম ডিজেনারেশন আছে। তারা কিন্তু আবার এইটা সাপোর্ট করছে। অদ্ভুত না এইটা? এই দেশ কীভাবে চলবে, বলেন? এ দেশের লোক চায়, খারাপ লোকদের অ্যারেস্ট করুক, পানিশমেন্ট দিক। ওরা যদি ইললিগ্যালি থেকে যেত আর যদি করাপ্ট লোকগুলোকে ধরত, বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক, যদি হ্যারাস না করত, ঠিকই যদি ক্রিমিনাল ধরত, লোকে কিন্তু খুশি হতো। এ দেশের মানুষ এটাই চায়। সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র বোঝে না। ভালো কাজ হলে প্রশংসা করে সবাই। আমি চাই করাপ্ট লোকের পানিশমেন্ট হোক।

মহিউদ্দিন : রিলিজ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কি কখনো দেখা হয়েছে?

সদরুল : না।

মহিউদ্দিন : এটা ইন্টারেস্টিং হতো, যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কী করলেন?

সদরুল : ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমরা গিয়েছিলাম একটা মিটিং করতে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির সম্পত্তি, জায়গা-জমি নিয়ে। বড় মিটিং ছিল। আমি বলেছিলাম, আমাদের আগে কত জায়গা ছিল, জায়গা এখন কত কমে আসছে। উনি বললেন, 'আমরা তো জায়গা দিতে পারব না'। জায়গা তো চাইনি। আমাদের জায়গা ফেরত চাচ্ছি আমরা। এসব কথাবার্তা হয়েছে। ওনাকে ভদ্রলোকই মনে হলো আমার কাছে। দাম্ভিকতা ছিল না।[১৩]

অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের অভিজ্ঞতা একটু আলাদা ধরনের। ২৩ আগস্ট তিনি গ্রেপ্তার হন। আটক অবস্থায় রিমান্ডে নিয়ে তাঁকে হয়রানি ও নির্যাতন করা হয়েছিল বলে তাঁর অভিযোগ ছিল। শিক্ষক সমিতির আওয়ামী লীগপন্থী 'নীল' দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা তিনি। লেখককে দেওয়া

সাক্ষাৎকারে ওই সময়ের একটা চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁদের কথোপকথন ছিল এ রকম।

মহিউদ্দিন আহমদ : জেলে কেমন কেটেছিল?

হারুন-অর-রশিদ : এই যে রাউন্ডে আসে, লক করে দেয় তালা-টালা দিয়ে, এসব তো আমাদের চোখের সামনে। আমার বইটা পড়ুন, সব পাবেন।

আপনাকে বলে রাখি, খালেদা জিয়া যে অ্যারেস্ট হবে, আমাকে আটক থাকা অবস্থায় বলেছে। বলেছে, একজনকে (শেখ হাসিনা) অ্যারেস্ট করেছি, আরেকজনকে করতে হবে। খালেদা জিয়াকে সম্ভবত তেসরা সেপ্টেম্বর অ্যারেস্ট করেছে।

মহিউদ্দিন : হ্যাঁ হ্যাঁ।

হারুন : এটা আমরা আগেই জানতাম।

ইন্টারোগেশনের সময়টা এভাবে বর্ণনা করছি। চারদিক নীরব। দুই চোখ দোপাট্টা করে বাঁধা। প্রথম আধা ঘণ্টা একটা রুমে ইন্টারোগেশন চলে। সেখানে একজন মাত্র লোক। কতগুলো ছবি দেখিয়ে উল্টো দিকে তাকিয়ে শনাক্ত করতে বলে। লোকটি খুবই রুক্ষ মেজাজের। মনে হচ্ছিল যেকোনো সময়ে প্রহার শুরু করবে। মনে মনে মৃত্যুসহ যেকোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি হলাম। ভাবলাম, আমার এ বয়সে অনেক সহপাঠী বা পরিচিতজন মৃত্যুবরণ করেছে। পৃথিবীতে চিরদিন কেউ থাকে না। একজন অসহায় বন্দী মানুষ আর কী করতে পারে। আমার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, এদের ভুলে থাকার চেষ্টা করলাম। না হলে আমি হয়তো কান্নায় ভেঙে পড়তাম আর যৌথ বাহিনীর লোকজন হয়তো ভাবত, আমি নিশ্চয়ই দোষী, তাই ভয়ে কাঁদছি।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমাকে কিছু ছবি দেখাল। ছবিতে কয়েকজনকে চিনতে পারলাম। শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন। রাস্তায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারলাম না। একটা ছাত্রী, তাকে দেখলে চিনব বললাম। তখন তার নাম স্মরণ করতে পারছিলাম না। শামসুন্নাহার হলের অপর্ণা পাল। পরে মনে হয়েছিল। *ডেইলি স্টারের* একজন সাংবাদিককে চিনলাম, কামরুল, বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার। আরেকটি ছবি দেখলাম, আমি ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ইউসুফ হায়দারের হাতে হাত রেখে যাচ্ছি। ছবি শনাক্তকরণ পর্ব শেষ হলে একজনকে বলা হলো, রুমে নিয়ে যাও। চোখ বাঁধা অবস্থায় রুমে

নিয়ে গেল। দশ মিনিট যেতে না-যেতেই একজন সিভিলিয়ান এসে বলল, উঠুন, আবার যেতে হবে। রাত আড়াইটা থেকে তিনটা হবে। উঠে দাঁড়ালাম। দোপাট্টা করে কালো কাপড়ে আমার চোখ বাঁধা হলো। এরপর একটা আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে ইন্টারোগেশন কক্ষে নিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর আমাকে বসানো হলো। তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট আমি ওই অবস্থায় বসা থাকি। পা-পিঠ ব্যথা হয়ে যায়। এক ভীতিমিশ্রিত প্রতীক্ষা। এরপর হঠাৎ কেউ এসে চেয়ার এদিক-সেদিক ছড়িয়ে দেয়। তারপর চার-পাঁচজনের একটি দল গোল করে বসে। শুরু হয় জেরা। ওই কয়েক দিন, ২০, ২১, ২২ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী ঘটেছে? আমার ভূমিকা কী ছিল? দেশের রাজনীতি, দুর্নীতি, সমস্যা, দুই নেত্রী প্রসঙ্গ, নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর ভূমিকা, আরও কত কী? এসব বিষয় তারা বারবার জিজ্ঞেস করে—আমরা, শিক্ষকেরা, ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলাম কেন? খেলার মাঠ-সংলগ্ন সেনাক্যাম্প সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকেরা মৌন মিছিল করল কেন?

জিজ্ঞাসাবাদের সময় হাতের ঘড়িটিও নিয়ে যেত। ক'টা বাজে জানার উপায় ছিল না। রক্ষীদের কাছে ক্ষীণ স্বরে জানতে চাইতাম। তারা বলত। একটা দিন যে কত দীর্ঘ হতে পারে, তা ভাবা যায় না। কিছুতেই যেন সময় কাটে না। চার দিনের রিমান্ড আসলে পাঁচ দিন। যেদিন বিকেলে কোর্ট থেকে পাঠানো হতো, সেদিন রাত গণনা হতো না, কিন্তু রিমান্ডের ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে যেত।

প্রতিবার কোর্ট থেকে রিমান্ডে নেওয়ার পথে জহুরা মার্কেটের কাছে এলে চোখ বাঁধা হতো। জহুরা মার্কেট তো এখন আর নেই। কোর্টে আসার সময় একই স্থানে চোখ খুলে দেওয়া হতো। মনে হতো, এই বুঝি মুক্ত, স্বাধীন হলাম। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, গাড়ি, রিকশা, ভ্যান, পথচারী—সবই দেখতে পাচ্ছি। মনের ভেতরে ভিন্ন এক অনুভূতি। যেন টানেলের শেষ প্রান্তে আলো দেখা। কোর্টে নেওয়ার পথে একবার গোলাপ শাহ মাজারের সামনে আইল্যান্ডের ওপর থেকে একজন খানিকটা উচ্চ স্বরে 'স্যার' সম্বোধন করে হাত নাড়ল।

শাহবাগ থানায় আমাদের নামে দায়ের করা অঘোষিত মামলার আইও ছিলেন মেজর কামরুল। খুবই বদমেজাজের। মামলা দায়ের করার প্রয়োজনে শাহবাগ থানার একজন পুলিশ সদস্যসহ তিনি একবার গোপন স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসেন। লোকটি এতই রূঢ় যে নিজেই আমার বাঁধা চোখ খুলে চিৎকার করে নিজের নাম-পরিচয়

বলেন—দেখেন, আমি কামরুল।

মহিউদ্দিন : সে এখন কই?

হারুন : জানি না।

২৩ আগস্ট গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২৫ আগস্ট দুপুরে আমাদের উভয়কে, আমি আর ড. আনোয়ার হোসেন, একই গাড়িতে ওঠানো হয়। উদ্দেশ্য, কোর্টে হাজির করা। এই প্রথম একে অন্যকে দেখি। গাড়িতে ওঠানোর ঠিক আগে আমার সঙ্গে নিয়ে আসা ছোট ব্যাগ, হাতঘড়ি ও মোবাইল ফোন আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর চোখ খুলে দেওয়া হয়। এসব দেখে মনে হয়েছিল, শাহবাগ থানায় এনে হয়তো ছেড়ে দেওয়া হবে। হাতের মোবাইল দিয়ে আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করলাম। বললাম শাহবাগে আসো। আসলে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কোর্টে। আমরা বুঝি নাই।

রাতে ঘুম আসত না। ঘুমের সময় কই? একটু গ্যাপ পেলেই ভয়ে ভয়ে কাটত। এই বুঝি যম এসে উপস্থিত! দরজার দিকে মুখ না দিয়ে উল্টো দিকে মুখ করে থাকতাম বিছানায়। যাতে কাউকে দেখতে না হয়। স্কেয়ার্ড তো? সজাগ থেকেও ঘুমের ভান করে চোখ সামান্য খুলে দেখতাম, কেউ তুলে নিতে এল কি না। তুলে নিতে আসাটাই হলো বীভৎস।

একটা ছেলে পেয়েছিলাম ভালো, মেজর। বলল, আমি আপনার ছেলের মতো। তার স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সেদিন ছিল বোধ হয় শবে বরাতের রাত। সে নাকি বলেছিল, তোমরা আমাদের স্যারদের এভাবে ধরে নিয়ে আসলা? সেইটা আবার মেজর ইন্টারোগেশনের সময় বলছে। ভাবলাম, শিক্ষক হিসেবে এটাই আমাদের সার্থকতা।

মহিউদ্দিন : ওই সময় তো মওদুদ আহমদও জেলে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কি কখনো...?

হারুন : হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। মওদুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ফালুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

মহিউদ্দিন : আরও অনেকেই তো ছিলেন জেলে?

হারুন : মোশাররফের সঙ্গে, আমানউল্লাহ আমানের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওর একটা মেয়ে না স্ত্রী—ক্যানসার হয়েছিল। বলল, স্যার, আর পলিটিকস করব না। খুব ভেঙে পড়ছিল। ফালু সব সময় খোঁজখবর নিত।

মহিউদ্দিন : মইনুল হোসেনের রোলটা কেমন ছিল? সে তো গভমেন্টের পার্ট?

হারুন : ও তো খুবই অ্যাগ্রেসিভ ছিল। সে বলল না, টিএসসিতে এসে,

শিক্ষকদের শিক্ষা দিতে হবে? আমি তো তখন শিক্ষক সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট। তখন প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, সালাহউদ্দিন আহমদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আরেকজন, একটা ডেলিগেশন গেছিল মইনুল হোসেনের কাছে। তো বলল যে হারুন সাহেব এত ভালো আমরা জানি। উনি একজন গবেষক। উনি এইটার মধ্যে গেল কেন? আর ফখরুদ্দীন সাহেবও আমাকে চিনত। উনি বলল যে আচ্ছা, দেখছি। ওনাদের হাতে তো কিছু ছিল না। করছে তো আমিন (ব্রিগেডিয়ার) আর ওরা।

মহিউদ্দিন: আমার দুইটা জিনিস জানার আছে। এক নম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের অনেক সহকর্মী তো রেজিমের সঙ্গে ছিলেন।

হারুন: হ্যাঁ।

মহিউদ্দিন: ওপেনলি আতাউর রহমান সাহেবের কথা তো আমরা জানি।

হারুন: হ্যাঁ।

মহিউদ্দিন: এ ছাড়া আমি এটা শুনেছি, আমি প্রফেসর সদরুল আমিনেরও একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম। উনিও তো পরে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। ওই সময় বোধ হয় ডিন-টিন সব চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। আরেফিন সাহেবকে পরে ডিন করা হলো।

হারুন: অ্যাক্টিং ডিন, আমার অ্যাবসেন্সে।

মহিউদ্দিন: আমার একটা প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছা। আপনি যেখানে নির্যাতিত হচ্ছেন, সেখানে উনি ডিনের পোস্ট অ্যাকসেপ্ট করলেন কেন?

হারুন: এটা একটা পয়েন্ট।

মহিউদ্দিন: এটা তো একটা ইনডাইরেক্ট কলাবরেশন হয়ে যায় কি না? কারণ, আপনি ভিকটিম, সে জায়গাটায় আমি কেন যাব?

হারুন: আপনাকে বলি। মিটিং করলাম। মিটিংয়ে এ কে আজাদ চৌধুরী সাহেবও ছিলেন। উনি তখন আওয়ামী লীগের অ্যাডভাইজার। আমরা অ্যারেস্ট হলে তারও তো অ্যারেস্ট হওয়ার কথা?

মহিউদ্দিন: হ্যাঁ।

হারুন: হাউ ডিড হি এসকেপ? বলা হয় ব্রি. আমিনের বাড়ি নোয়াখালী। সে কারণে এটা হয়েছে। আজাদ চৌধুরী সাহেব কেন অ্যারেস্ট হলেন না, এটা আমার বিস্ময়।

তারপর, আরেফিন সাহেবের যেটা হলো। আমরা যখন বৈঠক করলাম, উনি তখন দেশের বাইরে। আসার পর তো থাকলেন। ওনাকে

তো অ্যারেস্ট করল না। কারাগারে সে আমাকে দেখতে গেছে একবার যদিও আমি এক্সপেক্ট করতাম, আমাদের খোঁজখবর নেবে। উই অয়ার ভেরি ক্লোজ। আমি অ্যারেস্ট হওয়ার পর ডিনের দায়িত্ব নিল। উনি, এই যে একবার (বাইরে) গেল, অ্যারেস্ট হলো না, এগুলো কখনো আমার মনে প্রশ্ন দেখা দেয় নাই। না দেখার কারণ হলো যে মানুষের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস।

মহিউদ্দিন : আপনারা তো একই ব্যাচের?

হারুন : সে তো হলো পাস কোর্স, উই আর অনার্স। সে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির রেগুলার ছাত্র না। স্টুডেন্ট লাইফে কোনো যোগাযোগ ছিল না। বুয়েটে ছিল।

মহিউদ্দিন : বুয়েটের পিআরও ছিল।

হারুন : হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক রিলেশন্স অফিসার। আমরা ছাত্র অবস্থায় তাকে কখনো দেখি নাই। আমরা তো অল অ্যালং মেইনস্ট্রিমের মধ্যে থাকতাম। আমরা তো নামই শুনিনি, আরেফিন সিদ্দিক নামে কেউ আছে। জীবনে কি একটা মিটিং-মিছিল করছে? কোথাও মিছিল করছে? আজকে, যেহেতু কথাটা তুললেন। তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, নেত্রীর (শেখ হাসিনা) কাছে নিয়ে যাওয়া—আই ডিড ইট। এ জন্য লোকজন তো বলে, আপনারই সৃষ্টি।

নির্বাচনে বারবার সেক্রেটারি-প্রেসিডেন্ট হয়েছে। স্বল্পভাষী। যখন তাকে ভিসি করল, আমাকে প্রো-ভিসি করল। বলল, আপনার কি কোনো অসুবিধা আছে? আমি ভাবলাম, আমাদের যে সম্পর্ক, আর আমরা তো পজিশন নিয়া কখনো চিন্তা করি নাই। তাহলে অসুবিধা কী। থাকলাম আমি। অফিসে দায়িত্ব নেওয়ার পর একটা লোককে বুঝতে পারলাম। আসলে, রিয়েল টেস্ট অব আপার্সন। এটা হলো সো-কল্ড পাওয়ার পলিটিকস। ওই পাওয়ার পজিশনে থাকার পর আপনি দেখবেন, একটা লোক যদি আগের মতোই থাকে, তাহলে সে মানুষের মধ্যেই পড়ে। আর চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে হলো তারা পাওয়ারের পূজা করে। এদের মনুষ্যত্ববোধ, বেসিক ক্যারেক্টর নাই। যে আরেফিন সাহেব একটা ফোন না করে রাতে ঘুমাত না, রাত একটা হোক, দুইটা হোক, হি বিকেম অলটুগেদার আ ডিফরেন্ট পারসন।

মহিউদ্দিন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমার জানামতে ড. আবু মাহমুদ যে লাঞ্ছিত হলেন, এরপর কিন্তু এটাই সেকেন্ড ইনসিডেন্স, যেখানে শিক্ষকেরা লাঞ্ছিত হলেন। এর মাঝখানে এই লেভেলে কিন্তু হয় নাই।

হারুন : একাত্তরে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল।

মহিউদ্দিন : একাত্তর একটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। কিন্তু আবু মাহমুদের পর এটা ওই রকম। ওটা করেছিল সরকারের প্রশ্রয়ে, গুন্ডারা। আর এটা সরকার নিজেই করেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, আপনাদের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি রাষ্ট্রপতি। আপনি চিন্তা করে দেখুন। তারপর আপনাদের কলিগরা আছে। এ তো রীতিমতো লজ্জাকর যে আতাউর রহমান সাহেব যেভাবে মিডিয়ায় আসত, যেভাবে ওয়ান-ইলেভেনের পক্ষে বলত।

হারুন : এখনো ওনাকে আমি মাঝেমধ্যে দেখি, মিডিয়াতেও আসে।

মহিউদ্দিন : সেকেন্ড একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই।

হারুন : সেকেন্ড জিনিসটা মনে রাইখেন, বিফোর ইউ ফরগেট। একটা পয়েন্ট বলি। ইন্টারোগেশনের সময় আমাকে বলে, মইন ইউ আহমেদের একটা বই প্রকাশনা উৎসব হয়েছিল, র‍্যাডিসনে। আমাকে বলেছে, আপনাকে ইনভাইট করা হয়েছিল, আপনি আসেন নাই। আতাউর রহমান ছিলেন, আরও কারা কারা ছিল। আমি যাই নাই। দ্যাট ইজ ট্রু। কাকে কাকে ইনভাইট করছিল, কে কে যায় নাই, সেটাও রেকর্ড রেখেছে। মইন ইউ আহমেদ একটা বই ইয়ে করবে, আমি সেখানে যাব, এটা হইতে পারে? পারে না। নেত্রী যখন ১৬ জুলাই ২০০৭ গ্রেপ্তার হলেন...

মহিউদ্দিন : ওনাকে তো টেনেহিঁচড়ে নামিয়েছে, ছবিতে দেখা যায়।

হারুন : আমরা কালো ব্যাজ ধারণ করলাম। দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি করলাম। অর্থাৎ উই অয়ার ভেরি অ্যাকটিভ। আর শিক্ষক সমিতির রেজল্যুশন যেটা হলো ২২ তারিখে, সেটা অন এয়ারে গেল। শাহবাগে রাস্তার ওপর স্টুডিও বসাইছে এনটিভি, সেখানে আমি গিয়া একটা বক্তৃতা করে বললাম, কী রেজল্যুশন হইছে। ওইটাই সারা দিন প্রচার হইছে। এটাও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। এনটিভির ফালু যখন (জেলে) আমার কামরায় আসল, বললাম, মিয়া, আপনার কারণেই তো এখানে আসছি? আপনার ওই ছেলে এসে আমাকে বলে, স্যার কী হইছে, বলেন। আনোয়ার হোসেনকে বলছিলাম আমি। সেক্রেটারি সে। আনোয়ার ভাই, আপনে যান। বলে যে না, আমার একটু কাজ আছে। এই যে আখতারুজ্জামান আছে এখন, প্রো-ভিসি, ওকে বলছিল, তুমি যাও। বলে, না। ওরা হয়তো বুদ্ধিমান বেশি, জানি না। আমাকে বলল, বুঝতেই পারছেন...

মহিউদ্দিন : গা গরম।

হারুন : একটা ফাইট করার মানসিকতা। যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে...

মহিউদ্দিন : এটা হলো জাসদীয় ভাব!

হারুন : হা... হা...।

মহিউদ্দিন : এইটা রক্তে আছে।

হারুন : এইটাই রক্ত। সত্য কথা বলা। চলে গেলাম। চারুকলা ইনস্টিটিউট—রাস্তার ওপারে, বিট করল, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়। পরে নিউজে চলে গেল, নেশন-ওয়াইড।

অনেককে অ্যাপ্রোচ করেছি। ইউসুফ হায়দার ছিল অ্যাকটিং ভিসি। আমি তখন টাওয়ার ভবনে থাকি, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে। ইউসুফ হায়দার সাহেব তখন মেডিকেলে। আমার কয়েকজন কলিগকে বললাম, চলেন। কেউ গেল না। রাত তখন চারটা। আনোয়ার হোসেন আসল একটা টেলিভিশন চ্যানেল থেকে, সঙ্গে তার ছেলে। আমরা তিনজন চলে গেলাম। এই সব করলাম আরকি। ভয়ভীতি, সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে।

যেদিন অ্যারেস্ট হব, আমার বন্ধুবান্ধব, সাংবাদিক, সবাই বলল যে আপনি অন্য কোথাও চলে যান। আসগর খানের বই—*উই হ্যাভ নাথিং টু ল্যুজ*—এই বই, আর আইয়ুব খানের ডায়েরি—এই দুটো বই আমার ছোট একটা ব্যাগে ঢুকালাম। এটা বিকেলের দিকের ঘটনা। তারপর পেস্ট, শেভিং রেজার নিলাম, আর ট্রাউজার-ট্রুউজার এগুলা ঢুকালাম। অর্থাৎ রেডি হলাম। অ্যারেস্ট হয়ে গেলে কী করব? দুইটা বই সঙ্গে নিয়া নেই। রাত সাড়ে এগারোটার সময় দেখি গাড়ি আসে না। সারা দিন ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে। বেডে গেলাম। আমার ওয়াইফ, ছেলেমেয়ে জানালার ধারে বসে আছে। হঠাৎ দেখে বিশটা গাড়ি এসেছে। মেয়েটা বলে, আব্বা, আসছে। রেডি হও। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্যান্টটা পরলাম। একটা শার্ট পরলাম। রুমে ঢুকল। স্যার, একটু যেতে হবে। শাহবাগ যেতে হবে। তো তখন মনোবল নিয়ে কোনো অসুবিধা নাই, জেলে যাব। রিমান্ডে যে নিবে, এটা তো ভাবি নাই।

বের হইছি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে সারিবদ্ধ গাড়ি। তখন রাত সাড়ে বারোটার মতো। গাড়িতে আমাকে প্রথম তুলল। তারপর আনোয়ার সাহেবকে। সদরুল আমিনকে খুঁজল, দক্ষিণ ফুলার রোডে। পেল না। শাহবাগ পর্যন্ত যখন আসল, শাহবাগে নামল না। জহুরা মার্কেট—এখন তো ভেঙে ফেলেছে—বাংলামোটর, ওখানে গাড়িটা একটু ঘোরাল। চোখ বাঁধল। সোজা বের হয়ে যাওয়ার পর, আমি ভাবলাম

কোথায় যাচ্ছি, খেয়াল করার চেষ্টা করলাম। স্ট্রেট গেল। মনে হলো, রাওয়া ক্লাব যেটা ছিল, ওদিকে গেল বোধ হয়। কিন্তু আসলে আই ওয়াজ রং। ঢুকছে ক্যান্টনমেন্টে, জাহাঙ্গীর গেট দিয়ে। ঢুকেই ওদের ডিজিএফআইয়ের যে ইয়ে আছে, সেখানে নিল। তখন রাত দেড়টা-পৌনে দুটা বাজে। একটা ঘরে নিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় ইন্টারোগেশন। রাত সাড়ে চারটা, পাঁচটা, আজান হচ্ছে, তখনো ইন্টারোগেশন চলে কিন্তু। এক গ্রুপ যায়, আবার আরেক গ্রুপকে নিয়া আসে। পাশে একজনকে মারছে, পানি ঢালছে, চিৎকার।

মহিউদ্দিন : আপনার গায়ে হাত তোলেনি?

হারুন : ওইভাবে না। তবে যেসব ভাবসাব করা শুরু করেছে, সেগুলো অশোভন, এটাও ঠিক। যখন রুমে নিয়ে ছেড়ে দিত, তখন চোখ খুলে দিত। একটা খাট, ফ্লোরে হাঁটুর ওপর বসিয়ে খাটের ওপর কাগজ আর কলম দিত। এতক্ষণ ইন্টারোগেট করেছে। এখন বলে, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে লেখেন, দুর্নীতি সম্পর্কে লেখেন, রাজনৈতিক দল—দুই নেত্রী সম্পর্কে লেখেন। ভারতপন্থী কারা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাদের সম্পর্কে লেখেন। খাজানা হোটেলে গিয়েছিলাম। ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের একটা ছেলে ছিল, ওদের হলো ম্যারেজ ডে। তো আমাদের ইনভাইট করল। সেখানে আবার মতিয়া আপা আছে, ড. মিজান ছিল। সেখানে আমরা খেয়েদেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে এসেছিলাম। ওইটা বলল—আপনারা খাজানা হোটেলে গিয়েছিলেন, প্রো-ইন্ডিয়ান এখানে কারা কারা আছে?

মহিউদ্দিন : ভুলে যাওয়ার আগে আমার আর একটা পয়েন্ট বলি। রিলিজ হওয়ার পরে আমরা টিভিতে শুনেছি, প্রফেসর আনোয়ার হোসেন একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন।

হারুন : রিলিজ হওয়ার পরে না। রিলিজ হওয়ার আগেই।

মহিউদ্দিন : ওইটা শুনে তো মনে হলো যে...

হারুন : হ্যাঁ। 'আমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলছি, এরা হলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। আমরা যদি অন্যায় করে থাকি, সে জন্য ক্ষমাপ্রার্থী'—এটা তো?

মহিউদ্দিন : হ্যাঁ।

হারুন : এটাই তো হলো সমস্যা। আনোয়ার সাহেবকে তো আপনি কম চেনেন না? ভালো করে চেনেন। ওনাদের ব্যারোমিটার যখন ওঠে তখন ওঠে, আবার নামলে নামে। ড. সদরুল আমিন ও ড. আনোয়ার

হোসেন ৩০ সেপ্টেম্বর রোববার বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান কমিশনের কাছে জবানবন্দি দিয়ে বিকেলে ফিরে আসেন। তাঁদের বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। কমিশন খুবই কো-অপারেটিভ। কিন্তু রাত পৌনে আটটায় রেডিও টুডের খবরে বিচারপতি সাহেব বললেন, তাঁরা দুজন ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের কথা স্বীকার করেছেন। তবে উসকানিদান সম্পর্কে তাঁরা যা বলেছেন তা অন্যদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় খবরটি ভালোভাবে পরিবেশিত হয়নি। আরও পজিটিভ আকারে হলে ভালো হতো। ভিসি সাহেবের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কী হয়, সেটাই দেখার বিষয়। ড. আনোয়ার হোসেন একা ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট কথা বলেছেন। এত কথা বলার কী আবশ্যকতা ছিল? তিনি পাবলিসিটি খুবই পছন্দ করেন।

মহিউদ্দিন : আই ওয়াজ ভেরি শকড এটা শুনে।

হারুন : নট ওনলি ইউ। হোল নেশন ওয়াজ শকড। ইট ওয়াজ সো ডিভাসটেটিং অ্যান্ড ডিমোরালাইজিং যে সবাই তো বলেছে, এটা তো হতে পারে না? উনি যেসব কথা বলেছে, করজোড়ে। অনেকেই হয়তো ভাবছে যে ওনাকে টর্চার করে হোক বা যেভাবেই। এটাও একটা ইমোশন। ইমোশন হলো, হয়তো বলছে, বের হয়ে এই কথাগুলো বলবেন। মনে হয় এটা সাজানো। আপনাকে যদি বলেও, আপনি কি পাবলিকলি এটা বলবেন?

মহিউদ্দিন : তাদের তো ধারণা আছে, এগুলো আপনাকে বললে আপনি বলবেন না।

হারুন : তা তো বটেই।

মহিউদ্দিন : সে বললে...তাদের রিডিংটা ঠিকই আছে। তাকে দিয়ে বলালে।...

হারুন : ওই যে জানে, রগটা জানে। এইটা বলা যায়? আমি তো অ্যারেস্ট। আমি তো পালায়া যাই নাই। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমরা শিক্ষক নেতৃত্বে। আমার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য। আমি শিক্ষক হয়ে যদি পালাই, হোয়াট উড বি দ্য মেসেজ? আর কেন আমি পালাব? কী অন্যায় করেছি? আমি তো অনৈতিক কিছু করি নাই? আমার কারাগারে থাকা অবস্থায় সব অ্যাকাউন্ট, গ্রামের বাড়িতে কী আছে না আছে, সম্পত্তি, সব তন্নতন্ন করে খোঁজ করেছে।

মহিউদ্দিন : নিমচন্দ্র ভৌমিক তো অত ভোকাল ছিল না। ওকে অ্যারেস্ট করল কেন?

হারুন : ওকে অ্যারেস্ট করছে ভারতীয় কানেকশন দেখানোর জন্য। ও হলো হিন্দু। ও কিসসু না। ও কোথাও ছিল না। একেবারে ফর নাথিং।

মহিউদ্দিন : ইন্টারেস্টিং!

হারুন : ভেরি ইন্টারেস্টিং![১৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ডিজিএফআইয়ের ইন্ধন ছিল, কিংবা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও এটার মীমাংসা না করে দ্বন্দ্ব উসকে দেওয়ার চেষ্টা ছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা গেছে। ব্রি. জে. চৌধুরী ফজলুল বারী এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

চৌধুরী ফজলুল বারী : ইউনিভার্সিটির ঘটনা। মারামারিটা লাগল কী নিয়া? একটা ছাতি নিয়া। ছাতির পানি পড়ছে, নাকি ছাতির জন্য খেলা দেখতে পারতেছে না, এই ঘটনা নিয়া। আমি তখন কোনো একটা মিটিংয়ে কারও সাথে কথা বলতে গেছি।

মহিউদ্দিন আহমদ : ওইখানে?

বারী : না, গুলশানে। কোনো পলিটিশিয়ানের সঙ্গে সম্ভবত কথা বলছি। অলরেডি গন্ডগোল শুরু হইয়া শেষের পথে। আমার ডিটাচমেন্ট থেকে ফোন করছে। ইন দ্য মিন টাইম, ব্রিগেডিয়ার আমিনদের জানাজানি হইয়া গেছে। তারা জানছে। জাইনা ধরপাকড় কইরা মাইরপিট করায়া দিয়া...। আমি রাত ১০টার সময়, কলিমুল্লাহ সাহেব আছে না। উনি তো বিএনসিসির লেফটেন্যান্ট।

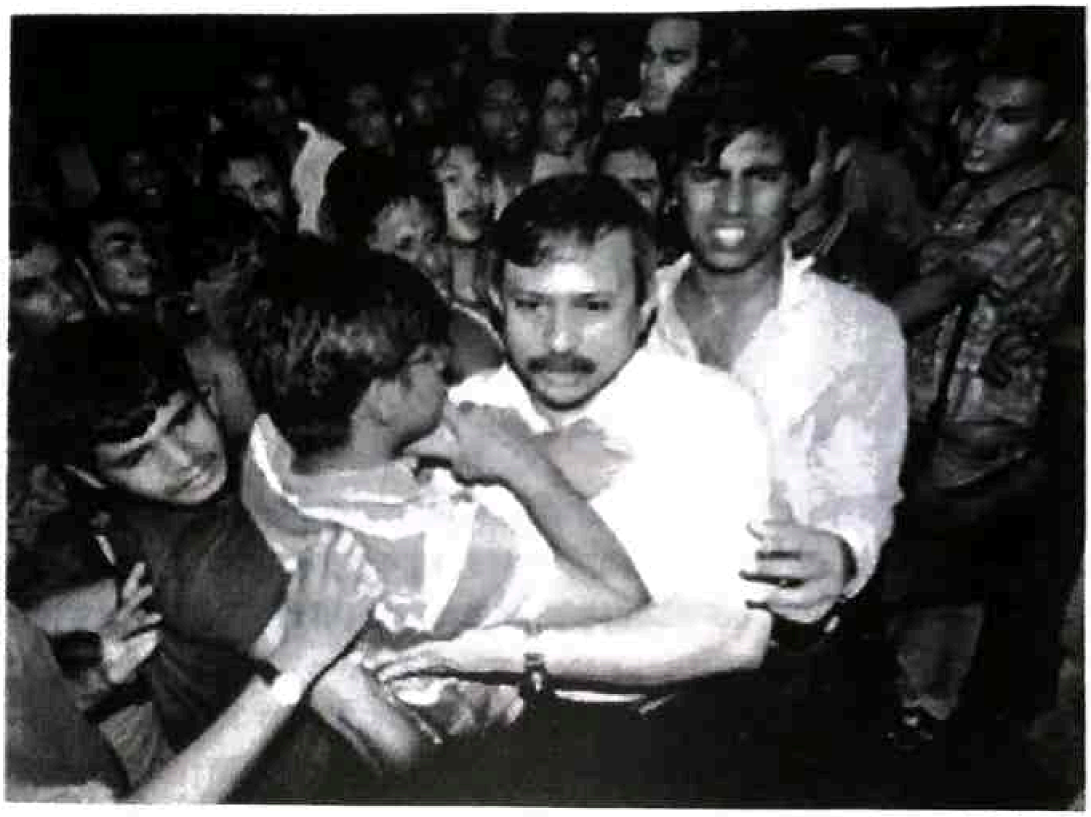
মহিউদ্দিন : এখন উনি রংপুর ইউনিভার্সিটির ভিসি।

বারী : উনি বললেন যে চলেন আপনি, দেখায়া নিয়া আসি। গেলাম। আমার একটা অভ্যাস কী, এটা বিডিআরে থাকতে রপ্ত করছি। গন্ডগোল থেকে দূরে গাড়ি রাখতে হয়। ছেলেপেলে কোন সময় কী করে! আমি গাড়ি দূরে রাইখা ঘুরে ঘুরে এসে দেখি এফ রহমান হলের সামনে ছেলেপেলেরা একটা গ্যাদারিং করছে। ওইখানে গেলাম। বললাম তোমরা কী চাও? কেন এসব করছ? বলে, আপনি কে? আমি যে-ই হই, তোমরা কী চাও, বলো।

—আমরা চাই এখান থেকে পুলিশ চলে যাক।

—তাহলে তোমাদের শান্তি লাগবে? আসো তোমরা আমার সাথে।

ওদেরকে নিয়া আমি পুলিশের কাছে গিয়া দেখলাম—দায়িত্ব তো অফিসারদের, কনস্টেবলরা তো হুকুমের দাস। এদেরকে রাইখা অফিসাররা গালগল্প, চা-পানি খাইতেছে। ওইখানে *ডেইলি স্টারের* একটা



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তোপের মুখে ডিজিএফআইয়ের পরিচালক চৌধুরী ফজলুল বারী

ছেলে ছিল। আমি যখন ওখান থেকে চলে আসছি, তখন সে বলল, আমার সাথে মোটরসাইকেল আছে, চলেন, আপনাকে নিয়া যাই। নিজে থেকে আমাকে বলছে, চিনে হয়তো। বললাম, চলো। এইটার ছবি কেমনে কেমনে উঠাইয়া দিয়া—বলে, আমারে নাকি হেনস্তা করছে। এদেরকে যে কেমনভাবে লালন-পালন করতেছে আমাদের বড় সাংবাদিকরা?

মহিউদ্দিন : ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইনসিডেন্সটা নিয়ে আমি দুজনের সঙ্গে কথা বলেছি।

বারী : কার কার সঙ্গে?

মহিউদ্দিন : প্রফেসর সদরুল আমিন আর প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ।

বারী : সদরুল স্যারের ওয়াইফ প্রায়ই আমাকে ফোন করত। এদেরকে কিন্তু ব্যালেন্স করার জন্য অ্যারেস্ট করছে।

মহিউদ্দিন : চারজন শিক্ষককে তো অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। এঁদের একজন ছিলেন নিমচন্দ্র ভৌমিক। উনি তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না? নাকি 'হিন্দু' বলে আপনারা ভাবলেন ইন্ডিয়ান এজেন্ট?

বারী : ওনাকে ডিজিএফআই মনিটর করত। উনি তো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা।

মহিউদ্দিন : আরেকজন ছিলেন আনোয়ার।

বারী : উনি মানুষ ভালো না।[১৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটিকে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে দেখেন কেউ কেউ। মনে হয়, সবকিছু শান্ত। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ধরপাকড় চলছে। কোথাও কোনো আন্দোলন-বিক্ষোভ নেই। হঠাৎ করেই যেন ছন্দপতন হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দেশের রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়াল। এ প্রসঙ্গে সেনা মনস্তত্ত্ব ছিল এ রকম—সব গন্ডগোলের মূলেই হলো বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষকেরা। লেখকের সঙ্গে সেনাপ্রধান জেনারেল মইনের আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বিষয়টি।

মইন ইউ আহমেদ : ঢাকা ইউনিভার্সিটির ঘটনাটা একেবারেই বানানো।

মহিউদ্দিন আহমদ : আমি এ বিষয়ে দুজনের ইন্টারভিউ নিয়েছি। চারজন শিক্ষক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের ইন্টারোগেশন নিয়ে কথা বলেছেন। ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে মেন্টাল টর্চার করা হয়েছে।

মইন : মেরেছে? রুক্ষ আচরণ?

মহিউদ্দিন : মেরেছে, এটা বলে নাই। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রফেসর হারুন-অর-রশিদকে। গায়ে হাত দেয় নাই। তবে, ওই যে বসিয়ে রাখা, সারা রাত লাইট জ্বালিয়ে রাখা, এগুলি আরকি। রেস্ট দেয় নাই, ফ্লোরে শুয়ে থাকতে হয়েছে। আপনার ব্যাপারে কিছু বলে নাই। ইন্টারোগেশন নিয়ে কথা বলেছে।

মইন : নিশ্চয় করেছে। তা না হলে উনি বলবেন কেন। আপনি ঘটনাটা জানেন, কী হয়েছিল?

মহিউদ্দিন : আমি জানি যে একটা ইনসিডেন্স হয়েছিল, ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে...

মইন : ফুটবল খেলা নিয়ে।

মহিউদ্দিন : একজন সৈনিকের সঙ্গে একজন ছাত্রের তর্কাতর্কি এবং পরে দুই গ্রুপের মধ্যে ঝগড়া। এটা নিয়ে পরে—আর্মির একটা জিপ ওরা পুড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর দু-একজন সৈনিককে ওরা বোধ হয় মারধর করেছে। একটা ছবি আছে ওয়েবসাইটে, আমি দেখেছি। তারপর অনেক ছাত্রকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল।

মইন : এগুলো সব পরের ঘটনা। ঘটনা ফুটবল খেলা নিয়ে। আর্মিতে

খুব খেলাধুলা হয়। যারা ওখানে ক্যাম্প করে ছিল, ছাত্ররা ফুটবল খেলা দেখছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল, নাকি ছাতির গুঁতা নিয়ে—এ রকম একটা ইনসিডেন্ট—এখানে ওটা ফ্লেয়ার আপ করে। ওখানে ইয়াং ছাত্ররা সব, সোলজার তো বেশি ছিল না। দুজনেরই দোষ আছে। আমি বলব না যে আমার সোলজার একেবারে নির্দোষ। ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে সূত্রপাত। এটা জেনে আমি সঙ্গে সঙ্গেই চিফ অব জেনারেল স্টাফ সিনা ইবনে জামালীকে পাঠালাম পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য। ওখানে গিয়ে উনি ছাত্র এবং টিচারদের সঙ্গে কথা বলে সলভ করে দিয়েছে। এটা সলভড। এর মধ্যে প্রফেসর আনোয়ার দেখল যে আরে, সব তো হয়ে গেল। উনি আরও তিন-চারজন টিচারকে নিয়ে, মানি না মানি না—আবার শুরু করল। তার পরদিন আর্মির গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। একজন সৈনিক যাচ্ছিল ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে, তাকে পিটিয়েছে। ইট ফ্লেয়ারড আপ আউট অব নাথিং। এটাকে বেসিক্যালি উৎসাহিত করেছে প্রফেসর আনোয়ার। একটা মাইক্রোবাসে ঘুরে ঘুরে সে এই সব করেছে। দিস হ্যাজ টু বি স্টপড। তারা বলল, আর্মি ক্যাম্প উইড্র করতে হবে। ঠিক আছে, আর্মি উইড্র করলে যদি সমস্যার সমাধান হয়—সেদিন সন্ধ্যায় উইড্র করে ফেললাম। দেখেন কত নমনীয় ছিলাম। আমরা তো পিটিয়ে শেষ করে দিতে পারতাম। উই ডোন্ট ওয়ান্ট অ্যানি ট্রাবল। উইড্র করলাম। এতে কাজ হলো না। তার পরদিনও তারা র‍্যাম্পেজ করল। তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে কন্ট্রোলে আনা হয়।

পরে পুলিশ কেস হয়েছে। পাঁচ হাজার বোধ হয় আসামি করেছে। এটা তো আমরা করিনি, পুলিশ করেছে। ঘুরেফিরে দোষ কিন্তু আর্মির। এটা নিয়ে পরে একটা ইনকোয়ারি হয়েছিল, এখন যে সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার, তাঁকে দিয়ে।

মহিউদ্দিন : রাশেদ খান মেনন?

মইন : হ্যাঁ, উনি করেছেন। কী ইনকোয়ারি করেছেন আল্লাহ জানে। ড. ফখরুদ্দীন আর আমাকে...আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ আই কাম ইন।

মহিউদ্দিন : ওই সময় রাশেদ খান মেনন কীভাবে ইনকোয়ারি করে?

মইন : পরের গভমেন্টের সময়।

মহিউদ্দিন : ওই টিচারদের তো কনভিকশন হয়েছিল। তারপর প্রেসিডেন্ট ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মইন : কেয়ারটেকার গভমেন্টের সময়? হ্যাঁ, ভেতরের কথা তো

EDWARD M. KENNEDY

**United States Senate**

WASHINGTON, DC 20510-2101

October 26, 2007

His Excellency M. Humayun Kabir
Ambassador of the People's Republic of Bangladesh
Embassy of Bangladesh
3510 International Drive NW
Washington, D.C. 20008

Dear Ambassador Kabir,

I'm writing to express my deep concern about twelve prominent intellectuals from Dhaka and Rajshahi University who have been detained without charges under the authority of the Director General of Forces Intelligence since August. A list of their names is attached. Their arrests were made in connection with student protests, and they have not been charged with any crime.

I'm especially troubled by accusations that they have been tortured. Holding these twelve men without charge and for political reasons is a major assault on the integrity and independence of the academic community of your nation and calls into question your government's commitment to human rights and the rule of law.

I join with Amnesty International, and others in the human rights community, to urge your government to release these intellectuals and students who have been detained for political reasons. It is wrong for any government to detain individuals for political reasons, and to deny them access for extended periods to attorneys, family members, and medical care.

I ask that you provide a copy of this letter to Dr. Fakhruddin Ahmed, Chief Adviser to the Caretaker Government of Bangladesh.

With respect and appreciation, and I look forward to their release.

Sincerely,

Edward M. Kennedy

আটক শিক্ষকদের মুক্তি চেয়ে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির চিঠি

অনেক কিছুই আছে। শিক্ষকেরা এসেছিলেন পুরো টিম নিয়ে, চিফ অ্যাডভাইজারের সঙ্গে দেখা করতে। চিফ অ্যাডভাইজার আমাকে ডেকেছে। তারা বলেছে, যা হয়েছে, ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখুন।

মহিউদ্দিন: আমি নিজেই এটা শুনেছি। কোর্টে একবার হাজিরা দেওয়ার সময় আনোয়ার বলছিল যে সেনাবাহিনীর গায়ে হাত দেওয়া খুব অন্যায় কাজ হয়েছে, খারাপ কাজ হয়েছে, সেনাবাহিনী আমাদের প্রাইড, একটু অ্যাপলোজেটিক। আমি প্রফেসর হারুনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ ব্যাপারে আপনার অপিনিয়ন কী। উনি বললেন, সে তো সর্বনাশ করছে, মুখে এক কথা বলে আর এই স্টেটমেন্ট দিয়ে আমাদের তো একেবারে

ইয়ে করে দিল। এটাই যদি করবা, তাহলে এত কাজ করলা কেন?

মইন: হি গেইভ দ্য লিডারশিপ। ডুবিয়াস ক্যারেকটার, পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য করে। এখানে, আমেরিকায়, শয়ে শয়ে ইউনিভার্সিটি আছে। কোনোখানে শুনেছেন এ রকম?[১৬]

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। ২৬ অক্টোবর ২০০৭ ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবিরের কাছে তিনি এ ব্যাপারে একটি প্রতিবাদলিপি পাঠান।

আটককৃত ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে বেশ কয়েক দিন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয়। ১২ জানুয়ারি ২০০৮ এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ক্লাস বর্জন ও মৌন মিছিল করে। পরদিন একই কর্মসূচি বহাল থাকে। ১৮ জানুয়ারি আবারও ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়।

২১ জানুয়ারি ২০০৮ ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্র ও কর্মচারীর শাস্তি মওকুফ করেন রাষ্ট্রপতি। একটি মামলা থেকে ১৬ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়। অবশেষে জট খোলে ২২ জানুয়ারি। অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক বেকসুর খালাস পান। অধ্যাপক সদরুল আমিন, হারুন-অর-রশিদ ও আনোয়ার হোসেন কারামুক্ত হন।

# বিদেশি হাত

বিদেশিরা বাংলাদেশের ব্যাপারে নাক গলায়—এটা অনেক পুরোনো অভিযোগ। এ জন্য অনেকেই বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ ও কর্মকর্তাদের দায়ী করেন। বলেন যে তাঁদের আশকারা না থাকলে বিদেশিরা এত লাই পেত না।

সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক বরাবরের। বিরোধী দলের নেতারা নানান অজুহাতে সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশিদের কাছে, বিশেষ করে ভিন দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কাছে নালিশ জানান। অন্যদিকে, সরকার চেষ্টা করে তাদের পক্ষে বিদেশিদের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করার, যেন তাদের সার্টিফিকেট না পেলে সরকারের কোনো একটি কাজ বা অর্জন পুরোপুরি বৈধতা পায় না। এসব কারণেই বিদেশিরা অনেক সময় বাংলাদেশের রাজনীতির অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে। তখন রাষ্ট্রাচারের দেয়ালটা আর থাকে না।

২০০৬ সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়লে জাতিসংঘের দূতিয়ালি শুরু হয়ে যায়। একই সঙ্গে শিল্পোন্নত কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁরা অনেকেই একটা পরিবর্তনের জন্য অনুঘটকের ভূমিকায় নামেন। রাজনীতিবিদ এবং নাগরিক সমাজের একটি বড় অংশ পরিবর্তন চাইছিল। ঘটনা ঘটছিল খুব দ্রুত। এ সময় ঢাকায় নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রেনাটা লক ডেসালিয়ান ছিলেন খুব তৎপর। তিনি এনডিসির কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল এ টি এম জহিরুল আলমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এ সময় ড. কামাল হোসেন জহিরের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে জহির তাঁকে বলেন, 'আপনি রেনাটাকে বলেন মইনকে ফোন করতে।' বার্তা পেয়ে রেনাটা ১০ জানুয়ারি মইনের কাছে যান। জহিরের মতে, 'রেনাটা ওয়াজ ফুললি ইন (রেনাটা এর মধ্যে পুরোপুরি ছিল), ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ওয়াজ ফুললি

ইনটু ইট (আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এর মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল)।' রেনাটার কাছে জাতিসংঘ থেকে একটা বার্তা এসেছিল। তিনি এটা মইনকে দেখিয়েছেন বা দিয়েছেন।[১]

দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) দুঃখ প্রকাশ করেছিল। ইইউর আটটি দেশের রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দেন। এর আগে মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস, ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী ও কানাডার হাইকমিশনার বারবারা রিচার্ডসন পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করে তাড়াতাড়ি নির্বাচন আয়োজনের কথা বলেন। ভারতের হাইকমিশনারও একই কথা বলেন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কেউই সামরিক আইন জারির ব্যাপারে সম্মত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্লকের দীনদশা শুরু হওয়ার পর থেকেই দুনিয়াজুড়ে একধরনের 'উদার গণতন্ত্রের' হাওয়া বইতে থাকে, যেখানে সামরিক বাহিনীর প্রকাশ্যে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়ার পক্ষে থাকার ইচ্ছা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ছিল না। পাকিস্তানের আদলে বাংলাদেশে আরেকজন 'পারভেজ মোশাররফ' তৈরি হোক, এটা তাঁরা চাননি। সেনাপ্রধান জেনারেল মইন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি করা হবে না। এ প্রসঙ্গে লেখককে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারের একটি অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

> মহিউদ্দিন আহমদ : কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত—আমাদের মতো দেশে এসব হয়—রাজনীতিবিদেরা রাষ্ট্রদূতদের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়। এ ছাড়া তাদের তো স্ট্রাটেজিক ইন্টারেস্ট আছেই। ওই সময় এটা দৃশ্যমান ছিল। বিশেষ করে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস।
>
> মইন ইউ আহমেদ : আমাদের সময় গীতা পাসি ছিল অ্যাকটিং অ্যাম্বাসেডর।
>
> মহিউদ্দিন : ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীও বেশ তৎপর ছিলেন। এ রকম আরও কয়েকজন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি, ইউএনডিপির রেনাটা লক, এঁরাও ছিলেন। ইইউর রিপ্রেজেন্টেটিভও ছিলেন।
>
> মইন : এরা আসত না। এরা নিজেরা নিজেরা গ্রুপ করত। আমি তো অ্যাম্বাসিতে কাজ করেছি। আমি জানি কী হয়। প্রত্যেক মাসে দেশে রিপোর্ট পাঠাতে হয়। আমি কিছু জানলাম, ও কিছু জানল, সে

জানল কিছু—সো দে গেট টুগেদার, দেন ডিসকাস—তারপর রিপোর্ট পাঠায়। ইট ডাজ নট মিন যে তারা ঝাঁপাঝাঁপি করছে। আর আপনি যা বললেন, আমাদের পলিটিশিয়ানদেরও দোষ আছে। তারা গিয়ে তাদের দাম বাড়ায়, তাদের বাসায় বেশি যাওয়া-আসা করে, আর মানুষ মনে করে যে দে আর প্যাট্রনাইজিং এভরিথিং। লেট মি টেল ইউ ওয়ান থিং। নো গভমেন্ট অ্যাপ্রোচড আস টু ডু এনিথিং।

ওই যে আমেরিকার অ্যাম্বাসেডর মহিলা, কী আপা যেন বলত, বিউটি আপা, আমরা আসার পরপরই চলে গেছে। গীতা পাসি অ্যাকটিং হিসেবে অনেক দিন ছিল। তার সঙ্গেই ইন্টারেকশন বেশি হয়েছে। শি ইজ ইন্ডিয়ান অরিজিন, বাট আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট। যখন দেশের মধ্যে ভীষণ গন্ডগোল, বিউটেনিস আসল আমার কাছে। বলল, তোমরা যা-ই করো, মার্শাল ল দিয়ো না। অনেকক্ষণ কথা বলার পর বললাম, দেখো, দেয়ার উইল বি নো মার্শাল ল ইন দিস কান্ট্রি। যদি মার্শাল ল হয়, তাহলে আই উইল নট বি দ্য চিফ অর আই উইল নট বি এলাইভ। এটাই তাকে বলেছিলাম। তারপর সে চলে গেল।

লোকজন তো অনেকেই চেয়েছে। এখনো তো বলে, আসছেন যখন, কেন ছেড়ে গেলেন? আই সেইড, আই হ্যাড লিমিটেড গোল। আই হ্যাভ ডান দ্যাট, আই হ্যান্ডেড ওভার পাওয়ার। দেশবাসীকে যেটা প্রমিজ করেছিলাম, আই হ্যাভ ডান মাই জব।

মহিউদ্দিন : আপনি বলেছিলেন না, এর আগে দুবার মিলিটারি টেকওভার হয়েছে, জিয়া এবং এরশাদ? তারা কমিট করেছিল, ব্যারাকে ফিরে যাবে, কিন্তু যায়নি।

মইন : দিস অলওয়েজ প্লেইড ইন মাই মাইন্ড। আমি যেন মিথ্যা কথা না বলি দেশবাসীকে। মিথ্যাবাদী না হই। যেদিন ড. ফখরুদ্দীন দায়িত্ব নিলেন, ওই দিনই একজন আমার ইন্টারভিউ করেছিলেন। বলেছি ফ্রি, ফেয়ার, ক্রেডিবল ইলেকশন অ্যান্ড গেট আউট। ধাপে ধাপে একই কথা বলে গেছি। এমনকি ইলেকশনের দিনও। ভোট দিতে গিয়েছি। অনেক জার্নালিস্ট ধরেছে—শুনলাম, আপনি মার্শাল ল দিচ্ছেন? হেসে বলেছি, আপনারা তো দুই বছর ওয়েট করেছেন, আর কয়েক ঘণ্টা ওয়েট করুন। দেখেন মার্শাল ল হয় কি না। বলার তো কোনো শেষ নেই।[২]

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে বিদেশিদের নানাবিধ মন্তব্য সরকারকেও অনেক সময় বিব্রত করেছে। জনমনে একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল যে এই সরকারের পেছনে বিদেশিদের, বিশেষ করে দাতাদেশগুলোর সমর্থন আছে। ২০ মার্চ ২০০৮ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন :

সম্প্রতি কিছু বিদেশি কূটনীতিকের মধ্যে জনসমক্ষে বিভিন্ন মন্তব্য করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, যাকে একশ্রেণির মিডিয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল বলে মনে করছে। আইন উপদেষ্টা বলেন, ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের কথা বলার অধিকার নেই। কেউ ভ্রমণভিসা নিয়ে এসে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে পারেন না। আমরা ভ্রমণভিসা নিয়ে কোনো দেশে গেলে সে দেশের ভেতরের বিষয়ে কথা বলি না, বলতে পারি না।[৩]

শফি ইউ আহমেদ একজন পেশাদার কূটনীতিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে যুক্তরাজ্যে হাইকমিশনার নিয়োগ দেয়। ওই সময়টি তিনি দেখেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কূটনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। লেখকের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে ধরেছেন নানান প্রসঙ্গ। এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো :

মহিউদ্দিন আহমদ : ওই সময় যে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ঢাকায় ছিলেন, আনোয়ার চৌধুরী, মিলিটারি ব্যাকড গভমেন্টের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। আপনার কী মনে হয়, এটা কি ব্রিটিশ গভমেন্টের পলিসি ছিল?

শফি ইউ আহমেদ : আমি মনে করি, এটা আনোয়ার চৌধুরীর পার্সোনাল ক্যারিশমা—একটু অতি-উৎসাহী রোল প্লে করছে। আমাদের অ্যাসেসমেন্ট হলো, ইট ওয়াজ মাচ মোর আনোয়ার চৌধুরীজ পার্সোনাল ইন্টারেস্ট দ্যান ব্রিটিশ গভমেন্ট। ব্রিটিশরা তো নরম্যালি ইলেক্টেড গভমেন্ট ছাড়া হেড অব দ্য গভমেন্ট লেভেলে ইন্টারেক্ট করে না। তখন তো ইলেক্টেড গভমেন্ট না। বরং ডেমোক্রেসিকে মাইনাস করে দিয়ে আনকনস্টিটিউশনাল একটা রেজিম ইজ ট্রায়িং টু লাস্ট অ্যান্ড ট্রায়িং টু এক্সারসাইজ অল কাইন্ডস অব থিংস। ওই সময় চিফ অ্যাডভাইজার হ্যাড হিজ ট্রিপ টু লন্ডন ফর ট্রিটমেন্ট। কিন্তু তারপরও তাঁকে, হি ওয়াজ রিসিভড বাই গর্ডন ব্রাউন অ্যাট দ্য ডাউনিং স্ট্রিট। ওয়ান টু ওয়ান। নরম্যালি এটা কিন্তু করার কথা না। দ্যাট সিগনিফাইজ দ্যাট ব্রিটিশ

গভমেন্ট অলসো সাপোর্টেড হোয়াট হ্যাপেনড ইন দ্যাট স্টেজ। আই হ্যাভ বিন উইটনেস টু আ স্টেটমেন্ট ইন দ্য টকস, সেয়িং দ্যাট, অ্যাট দ্য মিনিস্টারিয়েল লেভেল—উই ডু অ্যাপ্রেশিয়েট হোয়াট ইউ হ্যাড বিন ডুয়িং। উই হ্যাভ দ্য সাপোর্ট। বাট ইউ নিড টু হ্যাভ আ রোডম্যাপ ফর ট্রানজিশন টু ডেমোক্রেসি। এই সমস্ত জিনিস তারা কিন্তু ইন অল সারকামস্টেনসেস, ইফ ইট ইজ পারসিভড অ্যাজ আ মিলিটারি গভমেন্ট, তাহলে কিন্তু তাদের ইয়ে করা উচিত ছিল, প্রটেস্ট করতে পারত। করাটা এক্সপেক্টেড ছিল যে আমরা এটা পছন্দ করি না। এগুলো কিন্তু তারা বলে নাই। তারা বলেছে, উই অ্যাপ্রেশিয়েট দ্য প্রোগ্রাম অব রিফর্মস ইউ আর আন্ডারটেকিং। ডু ইট কুইকলি, বাট ইউ হ্যাভ টু হাভ আ রোডম্যাপ ফর ট্রানজিশন—এ রকম কথা।

চিফ অ্যাডভাইজারের সঙ্গে গর্ডন ব্রাউনের যে বাইলেটারাল মিটিং, এরপরে একটা জয়েন্ট ডিক্লারেশনও বের হয়েছে, জয়েন্ট ডিক্লারেশনের মধ্যে পার্টনারশিপ পর্যন্ত বলছে, বিটুইন ব্রিটেন অ্যান্ড বাংলাদেশ, যেটা বাংলাদেশ অ্যাজ অ্যান এইড-রিসিভিং কান্ট্রি—ওইখানে রিসিভিং থেকে পার্টনারশিপ হওয়া, এইটা একটা কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ, যেভাবে দেশ এবং সরকারকে মূল্যায়ন করা হয়। ওই সমস্ত কথাবার্তা ছিল। প্লাস দে এক্সপ্রেসড দেয়ার ডিটারমিনেশন—এই যে পভার্টি রিডাকশন, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, কীভাবে অ্যাচিভ করা যাবে, ব্রিটেন কীভাবে হেল্প করবে, এবং বাংলাদেশে এই সময়ে যখন রিকগনাইজড ইলেক্টেড গভমেন্ট নাই, ওই সময়ে ব্রিটিশ গভমেন্ট অফিশিয়ালি হোস্টেড আ ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স ইন লন্ডন, যেখানে বাংলাদেশের ট্রাস্ট ফান্ড অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ওয়াজ লঞ্চড। তখনকার দিনে, এই কেয়ারটেকারের সময়। দে অয়ার উইলিং টু ওয়ার্ক শোল্ডার টু শোল্ডার উইথ দ্য গভমেন্ট দ্যাট ওয়াজ ইন ট্রানজিশন। এদিক থেকে আমি মনে করি, ব্রিটিশ গভমেন্টের সাপোর্ট ছিল।

বাট আনোয়ার চৌধুরী একটু বেশি লাফালাফি করেছে, অতি-উৎসাহী। আই উড সে দ্যাট, পলিটিক্যালি ইমম্যাচিউর ছিল। প্রফেশনাল ডিপ্লোম্যাটরা মেজারড রোল প্লে করে। আনোয়ার চৌধুরী তো প্রফেশনাল ডিপ্লোম্যাট না। এক নম্বর। দুই নম্বর হলো, সে বাঙালি। তিন নম্বর হলো, এমন এক সময়ে আসছে সে, যখন এই পুরা চেঞ্জ হলো, এবং ইনসিডেন্টালি আর্মি চিফের সঙ্গে তার রিলেশনশিপ ভালো ছিল, টু দ্যাট এক্সটেন্ট। অ্যাম্বাসেডর-হাইকমিশনাররা যখন যায় একটা দেশে, তখন

এগ্রিমেট লাগে। এগ্রিমেট কি বোঝেন?

মহিউদ্দিন : কনসেন্ট?

শফি : হ্যাঁ। আপনার নাম পাঠাবে ফরেন অফিস থেকে। রিসিভিং কান্ট্রির কনসেন্ট লাগে একদম হাইয়েস্ট লেভেল থেকে। একদম প্যালেস, আমাদের এখানে প্রেসিডেন্ট। আমার যখন 'এগ্রিমো' পাঠাল, চিফ ফোনে বলল, চিফ পেইড অ্যান ইনস্ট্রুমেন্টাল রোল, ফোন করেছিল অন্য কারণে। বলল যে আনোয়ার চৌধুরীকে আমি বলেছি, খুব তাড়াতাড়ি আপনার 'এগ্রিমো' করে দিচ্ছে। ওইখানে তো সামার আসতেছে, কুইন সামারে চলে যাবে। এই সময় দেরি হওয়ার কথা। কিন্তু ইট ওয়াজ ডান পসিবলি ইন টু-থ্রি উইকস টাইম। এত তাড়াতাড়ি হওয়ার কথা না।

মহিউদ্দিন : জেনারেলের কথায় আনোয়ার চৌধুরী এটা তাড়াতাড়ি প্রসেস করে দিয়েছে?

শফি : আনোয়ার চৌধুরীর সঙ্গে খুব ফ্রেন্ডশিপ ছিল। এবং চিফ এটাকে ভ্যাল্যু করত। আরেকটা ইনসিডেন্ট হলো, ওই সময়ে চিফ অলসো ট্রানজিটেড টু লন্ডন। এখন দেখেন, ইন্টারিম গভমেন্টের দুইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিগার, আউট অব অল আদার কান্ট্রিজ গোয়িং টু লন্ডন ইজ আ কারেজিয়াস ডিসিশন।

মহিউদ্দিন : একই সময়?

শফি : না, দুইটা দুই সময়ে। চিফ অ্যাডভাইজার পরে গেছে। জেনারেল গেছে আগে। জেনারেল গেছে, অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ গোয়িং টু হার্ভার্ড, একটা লেকচার দিতে গেল না? আমার ভয় ছিল যে লন্ডনে বাংলাদেশি কমিউনিটি সো ইনটেন্সলি এজিটেটেড—এখন তারা মাইনাস করতেছে, কিংস পার্টি করাইতেছে। কিন্তু পরে দেখলাম, কমিউনিটি কিন্তু এদের এমব্যারাস করার জন্য কিছুই করেনি। ওই জাস্ট পোস্টার নিয়া দাঁড়ায়া থাকা, হোটেলের সামনে। এ ছাড়া আর কিছুই করে নাই। বাট লন্ডনে আমি দেখছি ডিম ছুড়ে মারতে। ইভেন শেখ হাসিনাকে বিএনপির লোকেরা আগেরবারও ডিম ছুড়ে মারছে। আই হ্যাভ উইটনেসড মেনি আদার ইভেন্টস। ওই তুলনায় এই দুই বছরে কেয়ারটেকার গভমেন্টের সময়—দ্য জেনারেল অ্যান্ড দ্য চিফ অ্যাডভাইজার গোয়িং, স্টেয়িং ইন লন্ডন, নট মাচ...।

মহিউদ্দিন : আর্মি চিফ যে লন্ডনে গেল, হু রিসিভড হিম?

শফি : ইট ওয়াজ আ ট্রানজিট। আমরা ছিলাম।

মহিউদ্দিন : হাসিনাকে যখন সেকেন্ড টাইম অ্যালাউ করল না ফ্লাইটে,

তখন তো তাঁকে কয়েক দিন থাকতে হলো লন্ডনে। তখন হোয়াট ওয়াজ দ্য রোল অব দ্য ব্রিটিশ গভমেন্ট?

শফি : অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশ গভমেন্ট কিছুই করে নাই। কিছু করল বলে মনে হয় নাই। এই নাটকে তারা ছিল পার্শ্বচরিত্র। দে অয়ার জাস্ট ওয়াচিং হোয়াট হ্যাপেনস। তারা কোনো দিকেই পজিটিভ কিছু প্লে করে নাই। বাট ইট ইজ ট্রু যে আওয়ামী লীগের যতটুকু কানেকশনস এবং যোগাযোগ, যেহেতু লেবার গভমেন্ট, দে অয়ার মোর সিমপ্যাথেটিক উইথ দ্য আওয়ামী লীগ।

মহিউদ্দিন : আপনার টেনিউরটা লন্ডনে কোন পর্যন্ত ছিল?

শফি : কেয়ারটেকার গভমেন্ট ইলেকশন দেওয়ার আগ পর্যন্ত।

মহিউদ্দিন : ডিসেম্বরের শেষে ইলেকশন হয়েছে।

শফি : আমার শেষ হয়েছে নভেম্বরে।

মহিউদ্দিন : এরপরে আপনার কি অন্য কোথাও পোস্টিং হয়েছে?

শফি : না, রিটায়ারমেন্ট।

মহিউদ্দিন : আপনি তাহলে নরমাল রিটায়ারমেন্টে গেছেন?

শফি : এইটা একটা ব্যাড লাক। এমন সময় রিটায়ারমেন্ট এইজটা আসছে, কেয়ারটেকার গভমেন্টের ইন্টারেস্ট নাই। নাইদার দে হ্যাভ কন্ট্রোল। তারা এখন গোছাবে। ইনকামিং গভমেন্ট কে, নো বডি নোওজ, আনলেস সামবডি ইজ ইলেক্টেড, আপনি তো কারও কাছে যাইতেও পারবেন না। যদিও যারা ইন্টেলিজেন্ট, তারা হয়তো ওই লাইনে চিন্তাভাবনা করছে। যেমন ইফতেখার চৌধুরী নিজেই তখন স্টার্টেড টু পারস্যু প্রবেবল ইনকামিং গভমেন্ট।

মহিউদ্দিন : ইনকামিং কারা হবে, এটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল তখন?

শফি : সে বুঝত। সে যোগাযোগ-টোগাযোগ বাড়াইছে। বিকজ সে মনে করছে যে আই উইল কনটিনিউ অ্যাট সাম ক্যাপাসিটি। সে তো মনে করছে যে ফরেন মিনিস্টারই থাকবে। অথবা না হইলেও লন্ডন অথবা নিউইয়র্কে সে আবার যাবে। হি ওয়াজ অলসো আইয়িং ফর লন্ডন। এ জন্য এটাকে খালি করার জন্য যা যা করা দরকার, ওগুলো ওর মাথার মধ্যে ছিল। ঠিক আছে ওইটা খালি হোক। তারপরে তার পক্ষে এটা গ্র্যাব করা ইজি হবে। পলিটিক্যালি যারা ইন্টেলিজেন্ট তারা এ রকমই করে। আমি তো একজন প্রফেশনাল হিসেবে এগুলো চিন্তাভাবনা করি নাই। কালটিভেটও করি নাই, চেষ্টাও করি নাই। আমার ক্যারিয়ার কেইম টু

অ্যান এন্ড অ্যাট আ টাইম যখন ভারচুয়ালি দেয়ার ওয়াজ নো গভমেন্ট।

মহিউদ্দিন : আনোয়ার চৌধুরী খুবই অ্যাকটিভ প্লেয়ার ছিল। চেঞ্জটার সময় কী হয়েছে? হাউ ডিড ইট হ্যাপেন? এটা তো সর্ট অব আ ক্যু?

শফি : কিন্তু তাদের ভারশানটা, তাদের জাস্টিফিকেশনটা আপনি জানেন না কি?

মহিউদ্দিন : তারা তো বলে যে ইউএন থ্রেট করছে, পিসকিপিংয়ে—এ রকম টারময়েল যদি চলতে থাকে, এটা তো কেউ চায় না। এদেরও তো কোনো সমঝোতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ওইটাই তো ছিল তাদের যুক্তি।

শফি : হ্যাঁ, ওইটাই জাস্টিফিকেশন। তবে জেনারেলের সাথে যে ইন্টারেকশন, তাতে আমার মনে হয় না যে তারা অ্যামবিশাস ছিল। আই কুড নেভার ইমাজিন দ্যাট হি ইনটেনডেড টু গ্র্যাব পাওয়ার। সে যেটা পাবলিকলি বলে, বলছে রিপিটেডলি, যে দেশের পরিস্থিতি, এটা গ্রিড অব পলিটিশিয়ানস। তাদের ইরেসপনসিবল,...দ্য ওয়ে দে অয়ার অ্যাকটিং উইথ দ্য কান্ট্রি ইন্টারেস্ট, ওয়াজ রেলিগেটেড টু নাথিং। প্রথম হইল নেতা, তারপর হইল পার্টি, তারপর হইল দেশ। হোয়ারঅ্যাজ দেশ শুড হ্যাভ বিন দ্য ফাস্ট। উইনার্স টেক অল, ভেনজিয়েন্স, ল'লেসনেস, ক্যায়োস, এগুলো হলো সিনড্রোম অব হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং ইন সোমালিয়া। সো আমাদের ওপর প্রেশার আসছে, তোমরা কিছু করো। কেননা পলিটিশিয়ানরা কিছু করতে পারবে না বিফোর ইট গোওজ ইনটু সিভিল ওয়ার সিচুয়েশন।

মহিউদ্দিন : আমিও শুনেছি, আর্মির মধ্যেও তো সবাই এক ছিল না। মইন যখন দেখল যে ঘটনা অন্যরা ঘটিয়ে দিচ্ছে, সেও ওদের সাথে যোগ দিয়েছে। মাসুদ, বারী, আমিন ওরাই তো লিডটা নিয়েছে।

শফি : মাসুদরা। তবে আরও কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে। ব্রিটিশরা তখন মোর ইন্টারেস্টেড টু ওয়ার্ক ইন কনটেইনিং ইমার্জিং টেররিস্ট থ্রেটস। ইউকে ওয়াজ আ বিগ প্লেয়ার ইন কনটেইনিং গ্লোবাল টেররিজম। এ জন্যই বাংলাদেশের সাথে একটা স্ট্রাকচার ডেভেলপ করা, টু ওয়ার্ক ইন ফিউচার। যাতে করে ট্রান্স-টেরিটোরিয়াল কো-অপারেশন...এই যে আমিন-টামিন, রেগুলার লন্ডনে আসা-যাওয়া করত। ওদের কাউন্টার টেররিজমের সাথে দে অয়ার ওয়ার্কিং ভেরি ক্লোজলি। এটা হঠাৎ করেই ওই সময় খুব ফোর্সফুল ছিল। পিছনে অন্য কিছু আলোচনা করত কি না জানি না। হি ইউজড টু গো ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি। দেয়ার অয়ার অলসো

সিভিলিয়ানস হু অয়ার ওয়ার্কিং ভেরি ক্লোজলি। এই যে আপনার থিংক ট্যাংকের মধ্যে এখন যারা আওয়ামী লীগ করে খুন হয়ে যাইতেছে, এই যে ওয়ালিউর রহমান বলে একজন, হি ওয়াজ অলসো ক্যারিং দ্য ব্রিফ অব আর্মড ফোর্সেস। ওই যে ওয়াশিংটনে গেছে, হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে যায়, এখানে যায়, ওখানে যায়, মানে চ্যাথাম হাউসে যায়, কনটিনিউওয়াসলি সে আর্মির ব্রিফ ক্যারি করত তখন।

মহিউদ্দিন : আর কে এ রকম ছিল?

শফি : এই লোকটাই, যেহেতু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি ছিল, প্রায়ই লন্ডনে গিয়ে হাজির, জেনেভায় যাচ্ছে। আপনি যেটা বলতে চাইছেন, কমিউনিটি দে রিমেইন্ড ইউনাইটেড, সলিডলি সাপোর্টেড শেখ হাসিনা, সেনসিটাইজড ব্রিটিশ পলিটিশিয়ানস। দেশের ভেতরে অ্যান্টি-করাপশনই বলেন আর রিফর্মই বলেন, যে সমস্ত কিছু হচ্ছিল, এসব ব্যাপারে দেয়ার ওয়াজ আ কনটিনিউয়াস প্রসেস অব ডিবেট অ্যান্ড ডিসকাশনস, তারা ওগুলোতে যেত। তারা ব্রিফ করত। আরেক সাইডে গভমেন্টের ব্রিফের জন্য অ্যামবেসি থেকে একজনকে পাঠানো-টাঠানো হইত আরকি। লর্ড এভবারি নামে একজন ছিল। হি ওয়াজ আ বেল ইন দ্য নেক। হিউম্যান রাইটস-এর ব্যাপারে এনিথিং অব বাংলাদেশ কামস, লর্ড এভবারি উইল কাম আপ। হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করত। প্রতি সপ্তাহেই সে একটা নোটিশ পাঠিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ইস্যুতে। রোডম্যাপ টু ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন, টাস্কফোর্স, এগুলো নিয়ে কনটিনিউয়াস প্রসেসে ডিবেট। বাট দে অয়ার অলসো স্কেয়ারড। বাংলাদেশের যেসব পলিটিশিয়ান, তারা আসা-যাওয়া কমায়া দিছিল। একটা ইনসিডেন্ট বলি। শফিক চৌধুরী, হি ওয়াজ দ্য ওনলি ওয়ান হু ওয়াজ অ্যাকটিভ। সে তার বাসায় একটা মিটিং করেছিল। তখন তো পলিটিকসের নামে কোনো অ্যাসেম্বলি করা যাইত না।

মহিউদ্দিন : সে কি লেবার এমপি ছিল?

শফি : না, সে লন্ডনে আওয়ামী লীগ নেতা ছিল। সিলেটি। সে এমসি কলেজে মনে হয় ছাত্রনেতা ছিল। ওখানে তার ভাই-টাই সব থাকে। রেস্টুরেন্ট আছে। পলিটিক্যালি অ্যাকটিভ। একদিন তারে বাসা থেকে ধরে নিয়ে আসল। এই সব ইনসিডেন্সগুলো একটু সেনসেশন ক্রিয়েট করছে। বাসা থিকা ধইরা নিয়া আসল। আটকায়া রাখল। হি ওয়াজ ফোর্সড টু মেক আ স্টেটমেন্ট—এগুলো করছে টরছে। এগুলোতে কিছু রিঅ্যাকশন হইছে।

মহিউদ্দিন : এইটাতে এখানে আটকিয়েছে?

শফি : হ্যাঁ, বাংলাদেশে। দেশে আইসাই তার সিলেটের বাড়িতে হি হোস্টেড আ পার্টি মিটিং।

মহিউদ্দিন : ওইটা নিয়ে লন্ডনে একটু তোলপাড় হয়েছে?

শফি : আমি যেটা ফিল করছি অ্যাজ আ হাইকমিশনার, এই যে ন্যুইসেন্স কতগুলো। এয়ারপোর্টে হ্যারাস করে, ব্যারিস্টার রিজওয়ানরে পিটাইছে, এ সমস্ত জিনিস। সিলেট এয়ারপোর্টে লন্ডন থেকে যারা আসে, প্যাসেঞ্জারস, তাদের হ্যারাস করে বেশি, বাড়াবাড়ি করছে। এগুলো নিয়ে ওরা ওখানে বেশ ভোকাল ছিল। আদারওয়াইজ, অন অকেশনস, হাইকমিশন অফিসের সামনে দাঁড়ায়া থাকা, দশ-পনেরো-বিশজন, বুকে ব্যানার নিয়ে, এগুলো ছিল। বাট ভায়োলেন্ট কিছু করে নাই। আই উড সে, তারা আমাকে টার্গেট করে নাই। এটার কারণ হলো, আমি যে আগেরবার ছিলাম, আই ওয়াজ ক্লোজ উইথ দেম। আই আর্নড দেয়ার কনফিডেন্স।

আনোয়ার চৌধুরী নিজের কিছু কিছু স্কিম ব্রিটিশ গভমেন্টকে দিয়া বাইর করাইছে। ওইটা তার পার্সোনাল অতি-উৎসাহ, এখানে পার্সোনাল কানেকশনস উইথ দ্য হাই-আপস। এইটাকে হাইলাইট করার জন্য করছে। একটা মানুষ যখন এত এক্সপোজার পায়, এটা কে না করে? বাংলাদেশি মানুষ না আমরা? এগুলো থেকে সে আরও বেশি উৎসাহিত হইছে এবং আমরা মনে করি, বিয়ন্ড দ্য নরমাল কল অব দ্য ডিউটি অব আ ডিপ্লোম্যাট। প্রফেশনাল ডিপ্লোম্যাট হলে হয়তো সে এটা করত না। আনপ্রফেশনাল, অন্য সার্ভিস থেকে এসেছে, বাংলাদেশি, ওইখানে সে ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাবিনেট অফিসে চাকরি করত। গভমেন্টের চাকরি করত। বাট নট ট্রেইনড অ্যাজ আ ডিপ্লোম্যাট। বয়সও কম ছিল।[৪]

শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার কয়েক মাস পর আওয়ামী লীগের চারজন কেন্দ্রীয় নেতা দিল্লিতে গিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী (পরে রাষ্ট্রপতি) প্রণব মুখার্জির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁরা হলেন আবদুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। এঁরা সবাই ছিলেন 'সংস্কারবাদী'। প্রণব মুখার্জি তাঁদের উদ্যোগকে সমর্থন করেছিলেন। আবদুর রাজ্জাককে তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। পরে যে কারণেই হোক, তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। দিল্লিতে আওয়ামী লীগের চার নেতাকে তিনি যা বলেছিলেন, পরে স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন উল্টো কথা। তিনি লিখেছেন যে

আওয়ামী লীগের মধ্যে 'হাসিনাবিরোধী গ্রুপের' কর্মকাণ্ডে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দলের চারজন নেতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁদের সমালোচনা করে বলেন, 'বিপদের সময় কাউকে পরিত্যাগ করা অনৈতিক।'[৫]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে ভারতের একটি সমঝোতা হয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল, এ রকম একটি প্রচার আছে। প্রচারটির পেছনে যৌক্তিকতা কিংবা সত্যতা আছে কি না, তা নিয়ে অনুসন্ধান হতে পারে। কিন্তু কিছু বিষয়ে ভারত যে পরামর্শ দিয়েছিল এবং এই পরামর্শ যে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে প্রভাব রেখেছিল, তা উঠে এসেছে প্রণব মুখার্জির বক্তব্যে। তাঁর ভাষ্যমতে :

> বাংলাদেশের সেনাপ্রধান মইন আহমেদ ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছয় দিনের সফরে ভারতে আসেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন। অনানুষ্ঠানিক আলাপের সময় আমি তাঁকে রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার গুরুত্বটি বোঝালাম। মুক্ত হওয়ার পর শেখ হাসিনা তাঁকে চাকরিচ্যুত করতে পারেন বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। কিন্তু হাসিনা ক্ষমতায় এলে তাঁর চাকরির ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নেব বলে তাঁকে আশ্বস্ত করি। আমি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি তাঁকে অনুরোধ করার জন্য, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি যেন হস্তক্ষেপ করেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে আমি সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং দেশটিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা নিশ্চিত করেছিলাম।[৬]

ছয় দিনের এক সরকারি সফরে জেনারেল মইন নয়াদিল্লি যান ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮। ২৫ ফেব্রুয়ারি সাউথ ব্লকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে তাঁকে প্রায় সাড়ে আট লাখ ডলার দামের ছয়টি ঘোড়া উপহার দেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল দীপক কাপুর। ঘোড়াগুলোর মধ্যে দুটি মর্দ এবং চারটি মাদি। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করা ছাড়াও তিনি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি এবং বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জয়রাম রমেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ও আলোচনা করেন। এটিই ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের কোনো সেনাপ্রধানের প্রথম ভারত সফর।[৭]

২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের সেনাপ্রধানের সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বাংলাদেশ প্রতিবছর সরকারিভাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের

আত্মত্যাগকে স্মরণ করবে।[৮]

৮ মার্চ বাংলাদেশের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৯৭১ সালে শহীদ ভারতীয় সেনাদের বাংলাদেশ শ্রদ্ধা জানাবে—এ ধরনের কোনো অঙ্গীকার বাংলাদেশের সেনাপ্রধান তাঁর ভারত সফরকালে করেননি। এ সম্পর্কে কয়েকটি পত্রিকায় বানোয়াট ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।[৯]

এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে টানাপোড়েন রয়ে গেছে, বিশেষ করে সেনা মনস্তত্ত্বে, এবং বাংলাদেশের সেনাপ্রধান তাঁর নিজস্ব এখতিয়ার বা কর্মপরিধির বাইরে গিয়ে কিছু কথা বলে থাকতে পারেন। ভারত সফর ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে লেখকের সঙ্গে কথা বলেছেন জেনারেল মইন। দুই নেত্রীকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রণব মুখার্জি কোনো অনুরোধ করেছিলেন কি না—এ প্রশ্নের জবাবে মইন বলেন, বিষয়টি তিনি স্মরণ করতে পারছেন না।[১০]

এ ছাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক বাধা নিয়ে তিনি খোলামেলা মন্তব্য করেন :

মহিউদ্দিন আহমদ : আচ্ছা, প্রণব মুখার্জির ব্যাপারে একটু আগে কথা বলছিলাম।

মইন ইউ আহমেদ : প্রণব মুখার্জির সঙ্গে যে দেখা হলো?

মহিউদ্দিন : হ্যাঁ।

মইন : হ্যাঁ, আমি ঠিক জায়গায় ঘা মারতে পেরেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল চাল আনা। হি হ্যাড পয়েন্টস, ইলেকশন দিবেন কবে?

মহিউদ্দিন : ওই যে অফিশিয়াল ভিজিটে যখন গেলেন। সে সময় তো?

মইন : হ্যাঁ।

মহিউদ্দিন : উনি ওই সময় ফরেন মিনিস্টার।

মইন : হ্যাঁ। ওদের মিনিস্ট্রিগুলো তো সব একসঙ্গে।

মহিউদ্দিন : ওই যে সাউথ ব্লক।

মইন : প্রথমে তো ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে ফরমাল কথা হলো। তারপর বললেন, একা কথা বলতে রাজি আছি কি না। বললাম, হোয়াই নট। আমাকে ছয়টা ঘোড়া প্রেজেন্ট করেছিল। এগুলি হাইব্রিড হর্স। পুরো হিস্ট্রি দিয়ে দিয়েছে। বললাম, পাঠানোর সময় তোমরা একটা ডাক্তার দিয়ে দিয়ো।

মহিউদ্দিন : ঘোড়াগুলো নিয়ে এসেছিলেন?

মইন : হ্যাঁ, নিয়ে এসেছি। আর্মিকে দিয়ে দিয়েছি। এগুলো অরিজিনালি রাশিয়া থেকে আনা। ওরা হিস্ট্রি দিয়েছে। এরা তো রেইজ করে? আমরা আসলে ঘোড়া কিনতে চেয়েছিলাম। তখন বলেছিল, না। ইফ চিফ কামস, উই উইল প্রেজেন্ট হিম।

অ্যানিওয়ে, ফরমাল টক হলো। কেমন আছেন, এই সব। তখন আমাদের দেশে বন্যা হয়েছিল, তিনবার। ওটা সম্বন্ধে বললাম। পরে অন্যরা চলে গেল। উনি তখন বললেন, ইলেকশন কবে দেব। পরে যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, উনি বলেছেন, 'আপনাকে যখন এ প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি জবাব দিতে একটু সময় নিয়েছেন।' ধরেন, অ্যাবাউট টেন সেকেন্ডস সময় নিয়ে উত্তর দিয়েছি। হি ওয়াজ সো প্রম্পট, হি হিমসেল্ফ রিপিটেড ইট।

বলেছেন, ট্রেন চলবে কি না। আমার বিষয় ছিল, চাল নেওয়া। কথা বলার সময় বলেছি, ট্রেন কি খাঁচার মধ্য দিয়ে যাবে? উনি 'না' বললেন এবং আমাকে দেখানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাকে উনি ফুল রেসপেক্ট দিয়েছেন। ওটা তো একেবারে বর্ডারে। বর্ডারে আমি ওদের বিওপিতে গেছি। হেলিপ্যাডটা ছিল বিওপির কাছে।

মহিউদ্দিন : কোন জায়গাটায়? বেনাপোলের কাছে?

মইন : ওর কাছেই। হেলিকপ্টার থেকে নেমে গাড়িতে ওখানে গেছি। ওদের বিএসএফ আমাকে গার্ড অব অনার দিয়েছে। ওদের পোস্ট ঘুরে দেখিয়েছে। দূরে দেখি কি, অনেক লোক, বাংলাদেশ অংশে। জিজ্ঞেস করলাম এরা এখানে কী করছে?

সাব, লোককো পাতা আ গিয়া, আপ ইহা আরাহে। সাব, আপকো দেখনে আয়া।

আমি হাত নাড়লাম।

মহিউদ্দিন : তখন কি ট্রেন চালু হয়ে গিয়েছিল?

মইন : না, আমি খাঁচা দেখতে গিয়েছিলাম। আমি বাংলাদেশের পেপারে পড়েছিলাম যে বর্ডারে ট্রেন যাবে একটা খাঁচার মধ্য দিয়ে। এটা দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর ট্রেন তো চালু হলো।

বাংলাদেশে তখন ফুড ক্রাইসিস। ইন্ডিয়া হ্যাড সারপ্লাস রাইস। যেভাবেই হোক, এই ভিজিটে আমাকে চাল নিয়ে যেতে হবে। ফরেন মিনিস্টারকে মিট করলাম। উনি বাঙালি। ওনার সব পয়েন্ট যখন শেষ হয়ে গেল—আচ্ছা দাদা, আমি কিছু বলতে পারি?

বলুন বলুন?

মহিউদ্দিন : দাদা বললেন?

মইন : যার সঙ্গে যে রকম। আমার তো দরকার চাল। হি ওয়াজ ভেরি কার্টিয়াস, ভেরি নাইস।

আপনিও বাঙালি, আমরাও বাঙালি। আমরা ভাত খাই, আপনিও ভাত খান। আজকে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হতে যাচ্ছে। আপনি খেয়ে আসছেন, আমাদের পুরা দেশ অভুক্ত। চাল দেবেন না?

তখন উনি দাঁড়িয়ে গেছেন। দাঁড়িয়ে আমাকে ধরেছেন। 'দোবো, দোবো, চাল দোবো।' অ্যান্ড হি কেপ্ট হিজ প্রমিজ। পাঁচ লাখ মেট্রিক টন ফ্রম ডিফারেন্ট স্টেটস। প্রথম চালানটা আসে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। তারপর আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন, 'আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' সবাই বলছিল, দেশে একটা দুর্ভিক্ষ হবে। আমরা এটা স্টপ করেছি।

মহিউদ্দিন : তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন চিফ মিনিস্টার।

মইন : হ্যাঁ। দ্যাটস রাইট। ভালো লোক ছিলেন। চাল দিয়ে দিয়েছেন। অন্য স্টেটগুলো কিন্তু এত প্রম্পটলি দেয় নাই। একটু সময় নিয়েছে। ৩৩৪ ডলার পার মেট্রিক টন, যতদূর মনে পড়ে। তখন ওয়ার্ল্ড মার্কেটে এক হাজার ডলার পার টন। আর পয়সা দিলেও চাল পাওয়া যাচ্ছে না। দেখলেন না, বিডিআরে চাল, ডালভাত নিয়ে কিছু হলো?

দ্যাট ওয়াজ আ গুড ট্রিপ। আই লাইকড ইট। আই কুড ডু সামথিং ফর দ্য নেশন। একটা হলো চাল নিয়ে আসা। তারপর ডিউটি ফ্রি গার্মেন্টস যাবে। এ ছাড়া নেপাল বর্ডারে ট্রানশিপমেন্ট, হেডলোডের বদলে ট্রাকের সঙ্গে ট্রাক মিলিয়ে মাল পাঠানো। আমি জানি না, পরে এটা হয়েছে কি না। কিন্তু উনি বলেছেন, এটা করিয়ে দেবেন।

এ ছাড়া ব্যক্তিগত কিছু ইচ্ছা ছিল। আমার আব্বা আমার নাম রেখেছিলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশতির নাম অনুযায়ী। তাঁর মাজারে গেলাম। সব ব্যবস্থা করা হলো। আর একটা জায়গায় যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। সেটা হলো শান্তিনিকেতন। সেখানে গেছি। ভালো লেগেছে। স্কুল দেখলাম। আমাকে সব ঘুরে ঘুরে দেখাল।

আমার কথা হলো, ডিপ্লোমেসিতে আমরা ছাড় দিতে রাজি আছি। কিন্তু বিনিময়ে কী পাচ্ছি, সেটা মাথায় রাখতে হবে। সব দিয়ে দিলাম,

কিছুই আনলাম না, সেটা তো হয় না? আমাদের কিছু ব্যুরোক্র্যাটস অ্যান্ড পলিটিশিয়ানস, দে নেভার থিংক অব দ্য ফিউচার অব অ্যানিথিং। একটা উদাহরণ দিই। যখন বার্মা প্রস্তাব দিল, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গ্যাস পাইপলাইন ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাবে, তারা আমাদের পারমিশন চাইল। বাংলাদেশ গভমেন্ট না করে দিয়েছে। আই ওয়াজ নট আ ভেরি সিনিয়র অফিসার। মে বি আই ওয়াজ আ ব্রিগেডিয়ার। বললাম, হোয়াট আর দে ডুয়িং? এটা কেন করতেছে? দেখেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইস্ট জার্মানি আর ওয়েস্ট জার্মানির ভেতর দিয়ে রাশিয়া গ্যাস পাইপলাইন নিয়েছে। তাদের মধ্যে ভীষণ হিংসা। ইকোনমিক গেইনের জন্য এটা দিল। আমাদের সঙ্গে তো ওদের এত খারাপ রিলেশন নেই। গ্যাস পাইপলাইন গেলে আমরা তো রয়্যালটি পেতাম।

মহিউদ্দিন : তখন তো বার্মার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার একটা সুযোগ তৈরি হতো?

মইন : হ্যাঁ, সম্পর্ক ছিল, খারাপ ছিল না। তখন আমরা গ্যাসে সারপ্লাস ছিলাম। যখন দরকার হতো, আমরা গ্যাস চাইতে পারতাম। আমাদের এখানে একটা পোর্ট রাখতে হতো। দেখেন, এখন আমরা মিডল-ইস্ট থেকে গ্যাস আনার কথা ভাবছি। অথচ আমরা হোম-ডেলিভার্ড, লো-কস্ট গ্যাস পেতাম। ওই সময় সরকারের ভুলের জন্য আমরা সুযোগ হারালাম।

২০০৭ সালে স্টাফ কলেজে গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি হচ্ছে। ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডর এসেছিলেন। বললাম, আমি জানি, আপনারা এ নিয়ে আগে কাজ করেছিলেন, পাননি। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমাদের দেশের ভেতর দিয়ে গ্যাস পাইপলাইন নিতে আমি আপনাদের হোল-হার্টেড সাপোর্ট দেব। উনি পরে চেষ্টা করেছেন কি করেননি, জানি না। এটা হয়নি। খুব দেরি হয়ে গেছে। ইন্ডিয়া করেছে কি, তাদের দেশের ভেতর দিয়ে লাইনটা ঘুরিয়ে নিয়েছে।

মহিউদ্দিন : মিজোরাম দিয়ে নিয়ে গেছে।

মইন : অনেক কস্টলি হয়ে গেছে। এখন যদি আমাদের গ্যাস পাইপলাইন থাকত, বার্মা কি এ রকম করতে পারত?

মহিউদ্দিন : ইন্ডিয়া কিন্তু এই গ্যাসের কারণে আমাদের কাছে আটকা থাকত।

মইন : ক্যালকাটা এবং অন্যান্য জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিতে এই গ্যাস

ব্যবহার হতো। আমরা যদি সাপ্লাই বন্ধ করে দিতাম, তাহলে ওরা চিল্লাচিল্লি শুরু করত, বার্মাকে বলত, ডোন্ট বি ফানি উইথ দেম। আমরা ওই শক্তিটা হারালাম। এই দেখেন আমাদের পলিটিশিয়ান আর ব্যুরোক্র্যাট, সবখানেই লাভ খোঁজে।

মহিউদ্দিন : ব্যক্তিগত লাভ।

মইন : দেশের লাভ না, ব্যক্তিগত লাভ। আমি তো বলি, এটা আমাদের জন্য কত বড় একটা অস্ত্র হতো। স্যাড। তারপর সাবমেরিন কেবল, আমাদের সিকিউরিটির নাকি ক্ষতি হবে। ইন্ডিয়া নিল। ইন্ডিয়া আমাদের চেয়ে কম করে হলেও দশ বছর এগিয়ে আছে, আইটিতে, বিকজ অব দিস।

মহিউদ্দিন : ফ্রি পাওয়া যেত।

মইন : ফ্রি দিচ্ছিল আমাদের। ব্যুরোক্র্যাটরা এসব বুদ্ধি দিয়েছে, সিকিউরিটি নষ্ট হবে। আরে, ইউ বিল্ড সিকিউরিটি, সো দ্যাট দে আর বাউন্ড টু নিল ডাউন।

যে যা-ই বলুক, স্ট্রাটেজিক্যালি আমাদের দেশ, ফিজিক্যালি বলে না—চেক পয়েন্টস, আমরা তা নই। আমাদের যে ল্যান্ড আছে, যেভাবেই পারি এটাকে ইম্পর্টেন্ট বানাতে হবে। কীভাবে করব? সো, ইউজ ইয়োর ব্রেইন।

আরেকটা জিনিস বলি, ট্রয়কা। ট্রয়কা জিনিসটা কী, জানেন? ট্রয়কা হলো ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টারি কমিশন। ওদের একটা টিম এসেছে। আমাদের এক বছর হয়ে যাওয়ার পর, তখন। আমরা তখন ভোটার আইডি নিয়ে ব্যস্ত। দশজন, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট মেম্বার, হেডেড বাই আ মিনিস্টার। তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছে। বললাম, ঠিক আছে। আমি একা। তারা দশজন, অভিজ্ঞ লোক। অনেক প্রশ্ন। ইলেকশন নিয়ে, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হবে কি না, এই সব। অল কোয়েশ্চনস রিলেটেড টু ইলেকশন। ওদের আমি এক ঘণ্টা টাইম দিয়েছিলাম। যখন টাইম প্রায় শেষ, তখন ওদের যে লিডার আছে, সে বলে, জেনারেল, হোয়াটএভার ইউ আর সেয়িং, ইজ ইট পসিবল টু কমপ্লিট রেস্ট অব দ্য থিংস ইন ওয়ান ইয়ার?

আমি এ রকম প্রশ্ন কখনো আশা করিনি। বললাম, ইয়েস, দিস কোয়েশ্চেন অলসো কামস ইন মাই মাইন্ড। বাট হু নোওজ, আফটার ওয়ান ইয়ার ইউ উইল কাম ব্যাক অ্যান্ড অ্যাপ্রিশিয়েট আস ফর ডুয়িং দিস গ্রেট জব, মে বি রিকোয়েস্টিং ফর হেল্প ফর ওয়ান অফ ইয়োর



হর্স ট্রেডিং? দিল্লিতে ভারতের সেনাপ্রধান দীপক কাপুরের কাছ থেকে ঘোড়া উপহার নিচ্ছেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ

> ইইউ কান্ট্রিজ। হোল ক্রাউড স্টার্টেড লাফিং। উই ফিনিশড ইট ইন অক্টোবর ২০০৮।[১১]

মইন ইউ আহমেদের দিল্লি সফরকে ইতিহাসের এই পর্বের একটি 'টার্নিং পয়েন্ট' বা মোড় পরিবর্তনের ক্ষণ হিসেবে দেখেন কেউ কেউ। ওয়াকিবহাল মহলে ওই সময় একটি কথা চাউর হয়েছিল যে মইন ঘোড়া আনতে গিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু ব্যাপারটি আদতে হয়ে গেছে 'হর্স ট্রেডিং'। এক-এগারো পরবর্তী রাজনীতিতে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

# সেনামনস্তত্ত্ব

সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করিয়ে ক্ষমতার চাবিটি হাতে নিয়ে নেয়। কিন্তু তাদের সামনে স্পষ্ট কোনো রূপকল্প ছিল না। শুরুতেই তারা হোঁচট খেল প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ নিয়ে। তাদের পছন্দের প্রথম ব্যক্তি রাজি না হওয়ায় তারা গেল দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে। অথবা বলা যায়, প্রথম পছন্দের মানুষের পরামর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয়জনের কাছে। তার মানে কে দায়িত্ব নেবেন, তার হিসাব তারা আগে থেকেই কষেনি।

সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করবে, এ ধরনের একটি পরিকল্পনা তাদের চেইন অব কমান্ডে আগে থেকেই ছিল কি না, তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। প্রথম প্রশ্ন হলো সেনা হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সেনা নেতৃত্ব একমত ছিলেন কি না। দ্বিতীয়ত, তাঁরা সামরিক আইন জারি করে একচ্ছত্র ক্ষমতা নেবেন, নাকি পেছন থেকে একটা অসামরিক সরকার চালাবেন, এ নিয়ে সেনা নেতৃত্বে দুই ধরনের মত ছিল বলে জানা যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বাভাবিক প্রথা ভেঙে মইন ইউ আহমেদকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে। প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তাঁর ছোট ভাই মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দার সেনাবাহিনীতে তাঁর পছন্দের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োগ দিতে পারিবারিক সম্পর্ককে কাজে লাগিয়েছিলেন। মইন ছিলেন সাঈদের কোর্সমেট। সাঈদের ভায়রা ভাই মেজর জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন রক্ষীবাহিনী থেকে আসা কর্মকর্তাদের একজন। কোনো পদাতিক ব্রিগেড কমান্ড করার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ নবম পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। এক-এগারোর অভ্যুত্থানে মূল স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে নবম ডিভিশনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মে. জে. সৈয়দ ফাতমী রুমী একনাগাড়ে পাঁচ বছর স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) মহাপরিচালক ছিলেন। মে. জে. আমিনুল

করিম ছিলেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব। বিএনপিতে তারেক রহমানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও উত্থান দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

সাঈদ এস্কান্দার আর তারেক রহমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। মামা-ভাগনের এই দ্বৈরথ ছিল বিএনপির উত্তরাধিকার নিয়ে। সাঈদ ছিলেন দলের সহসভাপতি, তারেক ছিলেন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর সাঈদ তাঁর কোর্সমেটদের নিয়ে ক্ষমতার একটা বলয় তৈরি করেছিলেন। সঙ্গে পেয়েছিলেন ভায়রা মাসুদকেও। সেনাবাহিনীর সব গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁদের বসানো হয়েছিল। একটা ব্যাপারে তাঁদের ঐকমত্য ছিল—যেকোনো উপায়ে তারেকের উত্থান ঠেকাতে হবে। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে তারেক সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তাঁরা সবাই একজোট হয়েছিলেন।[১]

সেনা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় জেনারেল এ টি এম জহিরুল আলমের নাম থাকাটাই স্বাভাবিক। ১৯৭৫ সালের বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির (বিএমএ) প্রথম ব্যাচে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। তবে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকার কারণে তিনি কোনো ঝামেলা করেননি এবং তাঁকে নিয়ে কোনো ঝামেলাও তৈরি হয়নি।

এক-এগারোর প্রেক্ষাপটে সেনামনস্তত্ত্ব এবং সেনাপ্রধান নিয়োগের কার্যকারণ বোঝার জন্য যে বিষয়গুলো দেখা দরকার, তা সচরাচর আলোচনায় আসে না। সেনাবাহিনী নিয়ে খুব কম দেশেই খোলামেলা আলোচনা হয়। বিগত বছরগুলোতে অনেকগুলো সফল ও ব্যর্থ অভ্যুত্থানের কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যকার দলাদলি ও রাজনীতি নিয়ে জনমনে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। লেখকের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে জেনারেল জহির কিছু কথাবার্তা বলেছেন। এই কথোপকথন এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> এ টি এম জহিরুল আলম : ঢাকায় এর আগে আমার পোস্টিং ছিল না। ঢাকা সম্পর্কে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট থাকার সময়ে।
>
> মহিউদ্দিন আহমদ : এটা কোন সময়ে?
>
> জহির : ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত। তারপর তো আমি জাতিসংঘে চলে গেলাম। আমাকে প্রথমে কিন্তু ফরেন মিনিস্ট্রিতে দিল। মইন আমাকে আর্মিতে চায়নি। কারণ, আমি তার কনটেম্পরারি ছিলাম। সে ভাবছে, আমি থাকলে যদি কোনো সময় আর্মিতে ক্যু হয়ে যায়। তাকে মুভ করে আমাকে না বসিয়ে দেয়। এ ধরনের একটা স্পেক্টার থাকেই। বিকজ আই

অ্যাম হিজ সিনিয়র। কেউ হয়তো পরামর্শ দিয়েছে, যার জন্য আমাকে ফরেন মিনিস্ট্রিতে পাঠাল। আমার অ্যাম্বাসেডর হয়ে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কথা।

মহিউদ্দিন : মইন চিফ হলেন কবে?

জহির : ২০০৪ সালে।

মহিউদ্দিন : মইন চিফ হলো, আপনি হলেন না। কারণটা কী? আপনাদের ব্যাচে আপনি তো সোর্ড অব অনার পেয়েছিলেন?

জহির : লে. জে. নাসিম চিফ ছিলেন। আর্মির মধ্যে বিএনপির বিরুদ্ধে যারা ছিল, তারা বলছিল জেনারেল সাদেকুর রহমান বা অন্য কাউকে চিফ করার জন্য। জেনারেল সাদেক ওয়াজ আ নাইস পারসন। আমার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। কিন্তু উনি ছিলেন রিপ্যাট্রিয়েটেড অফিসার। আমরা যারা সাঈদ এস্কান্দারের ব্যাচমেট ছিলাম, উই অয়ার অল ফ্রিডম ফাইটার্স। সাঈদ এস্কান্দারও ফ্রিডম ফাইটার। সাঈদ এস্কান্দারকে বললাম, একজন ফ্রিডম ফাইটারকে নেওয়া উচিত। আমরা কিন্তু একটা বিগ প্রেশার। আমাদের প্রেশারেই কিন্তু জেনারেল নাসিমকে চিফ করা হয়েছিল। ওই যে জেনারেল নাসিম যে ওইটা (ক্যু) করছে, তখন যারা অ্যান্টি গ্রুপ ছিল, তারা যেয়ে বলছে, আপনি ফ্রিডম ফাইটার দিচ্ছেন, আপনাকে কী করেছে? তখন মইন বিকেম দ্য ওনলি চয়েস। বিকজ, হি ওয়াজ সিনিয়র। নাম্বার টু, হি ওয়াজ আ নন-ফ্রিডম ফাইটার। নাম্বার থ্রি, হি ওয়াজ ফ্রম নোয়াখালী। মানে সব দিক দিয়ে মিলে গেছে। এখানে সব ইজমই কাজ করেছে। দে ডিড নট ওয়ান্ট আ ফ্রিডম ফাইটার টু বি দ্য চিফ।

মহিউদ্দিন : আপনি কি এতে আহত হননি?

জহির : আমি আহত বোধ করেছি। তবে অতটা না। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে আওয়ার কোর্স ইজ আ লিজেন্ডারি কোর্স। আমরাই প্রথম ব্যাচ, ১৯৭৫ সালে। আমাকে তো ওই সময় করবে না, কারণ, একটা প্রেশার ছিল। ফ্রিডম ফাইটারকে করবে না। কারণ, ফ্রিডম ফাইটাররা নট কন্ট্রোলেবল। তখন যদি মইনকে চিফ না করত, যদি অন্য কোনো সিনিয়র অফিসারকে করত, তাহলে আমাদের কোর্স থেকে চিফ হতে পারত না।

মহিউদ্দিন : রেজ্জাকুল হায়দারের নাম শুনেছিলাম।

জহির : হ্যাঁ, উনি হলে আমরা আমাদের কোর্সের কেউই চিফ হতে পারতাম না। বাংলাদেশে কিন্তু ফার্স্ট ব্যাচ থেকে কেউ চিফ হয়নি, শেখ কামালের ব্যাচ। বাংলাদেশে কিন্তু ওই কোর্স থেকে চিফ হওয়া উচিত ছিল। বিকজ দ্যাটস আ লিজেন্ডারি ব্যাচ, দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটেড ইন ওয়ার।

বাংলাদেশের যেকোনো সরকারের উচিত ছিল টু রেসপেক্ট দ্য হিস্ট্রি।

মহিউদ্দিন : ওই ব্যাচের কে ছিল আপনাদের সিনিয়র?

জহির : অনেকেই ছিল। জেনারেল সাঈদ ছিল। হি ওয়াজ দ্য সোর্ড অব অনার। উনি পিএসও-এএফডি (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন) ছিল।

মহিউদ্দিন : ওনার পুরো নাম কী?

জহির : জেনারেল সাঈদ আহমদ। উনি রিটায়ার করে চলে গেলেন। যদি রেজ্জাকুল হায়দারকে করত, তাহলে তো আমাদের ব্যাচ হতো না। তাহলে কী হতো—ফার্স্ট এসএসও হয় নাই। ফার্স্ট বিএমএও হয় নাই। এ জন্যই একদিকে আমি হার্ট ছিলাম, আবার অন্যদিকে, ও তো (মইন) আমাদের পঁচাত্তরের ব্যাচেরই। এ রকম একটা ফিলিং থাকে না অনেক সময়? আমি হই নাই, আমার সাথের একজন তো হয়েছে?[২]

সামরিক বাহিনীর মধ্যে পছন্দের লোক খোঁজার চেষ্টা রাজনৈতিক সরকারগুলোর মধ্যে বরাবরই দেখা গেছে। বিভিন্ন কারণে ভালো লাগা বা মন্দ লাগা, পছন্দ হওয়া বা না হওয়া—এসব দেখা গেছে সেনাপ্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে। অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠকে ডিঙিয়ে কনিষ্ঠকে বা একই ব্যাচের ক্রম অনুযায়ী যিনি ওপরে তাঁকে বাদ দিয়ে পেছনের একজনকে সেনাপ্রধান বানানোর রেওয়াজ চালু হয় ১৯৭২ সালেই। তখন জিয়াউর রহমানকে ডিঙিয়ে কে এম সফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়েছিল। এ নিয়ে জিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন। আবার তিনিই তিনজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সেনাপ্রধান বানিয়েছিলেন ১৯৭৮ সালে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯৪ সালে বেশ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে হাসান মশহুদ চৌধূরীকে ডিঙিয়ে হারুন অর-রশিদকে সেনাপ্রধান নিয়োগ দেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। তাঁরা কেউই নিয়োগকর্তা সরকারের বা দলের ত্রাণকর্তার ভূমিকা নেননি। কেউ কেউ তো বিরোধিতাই করেছেন। তাঁরা কেউ কেউ রাজনীতিতে জড়িয়েছেন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটাতে নিজের সীমানা অতিক্রম করেছেন। চেষ্টা করেছেন সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিজস্ব বলয় তৈরি করতে। রাজনীতিবিদেরা যেমন অনেক সময় সেনাবাহিনীর মধ্যে গোষ্ঠীগত বা দলীয় আনুগত্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন, সেনা নেতৃত্বের মধ্যেও তেমনই দেখা গেছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার চেষ্টা। সেনামনস্তত্ত্ব বুঝতে হলে এসব বিষয় আমলে নেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে বিমানবাহিনীর চিফ অব স্টাফ (২০০৩-

২০০৭) এয়ার ভাইস মার্শাল ফখরুল আজম লেখকের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছেন। এখানে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

মহিউদ্দিন আহমদ : আমি শুনেছি। এটা গসিপও হতে পারে। সাঈদ এস্কান্দার...

ফখরুল আজম : আমি ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে পরে বলেছিলাম। আফটার ইলেকশন ২০০৮। আমি বলেছি, ম্যাডাম, দেশ তো আপনার ভাইয়ের। যা কিছু হয়েছে, দোষ আপনার ভাইয়ের। মইন ইউ আহমেদ—এরা মিলে—মাসুদ ওয়াজ আ ব্যাক সিটার। ম্যাডাম একবার জিজ্ঞেস করেছিল—মাসুদ কী রকম লোক? ভালো?

আপনার আত্মীয়, আপনি তো বেশি করে জানেন?

সাঈদ এস্কান্দার সম্পর্কে বলতে গিয়ে—তখন তিনি অলরেডি মারা গেছেন। ম্যাডামের ভালো লাগেনি কথাটা। আফটার অল, ভাই তো। আসলে সে হতে চেয়েছিল পার্টির চিফ। এবং প্রধানমন্ত্রী হবে। অ্যান্ড মইন ইউ আহমেদ সিটিং ইন বঙ্গভবন অ্যাজ প্রেসিডেন্ট। দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান।

মহিউদ্দিন : এ জন্যই তারেকের সঙ্গে সাঈদের কনফ্লিক্ট? বিএনপির লিডার কে হবে?

ফখরুল : ওদের কনফ্লিক্ট এত তীব্র ছিল, বিটুইন মামা-ভাগনে, ইট ওয়াজ ফেল্ট বাই আদার্স। আমাদের মতো মানুষও ফিল করেছে।

মহিউদ্দিন : মইনকে চিফ করার পেছনে সাঈদ এস্কান্দারের ভূমিকা ছিল?

ফখরুল : হ্যাঁ। সবাই নোয়াখালীর। কাছাকাছি বাড়ি।

মহিউদ্দিন : জহিরের কি চিফ হওয়ার কথা ছিল না?

ফখরুল : প্রথম নামটি ছিল রেজ্জাকুল হায়দার। বিডিআরের ডিজি ছিল। ও আমাদের সমসাময়িক। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের। অলরেডি তার নাম চলে এসেছিল। এমনকি জেনারেল মাহবুব কনগ্রাচুলেটেড হিম। সন্ধ্যায় মইন ইউ আহমেদ আর সাঈদ এস্কান্দার কী একটা সিডি নিয়ে গিয়ে ম্যাডামকে দেখিয়েছে। রেজ্জাকুল হায়দারকে বানাবেন? দেখেন।

রেজ্জাকুল হায়দার ওয়াজ আ ফ্ল্যামবোয়েন্ট পারসন। ওই সন্ধ্যায়ই ম্যাডাম তার নাম কেটে দিছে। নেক্সট ওয়াজ সাপোজড টু বি জামিল।

মহিউদ্দিন : জামিল ডি আহসান?

ফখরুল : হ্যাঁ। কিন্তু যখন মাঝখানে আওয়ামী লীগ আসে (১৯৯৬-

২০০১), তখন তার ভূমিকাটা—অ্যাকর্ডিং টু বিএনপি—হি ওয়াজ সাইডট্র্যাকড। তারপর ছিল জহির। জহির ওয়াজ প্রফেশনালি ওয়ান অব দ্য বেস্ট। জহিরের কোনো বদনাম ছিল না। তাকে সাইডট্র্যাক করল। করছে সাঈদ এস্কান্দার আর মইন ইউ আহমেদ। আর এই নোয়াখালী কানেকশন।[৩]

এয়ার ভাইস মার্শাল ফখরুল আজমের কথায় এটা স্পষ্ট যে খালেদা জিয়ার ভাই সাঈদ এস্কান্দারের নিজস্ব একটি পরিকল্পনা ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে পোস্টিং-প্রমোশন নিয়ে এসব নতুন নয়। এক-এগারোর সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা খুঁজতে হলে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য গল্প দাঁড় করানো যায়।

সেনাবাহিনীর একটি অংশ সরাসরি সামরিক আইন জারির পক্ষে ছিল। এক সাক্ষাৎকারে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, 'আমি অ্যাডভাইজার হওয়ার ব্যাপারে রাজি হইনি প্রথম প্রথম। আমাকে মইন বলল, আপনারা না আসলে ইয়াংরা মার্শাল ল দিয়ে দেবে।'[৪]

কাগজে-কলমে দেশে সামরিক শাসন জারি না হলেও সামরিক বাহিনীর উঁচু পদগুলো অপেক্ষাকৃত সামনের কাতারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়। এ কাজে সফলও হন তাঁরা। সামরিক বাহিনীর কয়েকটি পদ 'আপগ্রেড' করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কের। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকাকালে নিজেই নিজেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে 'পদোন্নতি' দেন। সেই থেকে সেনাপ্রধানেরা লে. জেনারেল পদমর্যাদা পেতেন। এবার সেনাপ্রধানের পদটি 'জেনারেল' পদে উন্নীত করা হয়। একই সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধানের পদ রিয়ার অ্যাডমিরাল থেকে ভাইস অ্যাডমিরাল এবং বিমানবাহিনী প্রধানের পদ এয়ার ভাইস মার্শাল থেকে এয়ার মার্শাল পদে উন্নীত হয়। এর ফলে সেনাবাহিনীর র‍্যাঙ্কে লে জেনারেলের কয়েকটি পদ তৈরি হয়।[৫]

২৬ মে ২০০৭ থেকে এটি কার্যকর করা হয়।[৬]

সামরিক বাহিনীর পদগুলো 'আপগ্রেড' করার পেছনে যুক্তি ছিল বাহিনীগুলোর ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অন্য দেশের কর্মকর্তাদের পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা এবং আরও অনেক দেশের সামরিক বাহিনী অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়া সত্ত্বেও সেখানে চার তারকা জেনারেলের পদ থাকা ইত্যাদি। জেনারেল মইন বলেন :

আমাদের টেবিল অব অর্গানাইজেশনে তখন এটা ছিল না। গভমেন্ট হ্যাজ দ্য অথরিটি টু ডু ইট। আমার সময় টেবিল অব অর্গানাইজেশনে এটা

ঢুকিয়ে তারপর আমাকে ফুল জেনারেল করা হয়। এটাও দরকার। কারণ, নেপালের মতো একটা দেশেও ফোর-স্টার জেনারেল আছে, অনেক আগে থেকেই। তাদের ট্রুপস আমাদের থেকে অনেক কম। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা খুব দরকার। সমানে সমানে হয় না। আর এটা তো বেতনে কোনো এফেক্ট করে না। হলেও খুব অল্প।

তারপরও একটা প্রপোজাল ছিল, চিফ অব স্টাফ প্রতিমন্ত্রীর সমান মর্যাদা পাবেন। চিফ অ্যাডভাইজার একবার আমাকে বলেছিলেন, সেনাপ্রধানেরটা করে দিই, বাকিগুলো থাকুক। আমি বললাম, না, করলে পুরোটা করতে হবে। না হলে না। শুধু আমি হলে মানুষ এ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে।[৭]

রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে কেউ কেউ খেলায় মেতে উঠেছিলেন। একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার যেন না হতে পারে, এ জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার ব্যাপারে হার্ডলাইনে ছিলেন কেউ কেউ। এসব কথা উঠে এসেছে লেখককে দেওয়া ব্রি. জে. বারীর সাক্ষাৎকারে।

চৌধুরী ফজলুল বারী: এরপরের ঘটনা হলো—কেমনে আমাকে আউট কইরা দিবে, জেনারেল মাসুদকে আউট কইরা দিবে। সম্ভবত এগুলি জেলাসি থেকে হইছে। এখন কীভাবে আউট করবে? কথা উঠাইল যে আমরা ক্যু করতেছি, আমি আর জেনারেল মাসুদ মিলে। তো জেনারেল মাসুদকে পোস্টিং করছে। আমি জেনারেল মাসুদকে ফোন করলাম। আমার ফোনটা টেপ করছে। বললাম, স্যার, আপনার তো পোস্টিং হইয়া গেছে। তখনো আমাকে তাদের সাথে রাখছে। তো পোস্টিং হইছে কোথায়? যা হোক, আপনি যে মালপত্র বক্স-টক্স করবেন, খুইলেন না। এরপর আপনার আরেকটা পোস্টিং হবে। বিদেশে পাঠায়া দিবে।

ওনাকে তো বললাম ফোনে। একসঙ্গে কাজ করতেছি। আমি সবাইকে জানি। (মাসুদ) এমন কিছু করে নাই, যার জন্য তাকে বদলি করতে হবে। তখনই তো ওয়ান-ইলেভেনের বারোটা বাইজা গেছে।

আমার ডিজি আমাকে বলল, তুমি কি জেনারেল মাসুদের সঙ্গে কথা বলছ?

বলছি।

কয়েক দিন পর আমার ডিজি গোলাম মোহাম্মদ চলে গেল কক্সবাজার। ব্রিগেডিয়ার আমিন চলে গেল ব্যাংকক। ব্রিগেডিয়ার আমিন তো কথায় কথায় থাইল্যান্ডে চলে যেত, ইউকে চলে যেত। আমাকে শনিবারে ডাকছে।

আমি তো বুইঝা ফেলছি। আমার মনের মধ্যে টান দিছে। খুব সম্ভবত আমাকে বদলি কইরা দিবে। ডিজি যখন ঢাকার বাইরে যায় তখন অ্যাকটিং ডিজির অর্ডার করে দিয়ে যায়। সেটা হয় ডাইরেক্টর, সিআইবি। এইবার সেটা করে নাই। এসব কথা আপনাকে বলতেও খারাপ লাগে। কে যে কার চর? এটা আমার রিজিকের ওসিলা, আমি আপনাকে সত্যি কথাটা বলছি।

আনফরচুনেটলি এরা দুইজন দুই দিকে গেল। আমাকে ডাকল সেনাপ্রধান, ফোন করল। উনি নিজেই ফোন করলেন। তুমি একটু আসো।

কোথায় স্যার?

আমার অফিসে।

আমি মনে মনে কনফার্ম হয়ে গেছি। তো কথায় কথায়—এই কেমন আছ-টাছ। আচ্ছা, ডিজিএফআইয়ে—তো অনেক দিন হয়ে গেছে। আমাদের তো বদলির একটা সিস্টেম আছে। তো ইউ হ্যাভ টু লিভ দ্য কান্ট্রি।

কোথায় যাব?

তোমার জন্য দুইটা অপশন। আইদার ইউ গো টু আমেরিকা অ্যাজ ডিফেন্স অ্যাটাশে ফর থ্রি ইয়ার্স, অর ইউ গো টু চায়না ফর ওয়ান ইয়ার—ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমিতে কোর্স করার জন্য।

তাৎক্ষণিকভাবে বললাম, স্যার, ঠিক আছে। আমি আমার মায়ের সাথে, আমার ওয়াইফের সাথে একটু কনসাল করে দেখি। বাট আই উড প্রেফার টু গো টু দ্য অ্যামবাসি। কেন প্রেফার করি? বিকজ, আমি যদি এখন এক বছরের জন্য যাই, আমার মেয়ে ও লেভেল পরীক্ষা দিবে। এটা ডিসটার্বড হয়ে যাবে। আইসা আবার দুই বছর আর্মিতে চাকরি করতে হবে। আমি যদি আমেরিকা যাই, তিন বছরের মধ্যে আমার চাকরি শেষ হয়ে যাবে। আমি রিটায়ার কইরা চইলা আসব। আই উইল রিমেইন আ রিটায়ার্ড পারসন।

পরের দিন ফোন করলাম। বললেন, তুমি তো আমেরিকার কথা বলেই গেছ।

ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ওনারা আমাকে আউট অব দ্য রিং কইরা ফেলছে। ২০০৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে।

দুই নেত্রী তখন জেলে। শেখ হাসিনার কাছে ব্রিগেডিয়ার আমিন রেগুলার যায়। ওনার কাছে গওহর রিজভীকে নিয়া যায়। এগুলো কিন্তু না বলা কথা, আপনাকে বলতেছি।

মহিউদ্দিন আহমদ : আমিন নিয়ে যায় গওহর রিজভীকে?

বারী : জি। এটা সেনাপ্রধান জানে। এই তিনজন জানে। সেনাপ্রধান, আমিন আর রিজভী। আমার কাছে যখন খবর আসল, আমি তখন ডিজির অফিসে বসা। ওনার বাসায় একটা অফিস আছে, সেখানে। বললাম, স্যার, ড. গওহর রিজভীকে চেনেন নাকি?

না, আমি চিনি না।

উনি তো শেখ হাসিনার সঙ্গে রেগুলার দেখা করে।

কে নিয়া যায়?

আমিন।

অ্যা, তাই নাকি?

ডিজিও জানে না। চেইন অব কমান্ড কোথায় চলে গেছে? ডিজি সাথে সাথে লাল ফোনে সেনাপ্রধানকে ফোন করল।

স্যার, এ রকম তো ঘটনা।

আরে, এ তো আমি জানি।

আমার মনঃকষ্ট, রাগ—আমরা কোনো পক্ষপাতিত্ব করতে চাই নাই। যেটা নিয়ে মানুষ গর্ববোধ করবে, দেশের মানুষ—ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গর্ববোধ করবে ডেমোক্রেসি নিয়ে—কী করল? বললাম, স্যার, আই হেইট ইউ।

কেন?

স্যার, ইমার্জেন্সির উদ্দেশ্য তো এইটা ছিল না? বেগম জিয়া ক্ষমতায় বইসা যাচ্ছেন। আপনারা ওনার কাছ থেকে প্লেটটা আইনা আরেকজনকে দিয়া দিচ্ছেন। আমাদের দায়িত্ব তো এটা ছিল না? এটা ঠিক করেন নাই আপনারা।

আমি ডিজির ওপর রাগ করছি। ইন দ্য মিন টাইম ব্রিগেডিয়ার আমিন আসছে। দেখো দেখো, বারী কী বলতেছে।

কী, বারী?

কথা বলতে হলে সবার সামনে এসে এক কাতারে কথা বলেন। ইজ দিস কলড লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড? আপনি একজনের জন্য করবেন, আর সবাইকে ইয়া কইরা দিয়া? তার মানে এটা মটিভেটেড।

ঠিক আছে, তুমি যাও বেগম জিয়ার কাছে?

অবশ্যই যাব।

বেগম জিয়া কিন্তু খবর পাইছেন। এটা তো পাকিস্তান না যে আইসোলেট কইরা একজনকে পেশোয়ারে আর একজনকে রাওয়ালপিন্ডি রাইখা দিছেন? পাশাপাশি থাকতেছে। যে ঘর মুছতে আসে, সে-ই হয়তো বইলা দিছে।

ঠিক আছে, আমি যাব। এরপর আমি খোঁজখবর নিলাম। বেগম জিয়াকে জানাইলাম, আমি আসতেছি। যাওয়া শুরু করলাম। সাত দিন গেছি আমি।

এর আগেই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাজেন্ডা? আপনি শেখ হাসিনার সঙ্গে কী কথা বলবেন, বেগম জিয়ার সঙ্গে কী কথা বলবেন?

তখন কয়টা অ্যাজেন্ডা, মুখে যা আসে বইলা দিল—প্রেসিডেন্টের কাছে এই ক্ষমতা থাকবে, প্রেসিডেন্টের কাছে জুডিশিয়ারি থাকবে, ডিফেন্স থাকবে। তো ঠিক আছে। আমি গেলাম। উনি ওনার অনেক সুখ-দুঃখের কথা বললেন। উনি মশকরা কইরা আমাকে বললেন, তাহলে আমি প্রেসিডেন্ট হইয়া যাই?

মহিউদ্দিন : বেগম জিয়া?

বারী : জাস্ট ফান কইরা বলতেছে।

হইয়া যান? দেশের মানুষ ভোট দিলে তো আমাদের কিছু করণীয় নাই। অসুবিধা কী?

দ্যাট ওয়াজ দ্য লাইটার পার্ট। উনি আমাকে যেটা বলছেন—দেখো, আমার কী দরকার ছিল? আমি সব শেষ করলাম। আমার ইজ্জত তো শেষ হইয়া গেল। তোমরা অ্যারেস্ট কইরা ফেললা?

এখানে একটু কথা বলি। বেগম জিয়াকে অ্যারেস্ট করা হয়—জাস্ট টু ব্যালেন্স।

মহিউদ্দিন : শেখ হাসিনাকে অ্যারেস্ট করার কারণে?

বারী : হ্যাঁ। ওনার অ্যাগেইনস্টে কিছু ছিল না। আমি যখন সাত দিন গেলাম—সাত দিন যাওয়ার পর বললাম, ম্যাডাম তো সবই মানেন, এখন মনে হয় তাঁর কাছে সিনিয়র লেভেলের কারও যাওয়া উচিত। অ্যাডভাইজার লেভেলে, যারা ওইখানে (শেখ হাসিনা) যোগাযোগ রাখতেছে। ওইখানে কিন্তু অ্যাডভাইজাররা যাওয়া-আসা শুরু করছে। তখন গোলাম মোহাম্মদ বলে, আমি যাব। গোলাম মোহাম্মদ তখন চিফকে ফোন করল। চিফ বলল, না। আমিনের ওপর আস্থা এত বাইড়া গেছে। আমিন যাবে। কেন আমিন যাবে, কী কারণে আমিন যাবে, আমার কর্তব্যটা কী, কিছুই শুনল না। আমার কথা ছিল সিনিয়র লেভেলের কেউ যাক। আমার লেভেলের কেউ যদি কথা বলে, এটা অথেনটিকেটেড হইতে হবে আরেকটা সোর্স থেকে। সেটা হতে হবে, মাই সিনিয়র। আমিন তো আমার অ্যাট পার। আমি ব্রিগেডিয়ার, সে-ও। ঠিক আছে, চাকরিতে আমি জুনিয়র। কিন্তু এটার

কোনো ভেল্যু নাই। ভ্যাল্যু হইল, সে ডাইরেক্টর, আমিও ডাইরেক্টর। উপরন্তু একজনকে পাঠানো দরকার।

তো আমিনকে দিল। আমি আর আমিন গেলাম। ম্যাডাম প্রত্যেক সময় চেয়ারটা টান দিয়া দেন বসার সময়। এটা ওনার কার্টেসি। ওনার রুমে যাই আমি সব সময়। আমিন যাওয়ার কারণে উনি বাইরে বসছে। আগস্ট মাস। না না, আরও আগে। দিন-তারিখ ভুইলা যাচ্ছি।

মহিউদ্দিন : তখন তো উনি কাস্টডিতে?

বারী : হ্যাঁ, কাস্টডিতে। প্রচণ্ড গরম। উনি বাইরে গিয়া বসছেন এই গরমের মধ্যেও। আমিন যেভাবে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছে, এভাবেই—আমরা পলিটিকস ক্লিন করাইছি—দাঁড়ায়া গেছেন উনি। রাগ কইরা উনি দাঁড়ায়া গেছেন। কে বলল?

আমি বললাম, পত্রপত্রিকায় আছে, মিডিয়ায় এগুলি আসছে। আপনারাই তো দিছেন মিডিয়া? আপনারা তো কন্ট্রোল করেন নাই? মিডিয়াতে আসছে। একসময় শেষ হয়ে যাবে।

আমি বুঝায়া-টুঝায়া আসছি। আমিন করল কী? চিফকে ফোন করল। আমার বিরুদ্ধে—আমি নাকি নরম হইয়া কথা বলি।

আমি ভদ্রমানুষের ছেলে তো। আমি তো লাঠিয়ালি করতে পারব না। একটা দেশের প্রাইম মিনিস্টার ছিল, রাষ্ট্রপতির ওয়াইফ, সেনাপ্রধানের ওয়াইফ, সর্বোপরি আমার মায়ের বয়সী। সবার সঙ্গে আমি একভাবে কথা বলতে পারি না। যা আমি একটা রাস্তার লোকের সঙ্গে বলব, একটা তৃতীয় শ্রেণির পলিটিক্যাল কর্মীর সঙ্গে যেভাবে বলব, চোর-চোট্টা যদি হয় তার সঙ্গে যেভাবে কথা বলব, তাঁর মতো মানুষের সঙ্গে তো আমাকে অন্যভাবে কথা বলতে হবে।

যা হোক, আমার সঙ্গে আর কোনো কথা নাই। পরের দিন জেল থেকে আমাকে ফোন করল—জেলে একজন মেজর ছিল না?

মহিউদ্দিন : হ্যাঁ, একজন মেজর ছিলেন, ধীরে ধীরে কথা বলতেন। ডিআইজি প্রিজনস মেজর শামসুল হায়দার সিদ্দিকী।

বারী : হ্যাঁ, ডিআইজি প্রিজন্স। ও আমাকে ফোন করল—স্যার, কখন আসবেন?

ওর কাছে তো আমি ধরা দিতে পারি না? বললাম, টাইম ঠিক করে আমি তোমাকে জানাব।

আমি সাথে সাথে চিফকে ফোন করলাম।

স্যার, আজকে কি যাওয়ার কথা?

না, বারী—আমতা আমতা করা শুরু করল।

আমিনকে ফোন করি। আমিন আর ফোন ধরে না। আমি বুইঝা ফেললাম যে জিনিসটা শর্টসার্কিট হইয়া গেছে। এরপরেই আমাকে ডাকল। প্যাকআপ কইরা দিল যাওয়ার জন্য। ওয়ান-ইলেভেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফরমালি শেষ হইয়া গেল। ইন্ডিয়ার হাতে আমরা চইলা গেলাম।

এই যে আপনারা বলেন, রাজনীতিবিদদের কলুষিত করার জন্য ওয়ান-ইলেভেন—কলুষিত কইরা কি অন্য কেউ বইসা যাইত? রাজনীতিবিদরা—আপনারা আমাদের কলুষিত করতেছেন।

প্রণব মুখার্জি, উনি বোধ হয় একটা ইন্টারভিউ দিছেন। উনি জেনারেল মইনকে বলছিলেন ওনাদের ছাড়ার জন্য। জেনারেল মইন আবার ওনার কাছে আবেদন করলেন, আমার চাকরি আবার খেয়ে ফেলবেন না তো শেখ হাসিনা। তখন থেকেই সূত্রপাত হইছে। আমি আমার কথা বলতাছি। আমি জানতাম না কোনো কিছুই। এরপরই বোধ হয় আমিনরে দিয়া এসব করাইছে। আমিনেরও আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল।

আমি জেনারেল মইনকে বলতাম, স্যার, মানুষ বলে, আপনি বাঘের পিঠে সওয়ার হইছেন। আমি বলি, আপনি দুইটা বাঘের পিঠে ছুরি মারছেন। ছুরি মাইরা দুইটা বাঘের পিঠে সওয়ার হইছেন এক সাথে। আপনি যখন রিটায়ার করবেন, ব্যালকনিতে বসবেন, মনে করবেন যে বারী আমাকে এই কথাগুলি বলছিল। প্রণব মুখার্জির এককথায় উনি দেশটাকে ছ্যাড়াব্যাড়া কইরা দিছেন।

মহিউদ্দিন : ওই সময় আমরা কয়েকজন অ্যাম্বাসেডরের কথা শুনেছি।

বারী : দৌড়ঝাঁপ। এগুলা কিছুই না। এগুলা জাস্ট রুটিন। তারা ধরনা দিছে। আমি আপনাকে ওয়ান-ইলেভেনের যে গল্পটা বলছি, আমার জানামতে এটুকুই। বিদেশি কে আইসা কী করল না করল...।

আমি ব্রি. আমিনকে বলছি, এ ছাড়া কোনো উপায় নাই।

সর্বনাশ, তুমি বলো কী। ইমার্জেন্সি দিলে উই উইল বি স্ট্র্যানডেড! আমরা কোথাও যেতে পারব না। এটা আফ্রিকার মতো হয়ে যাবে। তাদের চিন্তাভাবনা হইল এই রকম।

এরা কেউ ইনভল্‌ভড না। কেউ না। পরে আইসা ইনভল্‌ভড হইছে। পরে জানতে চাইছে, এইটা কেমনে হইল, ওইটা কেমনে হইল, কেন হইল এটা, তোমরা পলিটিশিয়ানদের কেন ধরতেছ—এগুলা। কিন্তু কখনোই তারা এটার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে নাই। তাদের তো নিজস্ব একটা কোড অব

কনডাক্ট আছে। তারা তো এর বাইরে যাইতে পারে না। আর্মির সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমি জানি না, গোপনে যদি কিছু থেকে থাকে। এগুলা হইলে আমার জানার কথা। আমার সাথে জেনারেল মইনের যত কথাবার্তা হইছে, কোনোভাবেই এই সব জিনিস আসে নাই। জেনারেল মাসুদের সাথে কথাবার্তা হইছে, কোনোভাবেই এগুলা আসে নাই।

মহিউদ্দিন : জেনারেল মাসুদের সাথে জেনারেল মইনের একটা কনফ্লিক্ট ছিল বলে শুনেছি।

বারী : ওইটা তো বললাম। ওনাকে যে বাইর কইরা দিল, একই সাথে আমাকেও তো বাইর কইরা দিল। উনি কথাটা উঠাইল এইভাবে, দেখো, আমি আর্মির মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট চাই না। তার মানে উনি বুঝাইতে চাইছেন, আমি আর জেনারেল মাসুদ আর্মির মধ্যে একটা ক্যু-ট্যু করার চিন্তাভাবনা করতেছি।

মহিউদ্দিন : কেয়ারটেকার সরকারের দুই বছরের মেয়াদ ঠিক হলো কীভাবে?

বারী : এটা মোটামুটি হাই লেভেল মিটিং ছিল। আমি তখনো চিফের কাছে নম্বর ওয়ান। চিফ জিজ্ঞেস করতেছে, কত দিন হওয়া উচিত। বারী, তুমি বলো?

স্যার, দুই বছর হওয়া উচিত।

কেন?

এই যে রিফর্মগুলো, ভোটার লিস্ট করা, ইলেকশন কমিশনের জন্য বিধিমালা করা, দিস উইল টেক সাম টাইম। তাড়াহুড়া করতে যাবেন, ইট উইল নট বি সাকসেসফুল। আর বেশি দিন প্রলংও করা যাবে না। বাংলাদেশের মানুষ অধৈর্য মানুষ। তারা খালি পরিবর্তন চায়। আপনার অ্যাগেইনস্টে শুরু হয়ে যাবে।

আরেকজন অফিসার বললেন, স্যার, যত দিন দরকার তত দিনই থাকতে হবে। ক্ষমতা তো তৃপ্তির জিনিস না? এক বছর কয়েক মাস ছিলাম। জান বাইর হইয়া গেছে।

আরেক দল আসে, কাগজ নিয়া আসে, দেখায়—টার্কিতে এইভাবে করছে, সিঙ্গাপুরে এইভাবে করছে, জার্মানির কনস্টিটিউশন এই রকম, কনস্টিটিউশন চেঞ্জ কইরা ফেলেন—কত উপদেশ, পরামর্শ?

মহিউদ্দিন : কৌতূহল থেকে একটা কথা বলি। তথ্যের অভাবে তো অনেক গুজব তৈরি হয়। এই যে বিদেশি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি—এদের

অপারেটিভরা তো আমাদের দেশে আছে? র, আইএসআই, এমআই-সিক্স, সিআইএ? আপনাদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ হয় কীভাবে?

বারী : এটা মেনটেইন করত সিটিআইবি। এক্সটারনাল ইন্টেলিজেন্স ব্রি. আমিনের আন্ডারে।

মহিউদ্দিন : আপনারা কি কাছাকাছি বয়সের?

বারী : উনি তো থার্ড লং কোর্স করছেন। আমি ফোর্থ লং।

মহিউদ্দিন : উনি এক ব্যাচ সিনিয়র।

বারী : এক ব্যাচ। বয়স হয়তো সমান সমানই হবে। অনেকে তো আবার বয়স কমায়া নাবালক হিসাবে চাকরিতে জয়েন করে।

এরা ওয়ান-ইলেভেনের পর আমার সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করছে। ইচ্ছাকৃতভাবে আমি আগাই নাই। আমি সব সময় নিজের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছি। ইইউর মেম্বাররাও আমার সাথে মিটিং করতে চাইছে। আই ডিড নট। এমনিই জান বাঁচে না! এত জেলাসি!

মহিউদ্দিন : আপনি যখন রিটায়ারমেন্ট চাইলেন, জেনারেল মইন তো তখনো চিফ। তিনি কি আপনার জন্য কিছু করলেন না?

বারী : নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আমাকে ঢাকায় ডাকার পর আমি একবার ফোন করছিলাম। ওনার সাথে কথা হয়নি। ফোন ধরেই নাই।

মহিউদ্দিন : সরাসরি ফোন করেছিলেন?

বারী : না, পিএর মাধ্যমে, মিলায়া দেয় নাই।

মহিউদ্দিন : আপনার কি কখনো মনে হয়নি এটা একটা লুজিং গেম?

বারী : লুজিং তখনই মনে হইছে যখন উনি সিদ্ধান্ত নিছেন আমাকে বাইর কইরা দিবেন, মাসুদ স্যারকে বাইর কইরা দিবেন। তখনই তো উনি আইসোলেটেড। তার সাক্ষী হইল কে? আমিন। আমি আপনাকে বলছি, মাটির সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীনরা নেতৃত্ব দিতে পারে না। তাহলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হইতেন এক নম্বর লিডার। ড. কামাল হোসেন হইতেন আরেক লিডার। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কথায় মানুষ ঝাঁপ দিয়া দেয়।[৮]

সেনাবাহিনীর উঁচু পর্যায়ে ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব শুরু থেকেই ছিল। এক-এগারোর সময় এটা চাপা থাকেনি। সেনাপ্রধান মইনের সঙ্গে ডিজিএফআইয়ের পরিচালক আমিনের সখ্য লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লে. জে. মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর প্রতি ডিজিএফআইয়ের অন্য একজন পরিচালক ফজলুল বারীর সুসম্পর্ক ছিল। এর ফলে একধরনের মেরুকরণ তৈরি হয়। ক্ষমতার বলয়

থেকে বারী আগেই ছিটকে পড়েছিলেন। ডিজিএফআইয়ে তখন আমিনের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। মাসুদকে মইনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতেন কেউ কেউ। ক্ষমতার এই লড়াইয়ের একপর্যায়ে মইন তাঁর অবস্থান সংহত করতে সক্ষম হন। কার্যত তিনি মাসুদের ডানা ছেঁটে দেন। মাসুদকে পিএসওর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্টের পদে বসানোর সিদ্ধান্ত হয়। ৪ জুন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এক প্রাতরাশ বৈঠকে আমিন নিশ্চিত করে বলেন যে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান নজরদারি করার দায়িত্ব থেকেও মাসুদকে সরিয়ে দেওয়া হবে। ৫ জুন ২০০৮ ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির এক তারবার্তায় এসব কথা উঠে এসেছে।[৯]

জেনারেল মাসুদ এনডিসির কমান্ড্যান্ট হিসেবে যোগ দিতে পারেননি। সেনাপ্রধান মইন তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেশে রাখতে নিরাপদবোধ করেননি। এর আগে এনডিসির কমান্ড্যান্ট জেনারেল জহিরকে অস্ট্রেলিয়ায় হাইকমিশনার হিসেবে যাওয়ার কথা ছিল। শেষমেশ মাসুদকে যেতে হলো অস্ট্রেলিয়ায়। এর প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে জেনারেল জহিরের বয়ানে :

> আমার জায়গায় আসার কথা জেনারেল মাসুদের। মাসুদ তো তখন লাইমলাইটে। এটা আবার বিএমএ (বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি) অফিসাররা অ্যাকসেপ্ট করে নাই। মাসুদ এসেছে জেআরবি (জাতীয় রক্ষীবাহিনী) থেকে। আমাদের জুনিয়র, কিন্তু আমাদের পরের ব্যাচ থেকে সিনিয়র। এখন যে অ্যাডভাইজার, তারেক সিদ্দিকী—তাঁর সিনিয়র। তখন একটা গুঞ্জন উঠল যে মাসুদ ক্যু করে মইনকে সরিয়ে দেবে। এটা রিয়েল নাকি পারসিভ্‌ড, রিয়েল বলে আমাদের কাছে প্রমাণ নাই। পারসেপশন—এটা নিয়ে বিএমএ অফিসাররা কথাবার্তা বলেছে। তো ডিজিএফআই এটা পিক করেছে। যেদিন আমি তার কাছে হ্যান্ডওভার করব, সে এল। এমন সময় স্পেশাল টেলিফোনে মইনের কণ্ঠে, 'তুমি শুনবা, কিন্তু কোনো উত্তর দিবা না। হ্যান্ডওভার করবা না। ওকে বলে দাও—হি উইল রিপোর্ট রাইট নাও টু দ্য ফরেন মিনিস্ট্রি।'
>
> আমি তো ওকে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রেডি ছিলাম। এখন ওকে কীভাবে বলি। বললাম, মাসুদ, দেয়ার ইজ আ চেঞ্জ।
>
> —স্যার, কী?
>
> —আই জাস্ট গট আ কল ফ্রম দ্য চিফ। সে তোমাকে এটা বলতে বলেছে। তুমি চার্জ নিচ্ছ না। তুমি আজই ফরেন মিনিস্ট্রিতে যাও।
>
> দেখলাম, ওর দুই চোখে দুই ফোঁটা পানি। তারা তো একসঙ্গে ওয়ান-

ইলেভেন করেছে। তাকে না জানিয়ে হঠাৎ করে এ রকম একটা অ্যাকশন? হি ওয়াজ ইমোশনালি...। বললাম, মাসুদ, টেক ইট ইজি। আই অ্যাম অলসো কামিং। তোমাকে চার্জ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এখন যাও। তোমার পিছে আমিও আসতেছি। ডোন্ট ওয়ারি। তার দশ দিন পরেই আমি গেলাম।[১০]

মইন-মাসুদ দ্বন্দ্ব যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, এ নিয়ে কানাঘুষা ছিল। একসময় মনে হয়েছিল, মাসুদ পরবর্তী সেনাপ্রধান হতে পারেন। মইনের হয়তো মনে হয়েছে, কেউ খুব কাছে থেকে তাঁর ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে। এটি ছিল তাঁর জন্য খুবই অস্বস্তিকর। ফলে একজনকে যেতেই হতো। মাসুদকেই শেষ পর্যন্ত যেতে হলো। এ বিষয়ে এয়ার ভাইস মার্শাল ফখরুল আজমের বয়ানটি এ রকম :

একবার মইনের সঙ্গে দেখা হলো। বলল, স্যার, আপনার তো আছে আর এক মাস। আপনি রেস্ট করেন স্যার।

থ্যাংক ইউ। আই অ্যাম অলসো প্রিপেয়ারিং টু রেস্ট। কারণ, পাঁচ বছর ধরে আমি এয়ারফোর্সের চিফ। আই হ্যাভ ফিনিশড মাই টেনিউর। তিন বছরের জন্য কনট্র্যাক্ট, দুই বছর এক্সটেনশন। সো আই টুক ফেয়ারওয়েল।

এপ্রিলের ৭ তারিখ (২০০৭) আমি রিটায়ার করলাম। ওই দিন রাতেই নিজের বাসায় চলে এসেছি।

পরে যখন বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাসেস করলাম, অ্যানালাইসিস করলাম, সরওয়ার জাহান নিজাম অ্যান্ড আদার পিপল, ইনক্লুডিং জাহাঙ্গীর—কী হয়েছিল, কী হয়নি। মনে হলো যে মাসুদ ছিল অ্যাক্টর। হি ওয়াজ নট দ্য লিডার। মইন পরবর্তীতে মাসুদকেও ডিসকার্ড করেছে। মাসুদ ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু মি। যদিও অনেক জুনিয়র আমার, আমরা একসঙ্গে কোর্স করেছি। সে বলেছিল, স্যার, আপনি অ্যাম্বাসেডর হয়ে চলে যান, রিটায়ারমেন্টের পরে। মাসুদ কিন্তু মইনকে বলছে যে স্যারকে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পাঠায়া দেন। মইন ইউ আহমেদের একটা কোটারি ছিল। দেয়নি। এটা কীভাবে বুঝলাম? আন্দাজ করে তো বলতে পারি না। শুক্রবারে বারিধারা মসজিদে নামাজ পড়তে যেতাম। ওখানে আমার সব বন্ধুরা আসে। একদিন সাঈদ এস্কান্দারকে দেখেছি ওখানে। (ওয়ান-ইলেভেনের) দুই-তিন মাস পরে।

স্যার, আপনি এখানে?

কেন? আমার কি এখানে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ?

না না, আমি তো ভেবেছি আপনি অ্যাম্বাসেডর হয়ে কোথাও গেছেন?

তার মানে, দে হ্যাড আ ডিসকাশন—সাঈদ এস্কান্দার, মইন ইউ আহমেদ এবং মাসুদ।

হোয়াট আই কুড গ্যাদার অব অল দিস অ্যানালাইসিস, মাসুদ ওয়াজ হ্যাভিং টু মাচ অব অথরিটি। হি ওয়াজ এক্সারটিং হিজ অথরিটি এভরিহোয়ার। তখন মাসুদকে পোস্টিং করে দিল নাইন ডিভিশন থেকে প্রথমে এনডিসিতে, কমান্ড্যান্ট হিসেবে। ওখানে বসে থাকা মানে, টোটালি আউট অব দ্য আর্মি অ্যাফেয়ার্স। মাসুদ এটা পছন্দ করেনি। সে মইনের কাছে গেল।

স্যার, আমি আপনার নাম্বার টু হিসেবে সব জায়গায় কাজ করেছি, আই গেইভ ইউ সাপোর্ট। এখন আমাকে এনডিসিতে কেন পোস্টিং দিলেন? দিস ইজ নট কারেক্ট।

না না, ওখান থেকে উইড্র করে পিএসও, এএফডি বানাই।

ওইটাও তো বসে থাকা, কোনো অথরিটি নাই।

না, তোমাকে আমি প্রমোশন দিচ্ছি। লে. জেনারেল বানাচ্ছি।

তো তাকে পিএসও-এএফডি বানাল। তার হয়তো ইচ্ছা ছিল, সে আর্মি চিফ হবে। মে বি। আই ডোন্ট নো। আন্দাজ করতে পারি। মইন ভাবল, তোমারে পিএসও-এএফডি বানাইছি, তুমি এখানেও লাফালাফি করতেছ? যাও তুমি অস্ট্রেলিয়া। পাঠায়া দিল অস্ট্রেলিয়া।[১১]

এক-এগারোর পরে সেনাবাহিনীতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়। একদিকে মাসুদ-বারী, অন্যদিকে মইন-আমিন। মইন কর্তৃত্ব সংহত করতে তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে দেন। সেনাবাহিনীতে 'জেনারেল' পদ তৈরি হওয়ার পর মইন চার তারকা জেনারেল এবং কয়েকজন তিন তারকা লে. জেনারেল হন। অন্যদের জন্য এটা ছিল সান্ত্বনা পুরস্কার।

আমিনের ভাষ্য অনুযায়ী, জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীসহ সাবেক কয়েকজন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া সংক্রান্ত মাসুদের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আমিন প্রশ্ন তোলেন। সেনাপ্রধান মইনের নির্বাচনমুখী তৎপরতা নিয়েও সেনাবাহিনীর কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমিনের কথার অর্থ দাঁড়ায়, সেনাবাহিনীর মধ্যে নির্বাচনবিরোধীরা মাসুদকে ঘিরে একজোট হয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যকার রদবদলে মাসুদ আরও কোণঠাসা হন। সেনাবাহিনীর ভেতরে এই রদবদল ঘটানো হয়েছে কে কার স্থলাভিষিক্ত হবেন সেদিকে লক্ষ রেখে। আমিন মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন, লে. জে. জহিরুল

আলম মইনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সারিতে পরবর্তী ব্যক্তি হিসেবে থেকে যাবেন। চট্টগ্রামের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) মে. জে. আবদুল মুবীনকে ঢাকায় নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তিনি মইনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার তালিকায় তিন নম্বরে থাকবেন। সেনাপ্রধান হিসেবে মইনের মেয়াদ ২০০৯ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা।[১২]

ঘটনাপ্রবাহে এটা বোঝা যায় যে সেনা নেতৃত্ব সব বিষয়ে একমত ছিল না। তাঁদের মধ্যকার সংহতির বাঁধন ছিল অনেকটাই ঠুনকো। লক্ষ্য সম্বন্ধে সবার পরিষ্কার ধারণা ছিল না। সেনাপ্রধান সব ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি। সবার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও জবাবদিহির ঘাটতি ছিল। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মাহবুবুর রহমান একসময় সেনাপ্রধান ছিলেন। বিষয়টি তাঁর নজর এড়ায়নি। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> মাহবুবুর রহমান : আমার মনে হয় ইন্টারন্যাশনালিও যেভাবে চাইছিল সাপোর্ট, আমার তো মনে হইছিল, দে হ্যাভ দ্য সাপোর্ট, এই সাপোর্ট কিন্তু পরে তারা প্রজেক্ট করতে পারেনি। যদি তারা প্রজেক্ট করতে পারত, যে আমেরিকা ইজ বিহাইন্ড দেম, চায়না ইজ বিহাইন্ড দেম, তারা এটা প্রজেক্ট করতে পারেনি তো? যেমন আমি বলি, কে যেন একজন আমেরিকান, এক্স-মিলিটারি, এসেছিল। আমার সঙ্গে তার দেখা হইছে। সে আমাকে বলল যে হাউ ডু ইউ থিং ইয়োর চিফ অব স্টাফ? বললাম, ইয়েস, নাইস প্রফেশনাল ম্যান। এটা করছে ওটা করছে। ওয়ান-ইলেভেনের পরে। বলল, ডু ইউ থিং হি ক্যারিজ এভরিবডি টুগেদার? এটা তার প্রশ্ন ছিল কিন্তু। ডু ইউ থিং হি ক্যারিজ দ্য হোল আর্মি টুগেদার? বললাম, ইয়েস, হোয়াই নট? হি ইজ আর্মি চিফ অব স্টাফ?
>
> বলল, বাট বাই নেচার হি ইজ আ লোনলি ম্যান?
>
> আমি একটু অবাক হলাম। কী বলে? হোয়াই ডু ইউ সে দ্যাট?
>
> হি প্লেইজ গল্ফ অ্যালোন। এটা আমাকে বলেছে। হোয়াই শুড হি বি অ্যালোন?
>
> সে জমাতে পারেনি। একটা র‍্যালিং গ্রাউন্ড আছে না? ওটা ডিসজয়েন্টেড হয়ে যায়। আমার এটাই মনে হয়েছে, দ্যাট ইজ ওয়ান অব দ্য রিজনস অব ফেইলিওর, অ্যান্ড টু গেট প্রপার ব্লেসিং অব বিগ পাওয়ার লাইক আমেরিকা, চায়না, ইন্ডিয়া কতটুকু করবে না করবে জানি না। ইন্ডিয়াকেও পায়নি। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয়, লবি কম ছিল,

ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট কম ছিল, এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও— যেভাবে শুরু করছিল, সেটা রাখতে পারেনি। তাদের শুরুর আদর্শিক যে চেতনাটা ছিল, এটা তারা ধরে রাখতে পারেনি।

মহিউদ্দিন আহমদ : আচ্ছা, পার্সন লাইক প্রফেসর ইউনূস বা ড. কামাল হোসেন, তাঁদের তো ব্লেসিংস ছিল। তাঁদের তো ইন্টারন্যাশনাল কনট্যাক্ট অনেক। সেটা কেন কাজে লাগল না?

মাহবুব : সাংঘাতিক প্রশ্ন। ইউনূসের সঙ্গে আমার কিছু পার্সোনাল রিলেশনস আছে। আমার একটা বই আছে। বইটার ফরওয়ার্ড ইউনূস লেখেন। আমি তাকে স্টাফ কলেজে আনছিলাম। তখনো উনি নোবেল লরিয়েট হননি। আই ইনভাইটেড হিম টু স্পিক অন বাংলাদেশ ইকোনমি। সাবজেক্টটা বলতে গিয়ে উনি গ্রামীণ ব্যাংক ইনট্রোডিউস করলেন। ওনার ক্লাস ছিল। এক ঘণ্টার ক্লাস দেড় ঘণ্টা-আড়াই ঘণ্টা এক্সটেনডেড হয়। পিনড্রপ সাইলেন্স। সবাই শুনতেছে, এক্সিলেন্ট। পরের বছর ওনাকে আবার আনি। ওরাও বোধ হয় ওখান থেকে সরে গিয়েছিল। বা ওরা তাদের ধরে রাখতে পারেনি। কামাল হোসেনকেও ধরে রাখতে পারেনি।

মহিউদ্দিন : প্রফেসর ইউনূস তো প্রথমে একটা পলিটিক্যাল পার্টিও ফ্লোট করতে চেয়েছিলেন?

মাহবুব : রাইট।

মহিউদ্দিন : পরে ব্যাক করলেন।

মাহবুব : আমার মনে হয়, ওদের নিজেদের মধ্যে যে সলিডারিটি, এটা তারা ধরে রাখতে পারেনি। এখানে বাইরে থেকে কিছু কিছু আসছে, ওদের বাই করার জন্য। বা তারা কিছু কমপ্রোমাইজ করে গেছে। এরা তো স্পেল আউট করেনি যে আমরা ইলেকশনে যাব। এ ধরনের প্রোগ্রাম তো দেয়নি। তাই না? ওগুলো যদি তারা ডিফাইন করত, বলত, কমিটমেন্ট থাকত, তাহলে অন্য রকম হতো। বোঝা গেছে যে এটা চিফ অব স্টাফের নিয়ন্ত্রণে হবে। চিফ অব স্টাফ উইল বি দ্য বেনিফিশিয়ারি। চিফ অব স্টাফ নিজেকে ওভাবে প্রজেক্ট করতে পারেনি। সে তো অন্য ধরনের—তার বুদ্ধিমত্তা—এতটা জানিনি, বুঝিনি।[১৩]

এক-এগারোর শুরুর দিকে সামরিক বাহিনীর জোরালো কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার পক্ষে ছিলেন কেউ কেউ। তবে তাঁরা এ ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর ভেতরেও ঐকমত্য তৈরি করতে পারেননি। সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তারা সরকার চালাবে বা সরকারের ওপর খবরদারি করবে এমন একটা ধারণার

সঙ্গে অনেকেই একমত হননি। এয়ার ভাইস মার্শাল ফখরুল আজম তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

এক-এগারোর পর চতুর্থ দিন মইন আমাকে ফোন করে বলে, আসেন, একটা মিটিং করব। চিটাগাংয়ের জেনারেল মতিন ওয়াজ লুকিং আফটার সিভিল এভিয়েশন এবং আরও দুই-তিনটা মিনিস্ট্রি। মইন আমাকে বলল, স্যার, আপনি এগুলো ওভারসি করেন। বললাম, সরি। জেনারেল মতিন ইজ মাই সিনিয়র। আমি ওনার ওপরে গিয়ে ওভারসি করব? উইথ হোয়াট? গিভ মি আ প্রপার লেটার, সরকার থেকে যে ইউ ওভারসি জেনারেল মতিন'স থ্রি মিনিস্ট্রিজ।

উনি হলেন অ্যাডভাইজার, লাইক আ মিনিস্টার। ওখানে গিয়ে আমি বলব—এটা করবেন না, ওটা করেন। এটা কি বলা যায়? আই ক্যান সে ইট, প্রভাইডেড আই হ্যাভ অথরিটি।[১৪]

ভাইস অ্যাডমিরাল সরওয়ার জাহান নিজামের ভাষ্যও একই রকম। মইন তাঁকেও একই ধরনের কথা বলেছিলেন, সরওয়ার জাহান নিজামের কথায় বোঝা যায়, সশস্ত্র বাহিনীতে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে সাধারণ ঐকমত্য ছিল না। লেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উঠে এসেছে।

মহিউদ্দিন আহমদ : আপনি নেভির চিফ হলেন কখন?

সরওয়ার জাহান নিজাম : ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ, ২০০৭।

মহিউদ্দিন : অন্যান্য চিফের সঙ্গে আপনার মিটিং-টিটিং হতো?

সরওয়ার : মইন বলেছে যে আমরা তিনজন বসব আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে। সে একটা মাসিক মিটিং ধার্য করেছে। শুধু আমরা তিনজন। অনেক মিটিং হয়েছে। আমরা যারা বিভিন্ন বাহিনীর চিফ, আমাদেরকে এক-একটা মিনিস্ট্রি দেওয়ার প্ল্যান করেছে সে। আমাকে চারটা মিনিস্ট্রি দিয়েছে—এনভায়রনমেন্ট, শিপিং—আরও কী কী যেন। আমি বলেছি, এটা সম্ভব না। কী হিসেবে আমি থাকব? ওখানে অ্যাডভাইজার আছে না? বললাম, এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না স্যার। যেহেতু অ্যাডভাইজাররা লুকিং আফটার, তারা তো রিঅ্যাক্ট করবে। সেক্রেটারিরা রিঅ্যাক্ট করবে। আমি তো ইউনিফর্ম পরে যাব। আমি যদি শিপিং মিনিস্ট্রিতে যাই, সেখানে শিপিং অ্যাডভাইজার আছে। হাউ আই অ্যাম গোয়িং টু ইনট্রোডিউস মাইসেলফ ইন দ্য মিনিস্ট্রি? হাউ দ্য সেক্রেটারি অ্যান্ড আদার্স উইল টেক ইট?

না না, এটা করতে হবে।

এটা করা ঠিক হবে না স্যার। আপনি চিন্তা করেন। এটা করলে সেক্রেটারিদের হেডকোয়ার্টার্সে ডাকতে হবে। তাদের ডেকে প্রথমে আপনি অ্যাডভাইস করবেন। দেন আই উইল গো।

মহিউদ্দিন : এটা আপনি সাজেস্ট করলেন?

সরওয়ার : হ্যাঁ। এটা সে করে নাই। সে সবাইকে একটা করে কাগজের কপি দিয়ে দিল। এইটা হয় নাকি?

মহিউদ্দিন : এটা তো মার্শাল লর মতো?

সরওয়ার : স্টাইলটা ওই রকম। কিন্তু তার ভিত ছিল উইক। কারণ, আর্মি অফিসাররা এটা পছন্দ করছে না। আমি এটা ফিল করেছি। মিটিংয়ে আমি আর এয়ার চিফ ছাড়া সব তো আর্মি জেনারেল। মেজর জেনারেল অ্যান্ড অ্যাবাভ। আমি তাদের বলেছি—

ভাই, কী খবর-টবর?

কী করতেছেন? এগুলো ঠিক হচ্ছে না।

উইদাউট মেনশলিং অ্যানিবডিস নেম, আমাকে অনেকেই বলেছে, এগুলো ঠিক হচ্ছে না, স্যারকে বোঝান।

মহিউদ্দিন : মানে, কেউ পছন্দ করছে না?

সরওয়ার : ঠিক। হি ডিড নট গেট সাপোর্ট ফ্রম হিজ সাবোর্ডিনেটস, হিজ কোর কমান্ডারস, হিজ ডিভিশনাল কমান্ডারস, এরিয়া কমান্ডারস, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কমান্ডার, এরা কেউ বোধ হয় তাকে সাপোর্ট করে নাই।

মহিউদ্দিন : একজনও সাপোর্ট করে নাই?

সরওয়ার : একজন তো ছিল। গোলাম মোহাম্মদ ছিল মইনের ব্লাইন্ড সাপোর্টার।

মহিউদ্দিন : গোলাম মোহাম্মদকে তো ডিজিএফআইয়ের চিফ করল মইন?

সরওয়ার : হ্যাঁ। একসময় তো তার ডান হাত ছিল। হি ওয়াজ দ্য ওনলি ম্যান, যে তাকে সাপোর্ট করেছে।

মহিউদ্দিন : পরে তো শুনেছি জেনারেল মাসুদের সঙ্গে জেনারেল মইনের একটা সমস্যা...।

সরওয়ার : আমিও শুনেছি। মাসুদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। হঠাৎ দেখি, মাসুদ হ্যাজ বিন ট্রান্সফারড অ্যাজ অ্যাম্বাসেডর টু অস্ট্রেলিয়া। আমি রিং করলাম মাসুদকে। বললাম, কংগ্রাচুলেশন ফর

বিকামিং অ্যাম্বাসেডর।

মহিউদ্দিন : মাসুদ তখন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।

সরওয়ার : হ্যাঁ। ওখান থেকেই তো সরায়া দিল। কারণ, দেয়ার ওয়াজ আ রিউমার দ্যাট মাসুদ ইজ গোয়িং টু টপল হিম। কাকে? মইনকে।

মহিউদ্দিন : এটা কি রিউমার ছিল? নেভির ইন্টেলিজেন্স কী বলে?

সরওয়ার : আমি রিউমার শুনেছি। আমি ডাইরেক্ট ওর সঙ্গে কথা বলেছি। কী ব্যাপার ভাই, অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন। ঘটনা কী?

দেখেন না স্যার, আমাকে পাঠায়া দিচ্ছে।

ভালো তো। ভালো পোস্ট। আমাকে পাঠাইলে তো আমি খুশি হইতাম।

ন্যা, স্যার।

তার কথায় বুঝলাম, হি ওয়াজ নট হ্যাপি।

মহিউদ্দিন : এএফডি থেকে সরিয়ে মাসুদকে কি এনডিসির কমান্ড্যান্ট করার কথা হয়েছিল?

সরওয়ার : হ্যাঁ। হি ডিড নট লাইক ইট। কেন, মইন আপনাকে এসব বলে নাই?

মহিউদ্দিন : মইনের সঙ্গে কথা বলার সময় তো আমি এত কিছু জানতাম না। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারছি। মইন অবশ্য বলেছে, সে মিলিটারি রুল চায়নি। সে বলেছে, সে একটা ক্রেডিবল ইলেকশন চায়।

সরওয়ার : হ্যাঁ। সে বলেছে, আমি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ইলেকশন দেব। এরপর ডেফিনিটলি আই উইল হ্যান্ডওভার...। এটা সে বলেছে। এটা সব সময় সে বলে গেছে।

আমি বলেছি, ভালো করে শক্ত করে ধরতে পারলে ধরেন, না হলে ছেড়ে দেন। আপনি যদি সাপের লেজে পা রাখেন, তাহলে তো ছোবল মারবে। যদি গর্দানের ওপর, মাথার ওপর মারতে পারেন, তাহলে ইউ আর সেফ। ওর সঙ্গে গলফ খেলতে খেলতে অনেক সময় কথাবার্তা বলেছি।[১৫]

জেনারেল মইন যে একা হয়ে পড়েছিলেন এমন আভাস পাওয়া যায় লে. জেনারেল জহিরের কথায়। মনে হয়, অনেক সিদ্ধান্ত মইন একাই নিতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্বাপর বিবেচনা করতেন না। ফলে সেনাবাহিনী ব্যর্থ

হচ্ছে—এমন একটি ধারণা তৈরি হতে থাকে। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জহির বলেন :

দুবছরের ব্যাপারটা কোনো ছক কষে হয় নাই। এটা ছিল আরবিট্রারি। সেনাসদরে জেনারেলদের মিটিং হতো। প্রথম দুইটা মিটিংয়ে আমি যাই নাই। আমাকে যেতে বলেনি। আমি তো মইনের সিনিয়র। আমি থাকলে সে স্বস্তিবোধ করে না। আর একজন সিনিয়র ছিলেন, জীবন কানাই দাস। তিনি ১৯৭১ সালের সেকেন্ড ব্যাচ। মেজর জেনারেল। তাঁকেও ডাকে নাই। পরে কেউ হয়তো বলে থাকবে, জেনারেলদের মিটিংয়ে এরা নাই। ট্রুপসরা ভাববে, আর্মির মধ্যে বোধ হয় বিভেদ আছে। তারপর থেকে আমাকে ডাকত। মাসে একটা মিটিং হতো। আমি মইনকে বললাম, একাডেমিকস যারা ভালো, কিন্তু পলিটিসাইজড না, তাদের ডাকো, এদের নিয়ে তুমি সাত-আট দিন ব্রেইনস্টর্মিং করো। তাদের কাছ থেকে সাজেশন নাও। বলল, দু-একটা নাম দাও। আমি আমার রিসোর্স পারসনদের মধ্য থেকে কয়েকটা নাম দিলাম। আসলে কী হয়েছে। ওই সব মিটিং হলো স্ট্র্যাটেজিক্যাল। কিন্তু ওই সব মিটিংয়ে ডাকা হয়েছে ব্রিগেডিয়ার লেভেলের লোকজন। স্ট্র্যাটেজিক্যাল বিষয়ের সঙ্গে ট্যাকটিক্যাল বা অপারেশনাল বিষয় তো মিলিয়ে ফেলা ঠিক না। পরে যেটা করেছে। হাটবাজার ক্লিন করো, এটা-ওটা করো। আমরা তো এসব চাইনি। আমি মইনকে বলেছিলাম, গরিব মারার জন্য ওয়ান-ইলেভেন আসছে নাকি? তুমি রাস্তাঘাট থেকে সব ভেন্ডার তুলে দিয়েছ। এদের খাওয়াবে কে এখন? তুমি খাওয়াবে? ঢাকা ইউনিভার্সিটির ঘটনাটা দেখেন? ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা আর কীই-বা করেছে। যা করেছে, তা হলো নিউমার্কেটের সামনের হকাররা। পরে অবশ্য বুঝেছে যে এটা ভুল হয়েছে। কিন্তু বুলেট—ওয়ানস ইট ইজ ফায়ারড, এটা আর ব্যাক করা যায় না। একবার জনগণের আস্থা হারালে তা ফিরে পাওয়া কঠিন।

একবার মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো, ৩০০ জনের বিচার হবে। ৩০০ জনের লিস্ট করেছে। আমি বললাম, আর ইউ ক্যাপেবল? দুই বছরে ৩০০ জনের বিচার করা? তুমি তো দেখি বউ-বাচ্চাসুদ্ধ অ্যারেস্ট করছ?

বউ-বাচ্চার নাম তো আসতেছে। ওরা তো ডাইরেক্টর।

তুমি হয়তো তোমার বউয়ের নাম দিয়া দিছ, ডাইরেক্টর। সে হয়তো জানেই না।

ওরা ডাইরেক্টর, সে হিসাবে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

এটা মনে হয় টু মাচ হয়ে যাচ্ছে। আমি আবার এক্সামপল দিলাম, টুকুর বউ-বাচ্চাসহ অ্যারেস্ট। কী করতেছ? ৩০টা এক্সামপল হিসেবে করো, যাদের ব্যাপারে পারসেপশন খুব খারাপ। আর বাকিদের জন্য ট্রুথ কমিশন করো। ওর সঙ্গে যারা সব সময় চলত, ওরা তাকে কীভাবে আইডিয়া দিয়েছে, জানি না। আসলে, আমরা যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই, মেইন ফোকাস অব দ্য রিফর্ম শুড বি পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনস। আমি রিফর্মের ওপর একটা পেপারও লিখেছি। বলেছি, আর্টিকেল সেভেন্টি, এটা আপাতত তুলে দেওয়া, বা এটা সাসপেন্ড করার কোনো ওয়ে আছে নাকি। এ ছাড়া বলেছিলাম, পরপর দুবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না, এমপি হতে পারবে। তখন অন্য কেউ আসতে পারে। এতে করে একটা হেলদি কম্পিটিশন তৈরি হবে।

ব্যবসায়ীরা সাপোর্ট দিয়েছিল। কারণ, হরতাল-অবরোধে তাদের ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু পরে তাদের ওপর খড়্গ নেমে আসল। তাদের গুদাম-টুদাম সার্চ করা শুরু হলো। অনেকে বিদেশে পালিয়ে গেল। আবার অনেককে ধরে এনে পলিটিশিয়ানদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বলা হলো। এটা তো কোনো ব্যবসায়ী দিতে চায় না। এই যে ওয়াল ভাঙা, লাইন সোজা করা—এগুলো হলো ট্যাকটিকস। দিস ওয়াজ নট ডিমান্ড অব দ্য টাইম। একটা গ্রুপ ছিল, আমি জানি না, হোয়াই দে অয়ার সো মাচ ইন্টারেস্টেড ইন ট্যাকটিকস।

মইনের উচিত ছিল একটা স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপ তৈরি করা। ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা করেছিলও। কিন্তু ফাংশনাল হয়নি। ফোরামগুলো যদি ইফেকটিভ হতো, তাহলে কিন্তু আইডিয়া আসত।

মইন কথা কম বলত। হি ওয়াজ অ্যান আননোন কোয়ান্টিটি।

ফখরুদ্দীন সাহেবের অ্যাডভাইজাররা সব আমার কাছে আসত। অল অব দেম অয়ার মাই রিসোর্স পারসন। অ্যাকসেপ্ট ওয়ান—অ্যাডভাইজার ফর অ্যাগ্রিকালচার। ওরা তো কেউ মইনকে চিনত না। মইন যদি ওদের জন্য স্পেস অ্যালাউ করত, তাহলে সরকার ভালো চলত।

এখন তো সবাই বলে, আর্মি ইজ আ ফেইলিওর। কেসগুলোই শেষ করতে পারেনি। করাপ্ট লোকজন হাইকোর্ট থেকে বেইল নিয়ে হিরো হয়ে বেরিয়ে এসেছে। যাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, তাদের একজনও কিন্তু ভালো লোক ছিল না। আপনি এ টু জেড লিস্ট করে দেখেন? হয়তো এদের থেকে খারাপ লোকও বাদ পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু ভালো লোক কে ছিল? আমি তো কাছে থেকে দেখেছি।[১৬]

# বোঝাপড়া

ডিসেম্বর ২০০৮-এর মধ্যে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। আওয়ামী লীগও চাইছিল যত দ্রুত সম্ভব একটি নির্বাচন হোক। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছিল। ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত গীতা পাসি ৯ মার্চ ২০০৮ গুলশানে আইভি কনকর্ডে আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে দেখা করে বলেন, বাংলাদেশে টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের রোডম্যাপ বাস্তবায়ন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই; যুক্তরাষ্ট্র একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার অংশগ্রহণে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনে বিশ্বাস করে, অন্য কিছুতে নয়। এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংলাপ হওয়া খুবই দরকার। বৈঠকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মতিয়া চৌধুরী, কাজী জাফর উল্যাহ ও সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'আমরা আগে জাতীয় নির্বাচন চাই। তারপর স্থানীয় নির্বাচন হবে।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার চিকিৎসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উৎকণ্ঠিত ও চিন্তিত। মার্কিন রাষ্ট্রদূত চায়, শেখ হাসিনার চিকিৎসা হোক, তিনি ন্যায়বিচার পান। এ ক্ষেত্রে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়, সে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সজাগ।'[১]

সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটি বোঝাপড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছিল। একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এটি ছিল খুবই জরুরি। এ পর্যায়ে সরকারের পাঁচ উপদেষ্টার সঙ্গে আওয়ামী লীগের উঁচু পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয় ৭ এপ্রিল ২০০৮ ঢাকার রেলভবনে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। অনানুষ্ঠানিক এই বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, সাংগঠনিক

সম্পাদক সাবের হোসেন চৌধুরী এবং শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী হাছান মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে হাজির হয়েছিলেন আইন উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ, যোগাযোগ উপদেষ্টা মে. জে. (অব.) গোলাম কাদের, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইকবাল এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান। শেখ হাসিনার সম্মতি সাপেক্ষেই এ বৈঠক হয়েছে বলে জানা গেছে।[২]

সরকারের উপদেষ্টাদের সঙ্গে এই বৈঠক নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে নানান প্রশ্ন ওঠে। জানা যায়, হাছান মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেই এ বৈঠক হয়। দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ এ বৈঠক সম্পর্কে জানতেন না। হাছান মাহমুদ ঘনিষ্ঠজনদের জানিয়েছেন, উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কে শেখ হাসিনা জানতেন এবং তা জিল্লুর রহমানকেও জানানো হয়েছিল। তোফায়েল আহমেদ অবশ্য এটিকে 'বৈঠক' হিসেবে মানতে নারাজ। তিনি বলেছেন, 'এটা সিটিং, মিটিং নয়।' পরবর্তী সময়ে দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে উপদেষ্টাদের বৈঠক হবে বলে তিনি জানান। বৈঠকটি সরকারের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সরকারের উপদেষ্টা গোলাম কাদের সাংবাদিকদের বলেন, 'আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিএনপি-জামায়াতসহ অন্য দলের সঙ্গেও বৈঠক হবে।'[৩]

৯ এপ্রিল সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফকে পরদিন ১০ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'য় আরেকটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণের সূত্র ধরে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমানের বাসায় দলের সভাপতিমণ্ডলীর বৈঠক হয়। জানা যায়, দলীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া সরকারের পাঁচ উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেওয়ায় তোফায়েল আহমেদ ও মতিয়া চৌধুরী অন্য নেতাদের তোপের মুখে পড়েন। নেতাদের প্রশ্নের জবাবে তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় সব নেতাকে নিয়ে পরে বৈঠক করার কথা বলেছি।' বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সেই বৈঠক অনুষ্ঠানের তারিখও দেওয়া হয়। তবে সেদিন এভাবে বৈঠকে যাওয়া তাঁর ঠিক হয়নি। একইভাবে মতিয়া চৌধুরীও বলেন, সহকর্মীদের না জানিয়ে রেলভবনের বৈঠকে তাঁদের যাওয়া ঠিক হয়নি। সাজেদা চৌধুরী বলেন, হাছান মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে ওই বৈঠক সমর্থন করা যায় না। তোফায়েল আহমেদের উদ্দেশে আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'আপনি সব সময় একেকটা কাজ করেন, পরে ওজর-আপত্তি দাঁড় করান। এটা ঠিক না।' সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত

তোফায়েলকে বলেন, 'আপনি কীভাবে আমাদের না জানিয়ে বৈঠকে গেলেন?'[৪]

বোঝা যায়, আওয়ামী লীগের মধ্যে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। দলের মধ্যে একাধিক স্রোতোধারা টের পাওয়া যায়। নেতাদের মধ্যে আস্থার অভাব বেশ স্পষ্ট। ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে দলের প্রেসিডিয়াম থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের জন্য চিঠির মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। মৌখিক আমন্ত্রণে সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগ আর বসবে না।[৫]

অবশেষে বরফ গলল। সরকারের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক হলো ১৩ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনায়'। পাঁচ উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মতিয়া চৌধুরী ও সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। বৈঠক বিকেল পাঁচটায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনসহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য শেখ হাসিনার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। দলের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।[৬]

বক্তব্যে পাঁচ দফা দাবির কথা ছিল। দাবিগুলো হলো : শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।[৭]

১৩ মে ধানমন্ডির দলীয় কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় নেতারা শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে কোনো প্রক্রিয়ায় না যাওয়ার পক্ষে মত দেন। তবে সরকারের সঙ্গে সংলাপ চালু রাখার পক্ষে ছিলেন বেশির ভাগ নেতা। কেউ কেউ বলেন, সংলাপ বর্জন করে এর ব্যর্থতার দায় আওয়ামী লীগের নেওয়া ঠিক হবে না।[৮]

৪ জুন এক প্রাতরাশ বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলার সময় ব্রিগেডিয়ার আমিন নিশ্চিত করেন যে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনা চলছে, তাঁদের দুজনেরই নিজ নিজ দলের ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত আছে এবং তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া হতে হবে। হাসিনা, খালেদা এবং খালেদার ছোট ছেলে কোকোকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাগুলো তুলে নেওয়া হবে না। আগের দিন সন্ধ্যায় এক আলোচনায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার চৌধুরী রাষ্ট্রদূতকে একান্তে বলেন, দুই নেত্রীর সঙ্গে আলোচনা চলছে এবং হাসিনাকে শিগগিরই

মুক্তি এবং তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। আমিন রাষ্ট্রদূতকে জানান, দুই নেত্রীর মুক্তির ব্যাপারে সরকার দুজনকেই একটি সাত দফা প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড অনুমোদন করা এবং সংস্কার-প্রক্রিয়া চালু রাখার ব্যাপারে একমত হওয়ার বিষয়টি আছে। আমিন আশা প্রকাশ করেন, দুই নেত্রীর ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়টির সুরাহা হয়ে গেলে তাঁদের আবার সংলাপে ফিরিয়ে আনা যাবে এবং সংলাপে মধ্যস্থতাকারী বা সাক্ষী হিসেবে 'বিশিষ্ট ব্যক্তিদের' কিছু ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি বার্তায় তাঁর মন্তব্যে বলেন :

> নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জেনারেল মইনকে আন্তরিক মনে হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই আছে। সেনা নেতৃত্ব এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার একই লক্ষ্যে এগোচ্ছে। কিন্তু সরকারের উপদেষ্টারা ও ডিজিএফআই আলাদাভাবে যেসব আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে সমন্বয় নেই বলেই মনে হচ্ছে। তবু দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার সম্ভাবনা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি বলে মনে হয়। সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য থেকে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো যাতে সরে না যায়, সে ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকা দরকার। রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে, যেন তারা সংস্কার চালু রাখে, আর উভয় পক্ষের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে, যেন তারা একটা সমঝোতায় আসে।[৯]

২০০৮ সালের জুন মাসে প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়। প্রধান দুই দল ঘোষণা করেছে, তাদের নেত্রীদের জেল থেকে ছেড়ে না দিলে তারা সরকারের সঙ্গে সংলাপে বসবে না। এমনকি ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন বর্জন করবে বলে তারা হুমকি দিয়েছে। অচলাবস্থা দূর করা এবং সংলাপ আবার শুরু করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ শেখ হাসিনাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে বিদেশ সফরের অনুমতি দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উপদেষ্টাদের আশা, এসব পদক্ষেপের ফলে দুই নেত্রীর সঙ্গে সংলাপ শুরু হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অ্যাজেন্ডার মধ্যে আছে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, সরকার ও সেনাবাহিনীর নিরাপদে ফিরে যাওয়া এবং রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাখা। এসব কথা উঠে এসেছে ৬ জুন ২০০৮ ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের তারবার্তায়। বার্তায় বলা হয়, শেখ হাসিনা তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

কিছুদিন কাটাতে চান। ৯ জুন তাঁর যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে পৌঁছানোর কথা। যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক সপ্তাহ থাকার পর তিনি কানাডা যাবেন। একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কানাডায় শেখ হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের একটি সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চুক্তি হওয়া সাপেক্ষে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য শরৎকালের মধ্যেই শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসবেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতির মামলাগুলো থেকে যাবে। প্যারোলের একটি শর্ত হলো, শেখ হাসিনা এ বিষয়ে মুখ খুলবেন না বা বক্তব্য দেওয়ার ব্যাপারে নিজেকে সীমিত রাখবেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আশা করছেন, খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রক্রিয়া শুরু হবে, যদিও এ ব্যাপারে তাঁরা বিস্তারিত জানতে পারেননি। শেখ হাসিনার বৈধ মার্কিন ভিসা আছে। তাঁর যুক্তরাষ্ট্র সফর যাতে ভালোভাবে হয়, সে জন্য রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।[১০]

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি তাঁর মন্তব্যে বলেন, চলমান উদ্যোগ ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র দায়ী হতে পারে—মার্কিন প্রশাসন এমন কোনো অবস্থানে থাকতে চায় না। রাষ্ট্রদূত মনে করেন, দুই নেত্রীর সম্মতি ছাড়া চলমান রাজনৈতিক সংকটের একটি সমাধানে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে; উপদেষ্টা পরিষদ এবং সেনাবাহিনী একটা আপস করতে চায় বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এবং এটা ইতিবাচক লক্ষণ। মরিয়ার্টির মত হলো, 'রাজনৈতিক দলগুলো ও সরকার উভয় পক্ষের ওপর আমাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখা দরকার। এ পর্যায়ে তাদের পক্ষে একটা সহায়ক অবস্থা নিলে তা আমাদের সুবিধা এনে দেবে, যা পরে প্রয়োজনমতো আমরা কাজে লাগাতে পারব।'[১১]

সংলাপ না হলে বা ব্যর্থ হলে সেনা নেতৃত্ব চরমপন্থার দিকে ঝুঁকতে পারে, এ রকম আশঙ্কা ছিল। দুই বড় দলের সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসার চেষ্টা ছিল। যদি তা সফল না হয়, তাহলে অন্তত একটি বড় দলের সঙ্গে বোঝাপড়া হলেও ক্ষতি নেই—এমন চিন্তাও ছিল কারও কারও মনে। সেনাবাহিনীর সামনে 'সম্মানজনক প্রস্থানের' আর কোনো বিকল্প ছিল না। লেখককে দেওয়া জেনারেল জহিরের সাক্ষাৎকারে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

> জহিরুল আলম : বিএনপি তো গভমেন্টের সঙ্গে কো-অপারেট করছিল না। একসময় মনে হলো আওয়ামী লীগও কো-অপারেট করছে না। আমি একদিন ব্রিগেডিয়ার আমিনকে জিজ্ঞেস করলাম, দুই দলই যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে আর কী অপশন আছে। সে ত্বরিত জবাব দিল—তাহলে মিয়ানমারের মতো লং মার্শাল ল। ওই সময় আর একটা হাইপোথিসিস

ছিল—পাঁচ বছরের জন্য ন্যাশনাল গভমেন্ট। কিন্তু কনস্টিটিউশন তো এটা অ্যালাউ করে না। সে ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টকে বলা হবে একটা উপায় বের করার জন্য।

মহিউদ্দিন আহমদ : ডকট্রিন অব নেসেসিটি।

জহির : হ্যাঁ। এই অপশনটা বিবেচনা করা হবে যদি ওরা টোটালি কো-অপারেশন না করে। ওই সময় আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে আমেরিকান দূতাবাসে এক পার্টিতে আমার দেখা হয়। তাঁকে এক পাশে টেনে নিয়ে আমি বললাম, আপনারা কী করছেন? নেত্রীকে বাদ দিয়ে হলেও ইলেকশনে আসেন। আমি বললাম, তাঁকে বাদ দিয়ে ইলেকশন হলেও আওয়ামী লীগ জিতবে। পরে তারা বাই-ইলেকশনে তাঁকে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু যদি ইলেকশনে আওয়ামী লীগ না আসে, আর যদি পাঁচ বছরের জন্য ন্যাশনাল গভমেন্ট হয়, তাহলে পাঁচ বছর পর আপনি রাজনীতিতে ফিরে না-ও আসতে পারেন।[১২]

শেখ হাসিনা প্যারোলে ছাড়া পেলেন। প্যারোলের মেয়াদ ৬ আগস্ট ২০০৮ পর্যন্ত। তিনি ১২ জুন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টা তাঁর সঙ্গে যাবেন। শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী নিয়াজ আহমদ ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের একজন কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন, যাওয়ার পথে তিনি লন্ডনে যাত্রাবিরতি করবেন এবং সেখানে তাঁর বোন শেখ রেহানার সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর তিনি বোস্টনে যাবেন তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের কাছে। জয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। হাসিনা বোস্টনে তাঁর চিকিৎসা করাবেন এবং এরপর তিনি কানাডার টরন্টোতে যাবেন মেয়ের কাছে। হাসিনার ছাড়া পাওয়ার বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে খালেদা জিয়া এবং তাঁর দুই ছেলে তারেক ও আরাফাতের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা হচ্ছে।[১৩]

১০ জুন বাণিজ্য ও শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টিকে বলেন, দুই নেত্রীই নিজ নিজ দলের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের বিকল্প কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি এবং তাঁদের সঙ্গে সংলাপে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। এ জন্য তাঁদের মুক্তি দিতে হবে। জানা গেছে, শেখ হাসিনার মুক্তির ব্যাপারে যোগাযোগ উপদেষ্টা গোলাম কাদেরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গোলাম কাদের গোয়েন্দা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইয়ে সবাই তাঁকে মান্য করেন এবং এ জন্য দুই

নেত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসানোর গুরুত্ব সেনাবাহিনীকে তিনি বোঝাতে পেরেছেন। হোসেন জিল্লুর রহমান ও গোলাম কাদের দুজনই দুই বড় দলের সঙ্গে একটা আপসের ওপর জোর দিয়েছেন; কারণ, এ ছাড়া রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করা সম্ভব নয়। সেনাবাহিনীর মধ্যে যাঁরা হার্ডলাইনে ছিলেন, তাঁরা এখন রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে নমনীয় হচ্ছেন।[১৪]

১০ মাস ২৫ দিন আটক থাকার পর ১১ জুন ২০০৮ শেখ হাসিনা চিকিৎসার জন্য আট সপ্তাহের জামিনে ছাড়া পান। চারজন উপদেষ্টার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনা জানিয়ে দেন, সরকারের সঙ্গে সংলাপে আওয়ামী লীগ অংশ নেবে।[১৫]

শেখ হাসিনা প্যারোলে ছাড়া পেয়ে বিদেশে যাওয়ার এক সপ্তাহ পরও বিএনপির সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো রকম সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি। খালেদা জিয়া দাবি করেছেন, তাঁর দুই ছেলে তারেক ও আরাফাতকে চিকিৎসার জন্য শর্তহীনভাবে বিদেশে পাঠাতে হবে এবং তিনি নিজে দেশেই থাকবেন। তারেককে নিয়ে কী করা যায়, এ নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ অস্বস্তিতে আছে। বার্তায় মরিয়ার্টি আরও বলেন, তারেক 'দুর্নীতি ও নিষ্ঠুরতার জন্য ইতিমধ্যে যে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি রাজনীতিতে আবার ফিরে এলে বাংলাদেশের নাজুক গণতন্ত্র আরও ঝুঁকিতে পড়বে।' খালেদা জিয়া যদি তারেকের সঙ্গে বিদেশে যেতে রাজি হন, তাহলে হয়তো একটা আপস হতে পারে। তারেকের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের বলেছেন, তারেকের সঙ্গে বিদেশে চলে যেতে খালেদাকে সরকার চাপ দিচ্ছে। এর ফলে হাসিনা ও খালেদা হয়তো সম-অবস্থানে থাকবেন। কিন্তু খালেদা বিদেশে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় বলে ১৬ জুন আদালতে হাজিরা দেওয়ার সময় জানিয়ে দিয়েছেন। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসারকে বলেছেন, খালেদা জিয়া সামরিক বাহিনীর মধ্যে বেশ জনপ্রিয় এবং সরকারের সঙ্গে তাঁর ও তাঁর ছেলেদের ব্যাপারে একটি সমঝোতা হবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, ছাড়া পেলে খালেদা দলের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনার জন্য সপ্তাহখানেক সময় দেবেন। এরপর ছেলেদের সঙ্গে বিদেশে চলে যাবেন। তবে সরকারের সঙ্গে দলের সংলাপকে তিনি সমর্থন দেবেন। খালেদার আইনজীবী মোহাম্মদ নওশাদ জমির এবং বিএনপির দপ্তর সম্পাদক রুহুল কবির রিজভী মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসারকে বলেছেন, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন অংশটির সঙ্গে কোনো আপস নয়। নওশাদ এ-ও বলেছেন, খালেদা জিয়া সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদকে বিশ্বাস করেন না। বিএনপির অনেক নেতা তাঁকে আওয়ামীপন্থী



মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি

হিসেবে বিবেচনা করেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে মইনের এবং একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তিনজন সদস্যের পদত্যাগ চাইতে পারে বিএনপি। নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে তাদের আপত্তি হলো, কমিশন হাফিজকে সংলাপে অংশ নেওয়ার দাওয়াত দিয়ে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে।[১৬]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু কিছু তৎপরতা, সেনাবাহিনীর ভূমিকা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের সব খবর গণমাধ্যমে প্রচার হতো না। ফলে নানা রকমের আন্দাজনির্ভর কথা ও গুজব ছড়াত। এ ক্ষেত্রে মার্কিন দলিলে পাওয়া তথ্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। তথ্যগুলো পরে উইকিলিকসে ফাঁস হয়। এসব তথ্যে ওই সময়ের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ছবি পাওয়া যায়।

ঢাকা থেকে ২৯ জুন ২০০৮ ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির পাঠানো তারবার্তায় বলা হয়, সেনাপ্রধান মইনের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটা বৈঠক হয়েছে ২৬ জুন। মইন রাষ্ট্রদূতকে বলেন, একটি অবাধ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারে ফিরে যাওয়াই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি জরুরি। এ জন্য বন্দী দুজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে প্যারোলে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হচ্ছে। ডিসেম্বরে নির্বাচনের পর কী ধরনের সরকার আসবে, সে ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংলাপের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মইন চান না নির্বাচনের পরে বাংলাদেশ একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ুক, যেমনটি দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান ও নেপালে। মইন বলেন, সংলাপে দু-তিনটি বিষয় নিয়ে কথা চালাচালি হচ্ছে, যেমন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রাখা, একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এ জন্য পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হতে পারে। মইন রাষ্ট্রদূতকে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এমন একটি মীমাংসা চাচ্ছে, যাতে সবাই একমত হন এবং রাজনৈতিক দলগুলো ও নাগরিক সমাজ প্রকাশ্যে তাতে সমর্থন দেবে। দুর্নীতির মামলাগুলো হাসিনার অনুপস্থিতিতে চালু থাকবে, স্বাস্থ্যগত কারণে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার সময় এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতির দরকার ছিল। খালেদাকেও একই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি অবশ্য দুর্নীতির অভিযোগে আটক তাঁর দুই ছেলেকে ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত কোনো শর্তেই রাজি নন বলে জানিয়েছেন। মইন বলেন, আরাফাতকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সমস্যা নেই। 'দেশের অনেক সম্পদ লুট করা সত্ত্বেও' তারেককে ছেড়ে দিতেও সরকার রাজি। তারেক এবং তাঁর আইনজীবীদের কারণে এ ব্যাপারে সমঝোতা হতে দেরি হচ্ছে। মইন আরও বলেন, তারেকের পিঠের ব্যথার কারণ হলো ২০০৫ সালে তিনি একবার পড়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর তারবার্তায় মন্তব্য করেন যে আটক থাকা অবস্থায় নির্যাতনের কারণে এই ব্যথা বেড়েছে বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে। বেগম জিয়া নিজের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাবেন বলে মনে হয় না। এবং এতে মইন অবাক হবেন না, কারণ তিনি তো 'অসুস্থ' নন।[১৭]

এক-এগারোর সরকারের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো ডিজিএফআই। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির পাঠানো এক তারবার্তায় এই সংস্থার একটি নেতিবাচক রূপ ফুটে উঠেছে। দুই দলের মধ্যে সংস্কারপন্থী অংশগুলোকে মদদ দেওয়া এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অ্যাজেন্ডা সমর্থনকারীদের নিয়ে নতুন দল তৈরি করার অভিযোগ আছে ডিজিএফআইয়ের বিরুদ্ধে। মরিয়ার্টির বার্তায় আরও বলা হয়, ডিজিএফআই ভয়ভীতি দেখিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করছে। বাংলাদেশের মানুষ ডিজিএফআইকে কেমন ভয়ের চোখে দেখে, তা বোঝা যায় ব্যক্তিগত পর্যায়ের কথাবার্তা থেকেও, যেমন সংস্থাটির নাম সরাসরি উচ্চারণ না করে 'যাঁরা ক্ষমতায় আছেন' বা 'অদৃশ্য শক্তি' এসব শব্দ ব্যবহার করে। বার্তায় আরও বলা হয়, দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা অথবা দেশের ভেতরে রাজনৈতিকভাবে তাঁদের শেষ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ডিজিএফআইয়ের 'মাইনাস

টু' নীতি ব্যর্থ হয়েছে। উভয় নেত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নিজ নিজ দলের ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়ে গেছেন। তারেক রহমানকে ডিজিএফআইয়ের হেফাজতে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ রয়েছে, তার ফলে ব্যাপক দুর্নীতি ও নিষ্ঠুর আচরণের দুর্নাম থাকা সত্ত্বেও তারেকের প্রতি মানুষের সহানুভূতি তৈরি হয়েছে। তারপরও সংস্থাটির কারসাজি থেমে নেই।[১৮]

বিএনপির দুজন সংস্কারপন্থী নেতা সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ ও তাঁর ভাই সাবেক সাংসদ চৌধুরী আকমল ইবনে ইউসুফ ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক মে. জে. গোলাম মোহাম্মদ ও সন্ত্রাসবাদ দমন বিভাগের পরিচালক ব্রি. জে. এ টি এম আমিনের সঙ্গে দেখা করে বলেন, নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদ সদস্যরা যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অ্যাজেন্ডা সমর্থন করে, এটা তাঁরা নিশ্চিত করতে চান। তাই খালেদা-অনুগতরা যদি নির্বাচন বর্জনের ডাক দেয়, দলের সংস্কারপন্থীরা নির্বাচনে অংশ নেবে। ডিজিএফআই থেকে বলা হয়, তারা সংস্কারপন্থী প্রার্থীদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনবে। বিএনপির এই দুই নেতা ২৩ জুন মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে তাঁদের এ বিষয়ে আলোচনার কথা জানান। দুই ভাইয়ের একজন বলেন, সম্প্রতি আমিনের এক আত্মীয় তাঁকে ফোন করে নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম জানতে চান। আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ ও হুইপ মো. আবদুস শহীদ দূতাবাসকে বলেছেন, তাঁরাও ডিজিএফআইয়ের কাছ থেকে একই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। মরিয়ার্টির বার্তায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা হয়, নির্বাচনে কারসাজি করার লক্ষ্যে ডিজিএফআই কী কী কৌশল নিতে পারে, তা নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন আছে, যেমন পছন্দের প্রার্থীদের টাকাপয়সা দেওয়া, আর অপছন্দের প্রার্থীদের গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো। জেনারেল মইন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের সময় এ ধরনের কারসাজির কথা অস্বীকার করেন।[১৯]

ডিজিএফআইয়ের সন্ত্রাসবাদ দমন বিভাগের পরিচালক ব্রি. জে. চৌধুরী ফজলুল বারীকে সংস্থা থেকে বাইরে বদলি করাকে এই সংস্থার রাজনৈতিক পরাজয়ের একটি উদাহরণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আমিনের দুজন ঘনিষ্ঠ লে. কর্নেলকে জেনারেল মইন ডিজিএফআই থেকে বাইরে বদলি করে দিয়েছেন। এ দুজন রাজনৈতিক কারসাজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও আছে। এ থেকে মনে হতে পারে, জেনারেল মইন সংস্থাটির লাগাম টেনে ধরবেন,

যখন এর কর্মকাণ্ড সামরিক বাহিনীর মর্যাদা এবং অভীষ্ট সংস্কার কর্মসূচির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।[২০]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চায়, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে বিএনপি এই নির্বাচনে অংশ নেবে কি না, এ নিয়ে সরকার বেশ উদ্বিগ্ন। খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি সরকার বিবেচনায় রেখেছে এবং তিনি মুক্ত হলে তাঁর দল নির্বাচনে অংশ নেবে বলে আশা করা যায়। ডিজিএফআইয়ের পরিচালক আমিনের ভাষ্য হলো, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হবে বলে দলটির বিশ্বাস; তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা, নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে বিএনপি একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভেতরের কথা হলো, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ভালো করলেও সরকার গঠন করতে পারবে না।[২১]

ধারণা করা হচ্ছে, শেখ হাসিনা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারেন। নির্বাচনের ব্যাপারে যেসব বাধা আছে, তা নিয়ে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, জেনারেল মইন ও ফখরুদ্দীন আহমদের মধ্যে একটি বৈঠক আয়োজনের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। বৈঠকে আলোচ্যসূচির মধ্যে থাকবে নির্বাচনের পর মইনের ভূমিকা কী হবে। মইন রাষ্ট্রপতি হতে চান না, তবে সেনাপ্রধানের বর্তমান পদের সময়সীমা বাড়ানোর সুযোগ থাকবে তাঁর। আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ২০০৭ সাল থেকে চালু হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড। তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাচ্ছে কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতা হোক, যেমন এযাবৎ নেওয়া সব কার্যক্রম অনুমোদন, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ, একটি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল তৈরি, নির্বাচনের পর 'ঐকমত্যের' সরকার গঠনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা এবং দুর্নীতিবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখা। কয়েকটি বিষয়ে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া সম্মতি দিয়েছেন। তাঁরা নিজ নিজ দলে সংস্কারপ্রক্রিয়া চালু রাখা, নেতৃত্বের পুনর্বিন্যাস এবং দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনে প্রার্থী না করার ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন। ১৩ আগস্ট ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির তারবার্তায় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার আমিনের আলোচনার সূত্রে এসব কথা উঠে এসেছে। তারবার্তায় মরিয়ার্টির মন্তব্য হলো, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক লক্ষ্য—বিশেষ করে রাজনীতি থেকে দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়ার চিন্তা যে ২৪ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, তা সরকার বুঝতে পেরেছে। অতীতে এটা দেখা গেছে যে আলোচনার ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে দুই নেত্রীকে একমতে আনা কঠিন। এখন একটা সমঝোতার সম্ভাবনা দেখা গেলেও কিছু

বিষয় অমীমাংসিতই থেকে যাবে।'[২২]

তারেক রহমান বেশ কিছুদিন ধরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের প্রিজন সেলে ছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর তিনি জামিনে ছাড়া পান। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এখানেই থাকবেন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৩ মামলার সব কটিতেই তিনি হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ খারিজ করে দেওয়ায় তিনি মুক্তি পান। এর আগে সরকার প্যারোলে মুক্তি দিয়ে তাঁকে শর্ত সাপেক্ষে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছিল। ৩১ আগস্ট মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এক বৈঠকে যোগাযোগ উপদেষ্টা গোলাম কাদের বলেন, তারেকের আইনজীবীরা তাঁর জামিন বাগিয়েছেন দেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাজ্জব বনে গেছে। এ জন্য সরকার ও সামরিক বাহিনীর কেউ কেউ অ্যাটর্নি জেনারেল সালাহউদ্দিনকে দুষছেন।[২৩]

এর আগে ২৮ আগস্ট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। ওই সময় ব্রি. জে. আমিনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে তারেককে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার লক্ষ্যে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটা বন্দোবস্ত হয়। খালেদা প্রতিশ্রুতি দেন যে বিএনপি ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে অংশ নেবে এবং তারেক রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসা ও পড়াশোনার জন্য বিদেশে থেকে যাবেন।[২৪]

জেনারেল গোলাম কাদের রাষ্ট্রদূতকে আরও বলেন, মহাসচিবের পদে দেলোয়ারের জায়গায় আরও দায়িত্বশীল কাউকে বসাবেন বলে খালেদা কথা দিয়েছেন। সম্ভাব্য প্রার্থীরা হচ্ছেন যুগ্ম মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান ও সাবেক মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন। খালেদার প্রতি দেলোয়ার অনুগত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অনেকেই দলের জন্য বোঝা মনে করেন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বিএনপির কিছু নেতা তারেকের ছাড়া পাওয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ ও অসন্তোষ জানিয়েছেন।[২৫]

খালেদা জিয়া ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জামিনে ছাড়া পান। একই দিন তারেক চিকিৎসার জন্য লন্ডন রওনা হন। রুহুল কবির রিজভীর মতে, তারেক এক-দেড় বছরের মধ্যে ফিরে আসবেন। অন্যদিকে জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান বলেন, তারেকের অনুপস্থিতির ফলে দলে তাঁর দুর্নীতিবাজ বন্ধুদের দৌরাত্ম্য কমবে।[২৬]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল বোর্ড তারেক রহমানকে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানোর সুপারিশ করেছিল। হাসপাতালের ছোট্ট কামরায় তাঁর হাঁটাহাঁটি বা ফিজিওথেরাপির সুযোগ ছিল না। ফলে তাঁর পায়ের মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। চিকিৎসা ভাষায় এটা হলো 'ডিজইউজ অ্যাট্রফি'। এ জন্য তাঁকে দ্রুত বিদেশে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়েছিল। জামিন পাওয়ার পরও তিনি এক সপ্তাহ হাসপাতালে ছিলেন। তাঁর মা খালেদা জিয়ার জামিন হওয়ার পর তিনি এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে লন্ডনের পথে ঢাকা ছাড়েন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং চিকিৎসক কাজী মাজহারুল ইসলাম। যাওয়ার সময় ঢাকা এয়ারপোর্টে তিনি একটি মুচলেকা দেন। এই মুচলেকা নাটকের একটি ভাষ্য পাওয়া যায় ডা. ইসলামের কাছে। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> হঠাৎ শুনি চেঁচামেচি হচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম না কী হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বিন্দু আপাকে (তারেকের স্ত্রীর বড় বোন) জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?
>
> ওরা এখানে চার-পাঁচজন ঢুকল। ওরা এসে বলছে যে আপনাকে একটা মুচলেকা দিয়ে যেতে হবে, আপনি আর কখনো রাজনীতি করবেন না...।
>
> এখানে ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই প্রেজেন্ট। ওনার ওয়াইফ আছে, মেয়ে আছে। ওনার জেঠাস আছে, জেঠাসের হাজব্যান্ড আছে।
>
> আমার মনে হলো ওনার চিকিৎসাটাই তো সবচেয়ে জরুরি। সাদা কাগজে কী সব লিখে নিয়ে আসছে। এর কী ইম্পর্ট্যান্স আছে? আমি বললাম, আপনারা এখান থেকে যান। ওনার ইনজেকশন নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। পরে কথা বলবেন।
>
> আমি ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। উনি ভিআইপি লাউঞ্জে একটা সোফায় শুয়ে ছিলেন। আমি ওনার কানের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, যদি পুরো বাংলাদেশও লিখে দিতে হয়, দিয়ে দেবেন। এগুলোর কোনো মূল্য নাই। এখন চিকিৎসা করা দরকার।
>
> আমি যখন একটু পরে ওখান থেকে সরে গেলাম, আবার ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি হলো। 'আচ্ছা, ঠিক আছে দেন, কী লিখব।'
>
> একটা সাদা কাগজে লেখা ছিল—আমি আর কখনো এ দেশে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হব না—এই সব কথা। দুই-তিন লাইন লেখা ছিল। উনি সই করে দিলেন। পরে আমরা জানলাম, এটা নাকি একটা স্ট্যাম্পের ওপর লেখা। এটা সম্পূর্ণ একটা ভুয়া জিনিস দেখাচ্ছে।[২৭]

মুক্ত হয়েই খালেদা জিয়া দলের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন।

তিনি দলের সংস্কারবাদী দুজন নেতার সঙ্গে একান্তে কথা বলেন। এঁদের একজন মাহবুবুর রহমানের মতে, তাঁদের আলোচনা ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং খালেদাকে আগের চেয়ে নমনীয় মনে হয়েছে। খালেদা সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার সঙ্গেও কথা বলেন এবং রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিতে রাজি হন।[২৮]

রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে সঙ্গে নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ জোরেশোরেই পা ফেলছিল। দুই দলের দুই নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ ও দূতিয়ালির দায়িত্বে ছিলেন কয়েকজন উপদেষ্টা। তাঁদের একজন হলেন বাণিজ্য ও শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান। ১১ সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়া জামিনে ছাড়া পাওয়ার পরপরই তিনি খালেদার সঙ্গে দেখা করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির সঙ্গে দেখা করে হোসেন জিল্লুর সরকারের মনোভাব কী তা জানান। তিনি বলেন যে সরকার চাচ্ছে দুই নেত্রী অচলাবস্থা দূর করার জন্য একসঙ্গে বসুক। সরকার চায় দুই নেত্রী নিজ নিজ দলের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ আছে এমন লোকদের তালিকা তৈরি করুক, যাদের পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী করা হবে না; নির্বাচনী প্রচারের জন্য আচরণবিধির ব্যাপারে একমত হোক; সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশ তৈরির জন্য কমিটি তৈরি করুক; এবং নির্বাচনের পরেও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নীতির ধারাবাহিকতা মেনে চলার ব্যাপারে ওয়াদা করুক। জিল্লুরের মতে, দুজন যদি আলাদাভাবে ঘোষণা না দিয়ে একসঙ্গে বসে বিষয়গুলো ঠিক করে নেন, তাহলে সংস্কারপ্রক্রিয়াটিতে তাঁদের সম্মতি আছে বলে মনে করা হবে। তিনি আরও বলেন, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রশাসনিক সংস্কার ও শিক্ষার ব্যাপারে একটি মতৈক্যে পৌঁছার জন্য সরকার নভেম্বরে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে তিনটি শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন করতে চায়। দলগুলো যদি নীতিগত বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয়, তাহলে তাঁদের প্রচারে ব্যক্তিগত ও তিক্ত আক্রমণের প্রবণতা কমে যাবে।[২৯]

রাজনীতির হাওয়া ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে। হোসেন জিল্লুরের মনে হয়েছে, দীর্ঘদিন চাটুকার-পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও খালেদা জিয়ার মনোভাব বদলাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে হাসিনার সুরও বেশ নরম বলে মনে হচ্ছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভাষ্য হলো, গত জুলাই মাসে হাসিনার সঙ্গে ওয়াশিংটনে যখন তাঁর দেখা হয়েছিল, তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেকগুলো কাজকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বলে জানান। হোসেন জিল্লুরের সঙ্গে বৈঠকের পর রাষ্ট্রদূত অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন,

যুক্তরাষ্ট্র নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোই সব সিদ্ধান্ত নেবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। হোসেন জিল্লুর রাষ্ট্রদূতকে বলেন, কূটনীতিকেরা চাইলে ঈদের ছুটির পর অক্টোবরের গোড়ার দিকে দুই নেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন; তত দিনে শেখ হাসিনা বিদেশ থেকে ফিরে আসবেন। শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রস্তাবিত শীর্ষ বৈঠক নিয়ে কথা বলার জন্য হোসেন জিল্লুর রহমান ১৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হন।[৩০]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ ২০ সেপ্টেম্বর রাত আটটায় বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত ১৫ মিনিটের এক ভাষণে ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, '২০০৮-এর নির্বাচন আমাদের জন্য হবে গণতন্ত্র, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির নতুন মাইলফলক।' একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা গড়ে তোলা দরকার এবং এ কারণেই হয়তো কোনো কোনো সংস্কারপ্রক্রিয়ার গতি হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে বলে তিনি স্বীকার করেন। ভাষণ দেওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি নিউইয়র্ক রওনা হয়ে যান।[৩১]

প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ভাষণে ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাচন হবে বলে জানান। নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগেই উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যুক্তি হলো, এতে করে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা উপজেলা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবেন না। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে সমঝোতা হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে।[৩২]

এদিকে হরকাতুল জিহাদ নিষিদ্ধ থাকায় দলটি বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি) নামে নিবন্ধনের চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে। ২১ ডিসেম্বর সেনাপ্রধানের সঙ্গে এক বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি এই দলটির নিবন্ধনের ব্যাপারে মার্কিন সরকারের আপত্তির কথা জানান। আগের দিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এক প্রাতরাশ বৈঠকে ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক গোলাম মোহাম্মদ রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন, আইডিপির পেছনে ব্রিগেডিয়ার আমিনের হাত আছে। তিনি এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে আপত্তি জানানোর জন্য মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেন।[৩৩]

# রোডম্যাপ

১২ এপ্রিল ২০০৭ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, 'যে সকল কর্মসূচি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা যথাশীঘ্র সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আমরা বদ্ধপরিকর।...আমরা প্রয়োজনের চেয়ে এক দিনও বেশি ক্ষমতায় থাকব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই জনগণের প্রত্যাশিত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।'[১]

২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথের ৮১তম জন্মদিনে ঢাকায় হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা মতিউর রহমান চৌধুরী ও দৈনিক *যুগান্তর*-এর সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের কাছে বলেন, 'সেনাবাহিনী রাজনীতিতে অংশ নেবে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সেনাবাহিনী বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করছে। সময় শেষ হয়ে গেলেই সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে।' ২ এপ্রিল ২০০৭ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত সম্মেলনে দেওয়া ভাষণের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। আমি স্থির করেছি, আর কথা বলব না। কথা বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, সময়ের প্রয়োজনে রাজনীতিতে সংস্কার জরুরি। রাজনৈতিক দলগুলো এগিয়ে এলে এ সংস্কার খুব কঠিন কাজ নয়।[২]

এক-এগারো পরবর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই দুই ব্যক্তির বক্তব্যে এটি স্পষ্ট ছিল যে সরকার রাজনৈতিক সংস্কার চায় এবং সংস্কার সাপেক্ষে দেশে সময়মতো নির্বাচন হবে। নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম পরে 'রোডম্যাপ'

হিসেবে গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হয়।

৫ এপ্রিল ২০০৭ নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচনী আইনের সংস্কার নিয়ে খসড়া সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছিল। এর মধ্যে কিছু ছিল আগের আইনের সংশোধনী এবং কিছু ছিল নতুন আইনের সুপারিশ। উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো ছিল এ রকম :

- নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ছাড়া কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।
- কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলে নির্বাচনী এলাকার ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থনসূচক ও স্বাক্ষরসংবলিত তালিকা জমা দিতে হবে।
- সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে থাকলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী দিন থেকে কমপক্ষে তিন বছরের মধ্যে কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।
- বিদেশি অনুদান বা তহবিল গ্রহণকারী এনজিওর কর্মকর্তারা পদত্যাগ বা চাকরি শেষ হওয়ার তিন বছরের মধ্যে প্রার্থী হতে পারবেন না।
- ঋণখেলাপি বা বিলখেলাপিরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন।
- একই সময় তিনটির বেশি আসনে প্রার্থী হওয়া যাবে না। একাধিক আসনে বিজয়ী অতিরিক্ত আসন ছেড়ে দিলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।
- প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনী খরচের সম্ভাব্য তহবিলের উৎস সম্পর্কে একটি বিবরণী মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের মহাসচিবের স্বাক্ষরে দলের সার্বিক নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ নির্বাচনের ফল প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পাঠাতে হবে।
- মনোনয়নপত্রে ভুল তথ্য বা আয়-ব্যয়ের ভুল হিসাব দিলে এবং তা শনাক্ত করা গেলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে।
- নিবন্ধনের জন্য রাজনৈতিক দলকে আবেদনপত্রের সঙ্গে দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত তথ্য ও আয়ের উৎস জানাতে হবে। গঠনতন্ত্রে বিধান থাকতে হবে যে দল বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি অনুগত। দলের গঠনতন্ত্রে দলের জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান থাকতে হবে।[৩]

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া শর্তে তিনটি বিকল্প ছিল। এগুলো হলো স্বাধীনতার পর কোনো একটি নির্বাচনে কমপক্ষে একটি আসন পাওয়া অথবা অন্তত একটি সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের কমপক্ষে শতকরা ২ ভাগ পাওয়া অথবা দেশের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক জেলায় কার্যকর জেলা ও উপজেলা কমিটিসহ দলের অফিস থাকা, প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে এক হাজার ভোটার ও উপজেলায় কমপক্ষে ২০০ ভোটারকে দলের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করা; এবং কার্যকর কেন্দ্রীয় কমিটি ও অফিস থাকা।[৪]

১৯ মে ২০০৭ শেরেবাংলা নগরের এনইসি মিলনায়তনে নির্বাচনী আইনে প্রস্তাবিত সংস্কার নিয়ে গণমাধ্যমের সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ টি এম শামসুল হুদা বলেন, ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির কাজ ১৮ মাসের মধ্যেই শেষ হবে। ভোটার তালিকা তৈরির জন্য সময় গণনা পয়লা মে শুরু হয়েছে এবং ৩০ অক্টোবর ২০০৮-এর মধ্যে শেষ হবে। তিনি বলেন, 'ভুলে ভরা আগের তালিকা নিয়ে কাজ করার চেয়ে নতুন করে করাই ভালো।' উপস্থিত সাংবাদিকদের কয়েকজনের মন্তব্য ছিল এ রকম :

এবিএম মূসা : আইনগত দিক থেকে কমিশনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে আইনগুলো বলবৎ আছে সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে শুধু নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনকে আইনগত দিক থেকে শক্তিশালী হতে হবে।

আতাউস সামাদ (উপদেষ্টা সম্পাদক, *আমার দেশ*) : মতবিনিময়ে এসে এটা বুঝতে পেরেছি, নির্বাচন হচ্ছে। এটা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা ছিল, তা-ও কেটে গেছে।

গোলাম সারওয়ার (সম্পাদক, *যুগান্তর*) : অবসর নেওয়ার তিন বছরের মধ্যে নির্বাচন করতে পারবে না—এমন বাধ্যবাধকতা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। প্রশাসনের সব কর্মকর্তাই খারাপ নন। তাই গুটিকতকের দোষের কারণে বৃহৎ অংশকে শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়।

আবেদ খান (সম্পাদক, *সমকাল*) : হঠাৎ করে কেউ রাজনৈতিক দল করে যেন ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে না পারেন, সেদিকে কমিশনকে লক্ষ রাখতে হবে। আমাদের দেশে চাপিয়ে দেওয়া দলের ক্ষমতায় আসার প্রবণতা রয়েছে।

আব্দুল কাইয়ুম (যুগ্ম সম্পাদক, *প্রথম আলো*) : কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো দলকে সর্বোচ্চ কত টাকা চাঁদা দিতে পারবে, তা নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত।

শ্যামল দত্ত (সম্পাদক, *ভোরের কাগজ*) : ছাত্র ও পেশাজীবীদের রাজনীতি বন্ধের বিষয়টি বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। অতীতের ইতিহাস স্মরণ করলে চলবে না।[৫]

২৮ আগস্ট ২০০৭ নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সিইসি এ টি এম শামসুল হুদা বলেন, সেপ্টেম্বরে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে—সরকারের কাছ থেকে এমন আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশন আলোচনায় বসবে। নির্ধারিত শর্ত পূরণে সক্ষম ১৫টি দলের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো শুরু হয়েছে। আমন্ত্রণযোগ্য দলগুলোর নামের বাংলা বানানের ক্রম অনুসারে আলোচনার জন্য ডাকা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, 'অতীতে কথার এত বরখেলাপ হয়েছে যে কেউ আর নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। কিন্তু এখন আমি বলব, আমাদের ওপর আস্থা রাখুন। আলোচনা সম্ভব হবে না, এটা জানলে আপনাদের (সাংবাদিকদের) ডাকতাম না। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বডি। তাদের দাবি মানতে সরকার বাধ্য।'[৬]

আমন্ত্রিত ১৫টি দল হলো ইসলামী ঐক্যজোট, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি, জাতীয় পার্টি, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), জাসদ (ইনু), জাসদ (রব), জামায়াতে ইসলামী, ন্যাপ (মোজাফফর), আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় পার্টি (নাজিউর), বিএনপি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সাম্যবাদী দল (এমএল)। সিইসি বলেন, দেশে ১৫০-এর বেশি রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু সবার সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ জন্য শর্ত দিয়ে দল নির্বাচন করা হয়েছে।[৭]

ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ শুরু হবে কি না, এ নিয়ে সিইসি সন্দেহ প্রকাশ করেন। ৮ সেপ্টেম্বর তিনি বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে জানান, সরকার ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে না নেওয়ায় সংলাপে বসার ব্যাপারে দলগুলো প্রস্তুতি নিতে পারছে না।[৮]

সরকার ৯ সেপ্টেম্বর ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জরুরি অবস্থাও তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। বিএনপি নেতা আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাননি।[৯]

২ অক্টোবর ২০০৭ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সিইসি বলেন,




ছবিসহ ভোটার পরিচয়পত্র প্রকল্পের কাজ দেখছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ টি এম শামসুল হুদা (মাঝে) এবং কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন (বাঁয়ে)

যেকোনো নির্বাচনে ভোট গ্রহণের অন্তত দুই মাস আগে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া দরকার। তিনি বলেন, এটি সরকারের বিষয়। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের কোনো দাবি থাকলে তা সরকারের কাছে করা উচিত। এর আগে সিইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, 'জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হলে যুক্তরাজ্য একে স্বাগত জানাবে। তবে সরকারকে জননিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে।'[১০]

৯ অক্টোবর ২০০৭ নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে সিইসি সাংবাদিকদের বলেন, ১১ নভেম্বর ২০০৭ থেকে সারা দেশে ভোটার তালিকা তৈরির কাজ একযোগে শুরু হবে এবং ২০০৮ সালের জুলাইয়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে। যেখানে ভোটার তালিকার কাজ শেষ হবে, সেখানেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যাবে।[১১]

সংলাপে বসার জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে লেখা চিঠি ১৯ অক্টোবর পাঠানো হয়। চিঠিতে ৪ নভেম্বর বৈঠকের প্রস্তাব করা হয়। বিএনপির কোন গ্রুপকে চিঠি দেওয়া হবে এ নিয়ে কমিশন দ্বিধায় পড়ে যায়। ৫ ও ২৪ সেপ্টেম্বর খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পক্ষ থেকে কমিশনকে দুটি চিঠি দিয়ে সব ধরনের

যোগাযোগ তাঁদের সঙ্গেই করার দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে বিএনপির সংস্কারপন্থীদের পক্ষ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, তাঁরাই দলের মূলধারা এবং সংলাপে তাঁদের ডাকতে হবে।[১২]

কমিশন সংস্কারপন্থী গ্রুপের মহাসচিব মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমদের কাছে ৫ নভেম্বর সংলাপের চিঠি পাঠালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ৬ নভেম্বর সাংবাদিকদের কাছে কমিশনের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিইসি বলেন, সংলাপে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে বিএনপির গঠনতন্ত্রের চেয়ে 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তবে কেউ এতে অসন্তুষ্ট হলে আদালতে যেতে পারেন। মেজর হাফিজকে ডাকার পক্ষে নিজের অবস্থান তুলে ধরে সিইসি বলেন, 'যেকোনো সিদ্ধান্তে এক পক্ষ খুশি হবে, অন্য পক্ষ অখুশি হবে। এতে আমার কী করার আছে। কমিশন সবকিছু দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেউ এটা গ্রহণ করতে পারে, আবার কেউ এটা বর্জনও করতে পারে। বিচারককে তো বিচার করতেই হবে।'[১৩]

কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার পক্ষে হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করা হলে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ হাফিজকে দেওয়া চিঠির কার্যক্রম স্থগিত করেন। ফলে ২২ নভেম্বর প্রস্তাবিত সাইফুর-হাফিজ গ্রুপের সঙ্গে কমিশনের সংলাপ স্থগিত হয়ে যায়।[১৪]

শেষমেশ নির্বাচন কমিশন তার মত বদলেছিল। এর মধ্যে বিএনপির মধ্যকার গৃহবিবাদও অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। ৩১ আগস্ট ২০০৮ জাতীয় প্রেসক্লাবে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ সংশোধন ও নির্বাচন শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় সিইসি বলেন, 'বিএনপির সঙ্গে আগে যে ঘটনা ঘটেছে, সে জন্য আমি দুঃখিত। ওটা ছিল একটা অঘটন। এ জন্য আমরা নিজেরাও নিগৃহীত হয়েছি। অনেক মূল্যবান সময়ও এতে নষ্ট হয়েছে। ফলে গণপ্রতিনিধিত্ব সংশোধনী অধ্যাদেশ করতে কিছুটা দেরি হয়েছে।'[১৫]

১১ ডিসেম্বর ২০০৭ এক রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এর আগে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রাখায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আট ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক হলো। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি অপরাধের মামলা আছে কি না, আগে কখনো তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছিল কি না এবং থাকলে এর ফলাফল, প্রার্থীর পেশা, আয়ের উৎস, আগে সংসদ সদস্য ছিলেন কি না এবং থাকলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে কী ভূমিকা ছিল, প্রার্থীর বা তাঁর পোষ্যদের কোনো তফসিলি ব্যাংকে ঋণ আছে কি না, ঋণের সর্বশেষ অবস্থা কী বা তিনি ঋণখেলাপি কি না—প্রার্থীকে নিজের সম্পর্কে এই আটটি তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জানাতে

বলেছিলেন হাইকোর্ট। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় হলফনামার মাধ্যমে এসব তথ্য প্রার্থীকে জানাতে হবে।[১৬]

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত শিথিল করে প্রস্তাবিত নির্বাচনী আইনে সংশোধনী আনা হয়। যেসব শর্ত শিথিল হচ্ছে, সেগুলো হলো :

১. স্বাধীনতার পর যেকোনো একটি নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১ শতাংশ পেলে দলটি নিবন্ধনের যোগ্য হবে। আগের প্রস্তাবে ভোট পাওয়ার হার ২ শতাংশ বলা হয়েছিল।
২. নতুন দলের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের জন্য দেশের এক-তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় জেলা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম ২০০ ভোটার দলের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকা। আগের প্রস্তাবে দেশের অর্ধেক জেলায় কমিটি ও সংশ্লিষ্ট জেলায় এক হাজার ও উপজেলায় ২০০ ভোটারকে দলের সদস্য হিসেবে তালিকায় রাখার বাধ্যবাধকতা ছিল।
৩. নতুন শর্তেও কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার বাধ্যবাধকতা থাকছে। তবে তা পর্যায়ক্রমে ২০২০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।
৪. সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার দলীয় সদস্যরা সংসদ বা অন্য কোনো নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর প্যানেল তৈরি করবেন এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড ওই প্যানেল বিবেচনায় এনে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে। আগের প্রস্তাবে প্রত্যক্ষ ভোট ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় দলীয় সদস্যদের সংসদ বা অন্য কোনো নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনীত করার কথা বলা হয়েছিল।
৫. শিক্ষক ও ছাত্র, বিভিন্ন পেশার সদস্য এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সমন্বয়ে অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ থাকবে। তবে তারা স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে পারবে।
৬. পরপর দুটি নির্বাচনে অংশ না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিল হবে। নিবন্ধিত নয় এমন দলের সঙ্গে জোট করা যাবে না।

এ ছাড়া প্রার্থী দেশের কোথাও ভোটার না হলে এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হলে কোনো ব্যক্তি প্রার্থী হতে পারবেন না।[১৭]

১০ মার্চ ২০০৮ উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ আইন

সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০০৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়। এই আইনে উপজেলা পরিষদে সাংসদদের উপদেষ্টা থাকা ও তাঁদের পরামর্শ গ্রহণের বিধান বাতিল করে ১৯৯৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়।[১৮]

২৩ এপ্রিল ২০০৮ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, জেলা ও উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দুটি ভাইস চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি ভাইস চেয়ারম্যান পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে তাঁকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।[১৯]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা শেষ হয়েছিল ২৭ জানুয়ারি ২০০৭। এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না করায় ২৪ জানুয়ারি ২০০৮ ব্যারিস্টার মাসুদ রেজা সোবহান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে একটি রিট আবেদন করেছিলেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান না করা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানাতে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ওপর হাইকোর্ট ২৭ জানুয়ারি একটি রুল জারি করেছিলেন। ২২ মে ২০০৮ বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ও বিচারপতি মোহাম্মদ আশফাকুল ইসলামকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রিটের শুনানি শেষে অভিমত দেন যে জাতীয় সংসদ ভেঙে যাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন না করে নির্বাচন কমিশন সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। রায়ের পর্যবেক্ষণে তাঁরা বলেন, নির্বাচন কমিশন হলফনামা দিয়ে বলেছে যে রোডম্যাপ অনুযায়ী পরবর্তী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; এ বিষয়টি মেনে নেওয়া ছাড়া আদালতের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। রায়ে বলা হয়, 'দেশের সংবিধান বারবার লঙ্ঘনের জন্য আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।' নির্বাচন কমিশনের 'ব্যর্থতা' সম্পর্কে আদালত বলেন, বিষয়টি নতুন সংসদ ভেবে দেখবে। রায়ে আরও বলা হয়, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন নয়। আদালত বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, নির্বাচন কমিশন নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গত ১২ মে নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে। সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রায়ে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনকে প্রধানমন্ত্রীর (প্রধান উপদেষ্টা) কার্যালয় থেকে আলাদা করা দরকার। আদালত এ-ও বলেছেন, পরিস্থিতির আলোকে ডিসেম্বরের (২০০৮) মধ্যে নির্বাচন করা অযৌক্তিক নয়।[২০]

*ইত্তেফাক*কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে নির্বাচন কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কারণে যদি নির্বাচন

না হয়, তার দায় নেবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু কমিশন প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অন্য কারও কারণে যদি নির্বাচন না হয়, তার দায় তারা নেবে না। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে; তবে সিদ্ধান্ত দেবে সরকার।[২১]

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে ৫৪টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল। বিচারপতি এম এ আজিজ সিইসি থাকার সময় ১১৭টি দলের সঙ্গে কমিশনের সংলাপ হয়েছিল। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সরাসরি নিবন্ধনের যোগ্যতা আছে ১৪টি দলের। এর বাইরে অন্যান্য শর্ত পূরণ করে আরও ১৩টি দল নিবন্ধনের যোগ্য হতে পারে। নির্বাচন কমিশন পরে নিবন্ধনের জন্য তৃতীয় শর্তটি সংশোধন করে। ফলে, ১০টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় কমিটি থাকলেই একটি দল নিবন্ধন পাবে।[২২]

এর ফলে ছোটখাটো নতুন-পুরোনো আরও দলের নিবন্ধন পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

খালেদা জিয়া জামিনে মুক্তি পান ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষমেশ ২০ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিএনপির সংলাপের তারিখ ঠিক হয়। আলোচনায় বিএনপি নির্বাচনী আইনের প্রায় সব সংস্কারের বিরোধিতা করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের নেতারা বলেন, নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত স্থগিত বা সহজ না করলে তাঁরা নিবন্ধন করবেন না। সিইসি তাঁর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক থাকছে।[২৩]

বিএনপি দৃশ্যত নানান শর্ত দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চাপে রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যত দূর সম্ভব সুবিধা আদায় করে নেওয়া। অবশ্য কিছু নীতিগত প্রশ্নও ছিল। ভোটার তালিকা তৈরি হওয়ার সময় খালেদা জিয়া ভোটার হতে প্রথমে রাজি হননি। তিনি জানতেন, ভোটার না হলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তাঁর এই সিদ্ধান্তে নির্বাচন বর্জনের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার পর থেকে সরকারের চেষ্টা ছিল সবাইকে নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন আয়োজন করা। এ পর্যায়ে ফৌজদারি মামলাগুলো থেকে রাজনৈতিক নেতারা জামিন অথবা অব্যাহতি পেতে থাকেন। অনেকগুলো মামলার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশনের কাজের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিচারপ্রক্রিয়ার এই দিকটি বেশ দৃশ্যমান ছিল।

নির্বাচনের জন্য সবার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ তৈরি না হওয়ার অভিযোগে এবং জরুরি অবস্থার অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার দাবিতে বিএনপি সোচ্চার ছিল। ৩০ অক্টোবর ২০০৮ তাঁর অফিসে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের

নেতাদের সঙ্গে আলাপ করার সময় খালেদা জিয়া বলেন যে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট; এদের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। তিনি নতুন কমিশনের অধীনে অবিলম্বে নির্বাচন দাবি করেন। শিক্ষকনেতারাও বর্তমান কমিশনের অধীনে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন।[২৪]

এদিকে বিএনপির জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে চাপে পড়ে যায় বিএনপি। ৪ নভেম্বর গভীর রাতে বাণিজ্য উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে অনেকক্ষণ কথা বলেন। বৈঠকের শুরুতে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ছিলেন।[২৫]

৫ নভেম্বর রাতে চার দলের বৈঠকে খালেদা জিয়া জামায়াত নেতাদের উদ্দেশে বলেন, নির্বাচনে অংশ নিলে বিএনপিকে ৫০ আসন আর জামায়াতকে তিনটি আসন দেওয়া হবে। তাই তড়িঘড়ি করে এই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে নন তিনি। বরং নির্বাচনের বাইরে থাকবেন তিনি, তাতে যা হয় হবে। আর সরকার যদি বিএনপি ও চার দলের সব দাবি মেনে নেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।[২৬]

বিএনপির কেউ কেউ নির্বাচন বর্জনের পক্ষে ছিলেন। ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন খালেদা জিয়াকে বলেছিলেন, নির্বাচনের ফল ঠিক করা আছে; বিএনপি ৩০টি আসন পাবে।[২৭]

প্রকৃতপক্ষে দলকে নির্বাচনমুখী করতে গেলে যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি থাকা দরকার, বিএনপির তা নেই। এ অবস্থায় নির্বাচনে গেলে ফল অনুকূলে আসবে না ধরে নিয়ে খালেদা জিয়া নির্বাচন থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছেন, অথবা প্রস্তুতির জন্য কয়েক মাস সময় চাইছেন।

সরকার থেকে বেশ কয়েকবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হবে। পরে ঠিক হয় একই দিন সংসদ এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হবে। কিন্তু বড় রাজনৈতিক দলগুলো সংসদ নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছে বরাবরই।

১৩ নভেম্বর রাতে জার্মান রেডিও ডয়চে ভেলেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে খালেদা জিয়া বলেন, জরুরি অবস্থা তুলে না নিলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না।[২৮]

১৭ নভেম্বর চারদলীয় নেতাদের উপস্থিতিতে সংবাদ ব্রিফিংয়ে খালেদা জিয়া নির্বাচনে যেতে সরকারকে চারটি শর্ত দেন। শর্তগুলো হলো জরুরি অবস্থা সম্পূর্ণ তুলে নেওয়া, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৯১(ই) ধারা বাতিল, উপজেলা নির্বাচন সংসদ নির্বাচনের অন্তত এক মাস পরে করা এবং হাজিদের



২১ নভেম্বর ২০০৮ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া

ভোটাধিকার নিশ্চিত করে সংসদ নির্বাচনের নতুন তফসিল ঘোষণা করা। উল্লেখ্য যে কমিশনের প্রস্তাবিত ১৮ ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের সঙ্গে হজের সময় মিলে যাওয়ায় হজযাত্রীরা ভোট দিতে পারছেন না।[২৯]

শেখ হাসিনার সঙ্গে খালেদা জিয়ার দেখা-সাক্ষাৎ নেই অনেক দিন। ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকার সেনাকুঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে দুজনই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

২০ ডিসেম্বর চারদলীয় জোটের অবস্থান তুলে ধরে খালেদা জিয়া বলেন, নির্বাচন ১০ দিন পিছিয়ে ২৮ ডিসেম্বর করলে তাঁরা অংশ নেবেন। তবে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন থেকে জরুরি অবস্থা তুলে নিতে হবে।[৩০]

শেষমেশ নির্বাচন কমিশন ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করে এবং উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ থেকে সরে আসে।

# প্রস্থান

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ওয়াশিংটনে পাঠানো মার্কিন দূতাবাসের তারবার্তায় বলা হয়, ২০০৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টির সঙ্গে বাণিজ্য ও শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমানের এক আলোচনায় জানা যায়, গণতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে দুই নেত্রীর অঙ্গীকারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাঁদের মধ্যে একটি বৈঠকের চেষ্টা চলছে। তারবার্তায় বলা হয়, ১১ সেপ্টেম্বর বেগম খালেদা জিয়া জামিনে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর হোসেন জিল্লুর রহমান তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। জিল্লুর ১৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে যান। দুই নেত্রীর মধ্যে সম্ভাব্য বৈঠকের ব্যাপারে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের পরিকল্পনা করেছিলেন। দুই রাজনৈতিক দলে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এমন নেতাদের নির্বাচনের বাইরে রাখা, নির্বাচনী ও সংসদীয় আচরণবিধির বিষয়ে দুই নেত্রীকে সম্মত করানোসহ আরও কিছু বিষয় আলোচনা করা ছিল এই বৈঠকের উদ্দেশ্য।[১]

সরকারের পক্ষ থেকে দুই নেত্রীর মধ্যে সরাসরি আলোচনার একটি উদ্যোগের কথা এ সময় চাউর হয়েছিল। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ প্রকাশিত *নয়া দিগন্ত*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খালেদা জিয়া এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। *নয়া দিগন্ত*-এর প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

> *নয়া দিগন্ত*: সম্প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে দুই নেত্রীর মধ্যে বৈঠকের কথা বলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই।
>
> খালেদা জিয়া : আমি তার সঙ্গে বসতে চাই, কথা বলতে চাই। আমি সৌহার্দ্যের সম্পর্ক চাই। দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে সব দলের মধ্যে ন্যূনতম সমঝোতা ও সৌহার্দ্য থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

*নয়া দিগন্ত*: সরকার বা অন্য কারও কাছ থেকে এ ধরনের প্রস্তাব কি এসেছে?

খালেদা জিয়া : আমাদের অভিন্ন আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক সাহেব এ রকম একটা বৈঠকের ব্যাপারে আমার মতামত চেয়েছেন। আমি তাতে সম্মতি দিয়েছি।

*নয়া দিগন্ত*: দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে জাতীয় বিষয়ে সমঝোতা বা ঐকমত্য হওয়া প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন। আপনার পক্ষ থেকে কি এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে?

খালেদা জিয়া : আমি বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে আহ্বান জানিয়েছি, উদ্যোগ নিয়েছি। আগামীতেও তা বহাল থাকবে।[২]

দৈনিক *আমার দেশ*-এর সাংবাদিক জাহেদ চৌধুরীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আগের দিন খালেদা জিয়া বলেছিলেন, এ ধরনের একটি শীর্ষ বৈঠক খুবই ফলপ্রসূ হবে। স্থায়ী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুই নেত্রীর এক টেবিলে বসে আলোচনার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন :

আমি তো সব সময়ই এ ব্যাপারে সম্মত। এবারেও আমার কাছে প্রস্তাব আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি সানন্দে রাজি হয়েছি। আমি মনে করি, গণতন্ত্র, সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, স্থিতিশীলতা, সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থেই দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ বা মতবিনিময়ের সুযোগ থাকা দরকার।

এ বিশ্বাস থেকে একটি সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্যোগ আমি অতীতেও বিভিন্ন সময়ে নিয়েছি, ভবিষ্যতেও নেব। আমাদের মধ্যে আদর্শ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা তো নেই, থাকা উচিতও নয়। সে জন্য আমি শেখ হাসিনার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেছি, তাঁর মুক্তি চেয়েছি এবং তিনি বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছি। আদালতের নির্দেশে আমি জামিনে মুক্ত হওয়ায় আমার ধারণা, তিনিও নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। আমাদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য যদি থাকে এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু জাতীয় ইস্যুতে আমরা দুজন যদি একমত হতে পারি, তাহলে দেশের অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের পথ সহজ হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।[৩]

দুই নেত্রীর মধ্যে সংলাপের ব্যাপারে একসময় ঘোরবিরোধী ছিলেন খালেদা জিয়া। এক-এগারোর পরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল। খালেদা জিয়া সরাসরি ওই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মইনুল হোসেন এ প্রসঙ্গে যা বলেন, তা এখানে তুলে ধরা হলো :

মইনুল হোসেন : প্রধান উপদেষ্টাকে বললাম, দেখেন, পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে তো আমাদের শত্রুতা নাই। মিলে-ঝুলে আলোচনা করেন। তাঁদের বলেন, একসঙ্গে চা খাই, আলোচনা করি। কিন্তু খালেদা জিয়ার কাছে এই মেসেজটা যখন পাঠাইলাম, নিজে কথা বলি নাই অবশ্য, যার মাধ্যমে পাঠাইলাম, সে ডিপেন্ডেবল বলে মনে করি। সে বলল যে সে রাজি না।

মহিউদ্দিন আহমদ : মানে বেগম জিয়া রাজি না।

মইনুল : রাজি না।

মহিউদ্দিন : একসাথে বসতে।

মইনুল : মানে, আমাদের সাথে একসঙ্গে বইসা চা খাবে। দুই নেত্রী বসবে, সেপারেটলি না একসঙ্গে, সেটা ভিন্ন কথা। খালেদা যদি বলত যে না, আমি সেপারেটলি বসব, তা-ই হইত। খালেদা জিয়া যখন রাজি হইল না, তখন শেখ হাসিনাকে আর অ্যাপ্রোচ করি নাই।

মহিউদ্দিন : প্রথম অ্যাপ্রোচটা বেগম জিয়াকে করেছেন?

মইনুল : হ্যাঁ। হাসিনা তো আসবে, আমরা জানি। সে তো বঙ্গভবনে গেছে। অতএব উনি তো আসবেনই। আমাদের প্রতি তাঁর তো ব্লেসিং আছেই। বেগম খালেদা জিয়ার সমস্যা। রাজি হইল না।

মহিউদ্দিন : এটা কি ওনার কাস্টডিতে থাকার সময়?

মইনুল : না, শুরুর দিকে। আমি টেকওভার করার দুই-চার দিনের মধ্যেই। আমার প্ল্যান ছিল, আমরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই সরকার চালাব। বাট নট অন দেয়ার অ্যাডভাইস। তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হলে তাঁরা তো না করতে পারত না। দুর্নীতি দমন কমিশন তো স্বাধীন। তাঁদের বিরুদ্ধে কেস আছে। দেখতাম কী বলে।[৪]

দুই নেত্রীর মধ্যে সম্ভাব্য সংলাপ নিয়ে জনমনে কৌতূহল ও আগ্রহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত এটি হয়নি। সরকারের উপদেষ্টারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'সম্মানজনক প্রস্থানের' পথ বের করার জন্য আলাদাভাবে দুই

দলের দুই নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ রাত আটটায় জাতির উদ্দেশে ১৫ মিনিটের এক ভাষণে সংসদ নির্বাচন ১৮ ডিসেম্বর এবং উপজেলা নির্বাচন ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, 'সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো বৈরী সম্পর্ক নেই, নেই কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থের সংঘাত। রাজনৈতিক দলসহ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমন একটি দুর্নীতিবর্জিত পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে নির্বাচনে কালোটাকা, পেশিশক্তি ও অনাচারের প্রাধান্য থাকবে না। সদিচ্ছা ও আদর্শের কাছে স্বার্থান্ধতা ও নীতিহীনতাকে হতে হবে পরাভূত।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব কাজ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়—এ কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দুর্নীতি দমনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কিছু প্রতিক্রিয়া শোনা গেছে, তবে সব চেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটি গ্রহণযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বপ্ন। আর সে লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা গড়ে তোলা দরকার। তিনি বলেন, 'জাতীয় রাজনীতি আজ একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমঝোতার দ্বারপ্রান্তে।'[৫]

বিবদমান দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে দৃশ্যত কোনো সমঝোতা হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে একটি চিন্তা ছিল, কীভাবে দৃশ্যপট থেকে সরে যাওয়া যাবে। এই 'প্রস্থান পরিকল্পনা' (এক্সিট প্ল্যান) অনুযায়ী বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ ও বৈঠক হয়। ২০ সেপ্টেম্বর ভাষণ দেওয়ার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান উপদেষ্টা নিউইয়র্কের পথে ঢাকা ছাড়েন।

শেখ হাসিনা প্যারোলে ছাড়া পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিনিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় সেপ্টেম্বরের (২০০৮) শেষ দিকে। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. গওহর রিজভী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যোগাযোগ উপদেষ্টা মে. জে. (অব.) গোলাম কাদের প্রমুখ।

প্রথমে ব্রিগেডিয়ার আমিনের দেওয়া আলোচ্যসূচি ধরে বৈঠক শুরু হলেও পরে এর বাইরেও অনেক কথাবার্তা হয়।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশে অনেক কিছু দ্রুত ঘটছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসিনার দেশে ফিরে আসা উচিত বলে আলোচনা হয়। এটা পরিষ্কার যে তাঁর শরীর ভালো না। তাঁর ওপর বোমা

হামলার পর তাঁর একটি চোখ ও একটি কান ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে তাঁর অন্য চোখটির অবস্থাও দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। সমস্যাটি খুবই জটিল এবং চিকিৎসা চলাকালীন চোখের দৃষ্টি বাড়ানোর ব্যাপারে ডাক্তাররা রাজি হয়েছেন। কিন্তু ১৭ অক্টোবরের আগে তাঁর পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব না।

আলোচনাকালে সংসদ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা এবং সাধারণ নির্বাচনের পর স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে জানানো হয়, আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ব্যাপারে পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ। নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া এবং নির্বাচনবিরোধীরা যাতে কোনো অজুহাত তৈরি করতে না পারে, সে ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য দলের কর্মীদের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুটি বিষয়ে উদ্বেগ আছে। প্রথমত, জনরায়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে নির্বাচন স্থগিত করার জন্য কিছু গোষ্ঠী হইচই করছে। দ্বিতীয়ত, অবাধ, সুষ্ঠু এবং জনমতের সত্যিকার প্রতিফলন হবে, এমন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। সরকারের প্রতিনিধি জোর দিয়ে বলেছেন, প্রশাসন কেবল নির্দলীয়ই নয়, কারও পক্ষ নিয়ে তাঁদের কোনো লাভ নেই।

বাংলাদেশের সংবিধান লেখার পর গত সাড়ে তিন দশকে প্রায়ই কোনো অবৈধ কর্তৃপক্ষ দ্বারা এর সংশোধন, বিকৃতি এবং অঙ্গহানি হয়েছে এবং গত ৩৮ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা পর্যালোচনা করা দরকার বলে সবাই একমত হন। তবে এটি করতে হবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে।

এটা ঠিক হয় যে উভয় নেত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন এবং নিজ নিজ দলে (এবং সরকারে, যদি দল নির্বাচিত হয়) তাঁদের ভূমিকা ঠিক করে নেবেন। এটাকে একটি মীমাংসিত বিষয় হিসেবে ধরা হবে এবং এ নিয়ে আর কোনো আলোচনার দরকার নেই।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগে সংস্কারের যে কাজগুলো শুরু হয়েছিল, কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে গেছে, সেগুলো চলমান রাখা হবে বলে জোরালো মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। সরকারের অনেকগুলো সংস্কার প্রস্তাব আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে আছে এবং তাঁরা ভোটে জিতে ক্ষমতায় গেলে এগুলো চলমান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসিসি (অ্যান্টি-করাপশন কমিশন) ভালো কাজ করার ক্ষমতা রাখে এবং তা চালু রাখতে হবে। অনেক দুর্নীতিবাজ ও অপরাধী জাতীয় রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে বলে জনমনে ব্যাপক ধারণা। আওয়ামী লীগ নেত্রী দুর্নীতিবাজদের হটাতে

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; তবে রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম এবং তারা চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তৈরি করা সংসদে প্রার্থীদের 'নেতিবাচক তালিকা'টি ভালো উদ্দেশ্যে করা হলেও এটা একপেশে; আরও যাচাই-বাছাই এবং অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ ছাড়া এটা গ্রহণ করা যায় না বলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মত প্রকাশ করে। তাঁরা খোলামনে সাক্ষ্যপ্রমাণ মেনে নেবেন এবং যথাসম্ভব ব্যবস্থা নেবেন। শুধু একটি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ সাফ করা সম্ভব হবে না বলে তাঁরা মনে করেন। এ কাজ সমাধা করতে হলে অনেকগুলো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মনে করে, তাদের ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে—কিছু দুর্নীতিবাজকে সরাতে হবে এবং একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে তাঁদের জয়ের সম্ভাবনা যেন পুরোটাই ঝুঁকিতে না পড়ে।

সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই বার্জ-মাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র, মিগ বিমান কেনাসহ অনেকগুলো মামলা এখনো চালু রাখায় উদ্বেগ রয়েছে বলে আলোচনায় উঠে আসে। রাজনৈতিক পরিবেশ ভালো করতে হলে সরকারের উচিত এই মামলাগুলো বাতিল করার বিষয়টি বিবেচনা করা। দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা কিংবা গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কেননা এর ফলে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে এবং এ জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলে আলোচনা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় মডেলের ভিত্তিতে তিনজন চিফ অব স্টাফ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করার বিষয়টি বৈঠকে আলোচিত হয়। সকল নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করার জন্য একজন সার্বক্ষণিক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। এনএসএ-এর কাজ হলো সমন্বয় করা, যেমনটি হয়ে থাকে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে।

সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে বৈঠকের আলোচনায় উঠে আসে যে, শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে উৎকণ্ঠা আছে। এটাও জানা কথা যে এই প্রক্রিয়া কোনো সহিংসতা ও গোলমাল ছাড়া সমাধা করার ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা ও সদিচ্ছা থাকতে হবে।

ওই আলোচনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের বিবেচনার জন্য আরও দুটি

বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং আওয়ামী লীগের কাছে প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয় বলে জানা যায়।

১. গণপরিষদ দ্বারা ১৯৭২ সালে লেখা সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছিল। পরে নানা সময়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে, কখনো কখনো অবৈধ প্রক্রিয়ায় বাজেভাবে সংবিধানের অঙ্গহানি ঘটেছে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে সংবিধান কার্যকর হচ্ছে না। স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পর সংবিধান পরিমার্জনের এটাই সময়।

সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে এবং সরকার ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য পুনরুদ্ধার, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ ও অপসারণের বিধান তৈরি—বিষয়েও কথাবার্তা হয় বলে জানা যায়।

২. বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো সরকারের দুর্নীতি। এটা কলঙ্ক যে দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বৈঠকে আলোচনা হয় যে, ভবিষ্যতে সরকারে এসে আরও জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে দুর্নীতির মূল উপড়ে ফেলতে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক সাবেক উপদেষ্টার সূত্রে এসব কিছু জানা যায়।

খালেদা জিয়া নানা বিষয়ে শক্ত অবস্থান নেওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সন্দেহের দোলাচলে ছিল। বিএনপি চেয়েছিল দর-কষাকষির মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব সুবিধা আদায় করে নেওয়া। তারেক রহমানের নিরাপদে বিদেশে যেতে পারা ছিল তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক। বিএনপিকে নির্বাচনে আনার জন্য নির্বাচন কমিশন দল নিবন্ধনের শেষ তারিখ এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছিল। বিএনপি এবং এর প্রধান সহযোগী জামায়াতে ইসলামী শেষ দিন অর্থাৎ ২০ অক্টোবর নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেন, নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেও পরে তারা প্রয়োজনে নির্বাচন বর্জনের বিষয়টি মাথায় রাখবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান দুবার খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন। ২৩ অক্টোবর বিএনপির একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে হোসেন জিল্লুরের নেতৃত্বে সরকারের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়। এসব কারণে মনে হচ্ছিল, বিএনপি আগের চেয়ে নমনীয় হচ্ছে।[৬]

খালেদা জিয়া দলের মধ্যে সংস্কারপন্থীদের কতটুকু জায়গা দেবেন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সাইফুর রহমান ও মাহবুবুর রহমান অংশ

নিলেও সরকারের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনায় তাঁদের রাখা হয়নি। এ আলোচনায় অংশ নেন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার, দপ্তর সম্পাদক রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব নজরুল ইসলাম খানসহ খালেদার অনুগত আরও কয়েকজন নেতা। সংস্কারপন্থীদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী ওসমান ফারুক ও কামাল ইবনে ইউসুফ দলের মধ্যে বেশ কোণঠাসা অবস্থায় আছেন। হাফিজউদ্দিন আহমদ তো বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখাও করতে পারেননি।[৭]

দুর্নীতিবাজ লোকেরা যাতে নির্বাচনে মনোনয়ন না পান, তাঁদের তালিকা আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে দেওয়া হয়েছে। একদিকে সংস্কারবাদীদের তৎপরতা, অন্যদিকে ডিজিএফআইয়ের এই তালিকা, এর ফলে বিএনপি দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়—আসলেই সব আসনে তারা শক্তিশালী প্রার্থী দিতে পারবে কি না। সংস্কারবাদীদের উত্থানের কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ কয়েকটি জায়গায় বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছিল। বিএনপির অনেক সমর্থক ভাবতে শুরু করেন যে নির্বাচনে তাঁদের দলের জেতার কোনোই সম্ভাবনা নেই। কেউ কেউ চাইছিলেন, নির্বাচন পেছানো কিংবা বাতিল হোক।[৮]

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তারেক রহমান দলের মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠদের নিয়ে হাওয়া ভবনে একটি সমান্তরাল শক্তিকেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে খালেদা জিয়াকে পরামর্শ দিতেন। তারেক বিদেশে চলে যাওয়ার পর হাওয়া ভবনের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু খালেদা জিয়া তাঁর নিজস্ব বলয়ের পরামর্শকদের ওপর নির্ভর করতে থাকেন। এরাই হলেন তাঁর 'থিংক ট্যাংক'। তাঁরা বারিধারার একটি বাসায় অফিস খুলে বসেন এবং এটাই খালেদার ব্যক্তিগত অফিস হয়ে দাঁড়ায়। বিএনপির এই থিংক ট্যাংকের নেতা হলেন সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান। এঁদের মধ্যে আছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত সমশের মুবিন চৌধুরীসহ খালেদার অনুগত আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠজন। দলের নির্বাচনী ইশতেহার লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁদের।[৯]

বিএনপির এই দুঃসময়ে জামায়াতে ইসলামী বেগম জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য বজায় রেখেছিল। এখন তারা আনুগত্যের পুরস্কার চাইছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে তাদের জন্য বিএনপি ৩০টি সংসদীয় আসন ছেড়ে দিয়েছিল। এখন দলটি চাইছে ৮০টি আসন। বিএনপি তাদের এতগুলো আসন হয়তো দেবে না। কিন্তু বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটে জামায়াতের ভূমিকা আরও বেশি হবে বলে মনে হচ্ছে। এটা নিয়ে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস বেশ চিন্তিত ও শঙ্কিত বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা থেকে পাঠানো এক বার্তায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন, 'নির্বাচনে যারাই জিতুক না কেন, বাংলাদেশের

রাজনীতিতে বিএনপি একটি বড় শক্তি হিসেবে থেকে যাবে। মধ্য মেয়াদে খালেদা জিয়ার কৌশল হবে দলকে এক রাখা এবং তারেকের ক্ষমতায় ফিরে আসার পথ খোলা রাখা। শেষের উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়ন না হলেই আমাদের স্বার্থ রক্ষা পাবে। তারেকের পুনরুত্থান ঠেকাতে হলে বিএনপির মধ্যে বিকল্প খুঁজতে হবে এবং দেখতে হবে যেন দলের মধ্যে সংস্কারপ্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশটি নিয়ে বেশি দরের বাজি ধরতেই হচ্ছে।'[১০]

বাংলাদেশে দুর্নীতির চালচিত্র সম্পর্কে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে ৩ নভেম্বর ২০০৮ ঢাকা থেকে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির পাঠানো তারবার্তায়। বিএনপি, বিশেষ করে এর দ্বিতীয় প্রধান নেতা তারেক রহমানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র যে চরমভাবে হতাশ, রাষ্ট্রদূতের বার্তায় সেটি স্পষ্ট। তারবার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে দুর্নীতি জনজীবনে ক্রমাগত ঢুকে পড়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তালিকা অনুযায়ী ২০০৬ সালে একটানা চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশ দুর্নীতিতে দুনিয়ার সব দেশের তালিকার এক নম্বরে রয়েছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা নিয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দারিদ্র্যপীড়িত এই দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করার ওয়াদা করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার শতকরা ২ ভাগ কমে গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজে কিছু সফলতা এলেও জনপ্রশাসনের রাজনৈতিকীকরণ হয়ে যাওয়া একটা বড় সমস্যা। দুর্নীতিবাজ নেতাদের জবাবদিহির আওতায় আনার ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে হতাশা দেখা দিচ্ছে। দুর্নীতি নিয়ে জনমনে উদ্বেগের কারণে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যতে গণতন্ত্রায়ণের ব্যাপারে মানুষের আস্থা কমছে।[১১]

বার্তায় তারেক রহমানের দুর্নীতির ফিরিস্তি দিয়ে একটি ভয়াবহ ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়:

> সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে কুখ্যাত এবং ভয়ংকর তারেক রহমান ৩ সেপ্টেম্বর জামিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তিনি ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্য রওনা হন। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের রাজনীতিবিদ। তিনি বাংলাদেশে চুরিচামারি ও সহিংস রাজনীতির প্রতিভূ এবং সরকারি কেনাকাটা ও রাজনৈতিক নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে সব সময় ঘুষ নেন বলে তাঁর অনেক দুর্নাম। দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, ঘুষ, অর্থ আত্মসাৎ এবং কর ফাঁকি দেওয়া—এসব ব্যাপারে অনেক মামলা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ছাড়া পাওয়ায়

বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আদালত হাতের মুঠোয় চলে আসায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জামিন না দেওয়ার সব আইনি চেষ্টা তারেক ভন্ডুল করে দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, তারেকের কয়েকটি পাসপোর্ট আছে নতুন একটি পাসপোর্টে তাঁকে যুক্তরাজ্যের ভিসা দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি পাসপোর্টে ২০০৫ সালের ১১ মে তাঁকে পাঁচ বছর মেয়াদি বি১/বি২ ভিসা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের সন্দেহ, ওই পাসপোর্টটি এখন সরকারের কাছে আছে।...

তারেকের প্রকাশ্যে দুর্নীতি মার্কিন দূতাবাসের লক্ষ্যগুলোকে মারাত্মকভাবে ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের তিনটি প্রধান অগ্রাধিকার হলো গণতন্ত্রায়ণ, উন্নয়ন ও সন্ত্রাসীদের কোনো রকম জায়গা না দেওয়া। অর্থ আত্মসাৎ, চাঁদাবাজি ও বিচারব্যবস্থায় নাক গলানোর মধ্য দিয়ে আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখানো—এসবের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই গণতন্ত্রে পৌঁছানোর মার্কিন উদ্দেশ্য তিনি নসাৎ করে দিয়েছেন। দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে ব্যবসা বাগানোর মধ্য দিয়ে তারেক যে পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, তা বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মার্কিন প্রয়াস নিরুৎসাহিত করছে এবং মার্কিন কোম্পানিগুলোর আন্তর্জাতিক কার্যক্রমকে কঠিন করে তুলেছে। তদুপরি আইনের শাসনকে তোয়াক্কা না করার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে সম্ভাব্য সন্ত্রাসীদের জন্য অনুকূল জমি তৈরি করে দিয়েছেন। ফলে দারিদ্র্য বাড়ছে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হচ্ছে। সব কথার সারকথা হলো বাংলাদেশে যত অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে, তার বেশির ভাগের দায় তারেক ও তাঁর অনুগতদের কাঁধে বর্তায়।[১২]

রাষ্ট্রদূতের এই বার্তায় বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র তারেককে বিপজ্জনক মনে করে এবং ভবিষ্যতে রাজনীতির পালাবদলের প্রশ্নে বিএনপির প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোনো রকম সহানুভূতি থাকবে না।

৬ নভেম্বর ২০০৮ শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। ৭ নভেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত একজন কাউন্সেলরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাসায় দেখা করেন। তাঁদের মধ্যকার আলোচনায় শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ, ব্যক্তিগত সচিব হাছান মাহমুদ, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক দীপু মনি, সাবেক সংসদ সদস্য সোহেল তাজ এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা মে. জে. (অব.) তারিক আহমদ সিদ্দিক। দুই পক্ষের আলোচনা চলে আধা ঘণ্টা। এরপর



যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি শেখ হাসিনা, ৬ নভেম্বর ২০০৮

শেখ হাসিনা ও রাষ্ট্রদূত ৪৫ মিনিট একান্তে কথা বলেন।[১৩]

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রদূতকে বলেন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ওই দিনই সভা করে আসন্ন নির্বাচনের জন্য দলের প্রার্থী ঠিক করবে। রাষ্ট্রদূত এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যে উল্লেখ করেন যে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে যাঁরা তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখাননি, তাঁদের তিনি ক্ষমা করে দেবেন, তবে এসব ভুলে যাবেন না। শেখ হাসিনা ২০০১ সালের নির্বাচনে ভরাডুবির দায় স্বীকার করে বলেন, প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীদের সম্পর্কে তিনি তথ্য সংগ্রহ করিয়েছেন এবং জনসমর্থন আছে এমন প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে স্থানীয় কমিটিগুলোকে বলবেন। তিনি দেশের সব ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠীর লোকদের প্রতিনিধিদের মনোনয়ন দিতে চান। উদাহরণস্বরূপ, ময়মনসিংহের একটি এলাকায় গারো সম্প্রদায়ের একজন খ্রিষ্টানকে এবার মনোনয়ন দেওয়া হবে। তিনি ৩০০ আসনেই মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন। পরে জোটের শরিকদের জন্য ৬০-৭০টি আসন ছেড়ে দেওয়া হবে। তাঁর ধারণা, সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের জাতীয় পার্টি ১৪টির বেশি আসনে জিততে পারবে না।[১৪]

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রদূতের কাছে জানতে চান, বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে

কি না। রাষ্ট্রদূত বলেন, বিএনপি শেষমেশ অংশ নেবে। তবে তাদের নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা কম এবং তারা সরকার থেকে যত দূর সম্ভব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে। শেখ হাসিনা মনে করেন, বিএনপি যদি নির্বাচন বর্জন করে, তাহলে তাদের সহযোগী জামায়াতে ইসলামী জোট থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাচন করবে। বিএনপি জোটের অন্য শরিকেরাও তাই করবে এবং খালেদা জিয়া একা হয়ে পড়বেন। এমনকি খালেদা তাঁর দলকে হারানোর ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। রাষ্ট্রদূত শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন বিএনপিকে নির্বাচনে আনার ব্যাপারে ভূমিকা রাখেন। শেখ হাসিনা বলেন, তিনি বিএনপিকে বোঝাবেন যে ভবিষ্যতে তারা বিরোধী দলে থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।[১৫]

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রদূতকে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারি করা ৮৭টি অধ্যাদেশ মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে পার্লামেন্টে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হবে। তিনি অধ্যাদেশগুলো কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করে পর্যালোচনার জন্য কয়েকটি কমিটির হাতে ছেড়ে দেবেন। তিনি কোনো অধ্যাদেশ সম্পর্কে গুরুতর আপত্তি তোলেননি।[১৬]

মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি রিচার্ড বাউচারের সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাতের প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, এ টি এম আমিনের ভূমিকা নিয়ে তাঁর শঙ্কা আছে। হাসিনা তাঁকে সনাতন উদারনৈতিক বাঙালি সংস্কৃতির বিপরীতে একজন ধর্মান্ধ মুসলমান (ইসলামিক ফ্যানাটিক) বলে মনে করেন। তাঁর চিন্তাভাবনা ও কথাবার্তা থেকে শেখ হাসিনার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে তিনি একজন গোঁড়া ইসলামপন্থী। হাসিনা তাঁকে খুবই বিপজ্জনক মনে করেন, বিশেষ করে তিনি ভবিষ্যতে ডিজিএফআইয়ের প্রধান হতে চান।[১৭]

শেখ হাসিনা ও রাষ্ট্রদূতের কথোপকথন থেকে এটা মোটামুটি পরিষ্কার যে উভয়েই মনে করেন পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতবে, বিএনপি বিরোধী দলে থাকবে এবং নির্বাচন-পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে শেখ হাসিনা এখন থেকেই ভাবছেন।

পরিস্থিতি ক্রমেই বিএনপির বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছিল এবং আওয়ামী লীগের অনুকূলে জমি তৈরি হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল যে বিএনপি ঘর গুছিয়ে উঠতে পারেনি এবং ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য দলটি প্রস্তুত নয়। বিএনপি চাচ্ছে নির্বাচন পিছিয়ে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে যাওয়া হোক। ১০ নভেম্বর দলের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া বলেন, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ নির্বাচন হলে চারদলীয় জোট তাতে অংশ নেবে। একটা সাজানো নির্বাচনের আয়োজন চলছে—এ রকম ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন :

আমাদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। চক্রান্ত করে আমাদের দল ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর নির্বাচন থেকে বাইরে রাখার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। একটি সাজানো-পাতানো নীলনকশার নির্বাচন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্বাচন কমিশন কী ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ করে চলেছে, সেটা আপনারা নিজেরাও জানেন।... আমরা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে সাত দফা তুলে ধরি। আপনারা দেখেছেন, তা দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখে কীভাবে সময় নষ্ট করা হয়েছে। এক মাস আগে সরকার সাত দফা প্রস্তাবের ছয়টি মেনে নেওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েও এর বাস্তবায়ন করেনি। এ অবস্থায় নির্বাচন কমিশন আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে এবং আমাদের সব কটি প্রস্তাব ঝুলিয়ে রেখেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল-জোট তফসিলকে স্বাগত জানিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলেও আমরা তা করতে পারিনি। আমরা সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে বলেছিলাম দ্রুত নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে।[১৮]

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে গোলাম কাদের মুখ্য ভূমিকা রাখছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি সরকারের নিজস্ব জরিপের বরাত দিয়ে বলেন যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ১৮০টি আসন পাবে, বিএনপি পাবে ৮০টি এবং অন্য দলগুলো পাবে বাকি আসনগুলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১০ জানুয়ারি নাগাদ হাসিনা সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। তারিখটি শেখ হাসিনাই ঠিক করেছেন। কারণ, এটা হলো ১৯৭২ সালে তাঁর বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। কিন্তু যদি বিএনপি নির্বাচনে জেতে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। কাদের আশা করেন, আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা নেবে এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা হবে তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল মইন সেনাবাহিনীকে নির্বাচনে নিরপেক্ষ রাখছেন। তবে তিনি তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়াতে চান না। কাদের বলেন, অবসরে যাওয়ার পর মইনকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব দিলে আওয়ামী লীগের জন্য ভালো হবে।[১৯]

অবশেষে নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হলো ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে সারা দেশে ২ হাজার ৪৬০ জন



ভোটকেন্দ্রে ভোটারের অধীর অপেক্ষা

মনোনয়নপত্র জমা দেন। নির্বাচন কমিশন ৫৫৭টি মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেয়। এর মধ্যে ৯৩ জন আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পান। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন ৫০০ জনের বেশি।[২০]

১৩ ডিসেম্বর বিএনপি ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। দলের মূল স্লোগান ছিল—দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও। ১৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'দিনবদলের সনদ' শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে।[২১]

২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো বহুপ্রতীক্ষিত নির্বাচন। নির্বাচনে চারদলীয় জোটের ভরাডুবি হয়। চারদলীয় জোটের প্রার্থীরা ৩০০ আসনের মধ্যে ৩৩টি আসনে জয়ী হন। শতকরা ৩৩ দশমিক ২ ভাগ ভোট পেলেও বিএনপির প্রার্থীরা মাত্র ৩০টি আসনে জয় পান। তাদের জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামী দুটি এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) একটি আসন পায়। অন্য শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের ঝুলি শূন্য পড়ে থাকে।[২২]

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট প্রায় একচেটিয়া জয় পায়। শতকরা ৪৯ ভাগ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩০টি আসনে জয়ী হয়। জাতীয় পার্টির (এরশাদ) প্রার্থীরা পান ২৭টি আসন। ১৯৭৩ সালের পর সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে কোনো নির্বাচনে এত বড় ব্যবধানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়নি।[২৩]

২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না। দলটি নির্বাচনে যাবে কি যাবে না, এ নিয়ে কালক্ষেপণ করেছে। বিএনপির অনেক নেতা নির্বাচনে যেতে চাননি। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দলের ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, 'আমি ম্যাডামকে বলেছিলাম, আমাদের ৩০টি সিট দেওয়া হবে এবং এর মধ্যে আমি থাকব না।'[২৪]

বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল। দৈনিক *মানবজমিন*-এ প্রকাশিত এক সংবাদ বিশ্লেষণে বলা হয়:

> ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ যে কৌশলটি নিয়েছিল, তা থেকে কোনো শিক্ষাই নিতে পারেনি বিএনপি। আবার ২০০৮ সালের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। নির্বাচনের পাঁচ দিন আগে বিএনপির আরেক নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বরাত দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টির এক তারবার্তায় বলা হয়, বিএনপির নেতারা অভিযোগ করছেন, এ নির্বাচনে ভোটে নয়, সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পছন্দের ব্যক্তিদের জয়ী করানো হবে। সে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টির চেয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবস্থায় সাড়া দিয়েছিল।[২৫]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'এক্সিট প্ল্যান' নিয়ে জেনারেল মইনের তেমন দুশ্চিন্তা ছিল না। এটা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে নির্বাচনে কারা জয় পাবে এবং কারা পরবর্তী সরকার গঠন করবে। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন:

> মইন ইউ আহমেদ: যখন সিদ্ধান্ত হলো ইলেকশন হবে, তখন দুটো পার্টির মধ্যেই সমস্যা ছিল। মূল ধারা ছাড়া যে এমন কোনো কাজ হবে না, এটা ক্লিয়ারলি বোঝা গেছে। সো ইউ হ্যাভ টু সি বোথ দ্য পার্টিজ কাম অ্যান্ড কাম ইন আ বেটার ফর্ম। অ্যান্ড টু ডু দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু গিভ লিডারশিপ টু দ্য রাইট পারসনস। বেসিক্যালি ইলেকশনটা যেন প্রপার হয়, সুন্দর হয়, সে জন্য তাদের বেইল দিয়ে রিলিজ করা হলো।
>
> মহিউদ্দিন আহমদ: তাঁরা সবাই জামিনে ছিলেন?
>
> মইন: হ্যাঁ, মামলা বাতিল হয়নি। ম্যাডাম জিয়া এখনো ওই মামলায় আছেন।
>
> মহিউদ্দিন: শেখ হাসিনার মামলাগুলো খারিজ হয়ে গেছে।



রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বুঝে নিলেন শেখ হাসিনা

মইন : এটাই হয়।

মহিউদ্দিন : এই কনটেক্সটে প্রণব মুখার্জির ওই মন্তব্যটা?

মইন : উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইলেকশন কবে? আমি বলেছিলাম ডিসেম্বর ২০০৮। আর দুই নেত্রীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য—আমার স্মরণ নেই এই প্রশ্ন উনি করেছেন কি না আর আমি উত্তর দিয়েছি কি না। এটা সরকারের বিষয়। সিদ্ধান্ত দেওয়ার আমি কে?

মহিউদ্দিন : নির্বাচনের পর কী হতে পারে, এ নিয়ে আপনার মনে কোনো আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল কি না, কোনো ঝুঁকি অনুভব করেছিলেন কি না। রাজনীতিবিদেরা অনেকেই তো ক্ষুব্ধ ছিলেন। এটা নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা করেছিলেন কি না।

মইন : আমাকে অনেকেই বলেছে, এমনকি দেশের বাইরে থেকেও, ইলেকশনের চার-পাঁচ মাস আগে—হ্যাভ ইউ প্ল্যানড ইয়োর এক্সিট? হোয়াট ইজ ইয়োর এক্সিট প্ল্যান? আই সেইড, আই হ্যাভ নট থট অ্যাবাউট ইট। অনেকেই ইনসিস্ট করছিল যে আমার একটা প্ল্যান থাকা দরকার। বলেছি, দেখা যাক। আমি জানতাম, যদি বিএনপি গভমেন্টে আসে, ডেফিনিটলি থিংস উইল বি ডিফারেন্ট। আওয়ামী লীগ এলে

ডিফারেন্ট। বিএনপি হ্যাজ অল দ্য রিজনস টু বি এগ্রিভড অন মি। আমার ওপর তাদের রাগ, ক্ষোভ সবই আছে। এটাই স্বাভাবিক। এটা অ্যাবনরমাল কিছু না। তারা আমাকে চিফ বানিয়েছে, আমার মাধ্যমেই সব হয়েছে। দে আর অল এগ্রিভড, এবং তারা হয়তো কিছু করবে। আমি এমন কোনো প্ল্যান করিনি যে ইলেকশনের পর আমি ভেগে যাব। কারণ, এটা হবে কাপুরুষতা। আওয়ামী লীগ এলে একটা সিনারিও হতো, বিএনপি এলে আরেকটা। আমি এটা নিয়ে ভেবেছি এবং এ জন্য তৈরি ছিলাম।

আওয়ামী লীগ তো জিতল। আগে থেকেই ইন্ডিকেশনস ছিল যে তারা জিতবে। এটা না যে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো কোনো অ্যাসেসমেন্ট করেছে। ডিপ্লোম্যাটরা এটা করেছে। ইলেকশনের তিন দিন আগে, আমি নাম বলব না, একটা অ্যাম্বাসি থেকে বলা হয়েছে, টু-থার্ড মেজরিটি নিয়ে আওয়ামী লীগ আসবে। ক্লিয়ারলি বলেছে। এক্সাক্টলি দ্যাট হ্যাপেনড।[২৬]

৬ জানুয়ারি ২০০৯ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। সাঙ্গ হয় এক-এগারোর সরকারের দুই বছর।

# পোস্টমর্টেম

কেমন ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২৪ মাসের ওই সময়টি? সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সংসদ সদস্যরাও নিজেদের সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারেননি। ফলে রাজনীতি হয়ে পড়ে একটি লাভজনক ব্যবসা। এবং জাতীয় সংসদ পরিণত হয় দুর্নীতিবাজ, কালোটাকা ও পেশিশক্তির মালিক তথা দুর্বৃত্তদের অভয়ারণ্যে।' তুলনামূলকভাবে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্জনগুলো ইতিবাচকভাবে দেখেছেন। তাঁর কিছু পর্যবেক্ষণ ছিল এ রকম :

> ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সালের পর বর্তমান সরকার নানা প্রশংসনীয় কাজ করেছে—সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, ভূমিদস্যুদের হাত থেকে বহু খাসজমি উদ্ধার, প্রথম ছয় মাসে সাবেক এমপিদের কাছ থেকে আড়াই কোটি টাকার ফোন বিল আদায়, অবৈধ ভিওআইপির ব্যবসার জন্য শীর্ষস্থানীয় টেলিফোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কয়েক শ কোটি টাকা জরিমানা আদায়, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র রাখার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার একটা বড় পদক্ষেপ নিয়েছে।
>
> নভেম্বর ২০০৭ থেকে এই পৃথক্করণ চালু হয়েছে। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় তা পরে দেখা যাবে। বর্তমান সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক উন্নয়ন এবং বন্যা মোকাবিলায় ও দুর্নীতিবিরোধী তৎপরতায় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেও সাধারণ জনগণ দ্রুত উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির মোকাবিলা করতে গিয়ে।...
>
> কর্মফল বা কপালের ফেরে দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ শতাধিক রাজনীতিবিদ কারাগারে এবার ঈদ পালন করেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী

বেগম খালেদা জিয়ার মা বেগম তৈয়বা মজুমদার বড় ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, 'রাজনীতি করলে জেলজুলুম তো হয়ই। মহাত্মা গান্ধী, শেখ সাহেবের মতো নেতারাও জেল খেটেছেন। তবে মা হিসাবে কষ্ট হচ্ছে।' ৩ সেপ্টেম্বর তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন, 'সরকার যা করছে তা মঙ্গলের জন্যই। তবে আমি চাই আইন নিজের গতিতেই চলুক।'[১]

প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬২তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যান। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে তিনি 'গণতন্ত্রকে' একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর সরকার 'সংকট রোধে বেসামরিক-সামরিক সহযোগিতার একটি কার্যকর মডেল এবং সংকট ব্যবস্থাপনায় দেশের অভিজ্ঞতা অনেক সংকটপূর্ণ নতুন গণতান্ত্রিক দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'গত দুই দশকে বাংলাদেশে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে নির্মমভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার অভাব দুর্নীতিকে আরও লাগামহীন করে তোলে। এতে "বিজয়ী পুরোটা পেল" এমন এক নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচন বিজয়ের নষ্ট-ফল দাঁড়ায় এত বিরাট এবং বিজয়ের ঝুঁকি হয় এত উঁচু যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হতাশাজনকভাবে মেরুকরণে পর্যবসিত হয়ে সাধারণ শাসন-কার্যক্রম স্থবির করে তোলে।'[২]

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ নিয়ে *ইত্তেফাক* ৪ অক্টোবর ২০০৭ একটি সম্পাদকীয় ছাপে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় :

> ...সরকারের কাজের ধারা লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশে সুশাসন এবং গণতন্ত্রের মজবুত ভিত রচনা করাই সরকারের উদ্দেশ্য। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যেই লক্ষ্য তাহার সহিত এই উদ্দেশ্যটি খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।...
>
> পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে সুশাসন এবং গণতন্ত্রের মজবুত ভিত রচনা করা না গেলে, সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন নিশ্চিত করা না হইলে বর্তমানের সাধু প্রচেষ্টাসমূহ নিরর্থক হইয়া যাইবে। তবে, সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিতে যেইসব উদ্যোগ নিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে নিয়মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকিবার মত একটা শক্তিশালী অবস্থা ইতিমধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসিয়াছে। তাহারা নিজেরাই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, এত দিন পর্যন্ত যে কপট রাজনীতির চর্চা তাহারা করিয়াছেন, তাহা সুশাসন ও গণতন্ত্রের অনুকূল নয়। দেশের জনগণও

এখন সচেতন হইয়া গিয়াছেন। তাহারা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের পুনরাবৃত্তি আর দেখিতে চাহেন না। এমতাবস্থায় এই আশাবাদ যথার্থ যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংস্কার হইয়াছে এবং যে সংস্কারের ধারা অব্যাহত রহিয়াছে, তাহার শুভফল হইবে সুগভীর এবং সুদূরপ্রসারী।[৩]

এক-এগারোর পালাবদল এবং পরবর্তীকালে সরকারের নেওয়া সংস্কার কার্যক্রমকে নাগরিক সমাজের অনেকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন, পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। লেখক-সাংবাদিক আবুল মোমেন এ নিয়ে তাঁর একটি কলামে লেখেন :

> সবারই মনে হচ্ছিল এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। এর একটা পরিবর্তন দরকার। তাই চলতি বছরের ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তনকে সাধারণভাবে মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুটি বড় কাজে হাত দিল—দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতিবাজদের শাস্তি প্রদান এবং রাজনৈতিক সংস্কার ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। কাজ দুটি অত্যন্ত বড়, জটিল, চলমান এবং দুটির প্রকৃতিতে পার্থক্যও আছে। দুর্নীতি দমনের বিষয়টি মূলত আইনি লড়াইয়ের বিষয় এবং তা হবে একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলে বর্তমান সরকারকে তার সীমাবদ্ধতা মেনে এ কাজটার সূচনাকারীর ভূমিকাতেই থাকতে হবে, সমাধান বা সম্পন্নকারী হিসেবে নয়। তবে রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে একটা পর্যায়ের সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে। নির্বাচনকেন্দ্রিক যে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয় তা বন্ধের ব্যবস্থা করা হবে মুখ্য কাজ। এটি এই সরকারের একটি প্রধান পরীক্ষার জায়গা। মানুষ দেখতে চাইবে নির্বাচনের পর দেশ সুষ্ঠুভাবে চলছে কি না।[৪]

চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক বশীর আল-হেলাল একটি কলামে লেখেন, 'বাংলাদেশের গণতন্ত্র একটা গণতান্ত্রিক সংবিধানের অধীনে শাসিত হয়েও যে গণতান্ত্রিক কদাচার করেছে তার তুলনা নেই। এনারা শুধু ভোটকে মনে করেন গণতন্ত্র। আমাদের দেশে ভোটকে নিয়ে যে কদাচার হয় তার তুলনা হয় না। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে এখন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চলছে বিশেষ আইনের বলে, যদি ধরে নিই এটা একটা নিরীক্ষা, এক্সপেরিমেন্টও হয়, শেষ পর্যন্ত এটাকে চালাতে দিতে হবে। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রনৈতিক পণ্ডিতদের যে অধৈর্য দেখা যাচ্ছে, সেটাকে আমল দেওয়া যাবে না।' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আস্থা ও আশাবাদ জানিয়ে তিনি

বলেন, 'যে অসাধারণ দায়িত্বগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তার পরিপালনের জন্য দরকার হলে তাদের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি অবশ্যই হতে পারে। এর জন্য গণতান্ত্রিক ন্যাকামির দরকার নেই।'[৫]

ড. কামাল হোসেন এক নিবন্ধে স্বাধীনতার ফসল 'রুগ্‌ণ রাজনীতির কারণে' হারিয়ে যাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। 'পতিত স্বৈরাচার' এরশাদকে নিজ দলে ভেড়ানোর জন্য দুই দলের দুই নেত্রী যে 'অনৈতিকভাবে টানাটানি করলেন' তাকে খুবই দুঃখজনক বললেন ড. কামাল। এই নিবন্ধে তিনি বলেন, 'আমাদের স্বাধীনতার ফসলটা তুলে নিয়ে গেছে সেই নতুন ঘুঘুরা—এই ঘুঘুদের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বর্তমান রুগ্‌ণ রাজনীতি যেভাবে ক্ষমতাহীন করেছে মানুষকে, যেভাবে চাটুকারিতাকে জাতীয় মূলনীতিতে পরিণত করেছে, তা থেকে আমরা মুক্ত হতে চাইছি।'[৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ একজন বিএনপি-সমর্থক বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। এক-এগারোর সরকারের ব্যাপারে বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক হলেও অধ্যাপক এমাজউদ্দীন এই পরিবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। *ইত্তেফাক*-এ ৩১ ডিসেম্বর ছাপা হওয়া এক নিবন্ধে ২০০৭ সালের ঘটনাবলির পর্যালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেন :

> বাংলাদেশের এক সংকটকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে যে ভূমিকা পালন করছে তা সত্য-সত্যই প্রশংসনীয়। এই সরকারের কিছু পদক্ষেপ নির্বাচিত সরকারের জন্য অনুকরণীয়। রাজনীতি রাজনীতিকদের জন্যে, কোনো পেশাজীবীর জন্যে নয়, নয় কোনো বুদ্ধিজীবী বা আমলার জন্যেও। এগারো জানুয়ারিতে এদেশে যা ঘটেছে তার ফলাফল যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের রাজনীতিকদের জন্যে এটি একটা বড় ধাক্কা, একটা বড় শিক্ষা, তাদের জন্যে এটা একটা মস্ত বড় সুযোগ আত্মসন্ধানের, আত্মসমালোচনার, আত্মজিজ্ঞাসার।...এগারো জানুয়ারি এদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনো স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়। রাজনীতিবিদদের সর্বাত্মক ব্যর্থতার ফসল এটি। মানুষের মনেই যুদ্ধের সূচনা হয়। তাই শান্তি সংরক্ষণের চেতনা মানুষের মনেই শক্তিশালী করতে হয়। ক্ষমতার প্রতি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে বেড়েই চলে, তেমনি মানুষের মনেই চর্চা করতে হবে সবার জন্যে কল্যাণ চিন্তা। আইন ভাঙার প্রবণতা যেমন মানুষের মনেই সূচিত হয়, তেমনি আইনের প্রতি আনুগত্যবোধের বিকাশ মানুষের মনেই ঘটে থাকে। তাই ২০০৭ সালকে প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।[৭]

২৬ নভেম্বর ২০০৭ সরকার 'বেটার বিজনেস ফোরাম' গঠন করে। স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে এই ফোরাম গঠন করা হয়। ৩৮ সদস্যের এই ফোরামের চেয়ারপারসন হলেন প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ। অর্থ, পরিকল্পনা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ফোরামের নির্বাহী চেয়ারপারসনের দায়িত্বে থাকবেন। সদস্যদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও নেতা, ব্যবসায়ী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আছেন। এর সদস্যসচিব করা হয় বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানকে। সদস্য হিসেবে রাখা হয় সেনাবাহিনীর প্রধান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, মুখ্য সচিব অথবা প্রধান উপদেষ্টার সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান। এ ছাড়া ফোরামের সদস্য হিসেবে থাকছেন অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প, আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব; এফবিসিসিআই, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বিজিএমইএ, ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বিকেএমইএ এবং বিটিএমএ-এর সভাপতি পদাধিকারবলে এই ফোরামে থাকবেন। ব্যক্তিপর্যায়ে ফোরামের সদস্য হিসেবে রাখা হয় অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ মাহমুদুল হক, রেনাটা লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ এম কায়সার কবির, কাজী ফার্মস লি.-এর পরিচালক কাজী জিসান হাসান, রহিমআফরোজ বাংলাদেশ লি.-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সমীর আসাফ, ইনফরমেশন সলিউশন লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ শাপির খসরু, একটেল বাংলাদেশের চেয়ারম্যান সালাহউদ্দিন কাশেম খান, বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন লায়লা রহমান কবির এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম ও এস এম আশিকুজ্জামান।[৮]

ফোরামের লক্ষ্য, কার্যক্রম ও সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলি মন্তব্য পাওয়া যায় এর অন্যতম সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিমের ভাষ্যে। লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা উঠে এসেছে।

মোহাম্মদ আলী তসলিম : বেটার বিজনেস ফোরাম একটা হয়েছিল উইথ দ্য চিফ অ্যাডভাইজার ইন দ্য চেয়ার। অ্যান্ড লিডিং যত মিনিস্ট্রি ছিল,

তাদের যারা অ্যাডভাইজার এবং সেক্রেটারি, তারা এটার মেম্বার ছিল। অল চেম্বার প্রেসিডেন্টস এবং কয়েকজন বিজনেস পার্সোনালিটি ছিল এবং কয়েকটা ইয়ং ছেলে-মেয়েও ছিল। এদের নেওয়ার ভিত্তিটা কী ছিল, তা জানি না। মনে হয় চিফ অ্যাডভাইজার বা তাঁর বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের কথা অনুযায়ী নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদের ডিসটিংগুইশ করার মতো কোনো কারণ দেখিনি।

মহিউদ্দিন আহমদ : আপনার পজিশনটা কী ছিল?

তসলিম : আমি মেম্বার। বেটার বিজনেস ফোরামে সবাই মেম্বার। আমি ছিলাম ইকোনমিস্ট ক্যাটাগরিতে। ইকোনমিস্ট দুজন ছিল। তাদের মধ্যে আই ওয়াজ ওয়ান। এটাকে একটা খুব হাইপাওয়ার কমিটি বলে বলা হয়েছিল। কমিটির কাজ ছিল, ব্যবসাতে যে ধরনের সমস্যা আছে, এ সমস্যাগুলোকে তুলে ধরা এবং তা দূর করতে হলে কী করতে হবে, তা নিয়ে কিছু আলাপ করা। কিন্তু মিটিংটা হতো কয়েক মাস পরে পরে। আর্মি চিফও এটার মধ্যে ছিল। টপ ব্রাস কয়েকজন মিলিটারিও ছিল এর মধ্যে। আর্মি চিফ কিন্তু প্রথম মিটিংয়ের পরে আর কখনো এসেছিল বলে আমার মনে হয় না। প্রথম মিটিংয়ে আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল। আমি যেসব কথা বলেছিলাম, তা বোধ হয় তার খুব একটা পছন্দ হয়নি। সে দু-একটা মন্তব্য করেছিল।

এটাতে কিন্তু আমরা সবাই খোলামেলা আলোচনা করতাম। কোনো ধরনের চাপ ছিল না। যে যা খুশি বলত। ওইভাবেই রেকর্ডেড হতো। এবং আমরা অনেক কিছু সাজেস্ট করতাম। একসময় দেখা গেল, দু শটার বেশি সাজেশন হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ করে একদিন চিফ অ্যাডভাইজার বলল, 'আমরা তো অনেক সাজেশন দিচ্ছি, কিন্তু হচ্ছেটা কী?' আসলে কিছু হচ্ছে না। বলা হলো, এগুলোর কী ফলোআপ হচ্ছে তার একটা রিপোর্ট দিতে হবে। পরেরবার যখন আসলাম, তখন রিপোর্ট লেখা হয়েছে। তাতে লেখা আছে প্রায় নাইনটি ফাইভ বা নাইনটি এইট পার্সেন্টই হয়ে গেছে। আমরা তো থ। আমরা তো জানি, কিছুই হয়নি। এরা বলছে, সব হয়ে গেছে। আমি একজন বিজনেস লিডারকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? ও দেখি হাত দোলাল, মানে সে-ও কিছু জানে না। পরে যেটা বুঝতে পারলাম, সেক্রেটারি সাহেবরা, যাদের ওপর বাস্তবায়নের দায়িত্ব, তাদের কাছে বাস্তবায়ন হলো চিঠি একটা লিখে দেওয়া। তারা ওই চিঠি লিখেছে, যাকে যথাযথভাবে লেখা দরকার, লিখেছে। এটাই বাস্তবায়ন, পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে ইনস্টিটিউট করতে হবে, ট্রেনিং দিতে হবে, এগুলো বললাম। এটা করতে হবে, এই বলে তারা যে চিঠিটা

পাঠিয়েছে, এটাই বাস্তবায়ন। ওই ধরনের দু-চারটা হবে। আদারওয়াইজ কী করে কয়েক মাসের মধ্যে, আমরা যেসব লংটার্ম সাজেশন দিচ্ছিলাম, আমরা ধরে নিয়েছি যে পাঁচ-সাত বছর বা দশ বছর লাগবে ঠিকমতো ইমপ্লিমেন্ট করতে, সেটা দশ সপ্তাহের মধ্যে কী করে হয়ে গেল, সেটা বোধগম্য না। এটা হয়েছিল।

তবে আমার ধারণা ছিল, এটা সাংঘাতিক একটা ভালো কাজ। যে সরকারপ্রধান এবং সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইকোনমির যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, ইয়ং এবং ওল্ড, সবাই প্রেজেন্ট। সুতরাং ওই মিটিংয়ে বসেই অনেক বিষয় খোলাসা করে নেওয়া যেত। এরা কী চাচ্ছে, সরকার কী চাচ্ছে, বা সরকার কেন করতে পারছে না, সে সম্পর্কে ভালো ধারণা হতো। আমার সব সময় নজর ছিল স্কিল ডেভেলপমেন্টের দিকে, এডুকেশনের দিকে। আমি এসব বিষয় নিয়েই কথাবার্তা বলেছি। অন্য কিছুতে এত স্ট্রংলি কথা বলিনি। এ ব্যাপারে অফিশিয়ালি সকলের দারুণ রকম সাহায্য ছিল। সবাই বলেছে, হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই করতে হবে।

মহিউদ্দিন : মিটিংগুলো হতো কোথায়?

তসলিম : সবই প্রাইম মিনিস্টারের অফিসে। ওটাই তো তখন চিফ অ্যাডভাইজারের অফিস।

মহিউদ্দিন : এটা শুরু হলো কোন মাসে?

তসলিম : এটা আমার খেয়াল নেই। তবে ওরা একটু স্থিতিশীল হয়ে বসার পরেই। ফখরুদ্দীন গভমেন্ট তৈরি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই।

মহিউদ্দিন : অ্যান্ড ইট কনটিনিউড আনটিল দ্য এন্ড।

তসলিম : সেই সুবাদে আমি আরেকটা কমিটিতে ছিলাম। ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে একটা কমিটি ছিল, ওদের কিছু সমস্যা দেখার জন্য। আরেকটা হয়েছিল যে হোসেন জিল্লুর রহমান, আমাদের বন্ধু, ও তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিরেক্টর ছিল। ও এক বছর ডিরেক্টর থাকার পর হঠাৎ করে অ্যাডভাইজার হয়ে গেল। কমার্স অ্যাডভাইজার। অ্যাডভাইজার হয়ে যাওয়াতে ওই পজিশনটা খালি হলো। তখন সম্ভবত ও বা অন্য কেউ, আমি জানি না কে করেছে, আমার ধারণা, হয়তো ও-ই করেছে, আমার নাম হয়তো প্রোপোজ করে গিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকে, অ্যাজ ডিরেক্টর। তো বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি বছরখানেকের মতো ছিলাম। আরেকটাতেও ছিলাম। এটা বাপেক্স বোধ হয়।

মহিউদ্দিন : পেট্রোবাংলায়?

তসলিম : ওই মন্ত্রণালয়ে একটা বোর্ড ছিল। সেই বোর্ডে আমাকে মেম্বার করা হয়েছিল। এগুলো ছিল অফিশিয়াল পজিশন। তবে সবগুলোর কাজ ছিল কয়েক মাস পরে একটা মিটিং করা। এর বেশি কিছু না।

মহিউদ্দিন : কিছু বিজনেস লিডার, যারা খুব প্রমিন্যান্ট বাংলাদেশে, অ্যারেস্ট হলো না? এর ফলে ইকোনমি তো বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছে।

তসলিম : ইকোনমি ধাক্কা খেয়েছে কি না আমি জানি না। কিন্তু ধাক্কা খেলেও সেটা ফিগারে আসেনি। ধরুন, এই হলো সরকারি ফিগার, এই হলো আগের সরকারের। অর্থনীতির একটা ব্যাপার হলো, অনেক তথ্য আছে। যেহেতু কিছু তথ্য আছে, কেউ যদি বাজে কথা বলে, সেটা ইমিডিয়েটলি ভেরিফায়েড হবে। সে জন্য হুট করে কিছু বলা ভেরি ডিফিকাল্ট। বেটার বিজনেস ফোরাম একটা হয়েছিল। প্রথম দিকে তাদের ধারণা ছিল, ব্যবসার সমস্যার সমাধান হয়তো হয়ে যাবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যা আছে, তা থাকবে না। কার্যত এটা সামরিক বাহিনী-সমর্থিত সরকার, জনগণের কাছে জবাবদিহি নেই, তাড়াতাড়ি সব হতে পারে। কিন্তু সে রকম তাড়াতাড়ি কিছু হতে দেখিনি। একটা জিনিস খুব তাড়াতাড়ি হতে দেখেছি ওই সময়, র‍্যাংগ্স—একটা বিল্ডিং ছিল, সেটা ভাঙা। বেশি তাড়াতাড়ি করতে যেয়ে যা হয়েছে, দশ-বারোজন শ্রমিক নিহত হয়েছে সে জায়গায়। এত বড় ভাঙার কাজ কিন্তু বাংলাদেশে আর কখনো হয়নি। ডেমোলিশনের কাজটা আমাদের জানা নেই। তাড়াহুড়া করতে যেয়ে এটা হয়েছিল।

ওই সময় কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যেগুলো বেটার বিজনেস ফোরাম থেকে হয়নি, মিলিটারিরা নিজেরাই এটা করেছিল। একটা ছিল, ফুটপাত থেকে সমস্ত লোক তুলে দেওয়া, দোকানপাট তুলে দেওয়া। ঢাকা শহরের একটা সিগনিফিক্যান্ট সেকশন অন দ্য পপুলেশন অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্টেড হয়েছিল। আরেকটা হয়েছিল, প্রায়ই মজুতদার বলে ধরত। সে সময়ের একটা লেখা, আমার বইতে পাবে, কাকে মজুতদার বলা হচ্ছে। কোথাও কোনো গোডাউনে গিয়ে দশ হাজার মণ চিনি পেয়েছে। বলছে যে তিনি মজুত করেছেন। ওই সময় চিনির একটা সংকট দেখা গিয়েছিল। দশ হাজার মণ চিনি দিয়ে তো মার্কেট কন্ট্রোল করা যায় না? এটাকে কেন মজুত বলা হলো? একজন বড় ব্যবসায়ী হলে তাকে তো মজুত রাখতেই হবে। কোন পর্যায়ে রাখা যৌক্তিক আর কোন পর্যায়ে রাখা যৌক্তিক না, এটা কে ডিফাইন করবে? অনেক প্রশ্ন চলে আসে। ইন ফ্যাক্ট, মজুতকে ইনভেস্টমেন্টের পার্ট ধরা হয়। ওভাবেই এটাকে ব্যালান্স শিটে লেখা হয়।

মহিউদ্দিন : স্টক আর হোর্ডিং।

তসলিম : স্টক আর হোর্ডিংয়ের পার্থক্য তো বুঝতে হবে। স্টক মানে গুদামে রাখা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাখলে এটা হোর্ডিং হচ্ছে। হোর্ডিং তো দুই কারণে হতে পারে। এক. আপনি বিক্রি করতে পারছেন না, এটা স্টকে অ্যাড হচ্ছে। আমরা এটাকে বলি আনইনটেন্ডেড অ্যাকুমুলেশন। আবার আমরা বলি, এটা ইনটেনশনালি করছে। ইনটেনশনালি আপনি হয়তো যৌক্তিক কারণে করছেন। কারণ, আপনি হয়তো টের পাচ্ছেন, ভবিষ্যতে এর ডিমান্ড বাড়বে। সুতরাং ইনভেন্টরি বাড়াতে হবে। প্রডাকশন দিয়ে এটা বাড়াতে পারবে না। তাই আগে থেকেই আপনি জোগাড় করছেন। যাতে আপনি মার্কেটে সাপ্লাই দিতে পারেন। অনেকগুলো ব্যাপার-স্যাপার আছে। এগুলো হঠাৎ করে বলা যায় না। প্রত্যেকটা ইনডিভিজুয়্যাল কেসে গিয়ে দেখতে হয়। এটা কিন্তু ওই সময় বিজনেসকে অনেক ডিজরাপ্ট করেছিল। যেখানে-সেখানে ব্যবসায়ীকে ধরে বলা, তুমি মজুত করেছ, এই করেছ, সেই করেছ। এসব কারণে ব্যবসা কিছুটা অ্যাফেক্টেড হয়েছিল। তৎকালীন সরকারের সঙ্গে যাদের ভালো যোগাযোগ ছিল, তাদের কিছু হয়নি। কিন্তু গ্রেট মেজরিটি অব পিপলের তো আর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ নাই। দে অয়ার অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্টেড। অথবা ভীতিটা ছিল, যেকোনো সময় ধরতে পারে। ব্যবসায়ে কিন্তু ভীতি খুব খারাপ জিনিস। সেটা ব্যবসার প্রসারণে হোক, কিংবা বিনিয়োগে, বাধার সৃষ্টি করে। ওই সময় অর্থনীতি কিছুটা স্থবির হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এটা ভুললে চলবে না, সে সময় কয়েকটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার দেশটাকে আক্রান্ত করেছিল। একটা ছিল সাইক্লোন, উপকূলীয় অঞ্চলে সিডর, আর দুটো বড় বড় ফ্লাড। দেশের একটা বড় অংশ ডুবে গিয়েছিল। আরেকটা বড় ঘটনা ঘটেছিল সে সময়। আন্তর্জাতিক বাজারে, কমোডিটি মার্কেটে বিরাট উথালপাতাল অবস্থা দেখা গিয়েছিল। কমোডিটির দাম কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। তেলের দাম তিন গুণ বেড়েছিল। চালের দাম বেড়েছিল। এগুলো সামাল দেওয়া—বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ওই সময় শুধু আমাদের দেশে না, পৃথিবীজুড়ে মন্দা ভাব ছিল। সেটা আমাদের অ্যাফেক্ট করেছিল। সব মিলিয়ে খুব একটা স্বস্তির মধ্যে সরকার ছিল না ওই সময়। তারপর তাদের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপে, কর্মকাণ্ডে, শুরুতে মানুষের মধ্যে যে কিছুটা সহানুভূতি ছিল সামরিক বাহিনী-সমর্থিত সরকারের ওপর, সেটা কিন্তু আর ছিল না। তাতে করে তাদের মনোবলেও কিন্তু চিড় ধরে গিয়েছিল। তারাও কিন্তু ওই ধরনের কনফিডেন্স নিয়ে কাজ করতে পারেনি পরের দিকে। পরের দিকে কয়েক মাস তো ইলেকশন হবে, নতুন সরকার

হবে, এসব ডামাডোলে চলে গিয়েছিল। কিছু বললেই বলতে হয়েছে, এগুলো পরবর্তী সরকার এসে ডিসাইড করবে। আমাদের এখন সব ডিসিশন নেওয়া উচিত হবে না। আমার এখন স্মরণ নাই, কোন প্রজেক্টের ব্যাপারে বলা হয়েছিল। তবে দু-একটা বড় প্রজেক্টের বেলায় বলা হয়েছিল যেমন বড়পুকুরিয়া সে সময় আলোচনায় এসেছিল কি না, আমার খেয়াল নাই। আসলেও আসতে পারে হয়তো। এ ধরনের প্রজেক্টে বলা হতো, এগুলো বড় জিনিস, পরবর্তী সরকার এসে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা নেব না। এভাবেই একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে সময় কাটিয়ে দিয়েছে। কোনো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। তার কোনো চিহ্নও আমরা দেখি নাই। শুধু একটাই আমাদের সবার মনে থাকার মতো, সেটা হলো র‍্যাংগস বিল্ডিং ভেঙে ফেলে রাস্তা বানানো। আর তার পাশ দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

মহিউদ্দিন : ওল্ড এয়ারপোর্টের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা।

তসলিম : এ দুটি জিনিস আমরা মোটামুটি চোখের সামনে দেখতে পাই।

মহিউদ্দিন : হাতিরঝিল তো তারা শুরু করেছিল।

তসলিম : শুরু করলে কী হবে, শেষ তো করতে পারে নাই।

এর মধ্যে কোনো এক সময় শেষের দিকে, হেডকোয়ার্টার্সে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ব্যবসায়ীদের আর না ঘাঁটানো। পরের দিকে কিন্তু ব্যবসায়ীদের আর খুব একটা হ্যারাস করা হয়নি। এর মধ্যে আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে ওই অঞ্চলের যে শীর্ষ ব্যক্তি ছিল, মিলিটারি, সে এ ধরনের একটা মন্তব্য করেছিল যে চিফ যদি আমাদের থামিয়ে না দিতেন, ছয়টা মাস যদি সময় পেতাম, পিটিয়ে সব ঠিক করে দিতাম। মনে মনে ভাবলাম, এত দিন তো সময় পেয়েছেন, ছয় মাসের চেয়ে তো বেশি সময় পেয়েছেন, কাজ তো কিছুই হয়নি। বরং সবকিছু খারাপ হয়েছে।

ইয়াং মিলিটারি অফিসাররা, এদের অনেকেই হয়তো মেজর, কর্নেল, এদের সিভিলিয়ান লাইফ সম্পর্কে খুব একটা ভালো ধারণা নেই। আর ব্যবসা সম্পর্কে তো ধারণা একেবারেই নেই, যদি না ছেলেমেয়েরা ব্যবসায়ী হয়ে থাকে। ওরা, ওদের বুদ্ধিতে মিলিটারিতে যেভাবে প্রবলেম সল্‌ভ করে, সেভাবে করতে চেষ্টা করেছিল। অর্ডার দিলাম, হলে ঠিক আছে, না হলে পিটিয়ে সব ঠিক করে দেব। ব্যবসাতে যে ওইভাবে কাজ হয় না, বা স্থায়ী কোনো সমাধান যে পেটানোর মাধ্যমে হয় না, এটা হয়তো ওরা আত্মস্থ করতে পারেনি। এটা আমি অনুমানের ওপর বলছি যে ডিসিশন হয়েছে ব্যবসায়ীদের আর ঘাঁটানো হবে না। এটা অনেক দিন পরে হয়েছে। শীর্ষ

পর্যায়ে এটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে যে এভাবে সলিউশনে যাওয়া যাবে না। কিন্তু তত দিনে যা ড্যামেজ হওয়ার হয়ে গিয়েছে।

মহিউদ্দিন : ফাইন্যান্স অ্যাডভাইজারের সঙ্গে ইন্টারেকশনের সুযোগ হয়নি?

তসলিম : ফাইন্যান্স অ্যাডভাইজারের সঙ্গে আমার মিনিমাম যোগাযোগ ছিল।

মহিউদ্দিন : ওটা তো কাম্য ছিল, লজিক তা-ই বলে।

তসলিম : কাম্য হতে পারে। আমি ব্যুরোক্র্যাট না, আর তিনি যেহেতু ব্যুরোক্র্যাট, সে কারণে হয়তো, অথবা অন্য কোনো কারণে। যেটুকু তার সঙ্গে যোগাযোগ, মোস্টলি বেটার বিজনেস ফোরামেই। আমার সঙ্গে বরং যোগাযোগ ছিল পরের দিকে কমার্স অ্যাডভাইজারের। তার সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম, যেহেতু শেষের দিকে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের চিফ হিসেবে যখন জয়েন করি। কমার্স মিনিস্টার বা অ্যাডভাইজার ইজ দ্য চেয়ারম্যান অব দ্যাট অর্গানাইজেশন। সে হিসেবে তার সঙ্গে আমার একটা ভালো যোগাযোগ ছিল। মিনিস্ট্রির অনেক মিটিং আমাকে অ্যাটেন্ড করতে হতো, অনেক সময় বিভিন্ন ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চাইত, কী করতে হবে, না করতে হবে।

মহিউদ্দিন : বাংলাদেশ ব্যাংকে?

তসলিম : বাংলাদেশ ব্যাংকেও একই অবস্থা। হোসেন জিল্লুর যখন অ্যাডভাইজার হয়ে গেল, তার খালি পজিশনে আমাকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেও আমার ধারণা, মনে হয়েছে যে তৎকালীন গভর্নর, উনিও আমার সঙ্গে খুব কমফোর্টেবল ছিলেন না, আমার মনে হয়েছে। তবে খুব ওপেনলি কিছু বলতে বা সাজেস্ট করতে শুনিনি। আমার ধারণা, সে কারণে সেখানেও আমার খুব ইফেকটিভ পার্টিসিপেশন হয়নি। বরং আমার বেশ কিছু ইফেকটিভ পার্টিসিপেশন হয়েছে আতিউর আসার পরে।

মহিউদ্দিন : টেনিউর কি শেষ হয়ে গিয়েছিল?

তসলিম : টেনিউর বলে কিছু আছে কি না আমার জানা নেই। কী হিসেবে আমাকে নেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট খেয়ালও নেই। একদিন চিঠি পেলাম, আমি আর ডিরেক্টর নেই। আমি চলে আসার পরও আতিউর কিন্তু যোগাযোগ রাখত। এবং আমি কিছু বললে সে শুনত অন্তত।

মহিউদ্দিন : মনিটরি পলিসি নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা ছিল আপনার।

তসলিম : ওটা একটা মজার কাহিনি। এক জার্নালিস্ট ফোন করল, জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা তো কাল মনিটরি পলিসি ডিক্লেয়ার করবেন? সে

ব্যাপারে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।' আমি তাকে বললাম, মনিটরি পলিসি আগামীকাল ডিক্লেয়ার হবে, এটা আপনাকে কে বলল? বলে, 'এটা তো আমরা সবাই জানি। আমরা তো কাল সবাই যাব ওখানে।' এ ধরনের কিছু একটা বলল। এ ব্যাপারে সে ভালোই অবহিত। এরপরে যে বোর্ড মিটিং হয়েছে, সেখানে শুরুতেই আমি প্রশ্ন তুললাম, এটা কেমন ব্যাপার? সাধারণ একটা জুনিয়র জার্নালিস্টও বোর্ড মিটিংয়ের কথা জানে। আমি ডিরেক্টর অব দ্য বোর্ড, আমি জানি না? এর মানেটা কী? দেখলাম আমাদের গভর্নর সাহেব একটু অপ্রতিভ হলেন। তিনি উত্তর দিতে পারছিলেন না। তখন আরেক বোর্ড মেম্বার, তিনি বহুদিন বোর্ডে আছেন, তিনি বললেন, দেখো, কেউ তো এত দিন মনিটরি পলিসি সম্পর্কে কিছু জানতে চায়নি? তাই এখন আর এটা ডিসকাসই হয় না। তখন গভর্নর সাহেব বললেন, এটা যখন আলোচনায় এসেছে, এখন থেকে মনিটরি পলিসি ডিক্লেয়ার হওয়ার এক দিন আগে আপনাদের জানানো হবে। গভর্নর সাহেব সম্ভবত আমার এই প্রশ্নটা পছন্দ করেন নাই। এটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাক্টের মধ্যে লেখা আছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সবকিছু ডিরেক্টরদের নির্দেশে হবে। মনিটরি পলিসি মোটামুটি একটা ইকোনমিকসের সাবজেক্ট। এটা আমার জানা উচিত ছিল। ইন্টারেস্টিংলি, তখন আমরা চারজন ছিলাম ইকোনমিকসের প্রফেসর ইন দ্য বোর্ড। সেটা বোর্ডকে জানানোর প্রয়োজন ছিল। চার চারজন প্রফেসর, দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রফেসর সবাই, তারা যদি না জানে...

মহিউদ্দিন : কারা কারা ছিলেন ইকোনমিকসের প্রফেসর?

তসলিম : বোর্ডে ছিলেন প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, প্রফেসর মমতাজউদ্দিন, প্রফেসর ইসমাইল হোসেন আর আমি। পরে যেটা বুঝতে পেরেছি, ওটার ব্যাপারে কিছু মেম্বার কিন্তু ভালোভাবেই অবহিত। যেমন ফাইন্যান্স সেক্রেটারি, মনিটরি পলিসি ফরমুলেশনের সঙ্গে সম্ভবত জড়িত সে। সে জানে। এনবিআরের চেয়ারম্যান যে সেও সম্ভবত জানে।

মহিউদ্দিন : বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট সবচেয়ে ভালো ছিল ২০০৫-০৬ সালে।

তসলিম : এ সরকারের তথ্য অনুযায়ী তা-ই।

মহিউদ্দিন : ২০০৭ এর মাঝামাঝি থেকে ২০০৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কেমন ছিল?

তসলিম : ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত খুব লো ছিল। লোয়েস্ট ছিল ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের প্রথম দেড় বছর।

কিন্তু ২০০৫-০৬-এ যা ছিল, তার চেয়ে কি বেশি ছিল?

মহিউদ্দিন : না। তুমি যদি এই দুই বছর দেখো, এক বছর ছিল ৬.৫৫, এখন ৭.০৫ বলছে এ বছর। ওয়ান-ইলেভেনের ওই দুই বছর ছিল ৬.৬৭ এবং ৭.০৬।

তসলিম : এই ডাটা কি ওয়েবসাইটে আছে?

মহিউদ্দিন : বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাটা, বিবিএসে পাওয়া যাবে।[৯]

এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল তথ্য অধিকার আইন তৈরির উদ্যোগ। ৫ ডিসেম্বর ২০০৭ ঢাকায় 'মানুষের জন্য' আয়োজিত 'গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের জন্য তথ্য অধিকার' শীর্ষক সম্মেলনে দেওয়া প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ তথ্য অধিকার আইন তৈরির ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া ইতিমধ্যে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে এবং আইনটি করা গেলে তা তথ্যের অবাধ প্রবাহ, গণতন্ত্র ও সুশাসনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান শামসুল বারী বলেন, সব রকম তথ্যের জন্য তথ্য অধিকার আইনের দরকার নেই। সরকার অনেক তথ্য নিজেরাই প্রচার করে। সরকার যেসব তথ্য গোপন করে বা গোপন করতে চায়, সেসব তথ্য পাওয়ার জন্য আইন করা দরকার। তিনি বলেন, জনগণ ঠিক করবে কী ধরনের তথ্য তারা চায়, সরকার ঠিক করতে পারবে না তারা কী তথ্য সরবরাহ করবে। এ ধরনের আইন থাকলে সরকারি কর্মকর্তারা সতর্কতার সঙ্গে কাজ করবেন; মন্ত্রণালয় ও রাজনীতিবিদদের কাজ, তাঁদের গুণাগুণ এবং রাজনৈতিক দলের টাকার উৎস সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে।[১০]

দেশে একটি মানবাধিকার কমিশন তৈরির দাবি অনেক দিন ধরে করে আসছিলেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া আসে। ৯ ডিসেম্বর ২০০৭ প্রধান উপদেষ্টার অফিসে উপদেষ্টা পরিষদের এক সভায় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দুই সদস্যের মধ্যে অন্তত একজন হবেন সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। সরকার কর্তৃক গঠিত ছয় সদস্যের একটি কমিটি তাদের নাম রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব করবে। বাছাই কমিটির প্রধান হবেন প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক। কমিটির অন্য সদস্যরা হবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অ্যাটর্নি জেনারেল, হিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আইনসচিব।[১১]

এক-এগারোর ঘটনা পুরোনো হয়ে গেলেও এর রেশ থেকে গেছে। এটিকে কেউ কেউ দেখেন একটি ইতিবাচক 'হস্তক্ষেপ' হিসেবে, কারও কাছে এটি ঘোর দুঃসময়, যা এখনো তাঁদের স্মৃতিকে তাড়া করে বেড়ায়। এক-এগারোর সরকারের দুটো কাজ ছিল উল্লেখযোগ্য, যা নন্দিত কিংবা নিন্দিত হয়েছে। এক. জোরেশোরে দুর্নীতি দমন অভিযান চালানো, যা অনেককেই নানাভাবে ভুগিয়েছে এবং দুই. নতুন একটি ভোটার তালিকা তৈরি করা, যা ব্যবহার করে সংসদ নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে।

ওই সময়ের সরকারের কাজ নানাভাবে দেখা ও বিশ্লেষণ করা যায়। সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী এবং এর কেন্দ্রে ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ। সরকারের নানান কাজ সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা ওই সময়ের একটি মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। লেখককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এসব বিষয়ে অনেক খোলামেলা কথা বলেছেন। এখানে তা তুলে ধরা হলো :

মইন ইউ আহমেদ : উপদেষ্টারা সবাই যাঁর যাঁর দপ্তর পেলেন। মোস্ট অব দেম ওয়ার্কড ভেরি হার্ড, খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে। দে রিয়েলি ওয়ান্টেড টু হেল্প দ্য কান্ট্রি। ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করার জন্য, আমি শুনলাম ঢাকায় পুলিশের সব পোস্টিং তো হয় সুপারিশে অথবা...

মহিউদ্দিন আহমদ : লিংকেজ।

মইন : হ্যাঁ। এদের দিয়ে কাজ হবে না। করাপ্ট লোক দিয়ে আপনি ভালো কাজ করাতে পারবেন না। আমি পুলিশের আইজির সঙ্গে কথা বললাম। বললাম, সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব আপনার। লেটস টক অ্যাবাউট ঢাকা। ঢাকায় তখন সম্ভবত ১৯টা থানা ছিল। বললাম, আমি চাই তাদের নয়জনকে ঢাকা থেকে সরাতে হবে, ওসি। আপনি নতুন নয়জনকে, আপনি যাদের ভালো মনে করেন, তাদের সিলেক্ট করেন। তাদের ঢাকায় নিয়ে আসেন। তারা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আপনিও ব্যর্থ হবেন।

মহিউদ্দিন : আইজি কি খোদা বখশ, নাকি নূর মোহাম্মদ? ওয়ান-ইলেভেনের সময় তো খোদা বখশ ছিল।

মইন : হি ওয়াজ টেকেন আউট। এরপর নূর মোহাম্মদ এসেছে। দুই সপ্তাহ পর নয়জন যখন সেটেলডাউন করল, আমি বললাম, বাকি ১০ জনকে আউট করেন। সে রকমই হলো। মানে, ঢাকায় সব ফ্রেশ ব্লাড। দিস পেইড লট অব ডিভিডেন্ড। এখনো অনেক লোক বলবে যে রাত ১২টার

সময় বিয়ে খেয়ে এসেছি, গায়ে অর্নামেন্ট, কিছু হয়নি। যদি একটা ঘটনা ঘটে, ঘটতেই পারে, যদি দ্বিতীয়বার ঘটে, হি হ্যাজ টু রিজন ইট আউট। মানে তার কমান্ড ইজ ব্যাড, সে জন্যই এ রকম ঘটছে। এবং থার্ড টাইম হলে, হি ইজ আউট। তার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। তারপর দেখেন, হোয়াট আ লাভলি সিচুয়েশন!

মহিউদ্দিন : পুলিশের ওপর ল অ্যান্ড অর্ডার অনেকাংশে নির্ভর করে।

মইন : আপনি খুব অল্প সময়ে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। আমরা এটা করে দেখিয়েছি। ওনলি থিং, যার যে দায়িত্ব তাকে সেটা করতে দিতে হবে। একজন উঁচু পদের কেউ, কোনো মন্ত্রী পর্যায়ের লোক যদি পুলিশকে, ওসিকে পোস্টিং করায়, সে তো কাউকে কেয়ার করবে না। যার যে দায়িত্ব, তাকে দেন এবং মেক হিম আনসারবেল। ইফ অ্যানিথিং গোওজ রং, মেক হিম অ্যাকাউন্টেবল। উনিই ওনার কমিশনার, ডিআইজিকে দায়িত্বশীল রাখবেন। এসপি-ডিএসপিকে টাইট দেন। এটাতে কাজ হয়েছে তো? পরিস্থিতির উন্নতি হলো। সবাই সিধা হয়ে গেছে। তারপর বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার শুরু হলো।

এর মধ্যে চিফ অ্যাডভাইজার তাঁর এক কনফারেন্সে আমাকে আসতে বললেন। আমরা কোনো সময় কোনো মিনিস্ট্রিতে কোনো অফিসারকে কিছু বলিনি। অনেকে বলে এটা মিলিটারি গভমেন্ট। টোটালি ফলস। কোনো মিনিস্ট্রিতে আমাদের কোনো কো-অর্ডিনেটর, এমনকি কোনো অবজারভারও ছিল না। তারা স্বাধীনভাবে কাজ করেছে। তারা করাপ্ট লোকদের তালিকা তৈরির জন্য আমাদের সাহায্য চেয়েছে। ওই সময় আমরা তাদের সাহায্য করেছি।

দুই বছর খুবই কম সময়। একটু সেটল করতে আমাদের তো সময় লেগেছে? ইলেকশন কমিশনকে ঢেলে সাজাতে হলো। নতুনরা প্রত্যেকেই ভালো। দে হ্যাভ ডান অ্যান একসিলেন্ট জব। ওনারা কী চাচ্ছেন, সেটা জানালেন। ওনারা চাচ্ছেন ফটোসহ ভোটার লিস্ট। যাতে চিটিং না হতে পারে। কত টাকা লাগবে? হিসাব-টিসাব দিল। আমি ওই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এটা কে করবে? আমাদের তো এক্সপার্টিজ নেই। কম্পিউটার-লিটারেট মানুষ খুব কম ছিল। কিন্তু সব আর্মি অফিসার কম্পিউটার-লিটারেট। তারা জানে কীভাবে এসব কাজ করতে হয়। কারণ, তারা ইউএন মিশনে যায়। সেখানে এসব শেখানো হয়। তারা শিক্ষিত। তারা বিদেশে অনেক নির্বাচন দেখেছে। বললাম, ঠিক আছে, উই উইল ডু ইট।

তখন আমি চিফ অ্যাডভাইজারকে বললাম, এতই যখন করছেন,

একটা আইডি কার্ড দিচ্ছেন না কেন? অতিরিক্ত কিছু লাগবে না। ডাটা ইজ দেয়ার। এই ডাটার সঙ্গে আমরা একটা আইডি কার্ড দিয়ে দিই। বিলিভ মি, বেহেমেন্ট অপজিশন। কী দরকার? পয়সা নষ্ট?

মহিউদ্দিন : রাজনৈতিক দলগুলো থেকে বিরোধিতা?

মইন : না, বিরোধিতা করলেন সেক্রেটারিরা। মিটিংয়ে অ্যাডভাইজারদের সঙ্গে সেক্রেটারিরা ছিলেন। পেছনে বসা। ওনারাই বেশি আপত্তি করলেন। অনেক অ্যাডভাইজারও অবজেকশন দিয়েছেন। অ্যাডভাইজার তো নতুন। তারা তো সেক্রেটারিদের কথা শুনবেনই। বলে, না এটা বাংলাদেশ, গরিব দেশ, মানুষ লেখাপড়া জানে না, ফেলে দিবে, নষ্ট করবে।

আমি হিসাব করে এসেছি, আইডি কার্ড বানাতে কত টাকা লাগবে। ল্যামিনেটিংসহ আইডি কার্ড, এবং ওই যে দড়ি বান্ধে, ওইটাসহ মাথাপিছু তিন টাকা লাগে। আমাদের তখন প্রায় আট কোটি ভোটার, মানে ২৪ কোটি টাকা লাগবে, যেখানে ইতিমধ্যে সাড়ে তিন শ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। তারা এমনভাবে বলছে যে মনে হলো আমার প্রস্তাব বাদ হয়ে যাবে। তখন বললাম, এই কৃষকরা টাকা হারায়? টাকা তো হারায় না? সে টাকাটা কী করে? সে যখন ধান বিক্রি করে, টাকা পলিথিনে মুড়ে চোঙার ভেতরে লুকিয়ে রাখে, যাতে সেফ থাকে। সো মেক দিস আইডি কার্ড অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ মানি। এটা কীভাবে করবেন, আমি বলে দিচ্ছি। যখনই সে সার নিতে যাবে, এই আইডি কার্ড দেখাবে। যখন তার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে যাবে, হি উইল নিড দিস আইডি কার্ড। ব্যবসা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেখানে চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট লাগে, সেখানে আইডি কার্ডকে কাজে লাগাতে হবে। চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট কেন লাগবে? আইডি কার্ডই যথেষ্ট ওখানে যে বারকোড দেওয়া আছে, ওটা টান মারলেই সব হিস্ট্রি বের হয়ে আসবে। যেখানেই যাবেন, ওই আইডি কার্ডটা লাগবে। তাহলে আইডি কার্ডটা টাকার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হবে। এটাকেই বিবেচনা করে দেখুন। মানা করে দিলে তো হবে না?

তারপর আমি এর সুবিধাগুলো বললাম। এই আইডি কার্ডওয়ালা একটা চোর রংপুরে চুরি করেছে, ধরা পড়েছে। বলেছে, আমার খাবার ছিল না, এই সব গল্প বলে দুটো থাপ্পড় খেয়ে হয়তো ছাড়া পেয়ে গেছে। কয় দিন পর সে হয়তো চিটাগাংয়ে আবার চুরি করে ধরা পড়েছে। এখন ওসি যখন তার বারকোড পুল করবে, আগের রেকর্ডটা তখন চলে আসবে। সে আর মিথ্যা কৈফিয়ত দিতে পারবে না। এই যে পাসপোর্ট বানাতে চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট লাগে, এসব ইউজলেস, অপ্রয়োজনীয়। কারণ, আইডি কার্ডের

সকল তথ্য তার বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা কত গুরুত্বপূর্ণ! যখন এগুলো বললাম, দেখলাম আস্তে করে তাদের মুখটা নিচু হয়ে গেল। চিফ অ্যাডভাইজার বুঝলেন। বললেন, ইটস আ গুড আইডিয়া। আমরা এখন এর গুরুত্ব বুঝছি না। কিন্তু জাতি একদিন এর সুফল পাবে।

অনেক নতুন নতুন সমস্যা কিন্তু এসেছে। বাংলাদেশ আর্মি কিন্তু মাস্টার অব ইনোভেশনস। যারা কৃষক, চাষাবাদ করতে করতে তাদের আঙুলের চিহ্ন ক্ষয় হয়ে যায়। একজন অফিসার বলল, ওই যে টেবিল ল্যাম্প আছে, ওখানে হাত লাগাও তো?

তো হাত লাগিয়েছে টেবিল ল্যাম্পের ওপর।

ধরে রাখো।

তো রেখেছে। কাজ হয়েছে। আঙুলের রেখা ফুলে উঠছে। চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে। সে এই মেসেজটা কমিউনিকেট করেছে। তখন সবাইকে বলা হলো, এ রকম হলে, এভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে হবে।

আমরা এই কাজের জন্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। যে এর দায়িত্বে ছিল, হি ওয়াজ আ মেজর জেনারেল, সিগন্যালের।

মহিউদ্দিন : এটা তো একটা বিশাল কাজ?

মইন : ওই সময় আমাদের ভোটার আইডির সংখ্যাটাই ছিল পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। এর আগে হাইয়েস্ট ছিল ফ্রান্স। আমেরিকা কিন্তু এটা করে নাই। অফিসাররা অনেক কষ্ট করছে খাটছে। এর মধ্যে বর্ষাকাল এসে পড়ছে। বর্ষাকালে গ্রামে কাদার মধ্যে যে মহিলারা যেতে পারেনি, তাদের বাসায় গেছে। বাসায় তো ইলেকট্রিসিটি নেই। বৃষ্টির মধ্যে কাঁধে করে জেনারেটর নিয়ে গেছে। কোনো এলাকা বাদ পড়েনি।

মহিউদ্দিন : আফটার রেগুলার ইন্টারভেলস পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে। পাঁচ বছর পরপর। কীভাবে একটা টেকসই ব্যবস্থা তৈরি করা যায়?

মইন : ইলেকশন কনডাক্ট করে ইলেকশন কমিশন। আপনি দেখেন, পার্লামেন্টারি ইলেকশনের দেড়-দুই বছর আগে ইলেকশন কমিশন চেঞ্জ হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এমন একটা কমিশন সিলেক্ট করুন, যা হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। পিপলস পারসেপশন বলে একটা জিনিস আছে। ওটার দিকে আপনি খেয়াল রাখেন। ওই দিকে খেয়াল রেখে আপনি সত্যিকার মেধাবী, ভালো লোক সিলেক্ট করেন। আমাকে হেল্প করবে, এই ইনটেনশন থেকে না।

মহিউদ্দিন : আমাদের ইলেকশন কমিশনের যথেষ্ট পাওয়ার আছে। যাদের দেয়, এদের গাটস নেই।

মইন : যে অ্যাপয়েন্ট করছে, সে দেখে, আমার কথা কতটুকু শুনবে। আর যাকে অ্যাপয়েন্ট করবে, তাকে বলবে, আমার কথা কিন্তু শুনতে হবে। আগে ভালো ভালো কমিশন সিলেক্ট হয়েছে। ২০০৭ সালের কমিশনের উদাহরণ দেখেন। প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ, ভালো লোক। দেখেন, তারা কীভাবে ইলেকশন কনডাক্ট করেছে? আমাদের দেশে অনেক ভালো লোক আছে। কেউ যাতে কোনো প্রশ্ন তুলতে না পারে, এমন লোক সিলেক্ট করেন। গিভ দেম দ্য ফুল অথরিটি। সিলেক্ট দোজ পিপল হু হ্যাভ গাটস টু ডু ইট।

মহিউদ্দিন : ইলেকশন কমিশনে সিইসি বা অন্য কমিশনার কারা হবেন, এটার কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই। কোনো আইন নেই। আপনি কাকে সিলেক্ট করবেন?

মইন : আপনি কি জানেন, আমাদের যে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়, তার কোনো ক্রাইটেরিয়া ছিল না?

মহিউদ্দিন : নেই তো।

মইন : কারণ, কোনো সরকার এটা করেনি। অবাক ব্যাপার। বিচারপতি হয়ে গেছে, দেখা গেল সব থার্ড ডিভিশন, ম্যাট্রিক-ইন্টারমিডিয়েটে থার্ড ডিভিশন।

মহিউদ্দিন : একজনের তো বিএর সার্টিফিকেট জাল ছিল।

মইন : আমি এটা বলতে চাইনি। দেখেন আমেরিকায়। একেকটা বিচারপতি যে হয়!

মহিউদ্দিন : ওদের পাবলিক হিয়ারিং—কংগ্রেসনাল হিয়ারিং আছে।

মইন : ওদের যে পড়াশোনা, যে নলেজ। আমাদের সময় ক্রাইটেরিয়ায় বলা হয়েছিল, কোনো থার্ড ডিভিশন থাকতে পারবে না। এ রকম দশটা ক্রাইটেরিয়া করা হয়েছিল। গভমেন্ট অর্ডার করে এটা করে দেওয়া হয়েছিল। দেয়ার শুড বি সাম সিলেকশন প্রসিডিউর। এ জন্য সিনসিয়ারিটি থাকতে হবে। আমার মাথার মধ্যে যদি খারাপ চিন্তা থাকে যে আমার লোক হতে হবে, তাহলে তো আপনি পারবেন না। দে মাস্ট হ্যাভ দ্য অথরিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইল পাওয়ার টু এক্সিকিউট দেওয়ার পাওয়ার। ইলেকশনের সময় কী ধরনের সরকার থাকবে, সেটা আগে থেকে ঠিক করতে হবে। আমরা এই সিস্টেম অ্যাডপ্ট করেছি ব্রিটিশদের কাছ থেকে। দেখতে হবে, তারা কী করছে। ইলেকশনের আগে পুরো ক্যাবিনেট রিজাইন করে, রাজা বা রানি সিটিং প্রাইম মিনিস্টারকে কাজ চালিয়ে যেতে বলে। অন্য সবকিছু ডিসলভ করে দেওয়া হয়।

মহিউদ্দিন : শুধু রুটিন ওয়ার্ক করে।

মইন : বাকি সবকিছু দেখে ইলেকশন কমিশন। আমাদের নির্বাচনটা একটা বিজনেস হয়ে উঠেছে।

মহিউদ্দিন : লট অব ইনভেস্টমেন্টস।

মইন : প্রত্যেক দেশেই ইনভেস্টমেন্ট হয়। কিছু কম-বেশি। আমাদের দেশে কীভাবে হয়, দেখেন। ২০০৭ সালে একটা ইলেকশন হয়েছিল, ইউনিয়ন পরিষদের। যেখানে-সেখানে মাইক বাজছে না, গান-বাজনা হচ্ছে না, চা-বিস্কুট খাওয়ানো হচ্ছে না, খানাপিনা হচ্ছে না, এটা কেমন ইলেকশন?

চেয়ারম্যান ইলেকশনে কী করে? কতগুলো চায়ের দোকানে চা-বিস্কুট ফ্রি করে দেওয়া হয়। ক্যান্ডিডেটরা টাকা দেয়। তারপর আরও কত-কী। আমি ১০০ জন ভোটার দেব, আমাকে কত দিবা? এগুলা কিন্তু হরদম হয়।

ইলেকশনের আগে, ইলেকশনের সময় এবং ইলেকশনের পরে, আপনি যদি ভাগ করে দেখেন, কীভাবে খরচ হয়। ভোটের আগের রাতে ভোট বেচাকেনা করে—এটাকে বলে চান্দরাত। আমি এগুলি সব শিখেছি। চান্দরাতে করে কি, যারা ইলেকশন করে, হিউজ টাকা নিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করে।

মহিউদ্দিন : ২০০৮ এর ইলেকশনের আগের রাতে চিটাগাংয়ে এ রকম একটা ধরা পড়েছিল।

মইন : আমরা ধরেছি। নোয়াখালীতেও ধরেছি। যারা এগুলো করবে, তাদের অযোগ্য ডিক্লেয়ার করা দরকার। কোনো সেকেন্ড কনসিডারেশন নেই। পরে সে কোর্টে প্রমাণ করুক যে সে এটা করেনি। এই থ্রেটগুলো থাকতে হবে। সরকার এবং পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যদি চায়, তাহলে ফ্রি, ফেয়ার, ক্রেডিবল ইলেকশন সম্ভব।

অনেকে বলে, আমাদের লোকজন শিক্ষিত না। এ জন্য তারা ভোট বিক্রি করে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বলেছি, ভোট বিক্রি করেন না। আমি ৬০টা জেলায় মেলা করেছি। কীভাবে ভোট দিতে হয় ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছি। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। ওই সময় আমার স্লোগান ছিল : আপনার ভোট আপনি বিক্রি করতে পারেন, হয়তো আপনি ৫০০ টাকা পাবেন। ওই টাকা আপনি এক দুই দিন ভোগ করবেন। এর বেশি তো না? কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারেন, যে আপনার ভোট কিনল, নির্বাচিত হলো, সে পাঁচ বছর আপনাকে অভুক্ত রাখবে। দু-এক দিনের ভোগের জন্য আপনার পাঁচ বছরের খাবার অধিকার ছেড়ে দেবেন না। কিন্তু কে শোনে?

ভোট বিক্রি বন্ধ করার জন্য পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর টোটাল সাপোর্ট লাগবে। জনগণই ঠিক করুক, তারা কাকে ভোট দেবে। আর ভালো ইলেকশন কীভাবে হবে? দলগুলো তৃণমূল থেকে কেন প্রার্থী সিলেক্ট করে না? প্রাইমারি ইলেকশন হয় না কেন? আচ্ছা, ওইটা খরচের ব্যাপার, ঠিক আছে, বাদ দেন। পার্টির লোকেরা তো তাদের কাউন্সিলে ভোট দিয়ে বলে দিতে পারে, এটা ঢাকায় চেঞ্জ হবে না। গ্রাসরুটে যারা কাজ করে, তারা গ্রামের লোকের দুঃখ বোঝে। যিনি একবার ঢাকায় বসে ইলেকশনে জিতলেন, উনি এলাকায় যান না। গেলেও খুব কম যান। ফ্রাইডে সকালে যান, বিকালে চলে আসেন।

ভালো নির্বাচনের জন্য সবার অংশগ্রহণ থাকতে হবে—ভোটার, সরকার, পলিটিক্যাল পার্টির।

মহিউদ্দিন : ওই দুই বছর মিডিয়ার ভূমিকা আপনি কীভাবে দেখেন? পাবলিক এডুকেশনের জন্য মিডিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মইন : ঠিক। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মিডিয়াগুলো একেকটা পার্টির সঙ্গে অ্যাফিলিয়েটেড। নিউট্রাল যারা আছে, তারা নিউট্রাল কথা বলে। আমরা চাই নিরপেক্ষ মিডিয়া।

মহিউদ্দিন : পেশাদার।

মইন : হ্যাঁ, পেশাদার। ওই দুই বছর আমি কিন্তু মিডিয়াকে বন্ধু হিসেবে দেখেছিলাম। শত্রু হিসেবে না। প্রত্যেক দিন সকালে আমি প্রধান প্রধান কাগজগুলো দেখতাম। নোট রাখতাম। এবং অ্যাকশন নিতাম। দেরি করতাম না।

নরসিংদীর ওখানে যখন বন্যা হলো, লিখল যে গ্রামকে গ্রাম ডুবে গেছে। একটা ছবি দিল—এখানে খাদ্য নেই, মানুষ মারা যাচ্ছে। বললাম, কাল সকালে আমি যাব সেখানে। ব্যবস্থা করো। যেয়ে দেখি কি, গরুর ঘর আছে না? এমনভাবে ছবি নিয়েছে, গরু দাঁড়িয়ে আছে পানির মধ্যে, আশেপাশে কোনো বসতি নেই। ওখানে কোনো লোকও নেই, কী রিলিফ দিবে? একটা ভুল জিনিস তুলে ধরেছিল।

আরেকটা উদাহরণ দিই। একদিন *প্রথম আলো* পড়ছি, প্রথম পেজে দেখলাম, একটা বুড়া লোক, দড়ি দিয়া বান্ধা। নিয়ে যাচ্ছে থানায়। ওর বয়স প্রায় ৮০। এটা দিনাজপুরের কোনো এক এলাকায়। কী হয়েছে? সে ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছিল। দুইটা গরু কিনেছে। হালচাষ করত। কিছুদিন পর তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে যায়। গরিব মানুষ, কিছুই নেই। একটা গরু বিক্রি করে দিয়েছে। স্ত্রীর চিকিৎসার চেষ্টা করেছে। গরুও গেছে,

স্ত্রীও মারা গেছে। ওই টাকা দিয়ে কতই-বা ট্রিটমেন্ট সম্ভব? অভাবে পড়ে অন্য গরুটাও সে পরে বিক্রি করে দিয়েছে। তো চক্রসুদে অনেক টাকা লোন হয়ে গেছে। সে বোধ হয় নয় হাজার টাকা নিয়েছিল। এখন হয়ে গেছে ৩০ হাজার টাকা। তার নামে কেস হয়েছে। চার্জশিট বানিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। ওই ছবিটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

লোকটা ছিল 'হিন্দু'। আমার খুব খারাপ লাগল। ডিভ কমান্ডারকে (মে. জেনারেল ফাতমি রুমী) আমি সরাসরি ফোন করলাম। রংপুরের ডিভ কমান্ডারের আওতায় দিনাজপুর। আমি বললাম, আই ওয়ান্ট টু সি দিস ম্যান আউট অব দ্য জেল বাই দিস ইভনিং। টেল মি হাউ মাচ মানি আই হ্যাভ টু পে।

তিনি খুব এফিশিয়েন্ট অফিসার। সন্ধ্যার সময় আমাকে জানাল, স্যার, দ্য জব ইজ ডান।

কত টাকা পে করেছ?

স্যার, ৩০ হাজার।

৩০ হাজার দিলে কেন? তুমি তো নয় হাজার দিবে?

স্যার, আমি পারতাম। কিন্তু তাকে এত তাড়াতাড়ি বের করা সম্ভব হতো না।

এটা আবার *প্রথম আলোর* রিপোর্টার টের পেয়ে গেছে যে সে ছাড়া পেয়েছে। সে কীভাবে জেনে গেছে যে এর পেছনে আমি আছি। যদিও আমি বিষয়টা গোপন রাখতে বলেছিলাম। ওই লোকটাকে রিপোর্টার জিজ্ঞেস করেছে, আপনি কি জানেন, কীভাবে ছাড়া পেয়েছেন?

জানি না। আমার পক্ষে তো এত টাকা দেওয়া অসম্ভব। আমার একটা ছেলে আছে, বিয়ে করেছে। তার নিজেরই খাওয়া জোটে না। সে ৩০ হাজার টাকা দেবে কোথা থেকে। আমি ভেবেছি, বাকি জীবন আমার জেলেই কাটবে। কিন্তু আমি জানি না, কীভাবে জেল থেকে বের হয়ে এলাম। যে-ই এটা করে থাকুক, ভগবান তার মঙ্গল করুক।

মিডিয়াকে আমি কোনো সময় শত্রু ভাবিনি।

মহিউদ্দিন : ওই রিপোর্টারটা তো আপনাকে হেল্প করল?

মইন : যেকোনো রিপোর্ট আসুক, দরকার হলে ডাবল চেক করব—এটা কি সত্যিই হয়েছে? তারপর অ্যাকশন নেব।

মহিউদ্দিন : দিনাজপুরের রিপোর্ট আর নরসিংদীর রিপোর্ট পুরোপুরি বিপরীত!

মইন : দেখেন, ভালো মানুষ আছে, ভালো রিপোর্টারও আছে। আবার

মটিভেটেড রিপোর্টও হয়। আপনি এখান থেকে ওখানে গেলেন—ইটস আ ট্রুথ। কিন্তু ওখানে যে একটা গল্প বানিয়ে দিল, যা সত্য নয়।

মহিউদ্দিন : জুসি স্টোরি!

মইন : ভেরি কমন। আরেকটা উদাহরণ দিই। ওয়ান-ইলেভেনের কিছুদিন পরেই আমার সম্বন্ধে এক সাংবাদিক লিখল—মাহাথির মোহাম্মদ, আরও কত প্রশংসা। নেভার কলড হিম, নেভার টকড টু হিম। এ ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। পরে বোধ হয় ২০১২ সালে, একই সাংবাদিক আমার সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা লিখেছে। আমাদের দেশে ভালোবাসা এবং ঘৃণা দুটোই ক্ষণস্থায়ী। দেয়ার শুড বি নো ইয়েলো জার্নালিজম। ইট শুড বি ক্লিন।

মহিউদ্দিন : অবজেকটিভ।

মইন : অবজেকটিভ। বাংলাদেশে কিছু পেপার আছে, তারা জার্নালিজম করছে। কিছু পেপার আছে, যারা ব্যবসার জন্য করছে। বিজনেস দিলেন না, আপনার নামে একটা বিরাট স্টোরি করে দিল। জার্নালিস্ট যদি বিজনেসম্যান হয়ে যায়...

আমাদের একটাই গোল ছিল, একটা ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন করব। ভোটার লিস্ট করার সময় ইলেকশন কমিশনের কিচ্ছু ছিল না। আমি সেনাবাহিনী থেকে ২৫টা কম্পিউটার দিলাম, অফিসার দিলাম। এটা করতে করতে এপ্রিল-মে এসে গেছে। জুন থেকে আমরা ঢাকার একটা উপজেলায় পাইলট প্রজেক্ট নিলাম। ইউএনডিপি আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। বলেছিল কত লাগবে। হিসাব করে বললাম, এতগুলো কম্পিউটার লাগবে, এই লাগবে সেই লাগবে। তারা টাকা দিয়েছে। এই টাকা হ্যান্ডেল করেছে ইলেকশন কমিশন, আমরা করিনি।

মহিউদ্দিন : ইলেকশন কমিশন কীভাবে গঠন করলেন, কে তাদের সিলেক্ট করেছেন?

মইন : চিফ অ্যাডভাইজারই সিলেক্ট করেছেন। বাইরের লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াতের কথা আমি বলেছি। কারণ, তাঁকে আমি ভালোভাবে চিনতাম। বলেছি, যদি আর্মড ফোর্সেস থেকে কাউকে নেন, ওনাকে নিতে পারেন।

দিস ওয়াজ মাই হাঞ্চ যে এসব করতে দুবছর লাগবে। কারণ, বর্ষাকালে কাজ করা কঠিন হবে। দিস টু ইয়ারস ক্যালকুলেশন ওয়াজ মাইন। আল্লাহ ইজ কাইন্ড। আমরা অক্টোবরের (২০০৮) মধ্যেই সব শেষ করেছিলাম।

মহিউদ্দিন : এই দুবছরের ব্যাপারে পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট হলো

কখন? প্রথমে তো এটা হয় নাই?

মইন : যখন ফটোসহ ভোটার লিস্ট তৈরির প্রশ্ন উঠল, তখনই এটা হিসাব করা হয়। প্রথম থেকেই বলেছি—দুই বছর। এটা ছিল একটা কঠিন কাজ। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে দেখলাম কোথায় আছি আমরা, এই স্পিডে গেলে তো শেষ করতে পারব না? তখন লোকজন বাড়ালাম, স্পিড-আপ করলাম।[১২]

সাক্ষাৎকারে মইন যা-ই বলে থাকুন না কেন, গণমাধ্যম বেশ চাপের মধ্যে ছিল। জরুরি অবস্থার খড়্গ তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল নানান ধরনের অলিখিত নির্দেশ, যা সংবাদকর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা তৈরি করেছিল। এ দেশে মুক্ত গণমাধ্যমের অবয়বটি কখনোই পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। সরকার নির্বাচিত কিংবা অনির্বাচিত হোক, ক্ষমতাসীনেরা নানাভাবে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে থাকেন।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রমবিষয়ক মার্কিন উপসহকারী মন্ত্রী এরিকা বার্কস-রাগলস ১৯ থেকে ২১ মে ২০০৮ বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা এবং টেকসই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। তখন এটা মোটামুটি জানা হয়ে গেছে যে ২০০৮ সালের শেষের দিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বার্কস-রাগলস ঢাকায় বেশ কয়েকটি বৈঠক করেন। একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য তিনি এমন একটি পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেন, যেখানে মুক্ত প্রচারণা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ থাকবে।[১৩]

বার্কস-রাগলস সাংবাদিক নেতাদের কাছে এমন অভিযোগ শুনতে পান যে সরকারি কর্মকর্তারা, বিশেষ করে ডিজিএফআইয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের হয়রানি করছেন। ডিজিএফআই থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের ঘন ঘন ফোন করে বলে দেওয়া হয়, কোন সংবাদ প্রচার করা যাবে না, কীভাবে প্রচার করতে হবে, ইত্যাদি। একটি বৈঠকে ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক মে. জে. গোলাম মোহাম্মদ এবং পরিচালক ব্রি. জে. এ টি এম আমিন এ ধরনের টেলিফোন করা হয় বলে স্বীকার করেন। বার্কস-রাগলস তাঁদের এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, বেসামরিক বিষয়ে সামরিক গোয়েন্দাদের ঘোঁট পাকানো বন্ধ করা উচিত।[১৪]

বার্কস-রাগলসের সঙ্গে বৈঠকে আইন উপদেষ্টা হাসান আরিফ একটি খসড়া আইন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, এই আইনে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীগুলো

সম্পর্কে কোনো নাগরিক 'তুচ্ছ' বা 'বিরক্তিকর' অভিযোগ করলে তার আর্থিক জরিমানা অথবা কারাদণ্ড হবে। হাসান আরিফ বলেন, প্রস্তাবিত আইনটি 'জঘন্য ও অত্যন্ত আপত্তিকর' এবং এর ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব তৈরি হতে পারে। হাসান আরিফের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, এসব বিষয় নিয়ে ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং তাঁরা অনেক ব্যাপারেই একমত নন। পরে বার্কস-রাগলস এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি উভয়েই ডিজিএফআই ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার আহমদ চৌধুরীর কাছে প্রস্তাবিত আইনটি নিয়ে উদ্বেগ জানান। ১ জুন ২০০৮ ওয়াশিংটনে পাঠানো রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির পাঠানো তারবার্তায় এসব কথা উঠে এসেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের পূর্বমুহূর্তে বার্কস-রাগলসের এই সফর সময়োপযোগী হয়েছে বলে তারবার্তায় মন্তব্য করা হয়।[১৫] এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল তাঁর একটি অভিজ্ঞতার বয়ান দেন এভাবে :

> ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে একটা ডেলিগেশন এসেছিল বাংলাদেশে। ওয়ান-ইলেভেনের সময় ডিজিএফআইয়ের ইনফ্লুয়েন্স টু দ্য মিডিয়া—এটা নিয়ে বাইরে তো আলোচনা ছিল প্রচুর। তখন আমি ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের বোর্ডের মেম্বার। ডেলিগেশনে নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, পাকিস্তান আর নেপাল থেকে একজন করে। তখন ফাহিম মুনয়েম ছিলেন ফখরুদ্দীন সাহেবের প্রেস সেক্রেটারি। আমি তাঁকে বললাম, তিনি ফখরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। দুই নেত্রী তো জেলে। আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে দেখা হলো। বিএনপির শফিক রেহমান—এঁদের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা সিরিয়াসলি চাচ্ছিল—আর্মির বিরুদ্ধে কমপ্লেইন, ওরা নানাভাবে মিডিয়াকে—তাদের সঙ্গে দেখা করা যায় কি না। কাজটা কঠিন। ব্রিগেডিয়ার মামুনকে বললাম, যদি কথা না বলেন, তাহলে তারা কিন্তু একটা খারাপ ধারণা নিয়ে যাবে। দে অ্যালাউড, ওই টিমটাকে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। তখন তারা তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে।
>
> তারা সাংবাদিকদের আলাদা আলাদাভাবে ডাকত। আওয়ামী লীগ নেতার মালিকানাধীন একটি দৈনিকের এডিটর হঠাৎ করে আমাদের লাঞ্চে দাওয়াত দিলেন, ঢাকা ক্লাবে। সাংবাদিকদেরই দাওয়াত। তো লাঞ্চের পর আমাদের যে গিফট দিলেন, তা হলো ডিজিএফআইয়ের কফি মগ।

বুঝলাম, দাওয়াত এডিটরের। কিন্তু অ্যারেঞ্জড বাই ডিজিএফআই।[১৬]

এক-এগারোর আগে নাগরিক চিন্তাচর্চা, অনুশীলন ও আন্দোলনের অন্যতম অনুঘটক ছিল সিপিডি। এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁকে এক-এগারোর সরকারের একজন সমর্থক হিসেবে বিবেচনা করেন অনেকেই। তিনি ওই সরকারের নানা কাজের একজন নিবিড় পর্যবেক্ষক ছিলেন। ওই সময়টিকে তিনি ব্যর্থ মনে করেন না। লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটা স্কোরকার্ড তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন :

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : অনেকে বলেন যে এটা একটা সুদূরপ্রসারী গভীর প্রস্তুতি, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির ফলশ্রুতি। আমি এটা মনে করি না। আমি মনে করি, দেশে শান্তিপূর্ণভাবে উচ্চবর্গের রাজনীতিবিদেরা যদি সংবিধানসম্মতভাবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং তার মাধ্যমে নতুন সরকার সৃষ্টি করতে পারতেন, তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে যদি দেখেন, তাহলে আমি মনে করি, বাংলাদেশের উচ্চবর্গের রাজনীতিবিদদের শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণেই এটা হয়েছে। এটাই বড় কারণ বলে মনে করি। তারপর আপনি যদি দায়িত্ব আরও ভাগ করতে চান, তাহলে যাঁরা ক্ষমতাসীন ছিলেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপালন করেন নাই। ওনারা এখানে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেটা প্রধান বিচারপতির বয়স বাড়ানো থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করা—এখানে চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। এটাই হলো মূল কারণ। যদি চাতুরী না করে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হতো, তাহলে অন্য রকম পরিস্থিতি হতো। এটা হলো তাৎক্ষণিক কারণ। যদি বিস্তৃত কারণ খোঁজেন, বাংলাদেশের রাজনীতির যে চরিত্র, গণতন্ত্রচর্চার যে সংস্কৃতি, অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা—নির্বাচন কমিশনসহ, যেভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, এ দেশে যেভাবে সংসদ নির্বাচন হয়, এগুলোর যে সামগ্রিক কাঠামোগত দুর্বলতা দশকে দশকে পুঞ্জীভূত হয়েছে—এটা হলো তার গভীর কারণ।

আমার দৃষ্টিতে, একটা গভীর কারণ আছে, আর তাৎক্ষণিকভাবে একটি শক—এই কারণটি আছে। এ জন্য কেউ গভীরভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে, এটা মাথায় রেখে ঘুঁটি চালিয়েছে, অন্য কেউ এটাকে মাথায়

রেখে লেখালেখি করেছে এই ঘটনাটাকে চিন্তা করে, আমার কাছে তা মনে হয় না। যেহেতু রাজনীতিবিদেরা তাঁদের অক্ষমতা স্বীকার করেন না, যেহেতু এটা করলে তা তাঁদের কাছেই যায়, সেহেতু ওনারা বিভিন্ন সময়—কোনো সময় নাগরিক সমাজ, কোনো সময় সেনাবাহিনী, কোনো সময় বিদেশি দাতাগোষ্ঠী, ইত্যাদির কাছে—ইংরেজিতে বলে স্কেপ গোট, নিমিত্ত খুঁজে বেড়ানো আরকি।

আমার আরেকটা পয়েন্ট হলো, যে পরিবর্তনটা হয়েছিল, যে প্রত্যাশাটা সৃষ্টি হয়েছিল নাগরিকদের ভেতরে বা জনমানুষের মধ্যে, প্রত্যাশা তো একটা সৃষ্টি হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই—ওই পুঞ্জীভূত কারণে। ওটা তাৎক্ষণিকতা না, ওটা গড়ে আসা ইতিহাসের কারণে।

এখন অনেকে বলে, এই আসা কি সফল হয়েছে? আরও এক ধাপ এগিয়ে কেউ কেউ বলেন যে ব্যর্থ হয়েছে। আমি এটা মনে করি না। আমি এটা মনে করি না এই কারণে, এখানে আবার দুভাগে দেখার আছে। একটা হলো, এই পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক কারণ এবং ফলাফল কী। তাৎক্ষণিক কারণটা ছিল নির্বাচন করতে না পারা। তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে সরকার রোডম্যাপের মাধ্যমে দুই বছর সময় নিয়েছে। অনেকে তিন মাস তিন মাস বলে। এটা তিন মাসের বিষয় ছিল না। হাইকোর্টের অনুমোদনসহকারেই রোডম্যাপ অনুমোদন হয়েছে, তারা সময়ের বাইরে যেয়ে করেনি। দুই বছরের কথা বলেছে, দুই বছরের বেশি এক দিনও যায়নি সরকার। এই আচরণটা আগের যেকোনো অনির্বাচিত সরকার থেকে ভিন্ন। এ জন্য তাদের অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে।

তিন মাসের পক্ষে যুক্তি ছিল না। কারণ, একটা বড় বিষয় ছিল নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া, যেটা হলো জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া এবং ভোটার লিস্ট ঠিক করা। ভোটার লিস্ট ঠিক করতে গিয়ে ওনারা জাল ভোটার বের করেছেন। তারপর ওনারা জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়েছেন। যখন জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়েছেন, তখন সকলে বলেছে, তারা আরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার জন্য অজুহাত সৃষ্টি করছে। সময়মতো এটা শেষ করবে, অনেকেই এটা বিশ্বাস করে নাই। তাৎক্ষণিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আপনি দেখেন, তাহলে ওনারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিশ্রুতির মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন করবেন বলেছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি তো রক্ষিত হয়েছে। কেউ যদি বলে যে এক-এগারোর সরকার ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে আমি বলব, প্রাথমিকভাবে এর চেয়ে সফল সরকার আপনি পাবেন না। কারণ, সে সুষ্ঠু নির্বাচন করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সুষ্ঠুতম নির্বাচন দিয়েছে। বর্তমান

সরকার এটা স্বীকার করে। যারা হেরে গেছে, তারা এখন অস্বীকার করলেও করতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টা হলো পুঞ্জীভূত কারণের সঙ্গে যুক্ত। একটা দীর্ঘমেয়াদি সময়ের মধ্যে যদি না-ও হয়, স্বল্প মেয়াদে কিছু সংস্কার, কিছু প্রতিষ্ঠান সংহতকরণের কাজ করবে কি না। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে তারা যে সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নাই, তা দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু একেবারে হয় নাই, তুলনামূলকভাবে এটা বলাও কষ্টকর হবে। বলা বাহুল্য, এই আকাঙ্ক্ষা তারা পূরণ করতে পারে নাই। এর অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে। সেটা উপলব্ধির অভাবের কারণে হয়েছে কি না, নাকি যে ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে এগুলো করা দরকার ছিল, তা ঠিকমতো করতে পেরেছে কি না, নাকি নিজেদের ভেতরেই নীতিভ্রষ্ট হয়ে গেছে, কেউ দুর্নীতিতে যুক্ত হয়ে গেছে—এ রকম ঘটনা হয়েছে কি না। সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে, আপনি সরকার বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন। আপনি তো সব সময় বলেন সেনাবাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তাহলে এখানে তো দুটি মুখ আছে, বা দুটো পর্যায়ও ছিল। প্রথম দিকে হয়তো সেনাবাহিনীর সমর্থন বেশি ছিল। পরে হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশি ভূমিকা নিয়ে সংলাপ করে নির্বাচনটা করেছে। আপনি কাকে বলছেন ব্যর্থ হয়েছে, এটাও আমাদের বুঝতে হবে। আপনি কি আমাদের সেনাবাহিনীর তৎকালীন কর্মকর্তাদের বলছেন, নাকি যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারে টেকনোক্র্যাট পর্যায়ের মন্ত্রী ছিল তাদের কথা বলছেন। লক্ষ করে দেখবেন, যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা কিন্তু কোনো দিন সেনাবাহিনীকে ধরে বলেন না। তাঁরা বলেন, অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি, পিএইচডি ব্যক্তি সরকারে ছিল, তারা কী করেছে। এভাবেই বলে। কিন্তু কোনো সময় অন্যদের ছোঁয় না।

এ ক্ষেত্রে আমার কথা খুব সিম্পল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার মূল কাজে ব্যর্থ হয়নি। সে অতিরিক্ত যে কাজের কথা বলেছিল, সে কাজে সফল হয়নি। সফল না হওয়াটায়ও একধরনের সফলতা আছে। এখন আপনি জানেন, কোন কাজ কোনভাবে করা উচিত না। অন্তত এটা তো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসেছে। সেগুলো ধরে ধরে এখন আলোচনা করা যায়। কোন কাজ করা উচিত, কোন কাজ করা উচিত না।

এক দল আছে, যারা সোজাসুজি বলেছে, আমিও শুনেছি, আগে যে দুটি বড় বড় অনির্বাচিত সরকার ছিল, জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ সাহেব, ওনাদের দুজনেরই অতিক্রান্তি—এক্সিট হয়েছে এভাবে যে ওনারা নিজেরা দল বানিয়ে গেছেন। এই সরকার দল বানায়নি। বলবেন, হয়তো চেষ্টা

করেছে, পারে নাই। কিন্তু মূল কথা হলো, দল বানানোর বিপক্ষে নাগরিক সমাজের একটা বড় ধরনের মতামত ছিল। যারা ওখানে দল বানাতে ব্যর্থ হয়েছে, তারাই আবার এসে আমাদের বলে, আপনারাই তো তখন দল বানানোর বিরুদ্ধে বলেছেন। কারণ, আমরা সব সময় চেয়েছি যে প্রচলিত রাজনীতিতে ফিরে যাব। সে জন্য হয়তো যারা দল বানানোর চেষ্টা করেছে ক্ষমতায় থেকে, ওই যে কিংস পার্টি করার চেষ্টা হয়েছে, ওটাতেও আগ্রহ দেখায়নি তৎকালীন নাগরিক সমাজের সক্রিয় ব্যক্তিরা। এবং যখন প্রফেসর ইউনূস দল বানাতে গেছেন, তখনো কিন্তু তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েননি। খেয়াল করবেন, তাহলে প্রফেসর ইউনূসের দলের চরিত্র তো আরেক রকম হতো। ওনাকে হয়তো পশ্চাদপসরণ না-ও করতে হতো।

মহিউদ্দিন আহমদ : উনিও এটা রিয়ালাইজ করেছেন।

দেবপ্রিয় : এই পুরো বিষয়টির মধ্যে নাগরিক সমাজের ভূমিকা কী? বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সরকারে নাগরিক সমাজ কেন যুক্ত হয়, পাকিস্তান থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য দেশে। যে কারণে নাগরিক সমাজ অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকে রাজনীতির মাধ্যমে পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু একসময় তারা রাজনীতি দিয়ে রাজনীতি পরিবর্তনের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, অধৈর্য হয়ে যায়। এটা অনেক দেশে দেখেছি। এমনকি পাকিস্তানে যখন মোশাররফ সরকার এসেছে, আমার অনেক বন্ধু, বিদগ্ধ ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে স্থানীয় সরকার করে দেবে, নারীমুক্তি হবে, দুর্নীতি বন্ধ করবে, ইত্যাদি। এটা নির্বাচিত লোকেরাও এসে প্রাথমিকভাবে বলে, পরে একটা হতাশা আসে। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে নাগরিক সমাজ সে সময় ক্ষমতায় থেকে দল বানানোর বিরুদ্ধে ছিল, অন্য রাজনৈতিক দল যখন বন্ধ অবস্থায় আছে, তখন দল বানানোর ক্ষেত্রে অন্যের উদ্যোগে অত ঝাঁপিয়ে পড়েনি এবং তাদের যেটুকু আকাঙ্ক্ষা ছিল—চালাক হোক বোকা হোক, নাগরিকেরা মনে করেছিল যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, আধুনিকায়ন—রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে, প্রচলিত রাজনীতিবিদরা খুব আগ্রহ নিয়ে কাজ করবে না। কিন্তু আপনি যদি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন এবং তারা যদি নির্বাচনের মাধ্যমে এসে সেটা অধিগ্রহণ করে, তাহলে হয়তো একটা সমাধান হয়ে গেল। এটা মনের ভেতরে ছিল, আমাদের মানবাধিকার কমিশন হবে, তথ্যের অধিকার হবে, নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হবে, একটা ব্লু-রিবন কমিটি করে আমরা জজ সাহেবদের নিয়োগ দেব, তৃণমূলে ইলেকশন করে জাতীয় সংসদে সদস্যপদে নমিনেশন আসবে, নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য-উপাত্তের

ঘোষণা দিতে হবে, মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্য তাদের সম্পত্তির ঘোষণা দেবে, সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবে, ইত্যাদি। একটা ধারণা ছিল, এসব প্রতিষ্ঠান তৈরি করে চলে গেলে, তারপর নির্বাচন হলে প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যাবে।

নাগরিক সমাজ যে কত বোকা, এটা হলো তার একটা উদাহরণ। ওরা দুই রকমের বোকামি করেছে। প্রথম বোকামিটা হলো তারা হয়তো মনে করেছে, ভালো মনে করে বোকা হয়েছে আরকি—ভেবেছে এটা এ রকম একটা সুযোগ, এটাকে ব্যবহার করা যায় কি না। আরেকটা বোকামি হলো, ওরা মনে করেছে, কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিলে চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের ভেতরে থাকবে।

মহিউদ্দিন : প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলবে।

দেবপ্রিয় : হ্যাঁ, দুটোই বোকামি হয়েছে। এটা হলো শিক্ষা, উপলব্ধি। একটা ক্লেশসাধ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছাড়া বড় ধরনের কিছু টেকসই করা যায় না। ভালো হোক মন্দ হোক, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চলমান রেখে ওটার ভেতরেই ডেন্টিং-পেন্টিং করে ফুট-ফরমাশ ঘেঁটে ঠিক করে দিয়ে যাওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত গগনবিদারী কোনো নেতৃত্ব সামনে না আসে। আরেকটা হলো, রাজনৈতিক উচ্চবর্গের মানুষেরা নাগরিক সমাজের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ, পাকা এবং স্মার্ট। আপনি প্রতিষ্ঠান বানিয়ে দিয়ে গেছেন। ওনারা এটাকে আবার খুলে ফেলতে পারে, ভেঙে ফেলতে পারে। আপনি কী করলেন, দেখেন। আপনি প্রতিষ্ঠান বানিয়েছেন? সেটা প্রতিষ্ঠানই থাকবে। সেখানে আমার লোক বসিয়ে দেব। অথবা তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে দেব না।

ওই যে নাগরিক সমাজ মনে করেছিল, প্রতিষ্ঠান থাকলেই ঠিকমতো চলবে, তারা অত্যন্ত 'নির্দোষ' একটা চিন্তা করেছিল, যেটা 'পাকা' ছিল না। আমরা দেখলাম, প্রতিষ্ঠান থাকলেও প্রতিষ্ঠান কেমনভাবে ব্যবহার করা যায়, ঠিক তার উল্টো কাজটাও প্রতিষ্ঠান করতে পারে। ওই দিক থেকে যেটুকু করেছিল, সেটুকুও টেকেনি।

নাগরিক সমাজে তো অনেক ধরনের লোক আছে। মূলধারার নাগরিক সমাজ হলো গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল নাগরিক যারা, তাদের কথাই বলছি। এর বাইরেও নাগরিক সমাজ আছে।

মহিউদ্দিন : শুরুর দিকে ইনিশিয়েটিভটা তো ছিল সেনাবাহিনীর। আপনার কি কখনো মনে হয়েছে যে ওদের সামনে কোনো ভিশন আছে কি নেই?

দেবপ্রিয় : এমন কিছু লিখিত তো ছিল না।

মহিউদ্দিন : তাদের মধ্যে কি সংহতি ছিল?

দেবপ্রিয় : সেটা আমি বলতে পারব না। আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রথম ইস্যুটা ছিল—দুর্নীতি। এটা একটা বড় ইস্যু হিসেবে বের হয়ে এসেছে। আপনি জানেন যে দুর্নীতির প্রেক্ষিত কী। হাওয়া ভবনের আলোচনা হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে জন্যই তো তৎকালীন বিরোধী দল এটাকে ইতিবাচকভাবেই দেখেছে। ওনাদের মধ্যে একটা আগ্রহ হয়তো ছিল, কিন্তু সমাজ বিবর্তনের যে ব্যাকরণ আছে, তার লক্ষ্য যদি আপনি বোঝেন, কিন্তু পদ্ধতি সম্পর্কে তো আপনার কোনো অনুশীলনই নাই। ধরেন, আপনার জমি বেদখল আছে। ওখানে গরিবও থাকতে পারে, বড়লোকও থাকতে পারে। প্রথম প্রথম রাস্তার পাশে যে সরকারি জমি বেদখল হয়ে ছিল, ওদের উঠিয়ে দেওয়া হলো। এটার তো একটা সামাজিক তাৎপর্য আছে। আপনি জানেন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা। কিন্তু আপনি জানেন না, কীভাবে এর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ককে জড়িত করে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ওই রকম একটি কাজ আপনি করতে পারেন কি পারেন না।

মহিউদ্দিন : আমার মনে হয়, ওরা যখন এটা করে ফেলে, তখন—হ্যাঁ, দুর্নীতি একটা বড় বিষয়, তারপরও একটা সিভিল ওয়ার সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল। যেভাবে মারামারি-কাটাকাটি চলছিল।

দেবপ্রিয় : বিষয়টির দুইটা পার্ট আছে। একটা হলো কনসেপচুয়াল বা ধারণাগত, আরেকটা হলো এটা কার্যকর করা। ওনারা তো কার্যকরের মানুষ। কিন্তু সেনাবাহিনী যে পদ্ধতিতে কার্যকর করে, এটা হলো বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থাকে কার্যকর করা। এটাই ওনাদের শিক্ষা। কিন্তু সামাজিক প্রক্রিয়ার ভেতরে—মানে গরিব তুলে দিচ্ছি না বড়লোক তুলে দিচ্ছি, কতজন গরিবের সঙ্গে একটা বড়লোক হবে এবং সেটাকে তোলার ক্ষেত্রে সামাজিক সংগঠনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, এটার ইমপ্যাক্ট অ্যাসেস করা, এটার ট্রেনিং-প্রশিক্ষণ ওনাদের নাই। এটা পেশাগত কারণে নাই। পেশাগত কারণে এটা আবার রাজনীতিবিদদের মধ্যে অনেক বেশি। এ জায়গাটাতেই একটা বড় দ্বন্দ্ব হয়েছে।

যদি ভিশনের কথা বলেন, হয়তো আগ্রহটা জানা ছিল, কিন্তু এটা কীভাবে করতে হবে, তা জানা ছিল না। আবার এক বছর বা দেড় বছর পরে বুঝেছে যে সবাইকে নিতে হবে, তখন দেরি হয়ে গেছে। তখন দুজন নেত্রীকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফলে নতুন একটা

রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আপনি কি মনে করেন, পুরোনো আমলের কর্নেল তাহের টাইপের কিছু?

মহিউদ্দিন : না, ওই ধরনের আর সুযোগ নাই।

দেবপ্রিয় : ওই রকম ছিল বলে আমার মনে হয় না। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা—ঘরে ঘরে পাঠচক্র করে কিছু করলাম। কিছু বুঝলাম না, কিছু বুঝলাম—আমার মনে হয় না এখানে এ ধরনের কিছু ছিল। যাঁরা মূল নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের একধরনের দেশপ্রেমিক আগ্রহ হয়তো ছিল, অন্তত ওই মুহূর্তে। পরে কী হয়েছে, তা বলতে পারব না। কিন্তু এটাকে কীভাবে অবয়ব দেওয়া যাবে, সেটাকে মূর্ত করা যাবে কীভাবে, সেটা ওনাদের ধারণা ছিল না।

মহিউদ্দিন : আমি একটা জিনিস বুঝি না। অনেক প্রিসিডেন্স আছে। আইয়ুব খান যখন মার্শাল ল দেয়, তার চার বছর পরে পার্টি করল, '৬২ সালে। এর মধ্যে অনেক রিফর্ম ওয়ার্ক করেছে। বিশেষ করে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন।

দেবপ্রিয় : দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের তো সবচেয়ে বড় মুক্তি দিয়ে গেছে।

মহিউদ্দিন : ৭০ বছর পর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অনুরূপ একটা রায় দিল। যখনই পলিটিকস করার শখ জাগে তখন লোক কেনাবেচা শুরু হয়ে যায়। এই প্রিসিডেন্সগুলো আছে। জিয়াউর রহমানের সময় দেখেছি, প্রথম একটা-দেড়টা বছর অন্য রকম। ভেতরে কী ছিল আমি জানি না। যখন সাত্তারকে হটিয়ে এরশাদ আসে, ইট ওয়াজ ওয়েলকামড বাই অলমোস্ট অল। কিন্তু পরে দেখা গেল কি, সে আবার আগের ধারায় ফিরে গেল। সেনাবাহিনীতে এই মডেলগুলো বা এই এক্সপেরিয়েন্সগুলো থাকা সত্ত্বেও তারা কি ওখান থেকে কোনো লেসন নিল না?

দেবপ্রিয় : সে জন্যই আমি বলি, যাঁরা বলেন যে অনেক প্রস্তুতি করে ওরা এসেছে, আমার কাছে তা মনে হয় না। কারণ, ওনাদের সে ধরনের চিন্তার প্রস্তুতি ছিল বলে মনে হয়নি। এখানে আরেকটা বড় বিষয় আসবে, নেতৃত্বের গুণগত মান। যে নেতৃত্ব বা দায়িত্ব নিল, সে কতখানি দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করতে পারে, কতখানি কনফ্লিক্ট রেজল্যুশন করতে পারে, দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে, নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে উঠে...।

মহিউদ্দিন : ওই সময় আরেকটা প্রবণতা দেখলাম, এটাও অনেকে ওয়েলকাম করেছে, রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রায়ণ। যেটাকে নানাভাবে ডেমোনাইজ করা হয়েছে 'মাইনাস টু' বলে। দলের মধ্যে

গণতন্ত্রের চর্চায় অনেকেই উৎসাহী হলেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে। পরে তাঁরা ভিকটিম হয়ে গেলেন।

দেবপ্রিয় : ওনারা যেটা করতে চেয়েছিলেন, এটা করার ক্ষেত্রে দুটো সমস্যা ছিল। ওনারা শেষে এসে যেগুলো বলেছেন, প্রেস কনফারেন্স করে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের চার নেতা, এটা কতখানি তাদের আন্তরিক চিন্তার দীর্ঘ অন্তর্বীক্ষণের ফলাফল, আর কতখানি ওই মুহূর্তে...

মহিউদ্দিন : সুযোগ নেওয়া।

দেবপ্রিয় : অথবা নিজের অন্য কোনো দুর্বলতাকে ওই মুহূর্তে ঢাকার জন্য তারা এই পদক্ষেপ নিল, এটা আলোচনার বিষয়। ওনারাই বলতে পারবেন—আপনি ওই দিন ওই কাজটা কেন করেছিলেন। আর যদি আপনি করে থাকেন, তাহলে আপনার পরবর্তী দশ বছরের কাজের সঙ্গে ওই কাজ তো মিলে না। হয় ওইটা ভুল ছিল, না হলে এখন আপনি— কিছু একটা হচ্ছে। এটা একটা বিষয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি হিসেবেও ওনারা, ওনাদের দলের নেত্রী যিনি, তার চেয়েও ওনারা বেশি সৎ, গুণমানসম্পন্ন মানুষ, এটা মানুষ গ্রহণ করে নাই। ওনারা যদি এটাকে একটা আন্তরিক প্রক্রিয়ার, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে বের করে নিয়ে আসত, যদি মানুষের কাছে সে রকম প্রতিভাত হতো, ব্যক্তি হিসেবে যে নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে ওনারা নিজেদের সামনে এনেছেন, যদি তাঁরা গুণমানসম্পন্ন হতেন, তাহলে ইতিহাস অন্য রকম হতো। ওনারা ওনাদের কর্মসূচির ক্রেডিবিলিটি দাঁড় করাতে পারে নাই, পার্সোনাল ক্রেডিবিলিটিও দাঁড় করাতে পারে নাই।

কথাগুলো হয়তো ঠিকই বলেছিল। কথাগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক আছে। ওই কথাগুলো আমাদের আগামী দিনেও আলোচনার ভেতরে রাখতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। এটা থেকে যেমন হলো, শুধু মেসেজ কারেক্ট হলেই হয় না, মেসেঞ্জারকেও কারেক্ট হতে হয়। মানুষ দেখেছে, তাঁরা যে কথাগুলো বলেছেন, যার বিরুদ্ধে এগুলো যাচ্ছে, তার চেয়ে তো ওনারা ভালো মানুষ না। এখন হয়তো সে কথাটা সত্য। মেসেজ এবং মেসেঞ্জারের একটা সম্পর্ক এটার ভেতরে আছে।

মহিউদ্দিন : দশ বছর তো হয়ে গেল ওয়ান-ইলেভেনের।

দেবপ্রিয় : একটা রেফারেন্স দিয়ে দেখেন, ওয়ান-ইলেভেন ভালো ছিল নাকি খারাপ ছিল। মানুষের কাছে দেন, জিজ্ঞেস করে দেখেন। যেকোনো পত্রিকায় লিখে মতামতের তালিকায় দেখেন, কে কী লেখে।

মহিউদ্দিন : একবার লিখেছিলাম। বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদেরা যখন অ্যারেস্ট হলো, অনেক মানুষ খুব খুশি হয়েছিল। খুশি হয়েছিল কিন্তু এই

কারণে যে মানুষ দেখল—কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ঘটনা থেকে যে প্রতিবাদ শুরু হলো, ওটাই তাদের জন্য কাল হলো। আমি জানি না, তারা হয়তো আরেকটা ফ্রন্ট খুলে ফেলল।

দেবপ্রিয় : সামাজিক সংবেদনশীলতা না থাকলে এ রকম হয়। আচার-আচরণের ফলে বৈরী পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। এটা তো তার একটি উদাহরণ।

দশ বছর হয়ে গেছে। একদল মানুষের স্মৃতিতে এটা একটা ভয়ংকর সময়। সেই ভয়ংকর সময়টা অনেকের জন্য—প্রথম দিকে অত ভয়ংকর ছিল না, পরের দিকে বেশি ভয়ংকর হয়েছে। প্রথম দিকে অনেক রাজনীতিবিদ সমর্থন দিয়েছেন, আমাদের নেত্রীও সমর্থন দিয়েছেন। ওনাদের জেলে যাওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গেল। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে কী আছে? সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে আছে—এ সময় ঘুষ-টুষ কম ছিল, সরকারি অফিসে গেলে কাজকর্ম পাওয়া যেত, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে না—এ রকম একটা পরিস্থিতি এল ইত্যাদি। একদিকে তথাকথিত সামরিক সমর্থনের সরকার, কিন্তু কথাবার্তার দিক দিয়ে খুব বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—কেউ বলতে পারবে না। বরং নির্বাচিত সরকারের আমলে নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি।

দশ বছরের স্মৃতিতে যদি মিলিয়ে দেখেন, সমাজে যে ধরনের বিভাজন আছে, ক্ষমতার বিভাজন আছে, ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষগুলো—ক্ষমতায়িত এবং ক্ষমতাহীনেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে এটা দেখবে।

এক-এগারোর ট্রিগারিং ফ্যাক্টর হলো, রাজনীতিবিদেরা সংবিধানসম্মতভাবে নির্বাচন করতে পারে নাই। যে প্রশ্নটা বারবার আসবে, কেন করতে পারে নাই—তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার কিছুতেই হেরে যেতে প্রস্তুত ছিল না। এটিই তো বিষয়? এ জন্যই তারা ছলচাতুরী করেছে। একটা ব্যবস্থাকে অপব্যবহার করে এর বদনাম করেছে। ওই শিক্ষাটা কি নিয়েছে রাজনীতিবিদরা? এই ধরনের পরিস্থিতিতে ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য এ রকম আচরণ করলে এ রকম প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সে জন্য এ রকম আচরণে আমাদের না যাওয়া উচিত। নাকি এ রকম শিক্ষা নিল যে আমি ওটাও করব, কিন্তু অন্য কিছু ব্যবস্থা রেখে করব, যাতে ওই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। সকলেই তো শেখে।[১৭]

এটা ধরে নেওয়া হয় যে এক-এগারোর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিএনপি। এক-এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বিএনপির মূল্যায়নে

ক্ষোভের প্রকাশ থাকা স্বাভাবিক। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই দলের প্রধান খালেদা জিয়া এই সময়টিকে তখন কীভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ *নয়া দিগন্ত* পত্রিকায় ছাপা হওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> বর্তমান সরকারের ওপর সাংবিধানিক ছত্রচ্ছায়া থাকলেও এর গঠন প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ। এই সরকার তত্ত্বাবধায়ক কি না তা নিয়েও বিতর্ক আছে। এ সরকার নিজেই তার মেয়াদ, কর্মপরিধি ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। এ সরকার অনিয়মিত হলেও বাস্তবতা। ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে এই বাস্তবতাকে আমাদের মেনে নিতে হতে পারে। এ সরকারের ভালো কাজগুলো বহাল রেখে ক্ষতিকারক ও বিতর্কিত কাজগুলো পরবর্তী পার্লামেন্ট পর্যালোচনার পক্ষপাতী আমরা।[১৮]

এক-এগারোর সরকার ব্যাকরণসম্মত ছিল না। এ ব্যাপারে ফখরুদ্দীন আহমদের নিজস্ব মত হলো, এটি অনির্বাচিত সরকার হলেও অসাংবিধানিক না। কেননা সংবিধানেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধি ছিল। তাঁরা দেখলেন, একটি ভালো ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে একটি সুষ্ঠু ভোটার তালিকা থাকা খুবই জরুরি। এটি তৈরি করা ছিল সময়সাপেক্ষ। সে জন্যই দুবছর। ফখরুদ্দীনের মতে, তাঁরা যে এত অল্প সময়ে একটা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা তৈরি করতে পেরেছিলেন, তা পৃথিবীতে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এক-এগারো পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুবছর সময়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। ইতিহাসে তাঁর স্থান কেমন হবে? কোথায় হবে? মইন অবসরে যাওয়ার দুই বছর পরে *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পাতায় 'মইন : হিরো না ভিলেন?' শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপা হয়। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টির পাঠানো তারবার্তার সূত্র ধরে এই মূল্যায়ন উঠে এসেছে। মরিয়ার্টি ঢাকা থেকে মার্কিন সরকারের কাছে ১৪ জুলাই ২০০৯ তারবার্তাটি পাঠান। মরিয়ার্টি তারবার্তায় লেখেন যে এক-এগারোর সময়ের সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদের ব্যাপারে দুরকম অভিমত পাওয়া যায়। একটি পক্ষ মনে করে, ২০০৭ সালের নির্বাচন পেছাতে বাধ্য করে মইন সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। অন্য পক্ষের দাবি, ২০০৬-০৭ সালে যে রাজনৈতিক রক্তক্ষয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, তা এড়াতে মইনের ভূমিকাকে পুরস্কৃত করা উচিত। মরিয়ার্টি তারবার্তায় আরও লেখেন, ভুক্তভোগী বা উপকারভোগীরা যে যা-ই বলুন না কেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে মইন সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালনকালে জনগণের সঙ্গে বেইমানি করেননি। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং

অবসরে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি কথা রেখেছেন। এটা প্রমাণিত সত্য যে ২০০৮ সালের নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে অবাধ ও স্বচ্ছতম। সংশয়বাদীদের সংশয়কে মিথ্যা প্রমাণ করে তিনি অনেকটা নীরবে অবসরে চলে গেছেন।[১৯]

এক-এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিশেষ করে ওই সময়ে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে সমাজের বিভিন্ন অংশে বিতর্ক আছে, আছে নানান মত। ওআরজি-কোয়েস্ট পরিচালিত এক জনমত জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৭০ ভাগ উত্তরদাতা ওই সময়ে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা যথার্থ মনে করেন। ২৮ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, সামরিক বাহিনীর ভূমিকা যথার্থ ছিল না। সামরিক বাহিনীর ভূমিকা শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বেশি ইতিবাচক হিসেবে মনে হয়েছে এবং পুরুষের তুলনায় নারী উত্তরদাতারা বেশি সংখ্যায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকায় সন্তুষ্টি জানিয়েছেন।[২০]

সবকিছুতে দলীয়করণ সমাজে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও মেধার বিকাশের পথে বড় বাধা। এক-এগারোর দুই বছরে 'নিরপেক্ষতার' চাদরে সবকিছু ঢাকা ছিল কি না, এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এক-এগারোর পরে দলীয়করণের মাত্রা যে কমেনি, বরং বেড়েছে, তার প্রতিফলন দেখা যায় একটি গবেষণায়। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার এক বছর পার করার পর ওআরজি-কোয়েস্টের এই জরিপে দেখা যায়, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেছে। শতকরা ৪১ ভাগ তথ্যদাতা মনে করেন দলীয়করণ বেড়েছে। অন্যদিকে শতকরা ৩৬ ভাগ তথ্যদাতার মতে দলীয়করণ কমেছে। ২১ শতাংশের মত হলো, অবস্থা আগের মতোই রয়ে গেছে। নারী-পুরুষ এবং শহর-গ্রামনির্বিশেষে মোটামুটি একই ধরনের মতামত উঠে এসেছে জরিপে।[২১]

জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা নিয়ে সব সময়ই প্রশ্ন ছিল। সরকারি দলের কর্তৃত্ববাদী মনোভাব এবং বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের যে উদাহরণ তৈরি হয়েছিল, তাদের আচরণে পরিবর্তন আসবে বলে অনেকেই আশা করেছিলেন। জনমত জরিপে দেখা যায়, বিরোধী দলকে সংসদে আনার ব্যাপারে সরকারি দলের উদ্যোগ যথেষ্ট নয় বলে শতকরা ৩৫ ভাগ উত্তরদাতার ধারণা। অন্যদিকে শতকরা ৬৯ ভাগ উত্তরদাতা সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নেওয়ার এক বছর পর এই জরিপটি চালানো হয়।[২২]

# উপসংহার

দেশ যত দূর এগোতে পারত, ততটা পারেনি। বিভক্ত সমাজ খুব বেশি এগোতে পারে না। রাজনৈতিক বিভক্তি সমাজে সংহতির বুননটা ছিঁড়ে দিয়েছে, গাড়িটা লাইন থেকে পড়ে গেছে, ওটাকে আবার লাইনে তুলে দিতে হবে—এ রকম একটা আওয়াজ তুলে সামরিক বাহিনী ক্ষমতার নাটাইটা হাতে নিল। মনে হলো, একটা মারমার-কাটকাট ভাব, নিমেষেই সব সাফ-সুতরো করে দেওয়ার ভাববিলাস। রবীন্দ্রনাথ যেমনটি বলেছেন, 'ঠিক যেন একজন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্যক্ষেত্রময় হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে, পাছে পাখিতে শস্যের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়! পাখি পলাইতেছে বটে, কিন্তু কঠিন বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোনো খেয়াল নাই।'[১]

এক-এগারো নিয়ে আলোচনার দুটি দিক আছে। মূল প্রশ্ন হলো—এটা কি ক্রিয়া, না প্রতিক্রিয়া। আরও ব্যাখ্যা করে বলা যায়—এটা কি বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের অনিবার্য পরিণতি, নাকি এ ধরনের একটি পরিণতিতে আসার জন্য নানান আয়োজন হয়েছে। অবধারিতভাবেই এই আলোচনায় একটি বিষয় চলে আসে। আর তা হলো—ষড়যন্ত্রতত্ত্ব। ষড়যন্ত্রতত্ত্বের মূল কথা হলো—কিছু লোক বসে হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত নিল—চলো, আমরা কিছু একটা ঘটিয়ে দিই, এদের হটাই, ওদের বসাই। বিষয়টি কি এতই সরল?

এটা ঠিক যে হুট করে কোনো কিছু ঘটে না। একদিকে আছে কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সংকট ও টানাপোড়েন। অন্যদিকে আছে প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার জন্য নেপথ্য থেকে কলকাঠি নাড়ানো। এর মধ্যেই হয়তো ওত পেতে থাকে সুযোগসন্ধানীরা। এটা একটা সাধারণ কথা যে অভ্যন্তরীণ শর্ত তৈরি হলেই বাইরের পক্ষগুলো নাক গলানোর সুযোগ পায়।

বাইরের পক্ষ বলতে এখানে দেশি-বিদেশি উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় কেউ জেতে, কেউ হারে, কেউ হয় বলির পাঁঠা।

এক-এগারোর দমকা হাওয়ায় রাজনীতিবিদদের ছোট-বড় কুঠুরিগুলো তছনছ হয়ে গিয়েছিল। দেশের জন্য এটা ভালো হয়েছিল, নাকি খারাপ, তা নিয়ে অনেক দিন আলোচনা ও বিতর্ক হবে। সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছিল 'মাইনাস টু' ফর্মুলা নিয়ে। এই সঙ্গে জন-আলোচনায় চলে আসে ব্যক্তিবিশেষের রাজনৈতিক অপরিহার্যতার প্রসঙ্গ। এ দেশের রাজনীতিতে দুই পরাক্রমশালী নেত্রী কি সম্পদ না সমস্যা—এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্ন তুলেছিলেন নিজ দলের রাজনীতিবিদেরাই। তাঁরা হস্তক্ষেপের শর্ত তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেনা নেতৃত্ব মনে করেছিলেন, রাজনীতিতে কেউই অপরিহার্য নন।

১৬ জানুয়ারি ২০০৮ ধারণ করা ও ১৯ জানুয়ারি চ্যানেল আইয়ের 'তৃতীয় মাত্রা' অনুষ্ঠানে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল মইন ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দুই নেত্রী না থাকলে দুটি দল চলবে না—এমন ধারণা ঠিক নয়; সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর যে একচ্ছত্র ক্ষমতা, তা বদলানো দরকার। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে এ কাজটি করতে হবে। তবে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের অনুপস্থিতিতে দলে শূন্যতা তৈরি হবে বলে তিনি মনে করেন না। তবে আইনি প্রক্রিয়ায় দুই নেত্রী ছাড়া পেলে তিনি খুশি হবেন। দুর্নীতিবাজদের ধরতে গিয়ে অর্থনীতির ওপর চাপ পড়েছে বলে অনেকের ধারণার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'বডিতে টিউমার হলে অপসারণ করতে হবে। অপারেশন করলে কিছুদিন অসুস্থ থেকে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠবে।'[২]

শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার লক্ষ্যে দল দুটির ভেতরে শুরু থেকেই ভাঙন ধরাতে উঠেপড়ে লেগেছিল সেনা গোয়েন্দারা। রাজনীতিতে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে সংস্কার আনার নামে তারা রাজনীতিকদের সামনে টোপ ফেলে। এতে সফলও হয়। এসব রাজনীতিকের সঙ্গে তারা নিয়মিত বৈঠক করত। বেশির ভাগ বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল—সভায়, সেমিনারে, রাউন্ড টেবিলে মূলত দুই নেত্রীর বিরুদ্ধে কী কী বলবেন, সে বিষয়ে সবক দেওয়া। এসব সেমিনারের নেপথ্য আয়োজকও ছিল ডিজিএফআই। এ রকম একটি সেমিনার হয়েছিল শেরাটনে ২০০৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। সেমিনারে দুদলের সব সংস্কারপন্থী নেতা উপস্থিত ছিলেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে গোপন বৈঠক হতো সেনানিবাসের বাইরে। হাসিনা-খালেদাকে মাইনাসে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে রাজনীতিকেরা যাতে কোনো ঝামেলায় না পড়েন, সে জন্যই গোপন ব্যবস্থা। রাজনীতিকদের অনুরোধেই এটা করা হয়েছিল। বেশির ভাগ বৈঠক হতো রাতে। বৈঠকের একাধিক জায়গা ছিল। হাই প্রোফাইল রাজনীতিকদের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান বৈঠক হতো। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফরিদ এসব বৈঠক করতেন। হাসিনা-খালেদাকে মাইনাস করার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল। জেনারেল মইন ভবিষ্যতে দল করবেন এবং তিনি সেই দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচন করে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবেন, এটা তাঁরা চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর বিদেশি বন্ধুরা কিছুতেই সরাসরি সামরিক শাসনে আগ্রহী ছিল না। এভাবেই মইন রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন, ওদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তখন দল গঠন করা থেকে পিছিয়ে যান। তত দিনে বিএনপি ভেঙে গেছে। যদিও আওয়ামী লীগে ভাঙন ধরাতে পারেননি। তবে মইন যদি দল গঠন করতে পারতেন, দুদলের সংস্কারপন্থীরা তাতে যোগ দিতেন, সে রকম পরিকল্পনা ছিল হয়তো।

ধীরে ধীরে এক-এগারোর কুশীলবদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। কারণ, মইনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অন্যদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। মইনও বলতেন না। ফলে সন্দেহ বাড়তে থাকে। ওপর থেকে যে নির্দেশ আসত, অপারেশনাল অফিসাররা সেটাই বাস্তবায়ন করতেন। পরবর্তী কাজ কী হবে, তাঁরা তা জানতেন না। এদিকে হাসিনা ও খালেদার প্রতি অনুগত নেতা-কর্মীরা ঘুরে দাঁড়াতে ও মুখ খুলতে শুরু করেন। সবাই বুঝতে পারলেন যে হাসিনা-খালেদাকে মাইনাস করা যাবে না। তাঁদের অনেকেই চাচ্ছিলেন যে সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিক। মইন প্রথমে রাজি ছিলেন না। তিনি জানতেন, বিদেশিদের সমর্থন পাওয়া যাবে না। তখন মইনকে মাইনাস করে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করা হয়। গুঞ্জন ছিল এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা জেনারেল মাসুদ উদ্দিনের এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন বারী। মাসুদ তখন ব্যবসায়ীদের ধরপাকড়ে ব্যস্ত। ব্যবসায়ীরা অনেকেই কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে নিরাপত্তা খুঁজছেন। মাসুদের জনসংযোগ ছিল না। তাঁর পক্ষে প্রচারের জন্য জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে মাসুদ ছিলেন প্রধান অতিথি। বিষয়টি মইন জেনে ফেলায় ওই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। মাসুদকে অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়। বারীকে ডেপুটেশনে সেনাবাহিনীর আইটি বিভাগে একটি মর্যাদাহীন পদে বদলি করা

হয়। পরে মইনকে বলে-কয়ে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রতিরক্ষা অ্যাটাশের পদে নিয়োগ পান বারী।

এক-এগারোর সময় ব্রিগেডিয়ার এ টি এম আমিন ছিলেন কাউন্টার টেররিজম ব্যুরোর পরিচালক। তাঁর সহযোগী ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম জোয়ারদার ও লে. কমান্ডার মিজানুর রহমান। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার বারী ছিলেন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক। তাঁর সহযোগী ছিলেন লে. কর্নেল ফরিদ। আমিনকে বারীর তুলনায় মেধাবী মনে হতো। গোপনে কাজ করার কারণে তাঁর পরিচিতি ছিল কম। পদের কারণে বারীর ক্ষমতা ছিল বেশি। বারী ছিলেন মিশুক এবং আমিন ছিলেন অন্তর্মুখী। বারীকে আমিন সহ্য করতে পারতেন না বলে গুঞ্জন ছিল।

সাইফুল জোয়ারদার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ ছিল। তিনি ছিলেন খালেদা জিয়ার ভাগনে লে. কমান্ডার (অব.) সাইফুল ইসলাম ডিউকের ভায়রাভাই। এ জন্য তিনি জিয়া পরিবারের প্রতি ছিলেন দুর্বল। এক-এগারোর অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে—এ বিষয়টি খালেদা জিয়াকে জানাতে গোপনে এবং বেনামে খালেদা জিয়ার কাছে তিনি একটা ফ্যাক্সবার্তা পাঠিয়েছিলেন। জানা যায়, খালেদা এটি বিশ্বাস করেননি। সাইফুল পরবর্তী সময়ে বাংলার বাণী অফিসের সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানোর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দুবাই পালিয়ে যান।

নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এ দেশে ১৯৯১ সালে দ্বিদলীয় রাজনীতি শুরু হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল প্রায় অলঙ্ঘনীয় এক মেরুকরণ। প্রধান দুই রাজনৈতিক পক্ষ—আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রায় সব ব্যাপারেই বিপরীত অবস্থান নেওয়ায় মূল বিষয়গুলোতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তলানিতে ঠেকেছিল। দুই দলেরই নিজস্ব বলয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আছেন, আছে 'থিংক ট্যাংক'। ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার 'তৃতীয় পথ'-এর আদলে তাঁরা স্ব-উদ্যোগে কোনো তৃতীয় ধারার কথা ভাবেন, তার কোনো আলামত দেখা যায় না। অন্য ছোট ও মাঝারি দলগুলো রাজনীতির আকাশে এই দুই পরাশক্তির কক্ষপথেই ঘুরপাক খায়, তাদের আলোয় আলোকিত হয়। 'তৃতীয় ধারার নামে গুটিসুটি যেসব কর্মকাণ্ড দেখা গেছে, তার অনেকটাই সামরিক বাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আনুকূল্যে বা প্রশ্রয়ে অনুপ্রাণিত।' ফলে গোড়া থেকেই এসব উদ্যোগের ব্যাপারে জনমনে প্রশ্ন ছিল।[৩]

মূল প্রশ্ন হলো, এক-এগারোর মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ কি জরুরি ছিল? ওই সময় জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের

সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ হুমকির মুখে পড়েছিল বলে জানা যায়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে সরকারগুলো পশ্চিমের ক্ষমতাধর দেশগুলোর অপছন্দের এবং তাদের স্বার্থবিরোধী, সেই সব সরকারকে অস্থিতিশীল অবস্থায় ফেলতে অথবা ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার অনেক নজির আছে। এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, বাংলাদেশে যে ধরনের হস্তক্ষেপ ঘটেছে, তেমন কোনো হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় কি না, সে ব্যাপারে প্রধান দাতাদেশগুলোর মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের হস্তক্ষেপ জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। ওই সময় সব দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্তিশালী জনমত ছিল। এটি কোনো সাধারণ পরিস্থিতি ছিল না। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলামের মতে, 'অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গড়ন তৈরিতে হস্তক্ষেপের জন্য ক্ষমতাধর দাতাদেশগুলোর এমন প্রচণ্ড বা অপ্রতিরোধ্য চাপের সামনে সেনাবাহিনীকে ছেড়ে দেওয়া শেষ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত কি না, সেটা এক বিতর্কের বিষয়। বিশেষ করে, যখন সেনাবাহিনীর হাতে রয়ে গেছে বলপ্রয়োগের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ।'[৪]

গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার নিরিখে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বিশ্লেষণ হলো, সেনাবাহিনী নানা ছুতানাতায় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি। সেনাবাহিনী সব সময় কোনো না কোনোভাবে 'বিপথগামী' রাজনীতিবিদদের শায়েস্তা করার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং সেই সব রাজনীতিবিদকে তাঁদের 'উপযুক্ত জায়গায়' পাঠানোকে দায়িত্ব মনে করেছে। ১৯৭৫-৯০ সময়ে যে অভ্যাস তৈরি হয়েছে, তা ভাঙা এত সহজ নয়। এত দীর্ঘ সময় ধরে সেনাবাহিনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ক্ষমতাচর্চার যে স্বাদ পেয়েছে, তাতে সাধারণভাবে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে তাদের যে শুধু নিচু ধারণা তৈরি হয়েছে তা-ই নয়, বরং যখনই তাদের মনে হয় কোনো রাজনৈতিক সরকার 'বিপথগামী', তখনই সেটিকে সরিয়ে দেওয়াকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে।[৫]

সামরিক হস্তক্ষেপের শর্ত রাজনীতিবিদেরাই অনেক সময় তৈরি করে দেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা বা সুস্থ প্রতিযোগিতার রীতিনীতি গড়ে ওঠেনি। বিজয়ী দলের 'সব দখলের' মানসিকতা গণতন্ত্রচর্চার সহায়ক হয়নি। এই দখলি মনোভাব থেকেই জন্ম হয়েছে আজীবন কর্তৃত্ব করার মানসিকতা। ফলে নির্বাচনব্যবস্থায় নিয়ামক হয়ে উঠেছে 'পাতানো খেলা'। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ সব সময়ই ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সামরিক

হস্তক্ষেপ চেয়েছে, উৎসাহিত করেছে, বৈধতা দিয়েছে। এটি দেখা গেছে ১৯৭৫, ১৯৮২ ও ২০০৭ সালে।

অসামরিক সরকারগুলো সব সময় দলীয় আনুগত্য খোঁজে। সামরিক বাহিনীও এর আওতার বাইরে থাকেনি। সেনাবাহিনীর উঁচু পদে 'পছন্দের লোক' নিয়োগ দিয়ে তারা সেনাবাহিনীর মধ্যে টানাপোড়েন ও বিভক্তি সৃষ্টির শর্ত তৈরি করে। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যেও 'পছন্দের দল' বেছে নেওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়।

এ দেশে সেনা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেনাবাহিনী যখন কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেয়, তখন পক্ষভুক্ত দলটি স্বাভাবিকভাবেই তার কর্তৃত্ব কিছুটা হলেও সেনাবাহিনীর কাছে ছেড়ে দেয় বা ভাগাভাগি করে নেয়। ফলে কখনো কখনো সেনাবাহিনী প্রকাশ্যেই ক্ষমতার ভাগীদার হতে চায়। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার একটি উপায় হলো 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' নামের কিছু একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে এর মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে অংশ নেওয়া।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই এ দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, কখনো অসামরিক সরকারের আবরণে, কখনোবা সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায়। 'আমাদের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক না কেন, আমরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হটানোর জন্য সেনা হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করব না'—এ রকম একটি অঙ্গীকার বাস্তবে নেই। থাকলে এ দেশে সামরিক বাহিনী কখনোই রাজনীতিতে নাক গলাতে পারত না। আর সেনাবাহিনী যখন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে, তার পেশাদারত্ব মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। দীর্ঘ মেয়াদে এর ফল ভালো হয় না।

এক-এগারো পরবর্তী ২৪ মাসের উথালপাতাল সময়টুকু রেখে গেছে অনেক জিজ্ঞাসা। এর ভালোমন্দের মিশেল থেকে একটি সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে। এ সময়ের অর্জনগুলো চোখে পড়ার মতো। ভালো কাজগুলোর মধ্যে ছিল দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা তৈরি, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচনী বিধির সংস্কার, দুদকের পুনর্গঠন, তথ্য অধিকার কমিশন তৈরির উদ্যোগ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি এবং সর্বোপরি একটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান। এসব কাজ জনমনে প্রত্যাশার একটি শক্ত ভিত তৈরি করে দিয়েছে, যেখান থেকে পিছু হটার সুযোগ নেই।

'লাইনচ্যুত গাড়ি' ফের লাইনে তুলে দেওয়ার কাজে অনুঘটকের ভূমিকায় নিজেদের সীমিত রাখতে পারলে সেনানেতৃত্ব বাহবা পেতেন। কিন্তু

তাঁরা একসঙ্গে অনেকগুলো ফ্রন্ট খুলে বিপর্যয় ডেকে আনেন। গণহারে গ্রেপ্তার-হয়রানি ছিল অনাবশ্যক। গরিব মানুষের রুটি-রুজির ওপর আঘাত পড়েছিল। আতঙ্ক ছড়িয়ে ব্যবসা-বিনিয়োগ অনেকাংশে স্থবির করে দেওয়া হয়েছিল। দল ভাঙার খেলা এবং পূর্বসূরি সেনাশাসকদের আদলে অনুগতদের নিয়ে দল তৈরির চেষ্টা ছিল দৃষ্টিকটু। দেশের প্রধান দুই নেত্রীকে জোর করে নির্বাসনে পাঠানোর কৌশলটি ছিল ভুল। রাজনীতির রসায়ন বোঝার অক্ষমতা থেকেই এ ধরনের কাজ হঠকারিতা এবং ষড়যন্ত্র হিসেবেই চিহ্নিত হলো।

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে যে সেনা হস্তক্ষেপ ঘটল, সাধারণ মানুষ তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। তার মানে এই নয় যে মানুষ সেনাশাসন চেয়েছিল। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। মানুষের মধ্যে এ চাহিদা কিন্তু রয়েই গেছে। এবং এক-এগারোর ঘটনা থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে।

# পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

# মুহাম্মদ ইউনূসের 'যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন'

২০ মার্চ ২০০৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত নাগরিক সংলাপে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইউনূস 'যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন' শিরোনামে এই লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

আমার এ বক্তব্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। নাগরিক কমিটি বা গ্রুপের কারও সঙ্গে এ নিয়ে আমার আলাপ হয়নি। একে আপনারা আমার প্রস্তাবনা হিসেবে দেখবেন।

**যোগ্য প্রার্থী আমরা কীভাবে পাব?**

১.০ দুই বিশালায়তন অর্থনীতির মাঝখান থেকে আমরা কীভাবে আমাদের অবস্থানের সুবিধা নিতে পারি এবং আমাদের অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগাতে পারি, এ বিষয়ে আমি সম্প্রতি কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। পত্রিকায় আমার বক্তৃতা প্রকাশিত হবার পর থেকে বহু লোক আমাকে ফোন করেছেন, আমার কাছে লিখিতভাবে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন।

২.০ আমার এই বক্তৃতায় একটি বিষয় এসেছে—যোগ্য প্রার্থী আমরা কীভাবে পাব? রাজনীতিবিদেরা আমাদের কথামতো দলীয় মনোনয়ন দেবেন না। অতীতে যেভাবে টাকার জোরে, পেশির জোরে নির্বাচন হয়েছে, এবারও সে রকম হবে। তার থেকে বাঁচার উপায় কী?

৩.০ আমি জোর দিয়েছি নির্বাচনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ওপর। অন্য কোনো পথের সন্ধান যেন আমরা করতে না যাই। যা কিছু করি সংবিধানসম্মতভাবে যেন করি। কোনোভাবে যেন সংবিধানকে দুর্বল করে না ফেলি। কিংবা সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে না যাই।

৪.০ নির্বাচন অর্থপূর্ণ হবে না যদি-না আমরা যোগ্য প্রার্থী দাঁড় করাতে পারি। দুর্নীতিবাজেরা প্রার্থী হবে আর আমরা দলীয় আনুগত্যের কারণে তাদের ভোট

দিয়ে নির্বাচিত করব, সেটা কোনো রকমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করার নানা পন্থা হতে পারে। আমি তার মধ্যে কয়েকটি পন্থার উল্লেখ করেছি।

ক. ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রতিবাদ হিসেবে ব্ল্যাংক ব্যালট জমা দেওয়া।

খ. নাগরিকেরা উদ্যোগ নিয়ে নিজেদের পছন্দমতো যোগ্য প্রার্থী দাঁড় করানো।

গ. নিজ নিজ দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। ইত্যাদি।

ব্ল্যাংক ব্যালট জমা দেওয়া হলো শেষ পন্থা। হতাশার চরম বহিঃপ্রকাশ। এতে তাৎক্ষণিক কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

অন্য দুটি পন্থা নির্বাচনে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে।

## নাগরিকেরা যোগ্য প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে

৫.০ নাগরিকদের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রার্থী দাঁড় করানোর ব্যাপারে আমি যে বক্তব্য রেখেছি সেটা সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন অনেকে। আজ আমি চেষ্টা করব এর কিছুটা রূপরেখা দেবার জন্য।

৫.১ প্রথমত 'সৎ প্রার্থী আন্দোলন' বা 'যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন' নামে নাগরিকদের একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে।

তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হবে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে এক বা একাধিক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে। তাঁরা একটা আন্দোলন পরিচালনা কমিটি তৈরি করবেন। এই কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য একটি নির্বাহী কমিটি এবং একজন নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ করবেন।

৫.২ এই আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় সৃষ্টি করতে হবে। সিপিডি এই সচিবালয়ের দায়িত্ব নিতে পারে।

৫.৩ প্রত্যেক জেলা, নির্বাচনী এলাকায় স্থানীয় কমিটি ও সচিবালয় তৈরি করা যেতে পারে।

৫.৪ সকল নাগরিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে সচিবালয় করা যাবে।

## ৬.০ অ্যাকশন প্রোগ্রাম ও কিছু মূল নীতি

৬.১ যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের পক্ষ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় আন্দোলনের পক্ষ থেকে একাধিক প্রার্থীর একটি প্যানেল ঘোষণা করে দিতে হবে।

৬.২ আগামী এক মাসের মধ্যে আন্দোলনের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রার্থী ঘোষণা করে দিলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

৬.৩ সম্ভাব্য প্রার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে আন্দোলনের প্রার্থী হতে সংকোচের কোনো কারণ নেই। কারণ, আন্দোলনের প্রার্থীরা নির্বাচনে জেতার জন্য প্রার্থী হচ্ছেন না। অযোগ্য রাজনৈতিক প্রার্থীদের নির্বাচনে জেতা অনিশ্চিত করার জন্য দাঁড়াচ্ছেন।

৬.৪ দেশের সম্মানিত মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের তালিকা বানিয়ে তাঁদের মধ্য থেকে অন্তত একজন মহিলা ও একজন পুরুষ প্রার্থীকে নিয়ে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় আন্দোলনের প্রার্থীদের প্যানেল মনোনয়ন ঘোষণা করে দিতে হবে। এই তালিকায় ক্রমে ক্রমে আরও নাম যোগ করা যাবে।

৬.৫ সকল সংবাদমাধ্যমে আন্দোলনের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাঁরা কেন দাঁড়িয়েছেন তা ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। প্রার্থীরা নিজেরা সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারেন, সাক্ষাৎকার দিতে পারেন।

৬.৬ নির্বাচনের তফসিল অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলো যখন তাদের মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দেবে, তখন আন্দোলন দুটি কাজ করবে :

ক. যে আসনে রাজনৈতিক দলগুলো যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন দেবে, সে আসনের জন্য আন্দোলনের পক্ষ থেকে সকল প্রার্থী প্রত্যাহার করা হবে।

খ. যে আসনের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন পাবে না, সে আসনে আন্দোলনের পক্ষ থেকে চারজন প্রার্থী রেখে বাকি নাম প্রত্যাহার করবে। আন্দোলনের পক্ষ থেকে যাঁদের নাম ব্যালটে রেখে দেওয়া হবে, তাঁদের মধ্যে ২ জন মহিলা ও ২ জন পুরুষ প্রার্থী থাকবেন। প্রার্থীদের মধ্যে যাঁকে আন্দোলনের নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করা হবে, তিনিই যে আন্দোলনের মুখ্য প্রার্থী সেটা প্রার্থীদের এবং ভোটারদের জানিয়ে দিতে হবে। সকল প্রার্থী মিলে তাঁর পক্ষে প্রচারণা চালাবেন।

৬.৭ আন্দোলনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন থেকে নির্দিষ্ট প্রতীক বরাদ্দ নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় একজন মহিলা প্রার্থীকে আন্দোলনের নির্বাচনী প্রতীকটি দেবার চেষ্টা করা হবে।

৬.৮ চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ে মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। যাঁরা এলাকায় বসবাস করেন তাঁদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। যাঁরা কমবয়সী তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬.৯ একাধিক প্রার্থীকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে যাঁরাই মনোনয়ন পান না কেন শেষ পর্যন্ত সবাই একজনকে সমর্থন করে প্রচারকার্য চালিয়ে যাবেন। যিনি প্রতীক পাবেন তাঁকেই মূল প্রার্থী বিবেচনা করতে হবে।

৬.১০ ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজের পক্ষ থেকে, মহিলাদের পক্ষ থেকে স্থানীয় সচিবালয় সৃষ্টি করে আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

৬.১১ যেহেতু আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রচারণায় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না, সে জন্য প্রচারমাধ্যমকে আন্দোলনের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

## ৭.০ মনোনয়ন দেবার প্রক্রিয়া

৭.১ আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি থাকবে—যে কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে সকল নির্বাচনী এলাকার জন্য অন্তত একজন মহিলা ও একজন পুরুষ প্রার্থীর প্যানেল ঘোষণা করবে। জেলা পর্যায়ের একটি মনোনয়ন কমিটি থাকবে, যারা মে মাসের মধ্যে তাদের প্রার্থী প্যানেল ঘোষণা করবে। তারাও প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য মহিলা প্রার্থীসহ একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে।

নির্বাচনী এলাকায় একটি মনোনয়ন কমিটি থাকবে। তারা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অনুরূপভাবে তাদের প্যানেল ঘোষণা করবে।

৭.২ প্রত্যেক স্তরের তালিকায় অবশ্যই সমান সংখ্যক মহিলা প্রার্থী রাখতে হবে।

৭.৩ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবার পর আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য ২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা প্রার্থীর নাম রেখে প্যানেলে প্রার্থী সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাঁরা সবাই আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন।

## ৮.০ প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার

৮.১ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীই হোক আর আন্দোলনের প্রার্থীই হোক, আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করা হবে। আন্দোলন যাচাই করে দেখবে আন্দোলনের মাপকাঠিতে প্রার্থী 'যোগ্য' কি 'যোগ্য' নয়।

৮.২ যোগ্যতা বিচারের জন্য আন্দোলনের পক্ষ থেকে দুটি কাজ করতে হবে :

ক. যোগ্যতার এমন মাপকাঠি তৈরি করতে হবে, যা দিয়ে সহজে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করা যায়।

খ. মাপকাঠি এমন হতে হবে যাতে যোগ্য প্রার্থী অযোগ্য প্রমাণিত না হয়, এবং অযোগ্য প্রার্থী যোগ্য প্রমাণিত না হয়।

গ. কোনো কারণে যোগ্য প্রার্থী অযোগ্য বিবেচিত হলেও যেন কোনো অবস্থাতে অযোগ্য প্রার্থী যোগ্য প্রমাণিত না হয়।

ঘ. প্রার্থী অযোগ্য না হলেই যেন তাঁকে যোগ্য প্রার্থী বিবেচনা করা না হয়। যোগ্য প্রার্থী হতে হলে তাঁকে অবশ্যই যোগ্যতার বিচারে যোগ্য হতে

হবে। অর্থাৎ তিনি শুধু 'অযোগ্য'-ই হবেন না, যোগ্যতার বিচারে তাঁকে উচ্চ স্থানে থাকতে হবে।

## ৯.০ কারা যোগ্যতা বিচার করবেন

৯.১ আন্দোলন কর্তৃক যোগ্যতার মাপকাঠি স্থির করে সেটা প্রচারমাধ্যমে বহুলভাবে প্রচার করতে হবে। নাগরিকদের কাছ থেকে এই মাপকাঠি আরও পরিচ্ছন্ন, ব্যবহারযোগ্য এবং fail-proof করার জন্য পরামর্শ চাওয়া হবে। তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে এটা চূড়ান্ত করে আবার দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে আরও পরামর্শ এলে একে আরও পরিশীলিত করা হবে।

৯.২ আন্দোলনের মাপকাঠিতে প্রার্থীদের বিচার করে ফলাফল জানবার জন্য একটা যোগ্যতা বিচার কমিটি গঠন করা হবে। আমি প্রস্তাব করছি দেশের সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে এই যোগ্যতা বিচার কমিটি গঠন করা হোক।

৯.৩ যোগ্যতা বিচারে কেউ কমিটি কর্তৃক অযোগ্য প্রমাণিত হলে তিনি যাতে আপিল করতে পারেন তারও ব্যবস্থা রাখা হবে।

৯.৪ যোগ্যতা বিচার কমিটি অবিলম্বে গঠন করতে হবে এবং কমিটিকে অবিলম্বে যোগ্যতা বিচারের কাজে লেগে যেতে হবে।

৯.৫ এখন থেকেই কমিটি নিম্নলিখিত কাজ শুরু করতে পারে :

ক. প্রথমত বর্তমানে যাঁরা সংসদের সদস্য আছেন তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে ফেলে ফলাফল ঘোষণা করে দেওয়া যায়। কারণ ধরে নেওয়া যায়, তাঁদের অনেকেই আবার দলীয় মনোনয়ন পাবেন। নাগরিকেরা এখনই বলে দিতে পারেন তাঁদের মধ্যে কারা কারা প্রার্থী হবার যোগ্য নন।

খ. দ্বিতীয়ত যাঁরা বর্তমানে সাংসদ নন তবে আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হবার চেষ্টায় আছেন তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে ফেলা যায়।

এই দুটি কাজ করে ফেলতে পারলে রাজনৈতিক দলগুলোও এ ব্যাপারে তাদের নিজ নিজ স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলতে পারবে।

গ. তৃতীয়ত আন্দোলনের পক্ষ থেকে যতজনকে মনোনয়ন দেওয়া হবে ক্রমাগতভাবে তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে যেতে হবে।

জেলা কমিটিকে এবং নির্বাচনী এলাকা কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হবে তারা যাঁদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে চায় তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য যোগ্যতা বিচার কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিতে, যাতে তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। যোগ্যতা বিচার কমিটির ছাড়পত্র ছাড়া আন্দোলন পরিচালনা কমিটি কারও মনোনয়ন অনুমোদন করতে পারবে না। আন্দোলন পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ছাড়া জেলা কমিটি কিংবা নির্বাচনী এলাকা কমিটির মনোনয়ন চূড়ান্ত করা যাবে না।

## ১০.০ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতা

১০.১ আন্দোলনে সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠানের কমন অ্যাজেন্ডা হবে দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখা; নির্বাচনে কেউ অংশগ্রহণ করলে তার কাছ থেকে জনসমর্থন সরিয়ে নিয়ে তাকে পরাজিত করা; দুর্নীতিবাজ এবং অযোগ্য প্রার্থী যে দলেরই হোক নির্দয়ভাবে তার বিরোধিতা করা।

১০.২ সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের রূপরেখা রচনায় অংশগ্রহণ করবে। পরবর্তীকালে যারা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ও নীতিমালায় আস্থা স্থাপন করে আন্দোলনে যোগদান করবে তাদেরকে আন্দোলনের পার্টনার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরকে এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকায়, এক বা একাধিক জেলায় আন্দোলন পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রত্যেক জেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া যায়। প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া যায়। কোনো প্রতিষ্ঠান তার এলাকায় মুখ্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানকে সে দায়িত্ব দেওয়া যাবে।

## ১১.০ দুর্নীতি দমন কমিশনের গাইডলাইন

প্রত্যেক নির্বাচনে ঋণখেলাপিরা যাতে প্রার্থী হতে না পারে সে ব্যাপারে একটা আইন প্রয়োগ করা যায়। নির্বাচনে শুধু ঋণখেলাপিদের বাদ রাখতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম, এটা কেন হবে? দুর্নীতির কী হবে? দুর্নীতি দমন কমিশন কি একটা আইন জারি করতে পারে না—কোন কোন ধরনের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে দুর্নীতির কারণে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতে হবে? দুর্নীতি দমন কমিশনকে অনুরোধ করব দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঠেকানোর জন্য নির্বাচন কমিশনের জন্য অন্তত একটা গাইডলাইন যেন তাঁরা তৈরি করে দেন। এই গাইডলাইন আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রার্থী বিচারে কাজেও লাগানো যাবে।

## ১২.০ নাগরিকদের দায়িত্ব

সকল নাগরিক সচেতন হলে দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচনে পরাজিত করা সম্ভব। সংসদে যদি দুর্নীতিবাজ এবং অযোগ্য প্রার্থীরা সাংসদ হিসেবে ঢুকে পড়ে তবে আগামী মেয়াদে দুর্নীতির পরিমাণ এমন প্রচণ্ড মাত্রায় বেড়ে যাবে যে দেশে অস্থিরতা ও সহিংসতা তীব্র আকার ধারণ করবে। দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য প্রার্থীদের সংসদে প্রবেশ থেকে ঠেকাতে হলে এখনই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। সময় আমাদের হাতে খুব অল্প।

## পরিশিষ্ট ২

# শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার

'কালক্ষেপণ করছে সরকার : সেনাশাসন সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করছে'—এই শিরোনামে ভারতীয় টিভি চ্যানেল সিএনএন-আইবিএন-এর সুমন চক্রবর্তীকে দেওয়া শেখ হাসিনার এই সাক্ষাৎকারটি *নয়া দিগন্ত* পত্রিকায় ২১ মে ২০০৭ ছাপা হয়।

সুমন চক্রবর্তী : নির্বাচন ঠিক কখন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

শেখ হাসিনা : আপনি যদি আমাকে বলেন কখন, তাহলে আমি বলব শিগগির সম্ভব অর্থাৎ এই মুহূর্তে।

সুমন : বাংলাদেশে কখন গণতন্ত্র ফিরে আসবে বলে আপনি মনে করেন?

শেখ হাসিনা : অতীতে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের পর আমাদের দেশে সামরিক শাসন চলেছিল। সামরিক শাসকেরা আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। সংস্কারের নামে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কালক্ষেপণ করা ঠিক হবে না। সরকারের উচিত জনগণকে তাদের মনের মতো সরকার গঠনের অনুমতি দেওয়া।

সুমন : ঠিক এ মুহূর্তেই?

শেখ হাসিনা : হ্যাঁ, এ মুহূর্তেই।

সুমন : সরকার বলছে তারা এখনো ভোটার তালিকা তৈরি করেনি।

শেখ হাসিনা : তারা চার মাস ধরে একই কথা বলে আসছে। কিন্তু এই লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এখন ভোটার তালিকা তৈরির নাম করে তারা কালক্ষেপণের কৌশল অবলম্বন করছে। এ ধরনের কালক্ষেপণের কৌশল অবলম্বন করা ঠিক হবে না। কেননা জনগণ বোকা নয়।

সুমন : অন্তর্বর্তী সরকার দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে অনেক কথা বলছে। তারা বিএনপি ও আপনার দল আওয়ামী লীগের অনেক লোককে গ্রেপ্তার করেছে। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে আপনি কি আপনার দলের সেসব নেতাকে দল থেকে ছুড়ে ফেলে দেবেন?

শেখ হাসিনা : দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার প্রথমে যে অবস্থান নিয়েছিল সেটাকে আমরা সমর্থন দিয়েছি। কিন্তু সরকারের সেই অবস্থান এখন কোথায়? বহু দুর্নীতিবাজ

এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বিদেশে থাকাকালে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খোঁজ নেওয়ার কথা শুনেছি। আমার কত টাকা আছে কিংবা বিএনপি নেত্রীর কত টাকা আছে প্রথমে তারা সে হিসাব দিক।

সুমন : সেটা কি জনগণকে জানানো উচিত?

শেখ হাসিনা : হ্যাঁ, সেটা প্রকাশ করা হোক।

সুমন : বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের একযোগে রাজনৈতিক আন্দোলনে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

শেখ হাসিনা : না, বিএনপির সাথে কখনো কোনো আন্দোলন নয়।

## পরিশিষ্ট ৩

# প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জাতীয় সনদ' প্রয়োজন—এই শিরোনামে ১৩ মে ২০০৮ *প্রথম আলোয়* প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের একটি ভাষণ ছাপা হয়। ১২ মে ২০০৮ তিনি জাতির উদ্দেশে এই ভাষণটি দিয়েছিলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। ২০০৭-এর ১২ জানুয়ারিতে এক অনিবার্য পরিবর্তনের পটভূমিতে আমরা দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আজ প্রায় ১৬ মাসের সংস্কার কার্যক্রমের ভিত্তিতে আমরা কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক উত্তরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছি।

দায়িত্ব গ্রহণের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। নির্বাচনোত্তর একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। আপনারা জানেন, নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন ছিল সকল রাজনৈতিক দলের অভিন্ন দাবি। সে লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা দ্রুত নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের কাজটি সম্পন্ন করি এবং এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরিতে আত্মনিয়োগ করে। ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য আমি নির্বাচন কমিশন, সশস্ত্র বাহিনী, মাঠ প্রশাসন ও উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে এই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রয়াসে সার্বিক সহায়তা ও সমর্থনের জন্য দেশবাসীর প্রতি জানাচ্ছি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

একটি অর্থবহ, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো কালোটাকা ও পেশিশক্তি দমন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং

সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর ও গতিশীল করে তোলা। আপনারা জানেন, আমাদের, সরকার আপসহীনভাবে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে; এবং একটি নির্বাচন-উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে ইতোমধ্যেই বহুলাংশে সাফল্য অর্জন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের তরফ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে আমি সুস্পষ্ট ঘোষণা দেব।

আশা করি, এরপর সাধারণ নির্বাচন নিয়ে সকল প্রশ্ন, সন্দেহ ও সংশয়ের অবসান হবে। ডিসেম্বরের পর নতুন বছরের সূর্য একটি নির্বাচিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকেই স্বাগত জানাবে। এবং সেটা সম্ভব করে তুলবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ, সহযোগী রাজনৈতিক দলসমূহ, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও শুভবুদ্ধিপরায়ণ নাগরিক সমাজ।

আমরা এখন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। আমাদের লক্ষ্য, পূর্বঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে টেকসই গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠা করা। তবে এ কথা সত্য যে এ লক্ষ্য অর্জন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন একটি অভিন্ন জাতীয় ঐকমত্য। সে বাস্তবতার আলোকে রাজনৈতিক দলসমূহ এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রস্তাবনা অনুযায়ী জাতীয় সংলাপের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা মূল সংলাপের পূর্বে ২২ দিনব্যাপী প্রাক-সংলাপ সম্পন্ন করেছি। সরকারের পাঁচজন উপদেষ্টা এ ব্যাপারে নিরলসভাবে ও নিবিড় বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রাক্-সংলাপের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। আমরা প্রাক্-সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থার ভিত্তি নির্মাণে আমাদের আন্তরিক আগ্রহের বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছি বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সরকারের এই পাঁচজন উপদেষ্টা সকল রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মূল সংলাপের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত গ্রহণপূর্বক আমার নিকট সুপারিশ উপস্থাপন করেছিল। এই প্রেক্ষিতে আমি ঘোষণা করতে চাই, আগামী বাইশে মে থেকে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সংলাপে বসব। সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার দপ্তর থেকে আগামীকাল থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে চিঠি যাবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ঐতিহাসিক এ সংলাপে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যাতে সকল রাজনৈতিক দল, শ্রেণি-পেশা এবং সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে সূচিত এই জাতীয় ঐকমত্যকে একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও স্থায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সরকার, রাজনৈতিক দল, সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জাতীয় সনদ' তৈরি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই 'জাতীয় সনদ'-এর মাধ্যমেই স্থাপিত হবে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনী অবকাঠামো। সূচিত হবে একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, নির্বাচনকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে সরকার একাধিক কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান শীঘ্রই জারি করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো এসব নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পদক্ষেপ নেবে বলে আমরা আশা করছি। সরকারের এই গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলো কার্যকরী সম্পূরক ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। জাতি প্রত্যাশা করে, কালোটাকা, পেশিশক্তি, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব, মনোনয়ন-বাণিজ্য, প্রচারাভিযান, মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়সহ সামগ্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কলুষমুক্ত করা এবং আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে নির্বাচন-উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দল সংলাপের মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌছাবে।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতীয় নির্বাচনের আগেই কিছু পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই ব্যক্ত করেছে। তা ছাড়া উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানও তাদের কর্মপরিকল্পনায় আছে। জনগণের কল্যাণে দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করতে উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক, এটা সময়ের দাবি। এ বিষয়ে সরকার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতা দেবে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের এই উদ্যোগ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে বিঘ্ন ঘটাবে না। জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা থাকব আপসহীন। আমরা শুধু আশা করব, স্থানীয় সরকার নির্বাচন বৃহত্তর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূল আবহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন করা ছাড়া আমাদের সকল প্রচেষ্টা বিফলে পর্যবসিত হবে। সে লক্ষ্যে আমাদের প্রথম কাজ রাজনীতির গুণগত উত্তরণের সকল বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া। এ বিষয়ে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর স্বপ্রণোদিত অভ্যন্তরীণ সংস্কারের সফল বাস্তবায়ন আশা করি। জাতি আজ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ, সৎ, যোগ্য এবং গতিশীল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা সৃষ্টির জন্য প্রত্যাশিত সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন দেখতে চায়। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও কার্যকরী সম্পর্ক জনগণ অকুণ্ঠচিত্তে কামনা করে। রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় সকল কার্যকলাপে সুস্থ ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ধারার প্রবর্তন ও তা অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়ে ঐকমত্যের অপরিহার্যতা সকলেই উপলব্ধি করবেন বলে আমি আশা করি।

প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচন-পরবর্তী সংসদ কার্যকর করার ঐকমত্য নির্বাচনের আগেই প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাবনা ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। কেউ নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করবে না, সংসদ বয়কট করবে না, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আমি আশা করব, সংলাপে এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ জনস্বার্থে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সংস্কার করেছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে আরও এগিয়ে নেওয়ার দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করতে হবে। সে ব্যাপারে প্রস্তাবনার মাধ্যমে ঐকমত্যে উপনীত হতে হবে।

এ কথা আজ সর্বজনবিদিত, দুষ্ট রাজনীতির একটি অন্যতম উৎস হচ্ছে লেজুড় রাজনীতির অপসংস্কৃতি। যে শুভ উদ্দেশ্যেই অঙ্গসংগঠনের জন্ম হয়ে থাকুক না কেন, আজকের রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে অধিকাংশ অঙ্গসংগঠন আদর্শহীন লেজুড়-রাজনীতির অপসংস্কৃতি থেকে উদ্ধার করে সুস্থ ধারা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এর গুণগত উত্তরণ আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। সংলাপের মধ্য দিয়ে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুধাবন ও সুস্পষ্ট সমাধান আমাদের বের করতে হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

বর্তমান বিশ্ব অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্রুত অগ্রসরমাণ। বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে হতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। প্রতিটি দিন, প্রতিটি কর্মঘণ্টা আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে যে আমরা সকল প্রকার নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতি পরিত্যাগ করব। চির অবসান ঘটবে হরতাল, অবরোধ ও সহিংস বিক্ষোভের। জাতি ভবিষ্যতে কোনো প্রকার নৈরাজ্যমূলক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখতে চায় না।

এখানে আমি আরেকটি বিবেচ্য বিষয় তুলে ধরতে চাই। ক্ষমতাকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে প্রশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতিকীকরণের প্রবণতা বিগত দিনে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি পেয়েছে। দুঃখের বিষয়, দলীয়করণের এই অসুস্থ সংস্কৃতি কোনো অর্থেই জাতির জন্য শুভ নয়। যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালনা একটি সার্থক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য দিক। সকল রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এ বিষয়ে আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে। আমি আশা করব, সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে কার্যকর সমাধান ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

আপনারা জানেন, ১১ জানুয়ারি ২০০৭-এর পূর্ববর্তী নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির মূল কারণ ছিল আইনের শাসনের ভয়াবহ অবক্ষয়। আমাদের সরকার আইনের শাসন কায়েম করার ক্ষেত্রে আপসহীন ভূমিকা পালন করছে। আপনাদের সকলের আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থনের জন্যই সম্ভব হয়েছে দেশের

সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। এ জন্য আমি সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং আপামর জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা সকলেই একমত হবেন যে আমাদের সরকার দুর্নীতি দমন অভিযান পরিচালনা না করলে দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র সম্পর্কে জনগণ হয়তো পুরোপুরি অবগত হতে পারত না। দুর্নীতি জাতীয় অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু। দুর্নীতির এই দুষ্টচক্র থেকে আমাদের যেকোনো মূল্যে বেরিয়ে আসতে হবে। একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমি আশা করি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সকল শ্রেণি-পেশার জনগণ এমন প্রস্তাবনা রাখবেন যাতে ভবিষ্যতে সকল দুর্নীতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার বিন্যাসের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে ভারসাম্যের অভাব। অত্যধিক কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা স্থিতিশীল ও দায়িত্ববান শাসনব্যবস্থার জন্য মোটেও সহায়ক নয়। সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদগুলোর মধ্যে কী ধরনের ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য শুভ ভূমিকা রাখতে পারে, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরি ও সে ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সংলাপের একটি অন্যতম প্রধান অর্জন হতে পারে। আমি আশা করব, সকল পক্ষ এ বিষয়ে তাদের মেধা ও মনন খাটিয়ে সরকারব্যবস্থা ও রাজনীতির গুণগত উত্তরণের পথে জাতিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে আজ জাতি নির্বাচন-পরবর্তী সরকারের সার্বিক স্থিতিশীলতা কায়মনোবাক্যে কামনা করে। ক্ষমতার ভারসাম্য, আইনের শাসন, সুস্থ রাজনীতি, কার্যকরী সংসদ, জবাবদিহিমূলক প্রশাসন একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থার অনুষঙ্গ মাত্র। এ সকল অনুষঙ্গকে ধারণ করার মতো একটি অবকাঠামো বা রূপরেখা থাকা আবশ্যক। এমন একটি অবকাঠামো বা রূপরেখা যা জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে জাতিকে সব সময় ঐক্যবদ্ধ রাখবে। রাজনৈতিক দর্শন বা আদর্শের ভিন্নতা থাকতে পারে, তবে তা কোনোক্রমেই যেন স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করতে না পারে, সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমি সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন এবং আপামর জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি—আসুন, আমরা পরবর্তী সরকারগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমন একটি অবকাঠামো বা রূপরেখা তৈরি করি, যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা সর্বদা অটুট থাকবে। এ বিষয়ে আপনাদের সকলের প্রজ্ঞালব্ধ প্রস্তাবনা ও ঐকমত্য আজ জাতির একান্ত কাম্য।

আমরা আশা করছি, রাজনৈতিক দলগুলো খোলা মন নিয়ে আসন্ন সংলাপে অংশ নেবে। আমি আশ্বাস দিতে পারি, সরকারের কোনো পূর্বনির্ধারিত অ্যাজেন্ডা নেই।

কারও বিরুদ্ধে বৈরী ভাবও নেই। রয়েছে সমঝোতা-উন্মুখ মুক্ত মন। রাজনৈতিক অঙ্গনের যাবতীয় সমস্যা, সম্ভাব্য সমাধান ও করণীয় বিষয়ে তাদের মতামত রাজনৈতিক দলগুলো খোলাখুলিভাবে তুলে ধরবে। রাজনৈতিক কাঠামোর গুণগত উত্তরণের লক্ষ্যে গঠনমূলক প্রস্তাব রাখবে। এই প্রক্রিয়ায় রাজনীতিকদের অংশগ্রহণ সহজতর করতে এবং আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ করে দিতে আমি আগামীকাল থেকেই সারা দেশে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা জারি করা হচ্ছে।

নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নিঃসংকোচে এবং মুক্তভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের চলাফেরা, সভা অনুষ্ঠান, অন্যান্য পন্থায় প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে; যার সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে কমিশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রাসঙ্গিক এসব বিষয় বিবেচনায় এনে সরকার নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসময়ে জরুরি আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ স্থগিত বা শিথিল করার ব্যবস্থা নেবে। নির্বাচনকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে যা যা করা প্রয়োজন তার সবকিছু করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

প্রিয় দেশবাসী,

সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা যে সফল হতে পারি, তার নিকটতম উদাহরণ হলো দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো তিনটি প্রধান খাদ্যশস্য বোরো ধান, গম ও আলু উৎপাদনে রেকর্ড। এই বাম্পার ফলনের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি, সদিচ্ছা ও উদ্যোগ থাকলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি।

এই বিশাল অর্জনের জন্য আমি সরকার ও জাতির তরফ থেকে কৃষক সমাজকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই অর্জনের পেছনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, মাঠ প্রশাসন ও সেনাবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আমি আশা করছি, আগামী আমন মৌসুমেও কৃষি খাতের এই নবজাগরণের ধারা অব্যাহত থাকবে। সরকার বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষককে সকল প্রকার সহায়তাদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রিয় দেশবাসী,

সংলাপ এক অর্থে একটি বিশ্বাসনির্ভর উদ্যোগ। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, বৈরিতা থাকতে পারে, প্রতিযোগিতা থাকতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারে এগুলোই আমাদের মুখ্য পরিচয় নয়। জাতি আমাদের সকলের কাছে আশা করে একটি সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল উত্তরণ। এই পথে এগোতে হলে আমাদেরকে সংকীর্ণ প্রতিহিংসা ও অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

আমি জানি, এসবের উর্ধ্বে ওঠার সেই সাহস আমাদের আছে। এই সাহস প্রকাশ করার এখনই সময়। আমাদের পেছনে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রিয় মাতৃভূমির পনেরো কোটি মানুষের প্রতিটি হৃদয়ে সময়ের বাস্তবতায় আজ অপ্রতিরোধ্য স্বপ্ন জেগেছে। এই স্বপ্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্তরণের, বিশ্বদরবারে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান উদ্ভাসিত জাতীয় পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার।

প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়ায় দেশের সাধারণ জনগণের ভূমিকাকেই আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমরা অতীতের দলীয় রাজনীতির সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে আর ফিরে যেতে চাই না। আমরা দেশের সরকার ও রাজনৈতিক কাঠামোয় গুণগত ও অর্থবহ পরিবর্তন চাই। একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যাতে আইন ও সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব জনগণকেই নিতে হবে। নির্বাচনে যাতে সৎ, যোগ্য, জনকল্যাণে নিবেদিত, দেশপ্রেমিক, মেধাবী ও দক্ষ প্রার্থীরা জয়যুক্ত হয়ে জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেটাও আপনাদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি আলোকিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের চাবিকাঠি জনগণ, অর্থাৎ ভোটদাতাদের হাতেই গচ্ছিত থাকে। আমি আশা করব, দেশের সকল ভোটার নির্বাচনের দিন তাদের এই সাংবিধানিক দায়িত্বটি সুচারুরূপে পালন করবেন। নিজের ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সৎ, দেশপ্রেমিক, স্বচ্ছ ও সত্যিকারের জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় আমরা নিশ্চিতভাবে সাফল্য লাভ করব, ইনাশা আল্লাহ।

দেশমাতৃকার জন্য এক সোনালি ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচনে আগ্রহী রাজনীতিবিদদের জন্যও আগামী নির্বাচন সুবর্ণ সুযোগ এনে দিচ্ছে। আমি আশা করব, প্রবীণদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সৎ, যোগ্য ও উদ্যমী নাগরিকেরা এই সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার করবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমি আশাবাদী, আমাদের লক্ষ্য যখন এক ও অভিন্ন, তখন মত ও পথের আপাত-পার্থক্য সৌহার্দ্যমূলক আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমরা দূর করতে পারব। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, মূল্যবোধ ও বিধিবিধান এ দেশের মাটিতে আমাদেরকে অবশ্যই প্রোথিত করতে হবে। এবং তা যেন হয় চিরস্থায়ী। এই টেকসই ব্যবস্থা যেন শত প্রতিকূলতা ও বাধা-বিঘ্নের মুখেও আমাদের গণতান্ত্রিক অস্তিত্বকে বিশ্বমঞ্চে সগর্বে প্রচার করে, তা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে।

শেষ করার আগে আমার আজকের বক্তব্যের কয়েকটি কথা পুনরুল্লেখ করতে চাই :

১. এ বছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই নবম জাতীয় সংসদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. আগামী বাইশে মে থেকে আমরা দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু করব।

৩. আগামীকাল থেকে দেশব্যাপী ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে।

৪. নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও নির্বাচনী প্রচারণা সহজতর করার জন্য আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসময়ে জরুরি আইন ও বিধিবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা স্থগিত বা শিথিল করব।

৫. নির্বাচনের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জাতীয় সনদ' প্রণয়নের প্রয়াস নেওয়া হবে, যাতে করে নির্বাচনের পরে সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুণগত উত্তরণ ঘটে।

সংলাপকে সফল করার দায়িত্ব আমাদের সবার। এককথায় বলতে গেলে এখানে ব্যর্থতার কোনো অবকাশ নেই। আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। এখানেই আমাদের মূল শক্তি। ২০০৭ সালের এগারোই জানুয়ারিতে যে যাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম, তার সফল পরিণতি আমাদের দ্বারপ্রান্তে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা অবশ্যই পৌঁছাব।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বছরের শেষে আর থাকবে না। কিন্তু রয়ে যাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আমরা প্রবলভাবে আশাবাদী, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের আজীবন লালিত স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা একটি বাস্তব রূপ পাবে।

সেই আলোকিত ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ হাফেজ।

## পরিশিষ্ট ৪

# 'টাইম' ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন

'রাজনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে জে. মইনের দৃষ্টিভঙ্গি: প্রধান দলগুলোর বিরোধিতা'—এই শিরোনামে মার্কিন সাময়িকী *টাইম*-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের বাংলা রূপান্তর ২২ জুন ২০০৮ *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় ছাপা হয়। এই প্রতিবেদনে সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদের একটি সাক্ষাৎকারও ছিল।

কোনো বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত জেনারেল মইন ইউ আহমেদের অফিসে যেতে হলে অবশ্যই পেরোতে হবে তিনটি নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট। ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে হবে অনেক অনমনীয় সৈন্যের তল্লাশি। এরপর গুরুগম্ভীর নীরবতায়, এমনকি খানিকটা ভীতির ইঙ্গিতে চওড়া কাঁধের সহকারীরা আপনাকে তাদের কমান্ডার-ইন-চিফের কক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। কেউ হয়তো এ সময় ভাবতে পারেন সেনাসদরের এই ওক কাঠের ভারী দরজার ওপাশে রয়েছেন ভীষণদর্শী, দীর্ঘকায় কোনো সেনানায়ক। কিন্তু জেনারেল মইন ঠিক তেমনটি নন। তাঁকে বরং নজরকাড়া, খর্বকায় এবং নিজের মর্যাদা জাহির করেন না—এমন এক সুদক্ষ কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি বলাটাই ভালো। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দেশের রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের অনেক ব্যর্থতার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিষোদ্‌গার কিছুটা কমই করলেন। স্মিতহাস্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদের এই সামরিক কর্মকর্তা বলেন, 'কোনো ধরনের সরকার-পদ্ধতিই তাদের দিক থেকে খারাপ নয়। মানুষই তাদের খারাপ করে তোলে।'

৫৫ বছর বয়সী জেনারেল মইন সম্পর্কে খুব কমই জানা গেল। শুধু এটুকুই জানা গেল যে ১৫ কোটি মানুষের দেশটির অন্য যে কারও চেয়ে তিনি বেশি কিছু, যাঁর কাছে রয়েছে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। দেড় বছরের বেশি সময় আগে জে. মইনের সেনাবাহিনী দাঙ্গা-হাঙ্গামাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়, সংসদ নির্বাচন স্থগিত করে এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে সহায়তা করে—যেখানে রাষ্ট্র 'উপদেষ্টা' নামে পরিচিত কতিপয় আমলাকে নিয়োগ দেয়। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিযুক্ত হন সাবেক বিশ্বব্যাংক নির্বাহী ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। তারপর থেকেই বাংলাদেশে চলছে জরুরি অবস্থা। এতে নাগরিক অধিকার

আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, মধ্যরাতের অভিযানে হাজার হাজার সন্দেহভাজন গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, সত্যিকার অর্থে এই সবকিছুই পরিচালনা করছেন জেনারেল মইন এবং তাঁর সেনাবাহিনী। হার্ভার্ডে প্রশিক্ষিত এই জেনারেল তিন বছরের কম সময় আগে সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন এবং ক্ষমতার পরিধি বাড়ানোর ব্যাপারে লাজুক। বিদেশি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে প্রথম বড় ধরনের সাক্ষাৎকারে *টাইম*কে তিনি বাংলাদেশের কপট, নির্বিচার, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করার জরুরি প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি কোন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করেছিল এবং সেই বিশৃঙ্খল সময়টাকে স্মরণ করে বলেন, 'খুব দ্রুতই পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করছিল। বিশ্বের মানুষ দেখেছে রাস্তায় মানুষ মরছে। এমনটি কি চলতে দেওয়া যায়?'

কিন্তু পরিস্থিতি ১৮ মাস আগের সেই অন্ধকার পথেই যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বছরের শেষ নাগাদই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে—জে. মইন এ কথা বারবার বলে আসা সত্ত্বেও ১/১১-তে তাঁর আবির্ভাবে নবযুগ সূচনার যে প্রত্যাশা জন্ম নিয়েছিল, তা আর এখন অবশিষ্ট নেই। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই হতদরিদ্র, হতভাগা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পথে চলা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। দুই একনায়ক জেনারেলের শাসনামল বাদ দিলে দুই বৃহৎ বিবদমান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শাসনাধীন ছিল দেশটি। তাদের শাসনামলের অপরাজনীতি এবং ব্যাপক লুটপাটের ধারাই বর্তমান সেনাসমর্থিত শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সেনাবাহিনীর অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে খুব কম মানুষই বিশ্বাস করে যে জেনারেল মইন সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের ত্রাতা হয়ে উঠবেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশ ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেটিক গভর্ন্যান্সের পরিচালক গওহর রিজভী বলেন, 'আমরা যদি বাংলাদেশি হই, তবে ঠিক যেন আমরা এক বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে আছি। এখন আমরা নামব কী করে?'

**কারাবন্দী দুই নেত্রী :** বাংলাদেশের বিবদমান রাজনীতি এখনো আবর্তিত হয় দুই নেত্রীকে ঘিরে। প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই কান যে অর্থবহ সুচারু নির্মাণশৈলীতে বাংলাদেশের সংসদ ভবন নির্মাণ করেছিলেন, সেখানেই দুই শীর্ষ নেত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার বন্দিশালা করা হয়েছে। অবশ্য চিকিৎসার জন্য সাময়িক মুক্তি দিয়ে শেখ হাসিনাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে। এই দুই নেত্রী—একজন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতমের কন্যা এবং অন্যজন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতার বিধবা স্ত্রী। দুই দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্রাধান্য বিস্তার করা এ দুজন এখনো দুই শীর্ষ দলের কর্ণধার। কিন্তু তাঁরা দুজনই ১/১১ পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেওয়া দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে এখন কারান্তরীণ। সম্মানিত শিক্ষাবিদ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রধান মোজাফফর আহমদ বলেন, '১/১১-এর আগে সবার জন্য এটা ছিল অবাধে দুর্নীতির জায়গা। জনগণের তহবিল

তছরুপ করা হয়েছে, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সব ধরনের অপব্যবহার চলছে।' দুই দলেরই প্রখ্যাত ব্যক্তিরা কর ফাঁকি থেকে শুরু করে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ডজন ডজন মামলা চলছে। অসুস্থ রাজনীতি এবং অর্থলিপ্সার এই ইতিহাসটাই মুছে ফেলতে চান বলে দাবি করছেন জেনারেল মইন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে বলে গর্ব করে থাকে। তারা ১ কোটি ২০ লাখ ভুয়া ভোটারের ভোটার তালিকা দক্ষতার সঙ্গে শুধরেছে। সরকারের এসব দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগের উদাহরণ দেখিয়ে মইন বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশিরা এসব দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। তিনি বলেন, 'গ্রামের লোকেরা খুব সহজেই বশীভূত হয়। তারা খুব উদার হৃদয়ের। আপনি একজন অপরাধী হলেও যদি তাদের কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলেন, তবে তারা আপনাকে সহজেই গ্রহণ করে নেবে।' ১/১১ পরবর্তী সেনাসমর্থিত ক্ষমতার পালাবদলকে প্রথমে সবাই ব্যাপকভাবে সাদরে গ্রহণ করেছিল। সংসদীয় নির্বাচনে জয়ী হতে ১/১১ পূর্ব ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্যোগ নেয়। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভে সারা দেশ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। হরতালে অচল হয়ে যায় সারা দেশ। এমনই এক পরিস্থিতিতে সুশীল সমাজের উদ্বিগ্ন ব্যক্তিবর্গ এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কূটনীতিকেরা তখন মইনকে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান বলে এপ্রিলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের এক প্রতিবেদনে বলা হয়। মইন বলে থাকেন, তিনি সততার সঙ্গে যথার্থভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন। বেসামরিক সরকারকে সহযোগিতা করছেন—এমনই মন্তব্য তাঁর। শেষমেশ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ঢাকার খুব কম লোকেরই সন্দেহের অবকাশ থাকবে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আড়ালে থেকে সবকিছু পরিচালনা করছেন জেনারেলরাই।

রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, অনেক মাস ধরে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রেখেও আওয়ামী লীগ বা বিএনপির ক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিতে পারেননি তাঁরা। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর মতো হাসিনা ও খালেদাকে জোর করে দেশ থেকে বের করে দিতে চেয়েছেন—কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়েছেন। এই দুই নেত্রীর নেতৃত্বের আভায় এখনো দুই দল যৌথভাবে এ দেশের ৮০ শতাংশ মানুষের সমর্থনে ঋদ্ধ। আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'হাসিনা তাঁর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। ক্যারিশমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বাস্তবিকই এর মূল্য রয়েছে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দেশের রাজনীতিকে শুদ্ধ করতে চাইছে, ঢাকার অনেকেই তখন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী জরুরি অবস্থার অধীনে ৪ লাখ ৪০ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর এক-চতুর্থাংশের কিছু কম এখনো অন্তরীণ। এক মাস আগে সাংবাদিকেরা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা বলছেন, টিভি টক

শো স্থগিত করা হচ্ছে। সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের নজরদারির কারণে অনেক সম্পাদকই সেল্ফ-সেন্সরশিপ অনুশীলন করছেন। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর সদস্য আদিলুর রহমান খান বলেন, 'যেখানেই তাকাবেন, দেখবেন দরজার বাইরে থেকে কেউ নজরদারি করছেন।' বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, 'মুখ খুললেই আপনাকে জেলে যেতে হবে।' কয়েক সপ্তাহ আগে সরকার দেশব্যাপী ২৫ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করেছিল। যার অনেককেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে আটক দেখানো হয়েছিল—যাদের অনেকেই ছিলেন রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় নেতা-কর্মী। গত মাসে প্রকাশিত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে 'অত্যন্ত নাজুক' বলে নিন্দা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে যখন খাদ্যসংকটের কারণে কষ্টের সম্মুখীন, তখন সামরিক বাহিনীর প্রতি হতাশা বাড়ছে। চালের দাম ইতিমধ্যেই ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ বেড়ে গেছে। ফলে দেশটির লাখ লাখ দরিদ্র লোকের দুর্ভোগ চরমে ঠেকেছে। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক বলেন, এটা শুধু দরিদ্র লোকদের বাছবিচারের সমস্যা নয়, এটা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তবে জেনারেল মইন জানেন, খাদ্য স্বাধীনতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। সরকার চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করাসহ আলুর মতো বিকল্প খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোরও চেষ্টা করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার ফলে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমে গেছে। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান তুলনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে ঢাকাভিত্তিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ জানিয়েছে।

**অস্বস্তিবোধ:** রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। 'আমরা এখন চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে,' বলেছেন বিএনপি নেতা দেলোয়ার হোসেন। 'গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে।' তাঁর দল এবং ইসলামপন্থী দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যেই ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বৈরিতা বহু বছর ধরে চলে আসছে, নজিরবিহীনভাবে সেই দলের নেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তিও দল দুটির পক্ষ থেকে চাওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা তখন কারাবন্দী ছিলেন। গণতন্ত্রের আগাগোড়া সংস্কারের সরকারের অগণতান্ত্রিক উদ্যাগে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে।

দেশটিতে ১৯৯০-এর দশকে নির্বাচনী রাজনীতি আবার শুরু হওয়ার পর থেকে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পালা করে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু এ সময়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে তিক্ত রেষারেষি, সীমাহীন দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় এবং জাতীয় সমঝোতার দিকে দৃষ্টি দেয়নি বললেই চলে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার চৌধুরী বলেছেন, 'আমাদের নির্বাচনে পরাজয়ের ক্ষতি কমিয়ে আনতে হবে। নির্বাচনে যারা জিতবে তারা সব পাবে আর যারা হারবে তারা শুধু রাজপথে থাকবে—এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সে লক্ষ্যে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। সংবিধানের সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী করাই এর প্রধান আলোচ্য বিষয়।' তবে বিএনপি ও জামায়াতের মতো বড় রাজনৈতিক দলগুলো এখন পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে সংলাপে বসতে রাজি হয়নি। শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেওয়ায় আওয়ামী লীগ অবশ্য সরকারের সঙ্গে সংলাপে যাওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে।

বাংলাদেশের অনেক মানুষই মনে করে, ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি 'জাতীয় ঐক্যে'র সরকার গঠনের দিকেই সেনাবাহিনী ও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এগোচ্ছে। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া যদি ডিসেম্বরের আগেই বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা হারাবেন। যদি সে রকমই কিছু হয়, তবে মূল রাজনৈতিক দলগুলো ভেঙে ছোট ছোট অনেক দল জন্ম নেবে বলে একজন পশ্চিমা কূটনীতিক অনুমান করছেন।

তবে অন্য রকম ঘটনাও ঘটতে পারে। ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দলগুলো রাস্তায় নেমে এসে গণ-আন্দোলনের ডাক দিতে পারে। জেনারেল মইন বলছেন, 'যদি তারা গন্ডগোল করতে চায় তাদের করতে দিন।' জেনারেল মইন বাংলাদেশের বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষিত এবং একটি কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। তাঁর মতে, 'একটি দেশের জনগণ কী ধরনের নেতা নির্বাচন করে, সেটা দিয়ে আপনি ওই দেশের জনগণকে বিচার করতে পারেন।' বাংলাদেশের জনগণ ভাবছে, কখন তারা সত্যিই সেই সুযোগ পাবে।

## পরিশিষ্ট ৫

# বেগম খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎকার

'রাজনৈতিক সংকটকে পুঁজি করে চরম ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণ আনে না'—এই শিরোনামে সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ *নয়া দিগন্ত* পত্রিকায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সালাহউদ্দিন বাবর ও বার্তা সম্পাদক মাসুমুর রহমান খলিলী। এখানে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

*নয়া দিগন্ত*: জাতির এক ক্রান্তিকালে আপনি বিএনপি ও চার দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য এ মুহূর্তে সরকারের করণীয় কী বলে আপনি মনে করেন?

বেগম খালেদা জিয়া : সরকারের প্রধান করণীয় একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর জন্য ভারসাম্য এবং আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা খুবই জরুরি। এরই মধ্যে নির্বাচনের অনেক দেরি হয়ে গেছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা করা রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন করতে পারলেও অন্তত বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হতে পারে।

*নয়া দিগন্ত*: সরকারের পক্ষ থেকে আগামী নির্বাচনকে ফলপ্রসূ করতে দুই নেত্রী এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে একসঙ্গে বসানোর কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

বেগম খালেদা জিয়া : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও বোঝাপড়া থাকাই উচিত। তাই সমঝোতার যেকোনো উদ্যোগকেই আমি সব সময় স্বাগত জানাই। এ রকম উদ্যোগ আমি নিজেও অনেকবার নিয়েছি। দুর্ভাগ্যক্রমে তা সব সময় সাড়া পায়নি।

এখন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে এক টেবিলে বসানোর কিংবা প্রধান দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বৈঠকে বসানোর ব্যাপারে যে প্রস্তাব উঠেছে, আমি তাতেও সম্মতি দিয়েছি। এ উদ্যোগ কারা নিচ্ছে, এটা তাদের কাজ কি না, এ রকম প্রশ্ন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আমি তুলতে চাই না। কারণ, যেকোনো ভালো উদ্যোগ যে কেউ নিতে পারেন। তাদেরকে ছোট করে দেখার কিছু নেই।

*নয়া দিগন্ত*: রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা ও সহনশীলতার অভাবের কারণে ১১ জানুয়ারির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এ ধরনের পরিস্থিতি আসলে কেন সৃষ্টি হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

বেগম খালেদা জিয়া : বাংলাদেশে গণতন্ত্র বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। কাজেই এর অনুশীলনের ইতিহাস খুবই কণ্টকাকীর্ণ ও নাতিদীর্ঘ। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো এবং দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সহনশীল ও উদার গণতান্ত্রিক মানসিকতা এখনো গড়ে উঠতে পারেনি। এর জন্য হয়তো আরেকটু সময় লাগবে এবং গণতন্ত্রকে সুযোগ দিতে হবে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে কোনো বিষয়ে সমঝোতার অভাবে অনেক সময় সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। নানা রকম অনাকাঙ্ক্ষিত অঘটন ঘটে। এই অপরাধে যদি গণতন্ত্রকেই তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে দেশ আরও পিছিয়ে যায়। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির ঘটনাকে আমি এই চিন্তা দিয়েই মূল্যায়ন করি। আমার নিজের ধারণা, জরুরি অবস্থা এড়াতে পারলে ভালো হতো। বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছিল, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় সমঝোতার পথ পরিহার করে রাজপথে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হলো। সেই নৈরাজ্যের পথ ধরে জরুরি অবস্থা জারি হলো। সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। দেশ পিছিয়ে গেল। এর পেছনে পূর্বপরিকল্পিত কোনো ষড়যন্ত্রও থাকতে পারে, বাইরের ইন্ধনও থাকতে পারে। ভুল হয়তো রাজনীতিকদের হয়েছে। যে সরকার জরুরি অবস্থা জারি করেছে এবং এর আওতায় যারা ক্ষমতায় এসেছে, তাঁরাও ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নন। এখন পারস্পরিক দোষারোপ না করে দেশটিকে বিপর্যয় থেকে বের করে এনে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে সবাই মিলে।

*নয়া দিগন্ত*: ১১ জানুয়ারির ঘটনার পর দেশের রাজনীতিতে গুণগত কোনো পরিবর্তন আসবে বলে কি মনে করেন?

বেগম খালেদা জিয়া : আসা উচিত এবং কিছুটা আসবে বলে আমার ধারণা। কেননা ভুল মানুষই করে, আবার মানুষ নিজেই সে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগোনোর পথ করে নেয়।

২০০৭ সালে সবার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান আমরা করতে পারিনি। নির্বাচন বর্জন ও সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির পথ ধরে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। এর ফলাফল কোনো পক্ষের জন্যই ভালো হয়নি, দেশের জন্য তো নয়ই। এখান থেকে রাজনীতিকরা নিশ্চয়ই শিক্ষা নেবেন। যেকোনো বিপর্যয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে সবাই হানাহানির পথ ছেড়ে সমঝোতার বিষয়কে প্রাধান্য দেবেন বলে আমার ধারণা। রাজনৈতিক ভিন্নমতকে অনমনীয়তার আশ্রয় নিয়ে রাজনৈতিক সংকটে পরিণত করবেন না।

*নয়া দিগন্ত*: ১১ জানুয়ারির পরিবর্তনের পর দুর্নীতি দমন অভিযানের নামে রাজনীতিবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

বেগম খালেদা জিয়া : দুর্নীতি দমন অভিযানের নামে জরুরি অবস্থার আওতায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাতে মূলত রাজনীতিবিদরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বেশি। ফলে একে রাজনীতিবিরোধী অভিযান হিসেবে কেউ কেউ মনে করতে পারে।

এ মনোভাব দূর করার জন্য সরকার ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে।

*নয়া দিগন্ত*: রাজনৈতিক সরকার পরিচালনার সময় দুর্নীতিবাজরা বিভিন্ন কৌশলে প্রশাসনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে বলে অভিযোগ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিএনপি সরকার গঠন করলে এ বিষয়ে কী ধরনের মনোযোগ দেওয়া হবে?

বেগম খালেদা জিয়া : এ কথা সত্য এবং রাজনৈতিক সব সরকারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরবর্তী সময়ে জনগণের রায়ে সরকার গঠন করতে পারলে বিএনপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর আগে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নিয়েছিলাম, আগামীতে দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সে ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।

*নয়া দিগন্ত*: নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। দেশে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে কি মনে করেন?

বেগম খালেদা জিয়া : দেশের মানুষ নির্বাচনমুখী। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন চাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সম্মতিতে সরকার নির্বাচনের তারিখ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তরফ থেকেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশন এই প্রত্যাশার সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিলেই নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার। বিনা বিচারে আটক ও বিচারাধীন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর মুক্তি ও হয়রানি বন্ধ, তাদের মধ্যকার শঙ্কা দূর করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার মতো পরিবেশ সৃষ্টি। সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির জন্য প্রশাসনিক ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ। বিএনপি ও চার দলের প্রতি যেসব বৈষম্য করা হয়েছে তার নিরসন। সব দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি।

*নয়া দিগন্ত*: বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আগামী নির্বাচনের পর প্রধান দলগুলো মিলে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের অগ্রিম অঙ্গীকার প্রকাশ করা উচিত বলে কোনো কোনো পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিএনপির কোনো বক্তব্য রয়েছে কি?

বেগম খালেদা জিয়া : নির্বাচনের সময় সমমনা দলগুলোর মধ্যে একটা সমীকরণ হয়ে যায়। কিন্তু জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই আমার ধারণা। গণতন্ত্রে বিরোধী দল অপরিহার্য। একদলীয় পদ্ধতি বা সর্বদলীয় সরকার গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

*নয়া দিগন্ত*: বিএনপির যেসব নেতা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা কি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণে আপনার দল থেকে সুযোগ পাবেন?

বেগম খালেদা জিয়া : অভিযুক্ত মাত্রেই অপরাধী নয়। হস্তক্ষেপ ও প্রভাবমুক্ত

স্বাভাবিক পরিবেশে প্রচলিত আইনে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তার সম্পর্কে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমাদের দলের গঠনতন্ত্রেও কোনো সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদস্য থাকার সুযোগ নেই।

*নয়া দিগন্ত*: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে?

বেগম খালেদা জিয়া : জনপ্রিয়তা, যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সততা, নিষ্ঠা ও অঙ্গীকারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

*নয়া দিগন্ত*: আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি নিয়ে চিকিৎসার জন্য এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। আপনি কি তাঁর মুক্তি দাবি করেন?

বেগম খালেদা জিয়া : আমি বিচারের আগেই কাউকে সাজা দেওয়ার পক্ষে নই। সে কারণে তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেছি। তাঁকে দেশে ফিরতে বাধা দেওয়ার সময় প্রতিবাদ জানিয়েছি। দাবি করেছি তাঁকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ দিতে। আমি আশা করি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগের বিচার তিনি মুক্ত থেকেই মোকাবেলার সুযোগ পাবেন।

*নয়া দিগন্ত*: সম্প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে দুই নেত্রীর মধ্যে বৈঠকের কথা বলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

বেগম খালেদা জিয়া : আমি তাঁর সঙ্গে বসতে চাই, কথা বলতে চাই, আমি সৌহার্দ্যের সম্পর্ক চাই। দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থের সব দলের মধ্যে ন্যূনতম সমঝোতা ও সৌহার্দ্য থাকা উচিত বলে আমি বিশ্বাস করি।

*নয়া দিগন্ত*: সরকার বা অন্য কারও কাছ থেকে এ ধরনের প্রস্তাব কি এসেছে?

বেগম খালেদা জিয়া : আমাদের অভিন্ন আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক সাহেব এ রকম একটা বৈঠকের ব্যাপারে আমার মতামত চেয়েছেন। আমি তাতে সম্মতি দিয়েছি।

*নয়া দিগন্ত*: দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে জাতীয় বিষয়ে সমঝোতা বা ঐকমত্য হওয়া প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন। আপনার পক্ষ থেকে কি এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে?

বেগম খালেদা জিয়া : আমি বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে আহ্বান জানিয়েছি, উদ্যোগ নিয়েছি। আগামীতেও তা বহাল থাকবে।

*নয়া দিগন্ত*: আগামী নির্বাচন সামনে রেখে চারদলীয় জোটকে কি আরও সংহত ও সম্প্রসারণ করা হবে?

বেগম খালেদা জিয়া : আমরা সে রকম চিন্তা করছি। আগামীতে আপনারা জানতে পারবেন। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য খুবই জরুরি।

*নয়া দিগন্ত*: আপনার বড় ছেলে ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান এখন চিকিৎসার জন্য বিদেশে আছেন। ভবিষ্যতে তিনি কি রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন?

বেগম খালেদা জিয়া : এখন সে অসুস্থ। আগে তার চিকিৎসা ও সুস্থতা দরকার। চিকিৎসকরাই বলেছেন, এ জন্য অনেক সময় লাগবে। এখন অন্য কোনো কিছু ভাবারও কোনো সুযোগ নেই।

*নয়া দিগন্ত*: বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের এখতিয়ারবহির্ভূত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, অর্ডিন্যান্স জারি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব এখতিয়ারবহির্ভূত আইনকানুন বা নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কী হবে?

বেগম খালেদা জিয়া : বর্তমান সরকারের ওপর সাংবিধানিক ছত্রচ্ছায়া থাকলেও এর গঠনপ্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ। এই সরকার তত্ত্বাবধায়ক কি না, তা নিয়েও বিতর্ক আছে। এ সরকার নিজেই তার মেয়াদ, কর্মপরিধি ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। এ সরকার অনিয়মিত হলেও বাস্তবতা। ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে এই বাস্তবতাকে আমাদের মেনে নিতে হতে পারে। এ সরকারের ভালো কাজগুলো বহাল রেখে ক্ষতিকারক ও বিতর্কিত কাজগুলো পরবর্তী পার্লামেন্টে পর্যালোচনার পক্ষপাতী আমরা।

## পরিশিষ্ট ৬

### নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮

| দল | প্রাপ্ত আসন | প্রাপ্ত ভোট (% |
|---|---|---|
| **মহাজোট** | ২৬২ | |
| আওয়ামী লীগ | ২৩০ | ৪৮.০৪ |
| জাতীয় পার্টি | ২৭ | ৭.০৪ |
| জাসদ | ৩ | ০.৭২ |
| ওয়ার্কার্স পার্টি | ২ | ০.৩৭ |
| **চারদলীয় জোট** | ৩৩ | |
| বিএনপি | ৩০ | ৩২.৫০ |
| জামায়াতে ইসলামী | ২ | ৪.৭০ |
| বিজেপি | ১ | ০.২৫ |
| **অন্যান্য** | ৫ | |
| এলডিপি | ১ | ০.২৭ |
| স্বতন্ত্র | ৪ | ২.৯৪ |
| **মোট** | ৩০০ | |

* যে দলগুলো কোনো আসনে জয়ী হয়নি, তাদের তথ্য এখানে নেই।

সূত্র : নির্বাচন কমিশন

# তথ্যসূত্র

## নাগরিক ভাবনা

১. সিপিডি (২০০৬)। *নাগরিক সংলাপ—জাতীয় নির্বাচন ২০০৭ : জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ*। ঢাকা, পৃ. ৫-১০

২. ওই, পৃ. ২০-২২

৩. ওই

৪. ওই, পৃ. ৪৪-৪৫

৫. ওই, পৃ. ৪৬-৪৭

৬. ওই, পৃ. ১২

৭. ওই, পৃ. ১২-১৭

৮. ওই, পৃ. ২৩-২৬

৯. ওই, পৃ. ২৭

১০. ওই, পৃ. ৩৩৯-৩৪০

১১. ওই, পৃ. ২৭-৪০

১২. ওই, ৩০১-৩০৩

১৩. সিপিডি (২০০৭)। নাগরিক কমিটি ২০০৬-এর উদ্যোগে প্রণীত বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১। ঢাকা

## সংকট

১. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬)। *বিএনপি : সময়-অসময়*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৮০-২৮৯

২. 'ফখরুদ্দীনের অস্থির সময়', *মানবজমিন*, ৭ জুলাই ২০০৭

৩. আহমদ (২০১৬), পৃ. ২৮১

৪. *প্রথম আলো*, ২৯ অক্টোবর ২০১৬

৫. *ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর ২০০৬

৬. ওই
৭. *প্রথম আলো*, ৩০ অক্টোবর ২০০৬
৮. *ইত্তেফাক*, ৩০ অক্টোবর ২০০৬
৯. এ টি এম জহিরুল আলম
১০. *ইত্তেফাক*, ৩০ অক্টোবর ২০০৬
১১. ওই, ৩১ অক্টোবর ২০০৬
১২. ওই
১৩. *প্রথম আলো*, ১ নভেম্বর ২০০৬
১৪. ওই
১৫. *ইত্তেফাক*, ২ নভেম্বর ২০০৬
১৬. ওই
১৭. ওই
১৮. *প্রথম আলো*, ৩ নভেম্বর ২০০৬
১৯. ওই
২০. *ইত্তেফাক*, ৪ নভেম্বর ২০০৬
২১. ওই, ৫ নভেম্বর ২০০৬
২২. *প্রথম আলো*, ৬ নভেম্বর ২০০৬
২৩. ওই
২৪. *ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর ২০০৬
২৫. ওই
২৬. *প্রথম আলো*, ৯ নভেম্বর ২০০৬
২৭. *ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর ২০০৬
২৮. ওই, ১১ নভেম্বর ২০০৬
২৯. ওই
৩০. *প্রথম আলো*, ১২ নভেম্বর ২০০৬
৩১. ওই, ১৩ নভেম্বর ২০০৬
৩২. ওই, ১৪ নভেম্বর ২০০৬
৩৩. *ইত্তেফাক*, ২০ নভেম্বর ২০০৬
৩৪. *প্রথম আলো*, ২৩ নভেম্বর ২০০৬
৩৫. ওই, ২৪ নভেম্বর ২০০৬
৩৬. *ইত্তেফাক*, ২৬ নভেম্বর ২০০৬
৩৭. *প্রথম আলো*, ২৭ নভেম্বর ২০০৬
৩৮. ওই, ২৮ নভেম্বর ২০০৬
৩৯. ওই
৪০. ওই, ২৯ নভেম্বর ২০০৬

৪১. *ইত্তেফাক*, ৩০ নভেম্বর ২০০৬
৪২. ওই
৪৩. ওই, ২ ডিসেম্বর ২০০৬
৪৪. *প্রথম আলো*, ৩ ডিসেম্বর ২০০৬
৪৫. ওই, ৮ ডিসেম্বর
৪৬. ওই, ১০ ডিসেম্বর ২০০৬
৪৭. ওই, ১২ ডিসেম্বর ২০০৬
৪৮. ওই
৪৯. ওই
৫০. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০০৮)। *বাংলাদেশের তারিখ*, দ্বিতীয় খণ্ড। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪
৫১. ওই
৫২. ওই
৫৩. *ইত্তেফাক*, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৬
৫৪. *প্রথম আলো*, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৬
৫৫. ওই, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৬
৫৬. ওই, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৭
৫৭. *ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৬
৫৮. ওই
৫৯. ওই
৬০. *প্রথম আলো*, ২২ ডিসেম্বর ২০০৬
৬১. *প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৬
৬২. ওই, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬
৬৩. ওই, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৬
৬৪. *ইত্তেফাক*, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৬
৬৫. *প্রথম আলো*, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৬
৬৬. *ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৬
৬৭. *প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬
৬৮. *ইত্তেফাক*, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬
৬৯. *প্রথম আলো*, ৪ জানুয়ারি ২০০৭
৭০. ওই, ৫ জানুয়ারি ২০০৭
৭১. ওই, ৬ জানুয়ারি ২০০৭
৭২. 'পুতুল ইয়াজউদ্দিনই দায়ী থাকবেন', মতিউর রহমান, *প্রথম আলো*, ১০ জানুয়ারি ২০০৭
৭৩. খোদা বখশ চৌধুরী

৭৪. *প্রথম আলো*, ১১ জানুয়ারি ২০০৭
৭৫. ওই
৭৬. *প্রথম আলো*, ক্রোড়পত্র, ১২ জানুয়ারি ২০০৭; রহমান, মতিউর সম্পাদিত (২০০৮)। *প্রথম আলোর* 'মুক্ত সংলাপ : দেশ এখন কোন পথে'। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১১-৪০

## অভ্যুত্থান

১. Ref. ID: 04 DHAKA 3164, Date: 16 September 2004, Time: 4:13 আলম, পৃ. ৭৭-৮০
২. ওই
৩. নূরউদ্দিন খান
৪. Ref. ID: 07 DHAKA 39, Date: 7 January 2007, Time: 11:10, Class: Confidential; আলম, পৃ. ১৬৩-১৬৬
৫. ওই
৬. ওই
৭. Ref. ID: 07 DHAKA 43, Date: 9 January 2007, Time: 11:10, Classification, Confidential, Subject: Ambassador and British High Commissioner Meet with Khaleda Zia Regarding Military Coup; আলম, পৃ. ১৬৬-১৬৯
৮. ওই
৯. Ref. ID: 07 DHAKA 53, Date: 11 January 2007, Time: 08:15, Class: Confidential; আলম, পৃ. ১৫৭-১৭৮
১০. ওই
১১. ওই
১২. Ref. ID: 07 DHAKA 56, Date: 11 January 2007, Time: 09:25, Classification: Confidential, আলম, পৃ. ১৭০-১৭৪
১৩. ওই
১৪. ওই
১৫. ওই
১৬. Ref. ID: 07 DHAKA 66, Date: 12 January 2007, Time: 10:17, Classification: Secret, Subject: Senior Military Official Discusses State of Emergency with Ambassador; আলম, পৃ. ১৭৮-১৮১
১৭. ওই
১৮. '১/১১-এর চূড়ান্ত রূপ : বঙ্গভবনে সেই সময় যা ঘটেছিল,' টিপু সুলতান, *প্রথম আলো*, ১১ জানুয়ারি ২০০৮
১৯. ওই

২০. এ টি এম জহিরুল আলম
২১. সাজ্জাদ হোসেন
২২. আহমেদ, জেনারেল মইন ইউ (২০০৯)। *শান্তির স্বপ্নে : সময়ের স্মৃতিচারণ*। এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, পৃ. ৩২০-৩২২
২৩. ওই, পৃ. ৩২২-৩২৪
২৪. ওই, পৃ. ৩২৪-৩২৭
২৫. ওই, পৃ. ৩২৮-৩২৯
২৬. মইন ইউ আহমেদ
২৭. সরওয়ার জাহান নিজাম
২৮. এস এম মিজানুর রহমান
২৯. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
৩০. চৌধুরী ফজলুল বারী
৩১. খোদা বখশ চৌধুরী
৩২. ফখরুল আজম
৩৩. *The Daily Star*, 18 April 2010
৩৪. ড. মুহাম্মদ ইউনূস, '১০-১১ জানুয়ারি নিয়ে আমার বক্তব্য', *প্রথম আলো*, ২৬ জুন ২০১৮
৩৫. খোদা বখশ চৌধুরী
৩৬. ওই
৩৭. ওই
৩৮. Mukhlesur rahman chowdhury. Webs.com/challengegenmoeen.htm
৩৯. 'প্রতিক্রিয়া : তথ্য ও সংবাদ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য নয়,' মতিউর রহমান, *প্রথম আলো*, ১২ জানুয়ারি ২০০৭
৪০. মনজুরুল আহসান বুলবুল
৪১. *প্রথম আলো*, ১৩ জানুয়ারি ২০০৭
৪২. ফখরুদ্দীনের অস্থির অপেক্ষা, *মানবজমিন*, ৭ জুলাই ২০১৫
৪৩. *The Daily Star*, 13 January 2007
৪৪. হক, সাহাবুল ও আলম, বায়েজীদ (২০১৪)। *বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪*। অবসর, ঢাকা, পৃ. ২১৬
৪৫. *প্রথম আলো*, ১৩ জানুয়ারি ২০০৭
৪৬. ওই, ১৩ এপ্রিল ২০০৭
৪৭. মাহমুদুর রহমান মান্না
৪৮. ওই
৪৯. 'হাসিনার আনন্দ মিইয়ে গেল মুহূর্তেই,' *জনতার চোখে*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৫০. 'খালেদা ডুবলেন দুজনের পরামর্শে,' *জনতার চোখে*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

৫১. ওই
৫২. *প্রথম আলো*, ক্রোড়পত্র, ২০ জানুয়ারি ২০০৭; রহমান (২০০৮), পৃ. ৪১-৬৯
৫৩. 'ড. ফখরুদ্দীনের কাছে প্রত্যাশা : উপদেষ্টা তালিকা উৎসাহজনক নয়,' মতিউর রহমান, *প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০০৭
৫৪. *প্রথম আলো*, ক্রোড়পত্র, ২১ জানুয়ারি ২০০৭
৫৫. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০১৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৯৮
৫৬. *প্রথম আলো*, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৫৭. ওই, ১৩ এপ্রিল ২০০৭

## দমকা হাওয়া

১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'আমাদের গণতন্ত্র', *প্রথম আলো*, ২ নভেম্বর ২০০৬
২. আবদুল আউয়াল মিন্টু
৩. ওই
৪. ওই
৫. ওই
৬. ওই
৭. *প্রথম আলো*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৮. ওই, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৯. ওই, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
১০. ড. কামাল হোসেন, 'জাতিকে বাঁচানো এবং সংবিধানকে রক্ষার জন্যই জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে', *জনতার চোখে*, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ৩৯, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
১১. *প্রথম আলো*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
১২. *মানবজমিন*, ১ মার্চ ২০০৭
১৩. ওই, ৩ মার্চ ২০০৭
১৪. 'রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রজাতন্ত্রের প্রভু নন', *মানবজমিন*, ৪ মার্চ ২০০৭
১৫. 'সিনিয়র নেতাদের তোপের মুখে হাসিনা', *মানবজমিন*, ৫ মার্চ ২০০৭
১৬. *মানবজমিন*, ৬ মার্চ ২০০৭
১৭. *প্রথম আলো*, ১৪ মার্চ ২০০৭
১৮. ওই, ১৫ মার্চ ২০০৭
১৯. আবদুল আউয়াল মিন্টু
২০. *প্রথম আলো*, ১৬ মার্চ ২০০৭
২১. ওই, ১১ মার্চ ২০০৭

২২. ড. আতাউর রহমান, 'বাংলাদেশের নতুন অভিযাত্রা', *জনতার চোখে*, ৮ এপ্রিল ২০০৭
২৩. *প্রথম আলো*, ১১ এপ্রিল ২০০৭
২৪. *ইত্তেফাক*, ৩ এপ্রিল ২০০৭
২৫. *প্রথম আলো*, ৭ মে ২০০৭
২৬. *ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ২০০৭
২৭. ওই
২৮. রহমান, মতিউর (২০০৮) সম্পাদিত। *প্রথম আলোর* মুক্ত সংলাপ : দেশ এখন কোন পথে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১০১-১৩০
২৯. Yunus drops plans to enter politics, *Al Jazeera*, 3 May; 2007, *আমার দেশ*, ৪ মে ২০০৭
৩০. *প্রথম আলো*, ১২ মে ২০০৭
৩১. মাহমুদুর রহমান মান্না
৩২. জাফরুল্লাহ চৌধুরী
৩৩. আবদুল্লাহ আল-মামুন/ এইচ এম সাগর, 'সংস্কারের রূপরেখা চূড়ান্ত; শীর্ষ রদবদলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাদের নিয়ে গঠন করা হচ্ছে পৃথক প্যানেল', *যুগান্তর*, ১৪ জুন ২০০৭
৩৪. ওই
৩৫. ওই
৩৬. *যুগান্তর*, ১৭ জুন ২০০৭
৩৭. ওই
৩৮. ওই
৩৯. ওই
৪০. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'হাসিনাকে রেখেই আওয়ামী লীগে সংস্কার উদ্যোগ', *যুগান্তর*, ১৮ জুন ২০০৭
৪১. *যুগান্তর*, ১৮ জুন ২০০৭
৪২. *প্রথম আলো*, ২৪ জুন ২০০৭
৪৩. ওই
৪৪. ওই
৪৫. ওই
৪৬. *ইত্তেফাক*, ১ জুলাই ২০০৭
৪৭. ওই
৪৮. ওই, ২ জুলাই ২০০৩
৪৯. ওই, ৫ জুলাই ২০০৭
৫০. *প্রথম আলো*, ৩ জুলাই ২০০৭

৫১. ওই
৫২. *ইত্তেফাক*, ৬ জুলাই ২০০৭
৫৩. ওই, ১৩ জুলাই ২০০৭
৫৪. *প্রথম আলো*, ১০ ডিসেম্বর ২০০৭

## ধরপাকড়

১. এস এম মিজানুর রহমান
২. *প্রথম আলো*, ২৭ জানুয়ারি ২০০৭
৩. ওই, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৪. *জনতার চোখে*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৫. Ref ID: 07 DHAKA 198, Date: 5 February 2008, Time: 12.04; আলম, পৃ. ১৮৬-১৮৮
৬. ওই
৭. ওই
৮. বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী, 'জনস্বার্থেই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের শাস্তি হওয়া উচিত', *প্রথম আলো*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৯. *জনতার চোখে*, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ৩৯, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
১০. ওই
১১. *প্রথম আলো*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
১২. ওই, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
১৩. 'সাবেক এমপিরা কে কত টাকার গাড়ি ব্যবহার করেন : শীর্ষে আওয়ামী লীগ', *মানবজমিন*, ১০ মার্চ ২০০৭
১৪. *মানবজমিন*, ১১ মার্চ ২০০৭
১৫. 'তারেক রহমানের হলফনামা : মামুনের দুর্নীতির ভাগ নিয়েছি', *মানবজমিন*, ২০ মে ২০০৭
১৬. 'মামুনের জবানবন্দি', *মানবজমিন*, ১ এপ্রিল ২০০৭; 'Exclusive: Mamun's Interrogation Report', *Probe*, March 23-April 05, 2007
১৭. এ টি এম জহিরুল আলম
১৮. জাফরুল্লাহ চৌধুরী
১৯. কাজী মাজহারুল ইসলাম
২০. *মানবজমিন*, ২০ জুন ২০০৭
২১. নাঈমুল ইসলাম খান, 'আমার দেখা শেখ হাসিনা', *জনতার চোখে*, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ৪৫, ২৯ মার্চ ২০০৭
২২. 'Hasina Sued for Extortion', *The Daily Star*, 10 April 2007

২৩. Hasan Sahid Tushar, 'Hasina says she will face situation on return', *The Daily Star,* 10 April 2007
২৪. 'AL terms case farcial, baseless', *The Daily Stars,* 12 April 2007
২৫. আহমদ, মওদুদ (২০১৩)। *কারাগারে কেমন ছিলাম:* ২০০৭-২০০৮। ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১৭-৬২
২৬. ওই, পৃ. ৮৩
২৭. সরওয়ার জাহান নিজাম
২৮. জাকির হোসেন, 'বাবরের কাছ থেকে ঘুষের ২০ কোটি টাকা আদায় : কোটি কোটি টাকা জমা হচ্ছে সরকারের কোষাগারে', *যুগান্তর,* ১ জুন ২০০৭
২৯. মনির হায়দার, 'রাজসাক্ষী হতে চান মিন্টু', *ইত্তেফাক,* ২ জুন ২০০৭
৩০. ওই
৩১. ওই
৩২. আবদুল আউয়াল মিন্টু
৩৩. *সমকাল,* ২৮ নভেম্বর ২০০৭
৩৪. 'চাঁদাবাজির সিংহভাগ যেত হাওয়া ভবনে', *ইত্তেফাক, ২ জুন ২০০৭*
৩৫. *আমার দেশ,* ৩ জুন ২০০৭
৩৬. *ইত্তেফাক,* ৭ জুন ২০০৭
৩৭. *আমার দেশ,* ৮ জুন ২০০৭
৩৮. *ইত্তেফাক,* ১২ জুন ২০০৭
৩৯. ওই
৪০. *যুগান্তর,* ৩১ মে ২০০৭
৪১. *The Daily Star,* 13 April 2007
৪২. *যুগান্তর,* ৯ জুন ২০০৭
৪৩. ওই, ১০ জুন ২০০৭
৪৪. *প্রথম আলো,* ১১ অক্টোবর ২০০৮
৪৫. চৌধুরী ফজলুল বারী
৪৬. মইন ইউ আহমেদ
৪৭. *প্রথম আলো,* ১৫ জুন ২০০৭
৪৮. ওই, ১৬ জুন ২০০৭
৪৯. ওই
৫০. ওই
৫১. ওই
৫২. ওই, ২৫ জুলাই ২০০৭
৫৩. ওই
৫৪. *ইত্তেফাক,* ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭

৫৫. ওই, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৫৬. ওই
৫৭. *প্রথম আলো*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৫৮. ওই
৫৯. *ইত্তেফাক*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৬০. *ইত্তেফাক*, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৬১. ওই
৬২. 'সহজিয়া কড়চা : পৌষ-পরবর্তী পলিটিকসের পরিস্থিতি', সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রথম আলো*, ২ অক্টোবর ২০০৭
৬৩. *প্রথম আলো*, ৪ অক্টোবর ২০০৭
৬৪. ওই, ২৫ অক্টোবর ২০০৭
৬৫. মইন ইউ আহমেদ
৬৬. *প্রথম আলো*, ২৫ অক্টোবর ২০০৭
৬৭. ওই, ৯ ডিসেম্বর ২০০৭
৬৮. 'সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই', হাসান মশহুদ চৌধূরী, *প্রথম আলো*, ১৫ নভেম্বর ২০০৭
৬৯. ইফতেখারুজ্জামান
৭০. *প্রথম আলো*, ৫ অক্টোবর ২০০৭
৭১. 'বেশি কাজ করতে গেলে মূল উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হবে', *ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৭
৭২. 'সবই ছিল নাজমুল হুদার কথামালা', মনির হায়দার, *ইত্তেফাক*, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭
৭৩. ওই
৭৪. মইন ইউ আহমেদ
৭৫. বদিউর রহমান
৭৬. আহমেদ আলী
৭৭. *ইত্তেফাক*, ৪ ডিসেম্বর ২০০৭
৭৮. 'গল্প করে, বই পড়ে দিন কাটে হাসিনার : একা থাকতে ভালোবাসেন খালেদা', কামরুল হাসান, *প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০০৭
৭৯. ওই
৮০. ওই
৮১. ওই
৮২. ওই
৮৩. *প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭
৮৪. ওই

৮৫. ওই
৮৬. ওই

## মাইনাস টু

১. *প্রথম আলো*, ১৪ মার্চ
২. ওই, ১৫ মার্চ ২০০৭
৩. ওই, ২০ এপ্রিল ২০০৭
৪. ওই, ২১ এপ্রিল ২০০৭
৫. ওই, ২৫ এপ্রিল ২০০৭
৬. ওই, ৮ এপ্রিল ২০০৭
৭. ওই, ১৮ এপ্রিল ২০০৭
৮. ওই, ১৬ মে ২০০৭
৯. ওই, ১৬ এপ্রিল ২০০৭
১০. জাফরুল্লাহ চৌধুরী
১১. *প্রথম আলো*, ২৬ এপ্রিল ২০০৭
১২. ওই, ২৭ এপ্রিল ২০০৭
১৩. ওই, ২৮ এপ্রিল ২০০৭
১৪. শফি ইউ আহমেদ
১৫. *প্রথম আলো*, ২৭ এপ্রিল ২০০৭
১৬. *নয়া দিগন্ত*, ২১ মে ২০০৭
১৭. Ref. ID: 07 DHAKA 1007, Date: 19 June 2007, Time: 08:52, Classification: Confidential, Subject: Pressure Mounts on Two Ladies; আলম, পৃ. ২১৮-২২২
১৮. Ibid
১৯. Ref. ID: 07 DHAKA 1176, Date: 19 July 2007, Time: 08:37, Classification: Secret, Subject: Senior Army Officer British Embassy on Hasina Arrest; আলম, পৃ. ২২৪-২২৩
২০. Ibid
২১. Ibid
২২. *ইত্তেফাক*, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৭
২৩. ওই
২৪. ওই, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭
২৫. ওই, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭
২৬. ওই, ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭
২৭. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

২৮. *প্রথম আলো*, ৩০ অক্টোবর ২০০৭
২৯. ওই, ৩১ অক্টোবর ২০০৭
৩০. ওই, ১ নভেম্বর ২০০৭
৩১. ওই, ৩ নভেম্বর ২০০৭
৩২. ওই, ৪ নভেম্বর ২০০৭
৩৩. ওই, ৬ নভেম্বর ২০০৭
৩৪. ওই, ৭ নভেম্বর ২০০৭
৩৫. ওই, ৮ নভেম্বর ২০০৭
৩৬. *ইত্তেফাক*, ৪ নভেম্বর ২০০৭
৩৭. *প্রথম আলো*, ১৫ নভেম্বর ২০০৭
৩৮. ওই
৩৯. ওই, ১৯ নভেম্বর ২০০৭
৪০. হাফিজ উদ্দিন আহমদ
৪১. ওই
৪২. *প্রথম আলো*, ৫ নভেম্বর ২০০৭
৪৩. *প্রথম আলো*, ২৯ নভেম্বর ২০০৭
৪৪. ওই
৪৫. 'ওয়ান-ইলেভেন ব্যর্থ নয়!' আনোয়ার পারভেজ হালিম, *বাংলা ট্রিবিউন*, ১১ জানুয়ারি ২০১৬
৪৬. ইত্তেফাক, ৫ ডিসেম্বর ২০০৭
৪৭. *ইত্তেফাক*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৪৮. মাহবুবুর রহমান
৪৯. মাহমুদুর রহমান মান্না
৫০. মইনুল হোসেন
৫১. চৌধুরী ফজলুল বারী
৫২. আবুল হাসিব খান
৫৩. *প্রথম আলো*, ১৯ অক্টোবর ২০০৭
৫৪. ওই, ২০ অক্টোবর ২০০৭
৫৫. মইন ইউ আহমেদ
৫৬. আবদুল আউয়াল মিন্টু
৫৭. ওই
৫৮. Ref. ID: 07 DHAKA 500, Date: 19 May 2008, Time: 11:27, Classification: Confidential, Subject: Indias High Commissioner Says Release The Two Ladies, আলম, পৃ. ২৪৭-২৪৮
৫৯. Ibid
৬০. Ibid

## ক্যাম্পাসকাণ্ড

১. *প্রথম আলো*, ১৬ জানুয়ারি ২০০৭
২. ওই, ১৮ জানুয়ারি ২০০৭
৩. ওই, ১৬ জানুয়ারি ২০০৭
৪. ওই, ১৯ এপ্রিল ২০০৭
৫. ওই, ১৯ মে ২০০৭
৬. ওই, ১৬ জুন ২০০৭
৭. ওই, ২৩ আগস্ট ২০০৭
৮. ওই, ১৮ অক্টোবর ২০০৭
৯. ওই, ২৬ আগস্ট ২০০৭
১০. *ইত্তেফাক*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭
১১. ওই, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭
১২. ওই, ৩১ আগস্ট ২০০৭
১৩. সদরুল আমিন
১৪. হারুন-অর-রশিদ
১৫. চৌধুরী ফজলুল বারী
১৬. মইন ইউ আহমেদ

## বিদেশি হাত

১. এ টি এম জহিরুল আলম
২. মইন ইউ আহমেদ
৩. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০১৪)। বাংলাদেশের তারিখ, তৃতীয় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৭
৪. শফি ইউ আহমেদ
৫. Mukherjee, Pranab (2017). The Coalilion Years 1996-2012 Rupa, New Delhi, p. 214
৬. Ibid, p.115
৭. *প্রথম আলো*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৮. ওই, ২ মার্চ ২০০৮
৯. ওই, ৯ মার্চ ২০০৮
১০. মইন ইউ আহমেদ
১১. ওই

## সেনামনস্তত্ত্ব


১. 'Generel Moeen Purge 1/11 Key Players in Power Struggle to Retain Supremacy', Saleem Samad, Counter Currents, CounterCurrents. Org
২. এ টি এম জহিরুল আলম
৩. ফখরুল আজম
৪. মইনুল হোসেন
৫. *যুগান্তর*, ১৮ মে ২০০৭
৬. *প্রথম আলো*, ২৭ মে ২০০৭
৭. মইন ইউ আহমেদ
৮. চৌধুরী ফজলুল বারী
৯. 'Ref. ID: 08 DHAKA 608, Date: 5 June 2008, Time: 08:58, Classification: Secret, Subject: Generel Moeen Consolidates Position: Caretakers Close Deal with Former Prime Ministers; আলম, পৃ. ১৬৩-১৬৭
১০. এ টি এম জহিরুল আলম
১১. ফখরুল আজম
১২. 'Ref. ID: 08 DHAKA 608, Date: 5 June 2008, Time: 08:58, Classification: Secret, Subject: Generel Moeen Consolidates Position: Caretakers Close Deal with Former Prime Ministers; আলম, পৃ. ১৬৩-১৬৭
১৩. মাহবুবুর রহমান
১৪. ফখরুল আজম
১৫. সরওয়ার জাহান নিজাম
১৬. এ টি এম জহিরুল আলম


## বোঝাপড়া


১. *প্রথম আলো*, ১০ মার্চ ২০০৮
২. ওই, ৮ এপ্রিল ২০০৮
৩. ওই, ৯ এপ্রিল ২০০৮
৪. ওই, ১০ এপ্রিল ২০০৮
৫. ওই
৬. ওই, ১৪ এপ্রিল ২০০৮
৭. ওই, ১২ মে ২০০৮
৮. ওই, ১৫ মে ২০০৮

৯. Ref. ID: 08 DHAKA 608, Date: 05 June 2008, Time: 08:58, Classification: Secret, Subject: Generel Moeen Consolidates Position: Caretakers Close Deal With Former Prime Ministers; আলম, পৃ.২৬৫-২৬৭
১০. Ref. ID: 08 DHAKA 607, Date: 06 June 2008, Time: 10:57, Classification: Secret, Subject: Let Sheikh Hasina Travel to the United States-for Now
১১. Ibid
১২. এ টি এম জহিরুল আলম
১৩. Ref. ID: 08 DHAKA 632, Date: 11 June 2008, Time: 12:21, Classification: Secret, Subject: Hasina Released from Prison, Set to Fly to the States June 12
১৪. Ref. ID: 08 DHAKA 656, Date: 12 June 2008, Time: 00:09, Classification: Confidential, Subject: Civilian Leader Says Pragmatism Gaining Headway in Efforts to Resolve Politcal Impasse
১৫. রহমান (২০১৪), পৃ. ৩১
১৬. Ref. ID: 08 DHAKA 656, Date: 18 June 2008, Time: 01:29, Classification: Confidential, Subject: Imprisoned Former PM Khaleda Zia Remains Difficult
১৭. Ref. ID: 08 DHAKA 692, Date: 29 June 2008, Time: 09:37, Classification: Confidential, Subject: Bangladesh Army Chief Keeps His Eyes on the Prize: Elections
১৮. Ref. ID: 08 DHAKA 721, Date: 03 July 2008, Time: 04:35, Classification, Secret, Subject: Bangladesh Military Intelligence Active But Not Very Adept at Politics
১৯. Ibid
২০. Ibid
২১. Ref. ID: 08 DHAKA 873, Date: 13 August 2008, Time: 10:51, Classification: Confidential, Subject: Bangladeshis Caretaker Governments Political Endgame-Cause for Optimism
২২. Ref. ID: 08 DHAKA 928-a, Date: 03 September 2008, Time: 11:00, Classification: Confidential, Subject: Tariq Rahman Released on Bail; আলম, পৃ. ২৮৪-২৮৬
২৩. Ibid
২৪. Ibid
২৫. Ibid
২৬. Ref. ID: 08 DHAKA 982, Date: 16 September 2008, Time: 11:38, Classification: Confidential, Subject: Bangladesh Political Return: The Sheikh Hasina-Khaleda Zia Show in Back on Air

২৭. কাজী মাজহারুল ইসলাম

২৮. Ref. ID: 08 DHAKA 982, Date: 16 September 2008, Time: 11:38, Classification: Confidential, Subject: Bangladesh Political Return: The Sheikh Hasina-Khaleda Zia Show in Back on Air

২৯. Ref. ID: 08 DHAKA 985, Date: 18 September 2008, Time: 07:12, Classification: Confidential, Subject: Caretaker Government Adviser seeks Summit with Sheikh Hasina and Khaleda Zia

৩০. Ibid

৩১. *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮

৩২. Ref. ID: 08 DHAKA 1108, Date: 23 October 2008, Time: 11:01, Classification: Secret, No Form, Subject: COAS Pledges to Bloc IDP Registration: DGFI Promise Broadcast CT Corporation

৩৩. Ibid

## রোডম্যাপ

১. জাতির উদ্দেশে ভাষণ, ড. ফখরুদ্দীন আহমদ, ১২ এপ্রিল ২০০৭

২. *যুগান্তর*, ২৮ এপ্রিল ২০০৭

৩. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের খসড়া সুপারিশমালা, প্রেস ব্রিফিং, ৫ এপ্রিল ২০০৭

৪. ওই

৫. *প্রথম আলো*, ২০ মে ২০০৭

৬. *প্রথম আলো*, ২৯ আগস্ট ২০০৭

৭. ওই

৮. ওই, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭

৯. ওই, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭

১০. ওই, ৩ অক্টোবর ২০০৭

১১. ওই, ২০ অক্টোবর ২০০৭

১২. ওই, ২০ অক্টোবর ২০০৭

১৩. ওই, ৭ নভেম্বর ২০০৭

১৪. ওই, ১৯ নভেম্বর ২০০৭

১৫. ওই, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭

১৬. ওই, ১২ ডিসেম্বর ২০০৭

১৭. ওই, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

১৮. ওই, ১৮ মার্চ ২০০৮

১৯. ওই, ২৩ এপ্রিল ২০০৮

২০. ওই, ২৮ জানুয়ারি ২০০৮, ২৩ মে ২০০৮
২১. *ইত্তেফাক*, ২৪ মে ২০০৮
২২. *প্রথম আলো*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮
২৩. ওই, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮
২৪. ওই, ২১ নভেম্বর ২০০৮
২৫. ওই, ৬ নভেম্বর ২০০৮
২৬. ওই, ৭ নভেম্বর ২০০৮
২৭. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন
২৮. *প্রথম আলো*, ১৫ নভেম্বর ২০০৮
২৯. ওই, ১৮ নভেম্বর ২০০৮
৩০. ওই, ২১ নভেম্বর ২০০৮

## প্রস্থান

১. *ইত্তেফাক*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১
২. *নয়া দিগন্ত*, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৩. *আমার দেশ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৪. মইনুল হোসেন
৫. *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৬. Ref. ID: 08 DHAKA 1120, Date: 27 October, 2008, Time: 10;40, Classification: Confidential, Subject: Khaleda Zia Consolidates Leadership and BNP Adjustis to Life after Tarique Rahman
৭. ওই
৮. ওই
৯. ওই
১০. ওই
১১. Ref. ID: 08 DHAKA 1140, Date: 03 November, 2008, Time: 10;08, Classification: Confidential, Subject: Visas Dankey comption 212 (F) Rahman, Tarique)
১২. ওই
১৩. Ref. ID: 08 DHAKA 1158, Date: 10 November, 2008, Time: 00;52, Classification: Confidential, Subject: Confident and Relaxed, Sheikh Hasina Looks to Elections and Prepares to Govern
১৪. ওই
১৫. ওই
১৬. ওই

১৭. ওই
১৮. প্রথম আলো, ২২ নভেম্বর ২০০৮
১৯. Ref. ID: 08 DHAKA 1349, Date: 28 December, 2008, Time: 09;29, Classification: Confidential, Subject: Caretaker Government Prepares for Elections and Transition; Expets Awami Leage Victory
২০. আহমদ (২০১৬), পৃ. ৩০০
২১. *প্রথম আলো,* ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮
২২. আহমদ (২০১৬), পৃ. ৩০১
২৩. ওই
২৪. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন
২৫. 'টেলিফোনে রাগের মাশুল', *মানবজমিন,* ৬ জুলাই ২০১৫
২৬. মইন ইউ আহমেদ

## পোস্টমর্টেম

১. 'স্বপ্নের বাংলাদেশ, বাস্তবের বাংলাদেশ', মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *প্রথম আলো,* ১৫ নভেম্বর ২০০৭
২. *ইত্তেফাক,* ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৩. ওই, ৪ অক্টোবর ২০০৭
৪. 'সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তু তৈরি করে অগ্রগতি কি সম্ভব'? আবুল মোমেন, *প্রথম আলো,* ১৫ অক্টোবর ২০০৭
৫. 'সংস্কার নয়, পরিবর্তন চাই', বশীর আল-হেলাল, *প্রথম আলো,* ১৫ নভেম্বর ২০০৭
৬. 'যে স্বপ্ন আমরা সংবিধানে লিখেছিলাম', ড. কামাল হোসেন, *প্রথম আলো* বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৫ নভেম্বর ২০০৭
৭. '২০০৭ সালের বাংলাদেশ', অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, *ইত্তেফাক,* ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭
৮. *প্রথম আলো,* ২৭ নভেম্বর ২০০৭
৯. মোহাম্মদ আলী তসলিম
১০. *প্রথম আলো,* ৬ ডিসেম্বর ২০০৭
১১. *ইত্তেফাক,* ১০ ডিসেম্বর ২০০৭
১২. মইন ইউ আহমেদ
১৩. Ref. ID: 08 DHAKA 584, Date: 1 June 2008, Time: 10:47, Class: Confidential; আলম, পৃ. ২৫০-২৫৫
১৪. Ibid
১৫. Ibid

১৬. মনজুরুল আহসান বুলবুল
১৭. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
১৮. বেগম খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎকার, *নয়া দিগন্ত*, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮
১৯. *ইত্তেফাক*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১
২০. Org-Quest Limited. National Opinion Survey-December 2007: Report. Dhaka, 2 January 2010
২১. Ibid
২২. Ibid

## উপসংহার

১. 'রাজা প্রজা : ইংরেজ ও ভারতবাসী,' *রবীন্দ্র রচনাসমগ্র*, খণ্ড ৫, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃ. ৬২৩
২. *আমার দেশ*, ২০ জানুয়ারি ২০০৮; *যুগান্তর*, ২০ জানুয়ারি ২০০৮
৩. 'কেন প্রতিচিন্তা', মতিউর রহমান ও বিনায়ক সেন, *প্রতিচিন্তা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ. ১৭
৪. 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ও গণতন্ত্র', নুরুল ইসলাম, *প্রতিচিন্তা*, ওই, পৃ.২৯
৫. ওই, পৃ. ৩৩-৩৪

# যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

**আবদুল আউয়াল মিন্টু** : এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি। মাল্টিমোড গ্রুপের চেয়ারম্যান। ১৪ জুন ২০১৮

**আবুল হাসিব খান** : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থার নির্বাহী প্রধান। ৬ জুন ২০১৮

**আহমদ আলী** : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য। ২৭ এপ্রিল ২০১৬

**ইফতেখারুজ্জামান** : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক। ২৬ এপ্রিল ২০১৬

**এ টি এম জহিরুল আলম** : লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.)। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সাবেক কমান্ড্যান্ট। লাইবেরিয়ায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের সাবেক ফোর্স কমান্ডার। ১ মে ২০১৮

**এস এম মিজানুর রহমান** : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক কমিশনার, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সাবেক মহাপরিচালক। ২৭ এপ্রিল ২০১৮

**কাজী মাজহারুল ইসলাম** : চিকিৎসক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক। শাহাবুদ্দীন মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ। ৭ জুলাই ২০১৮

**খোদা বখশ চৌধুরী** : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক। ২ অক্টোবর ২০১৫, ২৭ জুন ২০১৮

**চৌধুরী ফজলুল বারী** : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, ডিজিএফআইয়ের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সাবেক পরিচালক। ১৯-২০ অক্টোবর ২০১৭

**জাফরুল্লাহ চৌধুরী** : চিকিৎসক, সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি। পিপলস হেলথ অ্যাসেম্বলির সংগঠক। মাসিক গণস্বাস্থ্য-এর সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি। ১ আগস্ট ২০১৮

**দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য** : সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো, সাবেক নির্বাহী পরিচালক। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

**নূরউদ্দিন খান** : লে. জেনারেল (অব.), সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত সদস্য ও মন্ত্রী। ৭ আগস্ট ২০১৮

**ফখরুদ্দীন আহমদ** : সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর। ৩১ অক্টোবর ২০১৭

**ফখরুল আজম** : এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.)। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ। ১৯ মে ২০১৮

**বদিউর রহমান** : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮

**মইন ইউ আহমেদ** : জেনারেল, সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ। ২৫, ২৬, ৩০ অক্টোবর ২০১৭, ২৯ জুন ২০১৮

**মইনুল হোসেন** : আইনজীবী। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা। ৮ এপ্রিল ২০১৮

**মনজুরুল আহসান বুলবুল** : সাংবাদিক। একুশে টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি। ১৩ আগস্ট ২০১৮

**মাহবুবুর রহমান** : লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.)। সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

**মাহমুদুর রহমান মান্না** : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি, আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। বর্তমানে 'নাগরিক ঐক্য'-এর আহ্বায়ক। ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

**মোহাম্মদ আলী তসলিম** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, বেটার বিজনেস ফোরামের সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক পরিচালক। ১৩ জুন ২০১৬

**শফি ইউ আহমেদ** : সাবেক রাষ্ট্রদূত। ২৭ এপ্রিল ২০১৬

**শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন** : বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান। প্রথম জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ, সাবেক মন্ত্রী। ৯ অক্টোবর ২০১৫

**সদরুল আমিন** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি, কলা অনুষদের সাবেক ডিন ও ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। ৪ মে ২০১৬

**সরওয়ার জাহান নিজাম** : ভাইস অ্যাডমিরাল (অব.)। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ। ১ জুন ২০১৮

**সাজ্জাদ হোসেন** : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, জাতীয় ছাত্রসমাজের সাবেক সভাপতি। সেন্টার ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল স্টাডিজ (সিএনআরএস) এবং বাংলাদেশ পারসপেকটিভ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (বিপিআরএফ) প্রধান নির্বাহী। ১২ অক্টোবর ২০০৮

**সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম** : মেজর জেনারেল (অব.)। বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির সভাপতি। ২৫ এপ্রিল ২০১৮

**হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম** : সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর। সাবেক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান। ৭ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

**হারুন-অর-রশিদ** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সহসভাপতি, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ৩০ আগস্ট ২০১৭

# নির্ঘণ্ট

## ই